গৌর ভাগবত

১ম খণ্ড

অশ্বিনী কুমার সাহা

পরিবেশক :

॥ সাহা বুক স্টল ॥
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলি— ৭০০০৭৩

॥ প্রাণ গোপাল প্রেস ॥
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার
পিন— ৭৩৬১৪৬

গোলকগত পিতৃদেবকে

ঃঃ সূচীপত্র ঃঃ

বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা ও ন্যায়ের ওপর টীকা রচনা। সেই টীকা রঘুনাথের মান বজায় রাখার জন্য গঙ্গায় নিক্ষেপ। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীর সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের তর্ক যুদ্ধ। সমস্ত জনসমাজের সঙ্গে শাস্ত্র ধারীদের যোগ বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্কল্প নিলেন নিমাই। কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ। প্রেমের দৃষ্টিতে যীশু, বুদ্ধ ও মহম্মদ। গয়ায় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পুরীর কাছ থেকে দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ। গৌরসুন্দরের ভাবান্তর ; নবদ্বীপে প্রত্যাগমন ও কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা ভাব। শ্রীবাস অঙ্গনে নিত্য নাম সংকীর্তন। নন্দনাচার্যের গৃহে অবধূত নিত্যানন্দের সঙ্গে নিমাইয়ের মিলন। ভক্তির স্বরূপ। নামের সাহায্যে সাম্য ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। নাম কীর্তনের মাহাত্ম্য। গৌরসুন্দর কর্তৃক নামকীর্তন সমগ্র জনসমাজে প্রতিষ্ঠা। নিত্যানন্দ ও হরিদাস কর্তৃক দ্বারে দ্বারে নাম বিতরণ। জগাই মাধাই উদ্ধার। চাঁদকাজী দলন। গণ আন্দোলনের পুরোধা গৌরসুন্দর। যুগানুযায়ী সাধন ভজন। পদ্ধতির পরিবর্তন— সহজতম পথ নির্দেশ— নাম সংকীর্তন। গৌরচন্দ্রই কৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীবাস গৃহে প্রভুর সপ্ত প্রহরীয় ভাব। গোপী প্রেমের স্বরূপ। গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ।

পৃঃ ৪২ — ১৪৭

চতুর্থ অধ্যায় ঃ সলীল শচীসুত কাটোয়ায়

কেশব ভারতীর নিকট নিমাইয়ের সন্ন্যাস, দীক্ষা গ্রহণ ও নাম-করণ। ব্রজ পথে ধাবমান হলেন নিমাই। ছলে নিতাই কর্তৃক

ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ভ্রমসংশোধন। মল্লারদেশের ভট্টমারী-দের উদ্ধার। শঙ্কর ও মধ্ব দুই আচার্য সম্প্রদায়ের ভ্রান্তিমোচন। পাণ্ডুপুরে রঙ্গপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ উদ্ধার। নীলাচলে প্রত্যাবর্তন।

পৃঃ ৪৬৩ — ৫০১

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ বৈষ্ণব মিলন

প্রভুর দক্ষিণ দেশের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ। বৎসরান্তে নীলাচলে প্রভুর প্রত্যাবর্তন। কটকরাজের প্রভুদর্শনের প্রবল ইচ্ছা— রাজা ও সার্ব্বভৌমের মধ্যে কথপোকথন। প্রভুর বাসস্থানের ব্যবস্থা। প্রভু, নিত্যানন্দ, সার্বভৌম, জনার্দন, কৃষ্ণদাস, শিখি মাহিতি, জগন্নাথ দাস, প্রদ্যুম্ন মিশ্র. মুরারি মাহিতি. চন্দনেশ্বর, বিষ্ণুদাস, পরমানন্দ ও রাযভবানন্দ। প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ নদীয়ায় প্রেরণ। নবদ্বীপে পরমানন্দপুরী, স্বরূপ, দামোদর। প্রভুমাধুর্য 'রসদয়া' ভক্তিরস দান করে। প্রভুর দুই অন্তরঙ্গ জন স্বরূপ ও রায়রামানন্দ। জাতপাতের কুসংস্কার সার্বভৌমের মন থেকে বিলুপ্ত করলেন প্রভু। ব্রহ্মা-নন্দ ভারতীকে বসন বিষয়ে শিক্ষাদান। ভারতী ও প্রভুর মধ্যে কথপোকথন। সবশেষে প্রভুদর্শনে কাশীশ্বর গোঁসাই।

পৃঃ ৫০২ — ৫২২

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ উড়িয়া গৌড়ীয়া যত গৌর ভক্তবৃন্দ

রাজার প্রভুদর্শনের ইচ্ছা প্রভুকে সার্বভৌম কর্ত্তৃক জ্ঞাপন।

দুই দুরাত্মার দুর্দশা। নিমাই ও জনৈক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। সন্দেশ ফেলে মাটি ভক্ষণ। কান্না সহজে থামে না, কিন্তু হরিনামে কান্না থামে। হিরণ জগদীশের ঘরে নৈবেদ্য ভক্ষণ। বিচিত্র লীলা মাধ্যমে শৈশব, পৌগণ্ড কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে নদীয়া লীলা। ভগবান যীশু ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ। ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যেরা। প্রভু ও তাঁর পরিকরগণ। মুখ্য ভূমিকায় নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, ঠাকুর হরিদাস, মুকুন্দ, মুরারী, জগদানন্দ, চন্দ্রশেখর, স্বরূপ, রামানন্দ, সার্বভৌম প্রমুখ। সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বছর পূর্ণ। জন্মভূমি দর্শনের বাসনা। পানিহাটির রাঘব ভবন। কামারহাটি। শিবানন্দের গৃহ। বাচস্পতির গৃহ। রামকেলি— সাকর মল্লিক ও দবির খাস। শান্তিপুর অদ্বৈতালয়। শচীমাতার আগমন। কানাইয়ের নাটশালা। রঘুনাথ। ভক্তের ইচ্ছায় বৃন্দাবন যাত্রা স্বল্পকালের জন্য স্থগিত।

গৌর চন্দ্রিকা

একটা জাতি অবক্ষয়িত হলেই পরবশতার শিকার হয়, না পরবশতার পর অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে পড়ে, না কি দুই-ই সমান ভাবে সত্য এ প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা দুরূহ। বোধকরি আমাদের পক্ষে দুই-ই সমান সত্য। ভারতে বিদেশীদের হানা সেই প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এমন কি যে মহৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আমরা উত্তরাধিকারী বলে গৌরব বোধ করি সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির জনক যে আর্যগণ তাঁরাও অনেকের মতে বহিরাগত। অবশ্য আর্যরা বহিরাগত কিংবা এই দেশেরই সে প্রশ্নের উত্তর পণ্ডিত গবেষকগণের বিচার্য।

আমাদের ইতিহাস না থাকলেও আমাদের একটা অতি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে এবং এক পরমাশ্চর্য সাহিত্য আছে সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত হয়ে। এই সাহিত্য অনুশীলন করলে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে খৃষ্টের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে খৃষ্টীয় প্রায় দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ শিল্পকলা স্থাপত্য, সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতটা উন্নতি করেছিল, উন্নতির সেই পর্যায়ে উপনীত হতে য়োরোপীয় গ্রেকো রোমান সভ্যতাকে প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর কাল লেগেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের একখানি গ্রন্থ আছে যার নাম প্রবোধ চন্দ্রোদয়। অনেকেই মনে করেন এই প্রবোধ চন্দ্রোদয় গ্রন্থের পরেই ভারতীয় মনীষা-প্রাচীন গরিমা অস্তগত হয়েছে। এর পূর্বে যে সমস্ত বিদেশী হানাদার ভারতে এসেছে বা তার কোন কোন অংশ জয়ও করেছে, তারা সাময়িক ভাবে জয়ী হয়েও পাকপাকি ভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের কাছে, ভারতীয় মনীষার কাছে পরাভব স্বীকার করে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলস্রোতের মধ্যেই নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির তখনও আত্মিকরণের ক্ষমতা ক্রিয়াশীল ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মুসলমান বিজয়ের পর থেকেই এর ব্যতিক্রম শুরু হল বলা যায়। এর কারণ সমকালীন সাহিত্য পাঠ করলে সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতি তার জঙ্গম শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বলেই বিদেশী সংস্কৃতির স্বাঙ্গীকরণ ক্ষমতা তার অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বীরবল প্রমথ চৌধুরীর একটি সনেটের দুটি ছত্র থেকে তুর্কি বিজয়ের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

আদিরসে দেশ ভাসে, অজয়ে জোয়ার।
বঙ্গভূমি পদে দলে, তুরস্ক শোয়ার।

আমরা যেন চোখের সামনে দেখতে পাই বিদেশী হানাদারগণ ভারতবর্ষকে কেবল পদদলিত নয় বিধ্বস্ত করে ফেলছে। ভিতরে ভিতরে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল এবং সংস্কৃতি তার জঙ্গমশক্তি হারালেই অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অবক্ষয় ও পরবশতার যুগপৎ অভিঘাতে ভারতীয় জীবন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সমাজ বেতসবৃত্তি ও কূর্মবৃত্তি আশ্রয় করে কোনক্রমে তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। বেতসবৃত্তি আশ্রয়ের ফলে ভারতীয় সমাজে কপটতায় নিপুণতাই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ

পরিচয় বলে বিবেচিত হত। এবং কূর্মবৃত্তি আশ্রয়ের ফলে বহির্বিশ্বের মুক্ত আবহাওয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারত এক অন্ধ অচলায়তনে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

পরবশ তার প্রায় মধ্য লগ্নে আবির্ভূত হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ; নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের পুত্র গৌর বা গৌরাঙ্গ বা শচীদেবীর আদরের নিমাই। বস্তুত গৌর, গৌরাঙ্গ, গোরা বা নিমাই কিংবা চৈতন্য, মনে হয় বাংলার এই একান্ত আপনজনকে বাঙালী যেন কোন একনামে ডেকে তৃপ্ত নয়, নয়ত বিশ্বম্ভর মিশ্র পুরন্দরের এত অজস্র নামকরণ হবে কেন ? আমরা যাকে ভালবাসি, যাকে আমরা পরাণের ধন বলে মনে করি, তাঁকে আমরা একনামে ডেকে তৃপ্ত হইনা। গৌরাঙ্গের নামের এই বহুবাহুল্যই তাঁর সার্বজনীন আকর্ষণের প্রাথমিক নিদর্শন।

গৌরের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কাল বাঙালীর জীবনে এক অতি সংকট মুহূর্ত। তমিস্রার তিমির ফলকে আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে প্রকটিত হয়। বাঙালীর সংস্কৃতির সেই অমানিশায় গৌরের আবির্ভাব তাই এমন জ্যোতিষ্মান।

যখন দিগন্তের কোন প্রান্তে আশার এতটুকু ক্ষীণরশ্মি অবশিষ্ট ছিলনা, তখন সেই মহাসংকট মুহূর্তে প্রেমের ঠাকুর গৌরহরি যেন নবোদিত সূর্যের মত আবির্ভূত হলেন। প্রভাতের সূর্য যেন নিজের মহিমায় নিজেই ভাস্বর। কেবল তিনি যে স্বয়ং ভাস্বর তাই নয়, তিনি তাঁর নিজের মহিমায় বিশ্বচরাচর আলোকিতও করেন। সবিতার এই মহামহিম অবির্ভাবকে প্রচারিত করবার জন্য তো কোন প্রচার যন্ত্রের ঢক্কানিনাদের প্রয়োজন হয় না। গৌর হরির অরুণ বিভাসিত মহিমাই নবোদিত সূর্যের মত সেদিন সকলকে কেবল আলোকিত নয়,

পুলকিতও করেছিল। এবং আজও সেই গৌরমহিমা অমলিন। আজও তা গৌড় জনের চিত্ত ক্ষেত্রকে নিগূঢ় প্রাণ রসে অভিসিঞ্চিত করে রেখেছে— বলা যায় সঞ্জীবিত করে রেখেছে। বোধকরি এমনি করেই গৌর তাঁর নিত্য লীলার ধারাটি অব্যাহত রেখেছেন।

গৌরের দিব্য জীবন বাঙালীর মহোত্তম উত্তরাধিকার। এই জন্যই গত প্রায় পাঁচ শত বৎসর ধরে বাঙালী কি গানের মধ্যে কি পালাকীর্ত্তনের মধ্যে, কি জীবনীর মধ্যে, কি নাটকের মধ্যে, বারং বার নানাভাবে গৌরকথা বলে আসছে—বলা যায় বাংলা সাহিত্যে গৌরের আবির্ভাব এক নবদিগন্তের সূচনা করেছিল। কেননা গৌরের পূর্বে বাংলায় কোন জীবনী সাহিত্য ছিল না। গৌরের আবির্ভাব থেকেই সাহিত্যের এই নবধারাটির সংযোজন ঘটেছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে গৌর এক অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন এই কারণে যে গৌরের প্রাথমিক জীবনীকারদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন। গৌর পদ তরঙ্গিনীতে এমন অনেক পদ ধৃত হয়েছে যা প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভবপ্রসূত এবং এই কারণেই এত মর্মস্পর্শী। ভগবান বুদ্ধ বা ভগবান যীশু খৃষ্টের জীবনের এমন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সমৃদ্ধ জীবনী এবং সংগীতের এই প্রাচুর্য থেকে গৌরজীবনের যে জ্যোতির্ময় আলেখ্যটি ফুটে ওঠে তা সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত বলেই আমাদের অন্তর্লোকে এমন অনায়াসে প্রবেশ করে আমাদের চিত্ত ক্ষেত্রকে যেন অভিষিক্ত করে।

গৌরের নিত্যলীলার যেমন অন্ত নেই তেমনি গৌরজীবন কথারও অন্ত নেই। এ যেন সেই কথা, শেষ নাই যে, শেষ কথা কে বলবে।

সমকালীন লেখকদের মধ্যে আছেন অনেকেই। তাদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস প্রধান। ঠিক সমকালীন না হলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মহৎ গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃতকেই বলা যায় চৈতন্য-লীলার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেখ্য। কবিরাজ গোস্বামী তার বিরাট পাণ্ডিত্য দিয়ে তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি দিয়ে, সর্বোপরি তার প্রেম ভক্তি দিয়ে যে গৌরাঙ্গকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সেই গৌরাঙ্গই হচ্ছেন বাঙালীর পরাণের পরাণ নীলমণি যাঁকে লক্ষ্য করে বাঙালী কীর্তনীয়া গেয়েছেন 'সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর।' কবিরাজ গোস্বামী তার পুণ্য গ্রন্থে যে তত্ত্বটি উপস্থাপিত করেছেন তা হচ্ছে গৌর আবির্ভাবের তাৎপর্য। গৌর এবং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অদ্বয়তা প্রতিপন্ন করতেই যেন কবিরাজ গোস্বামী তার লেখনী ধারণ করেছিলেন।

শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণই নবরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কৃষ্ণই হয়েছেন গৌর, হয়েছেন গৌরাঙ্গ। কিন্তু কেন? সেই কেনর উত্তরও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার ঐ গ্রন্থে বিপুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ উপস্থাপিত করেছেন। রসো বৈ সঃ। ভগবান সর্বরসেরই আধার। কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম বলেই ব্রহ্মরস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত। নরদেহে গৌর সেই ব্রহ্মরস আস্বাদনের জন্যই শ্রীরাধাভাবে ভাবিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ভগবানই ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। রাধা তত্ত্বের মূলকথাটি হচ্ছে যে রাধা হচ্ছেন আরাধিকা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তিন রাধা: কাম রাধা, প্রেম রাধা এবং নিত্য রাধা। নিত্য রাধা চলেছেন নিত্য অভিসারে যেন জীবাত্মা চলেছে পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সেই মিলনের যে রস, সেই রসই ব্রহ্মরস। গৌর চলেছেন

রাধার নিত্য সমাগমে — অনন্ত অভিসারে। শ্রীরাধার মহিমা ও প্রেমরস সীমা জানাতেই গৌর অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রজদেবী শ্রীরাধা হচ্ছেন পরমাসাধিকা বা আরাধিকা বা সকল আরাধনার মূর্তিময়ী প্রতীক।

পূর্বেই বলেছি যে গৌরের আবির্ভাব কালটা নানাকারণে বাঙালীর জীবনে এক অতি সংকটময় মুহূর্ত। ষড়দর্শনের ষড়জালে বাঙালীর মন যেন কুরুপিতামহ ভীষ্মের মত শর শয্যায় আপন মনীষার অস্তাচল গমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। স্মার্ত ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত গণের শাস্ত্রের শস্ত্রাঘাতে বাঙালীর জীবন শতধা খণ্ডিত হয়ে পড়েছিল। আবার তান্ত্রিক কাপালিকের আচার উপচার ও অভিচারের আধিক্যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এক বিভীষিকাময় তিমির রজনী নেমে এসেছিল। এই কালরাত্রে গৌর তাঁর প্রেমের বন্যায় তাঁর প্রাণের আলোকে ষড়দর্শনের ষড়জাল ভেদ করে এক স্বর্ণ উষার আবির্ভাব সম্ভব করেছিলেন। সেই প্রেমের আলোকে বাঙালীর আত্মসাক্ষাৎকার ঘটেছিল। সেই প্রেমের আলোকে বাঙালী তার প্রাণের পুরুষকে গৌরের মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছিল। গৌর এবং গৌড়জন যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। এই খানেই গৌর মহিমার একান্ত পরিচয়।

অতএব গৌর নৈয়ায়িক ছিলেন, কি স্মার্ত ছিলেন, কি বৈয়াকরণ ছিলেন এ প্রশ্ন অবান্তর। গৌর ছিলেন প্রাণের পুরুষ, গৌর ছিলেন অন্তরের পুরুষ। যে মোহনায় ভক্ত ও ভগবান একত্রে এসে মিশেছে, গৌর ছিলেন তারই পথের দিশারী। গৌর তাঁর অন্তরের অভেদ দিয়ে বাইরের প্রভেদ ও বিভেদকে প্রাণের সেই মোহনায় এনে মিলিত করেছিলেন যেখানে স্রষ্টার মধ্যে সৃষ্টি তার স্থিতি ও মহালয় প্রাপ্ত হয়।

গৌরের প্রেমরসধারা সংগীত রসের মধ্যেই তাঁর মুক্তি খুঁজে পেয়েছিল। তাঁর প্রেমবন্যা সংগীতের সুরধুনীর মধ্যে তার পরম পরিণতি লাভ করেছিল। সেইজন্যই গৌর তাঁর কথাকে জটিল দার্শনিক তত্ত্বে নিবদ্ধ না রেখে কীর্ত্তন ও নর্ত্তনের মাধ্যমে তার বিকাশের ধারা, তার প্রকাশের পথ খুলে দিয়েছিলেন। যখন আচারের মরু বালুরাশি বিচারের স্রোতঃ পথকে রুদ্ধ করে জাতির পৌরুষকে শতধা বিদীর্ণ করে দিয়েছিল তখন গৌর এই প্রেমভক্তি দিয়ে মানুষের চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করেছেন। এক মৃতপ্রায় জাতির জীবনে প্রাণ সঞ্চার করে গৌর সেই জাতিকে দিয়ে গেছেন তাঁর দিব্য জীবনের উত্তরাধিকার। এই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। বিমূঢ় জাতি হঠাৎ তার সংবিৎ ফিরে পেয়েছিল এবং এই জন্যই গৌর আজও বাঙালীর মনে এমন অনন্য মহিমায় অধিষ্ঠিত।

বাঙালী গত কয়েকশত বৎসর ধরেই নানাভাবে তার প্রাণ পুরুষের কথা বলেছে। আগেই উল্লেখ করেছি গৌর জীবনীকারদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্যকে ইতিহাসে আবিষ্কার করেন নি। তাঁর শ্রীচৈতন্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন অন্তর লোকে, তাঁর অনুভবের মধ্যে, তাঁর উপলব্ধির মধ্যে। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ কতখানি ইতিহাস বা কতখানি উপন্যাস এ বিতর্ক অবান্তর, যেমন গোস্বামী তুলসীদাসের রামচরিত মানসের সত্যতা বাল্মীকি রামায়ণে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। গোস্বামী তুলসীদাসজীর রামচরিত মানস প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরে উত্তর ভারতের মনোভূমিকে প্রেমরসে অভিষিক্ত করে রেখেছে। ঠিক তেমনি কবিরাজ গোস্বামীর এই

মহৎ গ্রন্থখানি প্রেমভক্তি সম্পদে সমৃদ্ধ বলেই বাঙালীর মানসলোকে আজও এমন দেদীপ্যমান।

আনন্দের কথা বর্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীঅশ্বিনী কুমার সাহা কবিরাজ গোস্বামীর সেই প্রেমভক্তির ধারাটি অনুসরণ করেই তাঁর গৌরকথা উপস্থাপন করেছেন। অশ্বিনী কুমার গৌরভাবে ভাবিত ও গৌরগত প্রাণ ব্যক্তি। কথকতার মনোহর ভঙ্গীতে একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবে তিনি তাঁর ভাবের গৌরাঙ্গকে, তাঁর প্রাণের গৌরাঙ্গকে, তাঁর প্রেমের গৌরাঙ্গকে তুলে ধরেছেন। অশ্বিনী কুমার জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিশয় পারঙ্গম। তাঁর গৌরকথায় অসামান্য বিদ্যার জৌলুস থেকেও তাঁর ভক্তির মাধুর্য তাঁর প্রজ্ঞার গভীরতা পাঠককে মুগ্ধ করবে। প্রত্যয় সঞ্জাত বলেই তাঁর গৌরকথা এমন গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে।

এই আশা নিয়ে আমার এই সংক্ষিপ্ত গৌর চন্দ্রিকার এই খানেই ইতি টানছি যে তাঁর গৌরকথা গৌড় জনের কাছে আদৃত হবে, যেমন আদৃত হয়েছে মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের অমিয় নিমাই চরিত। অশ্বিনী কুমারের গৌরকথা পড়তে পড়তে বারংবার মনে হয় যেন গৌরের প্রত্যক্ষ পুণ্য সান্নিধ্য অনুভব করা যাচ্ছে। বোধকরি এখানেই অশ্বিনী কুমারের গ্রন্থের পরম সার্থকতা।

—প্রফুল্ল হোড় রায়

ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, পিপল্‌স (জনতা) গভর্ণমেণ্ট কলেজ, রাণীপুর,
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, গভর্ণমেণ্ট হিন্দি টিচারস ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, মাথাভাঙ্গা কলেজ, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

উপক্রম

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন এক জায়গায় বলেছিলেন— পৃথিবীতে প্রেম একবারই মূর্ত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা শ্রীচৈতন্য রূপে। কথাটা সর্বাংশে সত্য। অধরা একবারই এই ধূলার ধরণীতে সার্বজনীন রূপে এসেছিলেন ধরা দিতে। বাংলার তথা ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর জীবনে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক অভাবনীয় ঘটনা। কয়েক শতাব্দী যাবৎ সে ঘটনার জের চলেছে। আজও যাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্ব সংকট মোচনে স্মরণীয়— তিনি বিশ্বনায়ক, প্রেমময় শ্রীমন্ মহাপ্রভু। এই নামেই তো আমরা তাঁকে চিনতে অভ্যস্ত। আজও যাঁর মূল্যায়ন করে চলেছেন অনুসন্ধিৎসুরা, যাঁর প্রয়োজন আজও যায় নি ফুরিয়ে, যাঁর উপদেশ আজও আনে ধূলিমলিন পৃথিবীর বুকে শান্তির স্নিগ্ধতা, যাঁর উদাত্ত আহ্বান আজও জাগায় নিপীড়িতের বুকে আশার আলো, যাঁকে লক্ষ্য করে আজও এগিয়ে চলে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ, তিনি জন-গণ-মন-অধিনায়ক প্রেম মূরতি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে আজ পাঁচশ বছর পিছনে ফেলে এসেছি আমরা সেই বিশ্বপথিকের আবির্ভাব লগ্নকে। অনেক

অজানা রহস্য, অজানা তথ্য, অজানা ইতিহাসের আলো-আঁধারিতে ঘেরা সেই আশ্চর্য জীবন। যাঁর স্মরণে ভক্ত পান সজীবতা, নিপীড়িত পান উদ্যম, ভ্রান্ত পথিক পান আলোর নিশানা, রাজনীতি-বিদ পান পথের সন্ধান, প্রেমিক পান প্রেমরস, সেই মহাপথিককে নিয়ে আজও রচিত হয় জীবনী কাব্য, রচিত হয় লোকগাথা, সুরকার বাঁধে সুর, গীতিকার বাঁধে গান, বিরহী খুঁজে বেড়ান ঐ আশ্চর্য জীবনের মধ্যে তাঁর 'আশ্চর্য' অধরাকে। সে যে 'অশেষ' তাই তো শেষ নেই তাঁর, শেষ নেই শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত বিষয়ের।

বাংলা সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ শ্রীচৈতন্য হলেও তাঁর "আশ্চর্য-জীবন" নিয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ আধুনিক যুগে নেই বললেই চলে। তন্মনস্কতার অভাবই বোধ হয় এর কারণ। অথবা বাঙালীর সত্তার সঙ্গে যিনি জড়িয়ে গিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কারণ যাইহোক, সংখ্যাল্প জীবনী গ্রন্থ সকলের তৃষ্ণা মেটায় না। "ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ"— অশ্বিনী বাবুর প্রচেষ্টা তাই ধন্যবাদের যোগ্য। জীবনের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে অশ্বিনীবাবু আশ্চর্য জীবনকে নিয়ে ভেবেছেন অনেক। তাঁর সেই ভাবনার প্রতিফলন এই গ্রন্থে। হয়ত ভাবুক, ভক্তি রসিকের কাছে এই গ্রন্থ ততখানি আদর পাবে না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে সাধারণ মানুষ যারা 'গৌর' বলতে বিচলিত হন, জানতে চান, সংস্কৃত জ্ঞান যাদের অপ্রতুল, তাদের কাছে এই গ্রন্থ আদর পাবে। চাঁদামামা যেমন সকলের মামা, মহাপ্রভু তেমনি সকলের। সার্বজনীন করে মহাপ্রভুকে আধুনিক যুগে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অশ্বিনীবাবুর এই প্রয়াস জানিয়ে দিল— আজও গৌরসুন্দরের আকর্ষণ অনেক। পৃথিবীতে আবির্ভূত কেউ

এমন আকর্ষণ জনগণে জাগাতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই।
গ্রন্থের সুবহুল প্রচার কামনা করে প্রার্থনা জানাই সেই রাতুলচরণে—

জয় জয় গৌরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥

গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য,
এম. এ., ভাগবতরত্ন।
নবদ্বীপ।

আমুখ

বৈষ্ণববৃন্দের বিদায় বেলা। ফেরার পালা। নীলাচল থেকে নদীয়ায়। প্রভু বিদায় আলিঙ্গন দিতে এলেন। সবাইকে এক সঙ্গে নয়। প্রতি ভক্তের কাছে আলাদাভাবে। অবধূত, অদ্বৈত, শ্রীবাস, রাঘব, শিবানন্দ, সত্যরাজ খান এই সব বৈষ্ণবদের বিদায় আলিঙ্গন দিয়ে প্রভু এলেন মুকুন্দের কাছে। মুকুন্দের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পুত্র রঘুনন্দন। কৌতুকী গৌরসুন্দর শুধোলেন, 'আচ্ছা মুকুন্দ, তুমি রঘুর পিতা, না রঘুই তোমার পিতা?' উত্তরে মুকুন্দ বললেন রঘুই তাঁর পিতা। কারণও বললেন ঃ

'আমা সভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘুপিতা। আমার নিশ্চিতে॥''— অর্থাৎ

প্রাকৃত পিতা প্রকৃত পিতা নন। ভাগবত পিতাই প্রকৃত পিতা। তাই এখানে পুত্রই পিতা।

প্রাকৃত পিতা ও ভাগবত পিতা— এই শব্দবন্ধদ্বয়ের বিচারে এই জীবাধম সুভগ। প্রস্থিত অক্ষয় কুমার সাহা একাধারে আমার লৌকিক ও ভাগবত পিতা।

এক অজ জনপদ। প্রতিটি পল্লীবাসী প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে সান্দ্র সান্নিধ্যে। নিস্তরঙ্গ জীবন। আময় নেই অমিত আকাঙ্ক্ষার। আমার তখন কৈশোর কাল। বাবার সঙ্গে মাঠে

যাই, শস্য ঘরে তুলি। ঘাটে যাই, জল আনি। বাগানে যাই, সব্জি তুলি। এই সব করতে করতে দুপুর গড়িয়ে যায়। আহার সেরে বিশ্রাম নিতে নিতে সাঁঝের বেলা ঘনিয়ে আসে।

মা শ্রীযুক্তা মহাবিদ্যা সাহা তুলসী তলায় সাঁঝের বাতি দিয়ে যান। ঠাকুরদা, বাবা ও আরো ভক্তজন তুলসী তলায় মণ্ডলাকারে খোল করতাল নিয়ে নামকীর্তন করেন। ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর। এই স্মৃতি চিত্তপটে বড়ই গাঢ়ভাবে চিত্রিত ছিল। ছিল বলেই জীবনের এই সাঁঝ বেলাতেও গৌরসুন্দরের জীবন চরিত রচনায় ব্রতী হতে পেরেছি।

জীবনী বা Hagiography লিখতে প্রয়াসী হলাম কেন? প্রভুর গুণ কীর্তন করেছেন অগণন ভক্তজন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জীবনী সংখ্যাল্প। এই ক্ষীণ সংখ্যাচিত্রটি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রসায়ন করতেই আমার এই অপটু প্রয়াস।

জীবন স্রোতের এই বাঁকের আরেকটি কারণও আছে: সেই কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হল আমার উত্তর যৌবনে যখন স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষপদ অলংকৃত করতে এলেন প্রফুল্ল হোড় রায়। আবার এই জ্ঞানার্ণবকে আবিষ্কার করলেন এক বীক্ষণশীল কর্মপ্রাণ পুরুষ। ইনি আমারই খুল্লতাত অভয় চরণ সাহা। আহারে! আজ এরা দুজনেই সুর্যতারার দেশে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের মুখে সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর হরি-গৌর কথা প্রাণিত করে আমাকে প্রভূত ভাবে। তিনি প্রয়াত, তবুও সান্ত্বনা এইটুকু এই ভক্ত প্রবর গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দেখে গেছেন এবং তাঁর অভিমত 'গৌরচন্দ্রিকা'য় জানিয়ে গেছেন।

বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন সুখ্যাত সন্তপ্রয়াত সাহিত্যিক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বহু কীর্তিত কথাকোবিদ শ্রীঅমিয় ভূষণ মজুমদার, শ্রুত কীর্তি কবি শ্রীবেণু দত্ত রায়, সুলেখক শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় যশস্বী ডাঃ শচীন্দ্র লাল ভৌমিক এবং সর্বশ্রী অহীন্দ্র কুমার সাহা, ধীরেন্দ্র কুমার সাহা, নিরঞ্জন সরকার, বীরেন্দ্র কুমার মুন্সী, শ্যাম সুন্দর সাহা, মৃণাল কান্তি সাহা, প্রফুল্ল চন্দ্র সাহা, শিপ্রা সাহা, ফণী বসু, ৺নদীয়া বিহারী সাহা, ৺রাধাগোবিন্দ সাহা ও ৺মনোমোহন সাহা।

গ্রন্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীভুবনেশ ভট্টাচার্য ও শ্রীশীতল রঞ্জন সাহা।

আমার অনেক কালের সাহিত্য চর্চার দুই অন্তরঙ্গ জন হচ্ছেন ডঃ তুষার কান্তি চক্রবর্তী ও শ্রীসন্তোষ সিংহ। এদের সহৃদয়তা এবং সার্বিক সহায়তা অমিতায়ু হয়ে থাকবে।

ডাঃ প্রদীপ কুমার বিশ্বাসের নাম স্মরণে আসছে প্রোজ্জ্বল প্রভায়। অন্যান্য সহায়তা তো আছেই, ডাঃ বিশ্বাস একটি বড় মাপের কাজ করেছেন স্বহস্ত অঙ্কিত প্রেমপুরুষোত্তমের একটি প্রতিকৃতি আমাকে দিয়ে।

স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকবে যাঁদের অবদান তাঁরা হচ্ছেন পরম ভাগবত শ্রীগোরাচাঁদ ভট্টাচার্য, পরমভক্ত এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীশিবেন্দ্র মোহন সাহা ও পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ শেখর কুমার সাহা।

পাণ্ডুলিপি পাঠ করে শ্রীভট্টাচার্য যে রসাস্বাদন করেছেন, তা তিনি 'উপক্রম' এ জানিয়েছেন তাঁর সোনার কলমে।

শ্রীশিবেন্দ্র মোহন সাহা আমার অগ্রজ যাঁর অবদানের কথা বিবৃত করতে আমার কলম-কল্কি অশক্ত। তবুও এইটুকু না বললে নিজেকে

বড়ই অপরাধী মনে হয় যে অগ্রজ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ শেখর যদি সহৃদয় সহায়তার হাত না বাড়াতেন তাহলে এ গ্রন্থের প্রকাশন অনিশ্চয়তায় লম্বমান হত।

গ্রন্থের জন্য কাগজ দিয়ে যথাসাধ্য আনুকূল্য করেছেন শ্রীঅজয় কুমার সাহা ও শ্রীকালিপদ সাহা। এঁদের গৌর সেবার কথা আমরণ স্মরণে থাকবে।

সবশেষে যাঁর সপ্রেম সহায়তার কথা বলতে হয়, তিনি আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রীতিকণা সাহা। প্রতিটি অধ্যায় সমাপনান্তে আমি এঁকে পাঠ করে শুনিয়েছি। পরামর্শ করেছি এবং এঁর একাধিক উপদেশও গ্রহণ করেছি।

আরও বহু ভক্তজনের আনুকূল্য লাভ করেছি। সেসব কথা বলতে গেলে এই কথা-মুখের আয়তন বৃদ্ধি পাবে আশঙ্কায় নিরস্ত হলাম।

—অশ্বিনী কুমার সাহা।

প্রথম অধ্যায়

গৃহত্যাগ

নিমাই গৃহত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়ঃক্রম চব্বিশ। পশ্চাতে পড়ে রইল তাঁর সংসার। সে সংসারে কে আছে তাঁর?—না, আছেন শচীমাতা যাঁর বয়ঃক্রম সাতষট্টি। আর আছেন তাঁর সহধর্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়া যিনি বয়সে কিশোরী-চতুর্দশী।

কোন্ মাকে ছেড়ে গেলেন নিমাই? না, এমনই মা যিনি প্রাকৃত জীবনে ইতিমধ্যে তেরটি আঘাত পেয়েছেন। এখন নিমাই-হারা হয়ে তিনি চোদ্দবার শোকক্লিষ্ট হলেন।

পরপর আটটি কন্যা সন্তান অকালে গত হয়েছে। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর ঘর শূন্য। তাই পুত্রের জন্য বিষ্ণুর আরাধনা করলেন। আরাধনায় সাড়া পেলেন। নবম সন্তান বিশ্বরূপ এলেন। এলেন ঘর আলো করে। কিন্তু সে আলোও বড় অসময়ে নিভে গেল। বিশ্বরূপ মাত্র ষোল বছর বয়সে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। চলে গেলেন সন্ন্যাসী হয়ে। না পাওয়ার একটা বেদনা আছে; কিন্তু পেয়ে হারানোর বেদনা যে তার চেয়েও বেশী। সেই বেদনাই পেলেন শচীদেবী।

বেদনা তিনি পাবেন বৈকি। বিশ্বরূপ তো তাঁর যে সে ছেলে ছিলেন না। যেমনি রূপে, তেমনি গুণে। চমৎকৃত করেছিলেন নদীয়াবাসীকে এত অল্প বয়সে সর্ব শাস্ত্রে পারীণ হয়ে। দশ বছরের ছোট ভাই নিমাই ছিল তাঁর প্রাণপ্রিয়। তেমনি প্রাণপ্রিয় ছিল গ্রন্থ। এহেন বিশ্বরূপকে শচীদেবী হারালেন অকালে।

দশম আঘাত তাঁর ভাগ্যে নেমে এল যখন তিনি পতিহারা হলেন। সংসারে আর কি আকর্ষণ রইল তাঁর ? হ্যাঁ, রইলেন একজন। তিনি হচ্ছেন তাঁর পরাণের পরাণী গৌরগুণমণি।

শচীদেবী বড় সাধ আহ্লাদে নিমাইয়ের বিয়ে দিলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ঘরে এলেন গৌর প্রিয়া হয়ে। কিন্তু বিধি যে বিরূপ। শচীদেবী ক্লিষ্ট হলেন একাদশ আঘাতে যখন লক্ষ্মীদেবী অকালে কাল কবলিত হলেন সর্পাঘাতে।

অভাব তাঁর নিত্য সঙ্গী। এও এক দুঃখ। আর্থিক সমস্যার নিরাকরণ করতে জগন্নাথ সদাপ্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু কই, সে প্রয়াসের প্রসাদ তো তিনি পাননি। অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করেই না তিনি পুরন্দর উপাধি লাভ করেছিলেন। পুরন্দর শিরোপা পান কে ? না, যিনি পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

এতো গেল তাঁর গুণ। কথায় বলে রূপে গুণে মানুষ। এক কথায় বলা যায় তাঁর মত সুদর্শন ব্যক্তি নবদ্বীপে তখন আর একজনও ছিলন না। এমনই অনবদ্য ছিল তাঁর রূপ।

রূপ ছিল। গুণ ছিল। আবার মানও ছিল। পণ্ডিতের মান কেমন ছিল তখন নবদ্বীপে ? এক বিরাট বিত্তশালী দোলায়

চেপে যাচ্ছেন। পথে এক পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হল। অমনি ঐ ধনবান দোলা থেকে নেমে এলেন জ্ঞানবানকে নমস্কার জানাতে। রূপ গুণ মান, এই ত্রিবিধ সম্পদে ঋদ্ধ ছিলেন জগন্নাথ। তবুও তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না কেন? অর্থ ভাগ্য কি সবারই হয়?

বয়সের ভার তাঁর জীবনের ত্রয়োদশ কষ্ট। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে যে তাঁর মা চতুর্দ্দশ ক্লেশে ক্লিষ্ট হবেন — এটা নিমাই নিশ্চয়ই জানতেন।

আর আঘাত চোদ্দটিই বা কোথায়? বিষ্ণুপ্রিয়া রয়েছেন যে! তাঁর কি হবে?

শচীদেবীর কতই না মনে ধরেছিল মেয়েটিকে? প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়, আর মেয়েটি তাঁকে প্রণাম করে। শচীদেবী ভাবেন, আহা মেয়েটি কতই না ভক্তিমতী! কত মেয়েই তো আসে গঙ্গা স্নানে নিত্যদিন। কই, আর তো কেউ এমন করে প্রণাম করে না। আবার মেয়েটি রূপেও তো কম নয়, যেন সোনার প্রতিমা। হ্যাঁ, সোনার প্রতিমাই বটে। তাই না বিবাহবাসরে যখন কনেকে আনা হল তখন সবাই কি দেখলেন?— না,

"বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখ বাণা সোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা॥"

এতো গেল রূপ। আর গুণ? গুণের শেষ কথা তো ভক্তিতে। মেয়েটি ভক্তিমতী। অন্তরে যাঁর ভক্তি আছে তিনিই না সর্ব গুণের আকর।

আর বংশ? একদিন গঙ্গার ঘাটে বিষ্ণুপ্রিয়া যথারীতি শচী-

দেবীকে প্রণাম করলেন। শচীদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবার নাম কি গো?"

বিষ্ণুপ্রিয়া মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন, "আমার বাবা হচ্ছেন সনাতন মিশ্র।"

শচীদেবীর মনটা আহ্লাদে ভরে গেল। মনে মনে বললেন, "এমন বাপ না হলে, এমন মেয়ে হয়। আহা, এ মেয়েটি যদি আমার ঘরে আসে!"

সনাতন পণ্ডিতের নাম কে না জানে নদীয়ায়? তিনি যে রাজ পণ্ডিত! যেমন ধনী তেমনি জ্ঞানী মানী। বিষ্ণুপ্রিয়া তাই মণি মাণিক্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন।

নিমাই পণ্ডিতের রূপ আছে। সে এমন রূপ যা দু চোখে দেখে আশ মেটেনা। তাই হৃদয় দিয়েও দেখতে হয়। যেন

"আমার ভুবন ভুলানো এলে
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।"

আর গুণ? নিমাই পণ্ডিতের তো-- তখন নদীয়া জুড়ে নাম। কিন্তু তাঁর যে ধন রত্ন নেই। না, তাঁর সোনার পালঙ্ক চাই না, চাই না সোনার আভরণ, বিষ্ণুপ্রিয়ার চাই শুধু সোনার গৌরাঙ্গ। গৌর সুন্দর যে তার মনে উদয় হয়েছেন। তাই তো তাঁর মনে এই নব অনুরাগ। শচীমাতা তো উপলক্ষ্য মাত্র। কতই বা বয়স মাত্র তো এগার। কিশোরী। তাঁর কি প্রয়োজন দিনে তিনবার গঙ্গা স্নানের? আসল উদ্দেশ্য গৌর দর্শন। দিনে অধিকবার যদি গঙ্গাস্নানের রীতি থাকত, তাহলে তিনি তাই করতেন। করতেন

বৈকি। ততবারই যে ঐ প্রিয় বদনের সুখ-দর্শন হত।

রাজ পণ্ডিত নন্দিনীর দশা ভাবতে ভাবতে রাজ নন্দিনীর দশা মনে আসে ঃ

" রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা ? "

রাই কিশোরীরও বয়ঃ সন্ধিক্ষণ। একদিন যমুনায় জলকে যেতে কদম্বতলে বেণুকর কানুকে দেখলেন, অমনি,—

" পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।" ফার্ষ্ট ফ্রেম অভ লাভ। ব্রজ কিশোরী তাই সখীকে বলছেন,

" সজনি ! কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে ॥"

বয়সে উভয়ে কিশোরী। অভিপ্রায়ও এক ঃ দয়িতের দর্শন লাভ। দর্শনস্থলও প্রকৃতিতে এক ঃ নদীকূল। একজনের কালিন্দী। অপরজনের গঙ্গা। ভাব প্রকাশের মাধ্যম একজনের সহচরী। অপর জনের ভাবী শাশুড়ী। বৃষভানু তনয়ার ভাব ব্যক্ত নানা কথায়, নানা নামে আর সনাতন-তনয়ার ভাব পরিস্ফুট পুনঃ পুনঃ প্রণামে।

যা হোক, এই প্রণয় পরিণতি লাভ করল পরিণয়ে। না, না, কোনরকমে শাঁখ বাজিয়ে এ বিয়ে নয়। বাপরে বাপ ! রাজ পণ্ডিতের মেয়ের বিয়ে। রাজ পণ্ডিততো রাজ রাজড়ারই মত। কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের যে ঘটা করার টাকা নেই। তাতে কি হয়েছে ? এগিয়ে এলেন সানন্দে জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান। কি ব্যাপার ? না, তিনি একাই পণ্ডিতের বিয়ের আয়োজন করবেন, তাও রাজসিকভাবে।

অবশ্য মুকুন্দ সঞ্জয় এবং নিমাইয়ের ছাত্ররাও সাধ্যমত ব্যয় বহন করলেন। কত আহ্লাদে, আমোদে, আনন্দে ও কত আড়ম্বরেই না বিয়েটা হলো। নিমাই কি হেঁটে যাবেন কনের বাড়ীতে? রাম কহ! তা কি কখন হয়? বুদ্ধিমন্ত খান রাজা থাকতে? তাই,

" তবে দিব্য দোলা সাজি বুদ্ধিমন্ত খান।
হরিষে আনিয়া করিলেন বিদ্যমান॥ "

সঙ্গে সঙ্গে কি হল?

" বাদ্য গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল॥ "

সঙ্গে কি শুধু বরযাত্রীরাই গেলেন? না। রাজকীয় আয়োজন বলে কথা! তাই,

" আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার॥ "

এই আয়োজন ষোলকলায় পূর্ণ হল আওয়াজে।

" জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ কাহাল।
দামামা, দগব, শঙ্খবংশী করতাল॥
বরংগো শিঙা, পঞ্চশব্দী, বেণু বাজে যত।
কে লিখিবে বাদ্য ভাণ্ড বাজি যায় কত॥"

সবই তো হলো। কিন্তু দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি কেমন হল? সে এমন হল যে,

" সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘর হয়।
তাহাতেই ভালো পাঁচ বিবাহ নির্ব্বাহ হয়॥"

আর কন্যা পক্ষের আয়োজনের তো কথাই নেই। রাজ পণ্ডিতের কন্যা। তার ওপর এটা তাঁর প্রথম কাজ।

এহেন বিয়ের, এহেন ঘটার• পেছনে যে অঘটনের ঘনঘটা আবডাল করেছিল, তা কি বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে একবারও জেগেছিল? হ্যাঁ, অঘটনই বলতে হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া এখন কিভাবে নিজের পরিচয় দেবেন?

যাঁর স্বামী আছে তাঁকে বলে সধবা। যাঁর স্বামী নেই তিনি বিধবা। আবার যাঁর স্বামী বিভুঁইয়ে থাকেন তিনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কি? তিনিতো এই তিনের কোনটিই নন। ধব থাকতেও তিনি না সধবা, না বিধবা। কি এক বিষম ব্যাপার। যে স্বামী স্মরণে তিনি ত্রিসন্ধ্যা সীমন্তে সিঁদুর পরবেন, সে স্বামী তো আর তাঁর একার নন। তিনি যে এখন জগৎ স্বামী। তবুও সীমন্তিনীর সব আচার আচরণ তাঁকে পালন করতে হবে।

গৃহত্যাগের আগে কোন্ গৌরাঙ্গের মুখচ্ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত? না, সেই গৌর সুন্দরের যাঁর গায়ের রঙ সোনার বরণ, যাঁর বসনেও সোনার আভা। সোনা-ঝরা আলোয় আরও ঝলমল করত সেই পট্টবস্ত্র। আর শিবের সুষমা ছিল চাঁচর কেশ কলাপ।

এই বেশে হেমদণ্ড বাহু তুলে নগর সংকীর্তনে নেচে নেচে যান যখন তাঁর গৌরসুন্দর, তখন কি সুন্দরই না দেখায়। তখন যেন মনে হয়,

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়?"

আরও যেন মনে হয়,

"কোটি ইন্দু যিনি জ্যোতি কোটি রবি তেজে।
কোটি কাম যিনি রূপ গোরাবর রাজে।"

আর এখন? হ্যাঁ, এখন তিনি সেই সিঁদুরই পরবেন, স্মরণ করবেন সেই স্বামীকেই; কিন্তু এ তাঁর কোন্ স্বামী? কোন্ গৌরাঙ্গ? বিষ্ণুপ্রিয়া তো কোন কল্পনাতেই আনতে পারবেন না যে তাঁর গোরা-চাঁদের আর সেই কুঞ্চিত কেশ দাম নেই। আছে এক মুণ্ডিত মস্তক; নেই সেই সোনার বরণ বসন। আছে শুধু গেরুয়া এক খণ্ড কৌপীন; আর যে রক্ত কমল করে তিনি তাঁর প্রিয়াকে আদর করতেন, সোহাগ করতেন, সেই করে আছে কি না করঙ্গ। না, না, এ দৃশ্য, এ ছবি প্রিয়াজী ভাবতে পারবেন না; কিছুতেই না।

কেনই বা পারবেন? বিয়ের আসরে তিনিই না বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলেছিলেন— শপথ করে বলেছিলেন "তুমি আমার, আমি তোমার।" এ চারটি শব্দে অনুরণিত হয়েছিল নববধূর হৃদয়; হয়েছিল চার চোখের মিলন; কিন্তু এখন? এখন তো আর তিনি বলতে পারবেন না, "তুমি আমার।" তুমি যে আর রইল না। একবচন বহুবচন হয়ে হল তোমরা; "তোমরা আমার।" যিনি ছিলেন গৌর হৃদয় মন্দিরে একমাত্র প্রিয়তম, এখন হলেন অন্যতম।

এহেন অবস্থায় পতিত হলেন নিমাইয়ের দুই নিজ জন। নিকটতম জন। তাঁর জননী ও ঘরণী। নিমাই তো বিশ্বম্ভর, পণ্ডিত, ধীমান ও স্থিতধী। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে এই রমণীদ্বয়ের জীবনচিত্র যে কত বিসদৃশ হবে, তা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

তবুও নিমাই গৃহত্যাগ করলেন। অবশ্য তাঁর এই সংকল্প অনেককাল আগের। প্রকাশ করেছেন অনেককাল পরে, তবে ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর মা ও স্ত্রী। নিমাই গয়া থেকে ফেরার পরই। না, শুধু এঁরা কেন? লক্ষ্য করেছেন সারা নদীয়াবাসী, বিশেষ করে তাঁর পার্ষদবৃন্দ। কি রকম সে ভাবান্তর?

" যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর
সেই প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির ॥ "

আবার যেমন শচীমাতা বলেন,

"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল ॥"

যা হোক, নিমাই কি ভাবে, কি অবস্থায় গৃহ তথা নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন? কিন্তু তার আরম্ভেরও আরেক আরম্ভ আছে। তা হচ্ছে প্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের শেষ যামিনীটি কেমন কেটেছিল?

নিমাই সংকীর্তন সমাপ্ত করে অধিক রাতে গৃহে ফিরতেন। গৃহ ত্যাগের দিন কিন্তু ব্যতিক্রম হল। নিমাই সেদিন সংকীর্তনে গেলেনই না। আন-কথা বাতাসের আগে চলে। বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন পিতৃগৃহে। সেখানেই তিনি 'অকাল বাজ'এর কথাটা শুনলেন। তাই ঝটিতি চলে এলেন পতিগৃহে। মনে কেমন একটা উথাল পাথাল ভাব। মন চাইছে কতক্ষণে শোনা কথাটা পরখ করবেন। পরখ করবেন তার প্রাণ গৌরকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু যা যত শীঘ্র চাওয়া যায়, তা কি তত শীঘ্র পাওয়া যায়? তাই প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে লাগলেন। কিন্তু প্রতীক্ষা আর সয়না বুঝিবা।

নিমাই নৈশাহার সেরে শয্যাগ্রহণ করলেন। মাঘ মাসের শীত। নিমাই তাই গরম চাদরে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়েছেন। শুধু মুখটি খোলা। মনে বড় উৎকণ্ঠা। বিষ্ণুপ্রিয়া তাই কোন রকমে সামান্য আহার সেরে শয়ন কক্ষে এলেন। হাতে পানের বাটা। আর আছে চন্দনের বাটি ও ফুলের মালা।

খাওয়ার পর পান খাওয়া নিমাইয়ের নিয়মিত অভ্যাস। আর আহারের পর অঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত করা ও ফুলের মালা পরা বৈষ্ণবের এক শুদ্ধ-সত্ব বিলাস। বিষ্ণুপ্রিয়া তাই বাটা, বাটি আর মালা নিয়ে শোবার ঘরে এলেন।

এসে দেখলেন তাঁর গৌরচন্দ্র ঘুমোচ্ছেন। চন্দ্রই বটে। মুখখানা যেন ঘরময় চাঁদের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। মন তাঁর জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল। তবুও তিনি তুষ্ট বোধ করলেন প্রিয়তমকে নিদ্রিত দেখে। করবেন বৈকি। মাসের অধিকাংশ দিনই যে তাঁর পরাণ বধুর ঘুম হয় না। হবে কি করে? ত্রিযামা যামিনীর শেষ যামে যে তিনি ফেরেন কীর্ত্তন সেরে। তাই গৌর প্রিয়ার এত তুষ্টি।

অতি সন্তর্পণে শয্যায় বসলেন। ইচ্ছা পদ সেবা করেন। কিন্তু তার হাত যে হিম শীতল। মাঘ মাসের শীত। সবে তিনি আহার সেরে এসেছেন। একটু অপেক্ষা করলেন। হাত একটু উষ্ণ হল। পরম আবেগে পতিদেবতার চরণ যুগল বক্ষে ধারণ করলেন। যেন তাঁর মন বলছে

"দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ দ্বন্দ্ব।"

এত তো ব্যাকুলতা; কিন্তু কথা যে গুছিয়ে আসছে না।

কথাটা কি ভাবে পাড়া যায় ? একথা ভাবছেন· আর গোরাচাঁদের চাঁদ মুখখানা দেখছেন। দেখতে দেখতে পরম আহ্লাদে ভাবছেন তাঁর মত ভাগ্য নদীয়া নগরে আর কার আছে ? যে বদন গগন চন্দ্রকেও মলিন করে, সেই গৌরচন্দ্রই না তাঁর প্রাণবল্লভ।

নীলিমার চাঁদে কলঙ্ক আছে। কিন্তু তাঁর গোরাচাঁদতো অকলঙ্ক। তাই কলঙ্কগ্রস্ত চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হয়েছিল রাহু মুক্ত গৌর চন্দ্রের উদয়ে। সেই সকলঙ্ক চন্দ্র ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। শুধু চোখে দেখা যায় মাত্র। আর তাঁর অকলঙ্ক কলানিধি দেখা যায়— ছোঁয়া যায়, ধরা যায়। এই তো তিনি ধরে আছেন। সেই প্রাণকান্ত কিনা অধরা হয়ে যাবেন। কখনও আহ্লাদ, কখনও বিষাদ। মনে তাঁর এই দ্বন্দ্ব ভাবের দ্বন্দ্ব। শেষে বিষাদেরই ঢল নামল দু চোখ বেয়ে

"দু নয়নে বহে নীর ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বহিয়া পড়ে ধারা।"

তপ্ত অশ্রুর তাপের স্পর্শে নিমাই জেগে উঠলেন। প্রিয়ার সেই বিসদৃশ বদন দেখে পরম সোহাগে কোলে তুলে নিলেন তাঁর প্রিয়াকে। চিবুক ছুঁয়ে আদর করে বললেন, তুমি তো বেশ মানুষ! এতদিন পরে দেখা হল, কোথায় একটু রসের আলাপ করবে— না কান্নাকাটি শুরু করে দিলে। তা, ব্যাপার কি ?— বলে নিজের কাপড় দিয়ে চোখের জল মুছে দিতে লাগলেন।

অবশ্য নিমাই বরাবরই কৌতুকপ্রিয় এবং সে কৌতুক সবার সঙ্গেই করতেন— এমনকি মায়ের সঙ্গেও। শচীদেবী একদিন

বললেন ; " জানিস নিমাই, কাল রাত্তিরে আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।" বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে কি রকম দেখেছেন খুলে বললেন। নিমাই একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁ মা, তুমি ভালো স্বপ্নই দেখেছ। আমাদের ঘরের ঠাকুর খুবই জাগ্রত।" কথাটার কৌতুক অন্যান্যরা বুঝতে পেরে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। শচীদেবী কিন্তু আপন মনেই রইলেন। এখন নিমাই আর একটু খোলসা করে বললেন, ঠাকুরের নৈবেদ্যের অর্ধেকটা প্রতিদিনই থাকে না। তা, বুঝলে মা, আমি এতদিন খুবই লজ্জায় ছিলাম। ভেবেছিলাম এ তোমার বৌমারই কাণ্ড। আজ তুমি আমাকে সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে। এখন তোমার স্বপ্নের কথা শুনে বুঝলাম জাগ্রত ঠাকুরই অর্ধেকটা খান।"

শচীদেবী ঝংকার দিয়ে বললেন,— "তোর যে কথা নিমাই। বৌমা আমার রাজ পণ্ডিতের মেয়ে। তাতে মা আমার লক্ষ্মী। এক লক্ষ্মীকে হারিয়ে আরেক লক্ষ্মী পেয়েছি। তার কিসের অভাব যে সে চুরি করে খাবে। রসিকতাটি সবাই উপভোগ করলেন। আর আড়ালে আস্বাদন করলেন আরেক জন। তিনি গৌরপ্রিয়া— বিষ্ণুপ্রিয়া।

যে কথাটা শত শত বার মনে মনে মহলা দিয়ে এসেছেন, সেই কথাটা বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন এখন। বললেন বটে, তবে সরা-সরি না। সন্ন্যাস কথাটা মুখে আনতে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে তাঁর। কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। আবার নিজের কথা বলতেও যেন বাধ বাধ ঠেকছে। তাই বললেন, "শুনলাম তুমি নাকি মাকে অথৈ জলে

ফেলে যাচ্ছ ?" নিমাই কৌতুকের হাসি হেসে বললেন ; "কাকে ফেলে যাচ্ছি— মাকে ? বল কি গো ? তোমাকে এসব গালগল্প কে শোনায় বলতো ?"

বিষ্ণুপ্রিয়া কিন্তু নিমাইয়ের এই কৌতুকে ভুললেন না। মরিয়া হয়ে বললেন, "আমার গাঁ ছুঁয়ে বলতো তুমি সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছ না।" নিমাই ওষ্ঠাধরে সেই প্রসন্ন হাসিটি রেখেই বললেন, কি মুশকিল, গা ছুঁয়েই তো আছি। তুমি না আমার কোলেই বসে আছ। শোনো প্রিয়া, তুমি এসব চিন্তা ছাড়তো। তোমাকে না জানিয়ে কি কোথাও যেতে পারি ?" বলে পরম আহ্লাদে হাসতে লাগলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া কিন্তু নিমাইয়ের এই আমোদ আহ্লাদে যোগ দিলেন না। কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। চোখের দিকে চেয়ে বললেন, "তবে তুমি কাঁদছ কেন ?"

চাতুর্য ও মাধুর্য পরস্পর প্রতীপ। চাতুর্য বহিরঙ্গ। মাধুর্য অন্তরঙ্গ। তাই মাধুর্যই জয়ী হয়। হলও তাই। নিমাই তাঁর বালিকা বধূর কাছে হেরে গেলেন। অভিনয়ের অবসান হল।

নিমাই তাই আসল কথাটিই বললেন, "অভিনয় করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। আমি সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী হব। প্রতিদিন নগর সংকীর্ত্তন করলাম, তবুও তো সব লোকে কৃষ্ণ নাম নিল না।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, বেশতো, "আমি তো তোমার সংকীর্তনে বাধা দিইনি। মাসের প্রায় সব কটি দিনই তো তোমার কীর্তনেই রাত ভোর হয়ে যায়। তোমার শয্যা সঙ্গ পাওয়া তো দূরের কথা,

তোমার মুখটিই ভালো করে দেখার সুযোগ পাইনা, অথচ তোমার চাঁদ মুখ দেখে লোক কতই না সুখ্যাতি করে। লোকের কৃষ্ণে মতি আনতে সংসার ছাড়তে হবে কেন?"

নিমাই বললেন, 'প্রিয়া তোমার সব কথাই ঠিক। তবে কি জানো—তোমাদের না কাঁদালে জগৎ কাঁদবে না, কৃষ্ণ নাম নেবে না।"

বিষ্ণুপ্রিয়া ধরা গলায় বললেন, "বেশ তো আমি না হয় বাপের বাড়ীতেই থাকব। তবু তুমি ঘরে থাক।"

নিমাই বিষণ্ণ গলায় বললেন, "তা হয়না প্রিয়ে। ঘরে বসে কৃষ্ণ নাম তো এতকালই নিলাম। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে ডাইনে নিয়ে, ভক্ত হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে কতই না হরিনাম বিতরণ করলাম তবুও তো সবার কৃষ্ণে মতি হল না।

না, এত কথায়ও প্রিয়াজীর মন গলল না। নিরুপায় নিমাই তখন কম্বু কণ্ঠে তত্ত্ব কথার অবতারণা করলেন,

"জগতে যতেক দেখ মিছা করি সব লেখ
সত্য এবে সবে ভগবান।
মিছা সুত; পতি, নারী পিতা মাতা যত বলি
পরিণামে কে বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি আর ত কুটুম্ব নাহি
যত দেখ এ মায়া তাহার॥"

পণ্ডিতের পণ্ডিত যে নিমাই, সেই নিমাই এবারও হেরে গেলেন। যে নিমাই দিগ্বিজয়ী বর্ষীয়ান পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে নত মস্তক করেছেন, সেই নিমাই কিনা হেরে গেলেন এক কিশোরীর কাছে—

হেরে গেলেন দু' দুবার।

তৃতীয়বার প্রয়াসী হলেন নিমাই। এবার কিন্তু প্রাকৃতরূপে নয়। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরে ঐশ্বর্যরূপ প্রকাশ করলেন। হ্যাঁ, এবার বিষ্ণুপ্রিয়া চমকিত ও আনন্দিত হলেন আচম্বিতে অপ্রাকৃতরূপ দেখে। কিন্তু এবারও নিমাই ব্যর্থ হলেন। তাঁর শবলারূপও স্বমতে আনতে পারল না বিষ্ণুপ্রিয়াকে। আন্তর সত্তায় এতই ঋদ্ধা প্রিয়াজী কারন,

'তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ দেখিয়া
পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।"

অথচ বিষ্ণুপ্রিয়া তো বিদুষী নন। শ্রুতিতে জ্ঞান নেই, নেই কোন জ্ঞান স্মৃতিতে। আছে শুধু একান্ত নিষ্ঠা পতিতে। আছে তাঁর একমাত্র ধন, শ্রেষ্ঠ ধন যার কাছে শুষ্ক জ্ঞান নিতান্তই অনর্থ। সে ধন হচ্ছে তাঁর প্রাণ, যেখানে প্রাকৃত অপ্রাকৃত জগতের কেউ নেই। আছে শুধু সোনার গৌরাঙ্গ একা একেশ্বর হয়ে।

হ্যাঁ, তাঁর পিতৃদত্ত নামে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া; কিন্তু তিনি তো গৌরাঙ্গ প্রিয়া মনে প্রাণে, যে মন প্রাণ সদাই কীর্ত্তন করে—হা গৌরাঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ বলে।

এখন নিমাই কি করবেন? আয়াস সাধ্য হলেও মায়ের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু প্রিয়ার বাঁধন থেকে তো তিনি কিছুতেই মুক্ত হতে পারছেন না। তবে কি তাঁর এত কালের নিষ্ঠা লালিত সংকল্প সফল হবে না?

পরিশেষে প্রতিশ্রুতি দিলেন নিমাই। কি সে প্রতিশ্রুতি?—না,

"শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এ তোরে কহিল হিয়া,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই আছিয়ে তোমার ঠাঁই
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়।"

এই যে কথাটা নিমাই বললেন, এটা কি শুধুমাত্র স্তোকবাক্য ? তাই তো মনে হয়। মনে হয়, যেন তেন প্রকারেণ তিনি প্রিয়ার বাহু পাশ থেকে মুক্ত হতে চান। নইলে সন্ন্যাস গ্রহণের পর কি করে তিনি পূর্বাশ্রমে ফিরবেন ? অথচ দিব্যি তিনি বললেন,

"আমি যথা তথা যাই আছিয়ে তোমার ঠাঁই।"

এটা কি করে সম্ভবপর ?

আবার বললেন, 'যখনে যে তুমি মনে কর।" অর্থাৎ কিনা বিষ্ণুপ্রিয়া যখনই স্মরণ করবেন, তখনই তিনি তাঁর প্রাণ বল্লভের অঙ্গ সঙ্গ লাভ করবেন ; অথচ তিনি গৃহাশ্রম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। চলে যাচ্ছেন একদিনের জন্য নয়, দু দিনের জন্য নয়, একেবারে চিরদিনের জন্য।

তাহলে কি ভাবে তিনি তাঁর প্রিয়াকে অঙ্গ সান্নিধ্য দেবেন ? তাও আবার বললেন, "সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়।" এ তো তিন সত্যির সামিল।

না, বিশ্বম্ভর বাক্য অনৃত হতে পারে না। তিনি যে সত্য সন্ধ। তাঁর বাক্য তাই মাণিক্য। "জগদ্ধিতায়"— জগৎ বাসীর কাছে সত্য প্রকাশ করতেই গৃহত্যাগ করছেন।

সেই নবকিশোর নটবর— গোপবেশ বেণুকর যখন বংশীবটে

বংশীধ্বনি করতেন, তখন ভানুবালা ছুটে যেতেন তাঁর কাছে। চক্ষু-কর্ণ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হত। জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন সক্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় তখন নিষ্ক্রিয়।

শীঘ্র আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে যশোদানন্দন যখন চিরতরে ব্রজপুরী ত্যাগ করলেন, তখন ভানু নন্দিনীর মধ্যে দেখা দিল বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় হল সক্রিয়; আর জ্ঞানেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়। তাইতো বিরহ প্রেমে আনে প্রাচুর্য্য, আনে প্রাবল্য। আনবেই তো। তখন যে এর আস্বাদন হয় বিশেষভাবে রহঃস্থানে নিরালায় অর্থাৎ কিনা অন্তরের অন্তঃপুরে।

তখন শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে প্রিয়মুখচন্দ্র পূর্ণায়তরূপে প্রিয়ার নির্মল চিদাকাশে বিরাজ করে। আর নির্মল আনন্দ দেয় দয়িতাকে। তাই না কবি গাইলেন,

"দূর এসেছিল কাছে ফুরাইলে দিন,
দূর চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে।"

সত্যিই তাই। দয়িতা তখন অধিক সান্নিধ্য লাভ করেন। ঠিক এই অর্থেই নিমাই তাঁর প্রাণপ্রিয়াকে তিন সত্যি করে আশ্বাস দিলেন।

আর তখন দয়িতা যেন আপন সান্ত্বনায় বলেন,

"যখন থাক দূরে—
আমার মনের গোপন বাঁশী বাজে গভীর সুরে।
কাছে এলে তোমার আঁখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি —
সে যেন মৌন প্রাণের রাতে তারা জ্বলো জ্বলো।"

শেষ যামিনী সাঙ্গ হল ; কিন্তু নিমাইয়ের ইচ্ছা কি বিষ্ণু-প্রিয়ার ইচ্ছার সাযুজ্য লাভ করল ? হ্যাঁ করল। কি ভাবে ?

কর্ম কি ? —না, আত্মার শক্তি। এ শক্তি ত্রিবিধ। জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি— এই ত্রয়ী। জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া ভাবনা, ইচ্ছাশক্তির বাসনা, আর ক্রিয়া শক্তির চেষ্টনা। থট, ডিজায়ার, অ্যাকশন্।

শব্দের স্পন্দন আছে। তেমনি স্পন্দন আছে জীবের ভাবনা বাসনারও। একের মস্তিষ্ক ও মন থেকে এই স্পন্দন অপরের মস্তিষ্ক ও মনে সঞ্চারিত হয়। টেলিপ্যাথি এই অভিধা দিয়েছে একে বিজ্ঞান। ... ...থট ট্রান্সফারেন্স। যথার্থ ই বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ ঃ

"মহাপুরুষেরা স্পর্শ করা ছাড়াও ইচ্ছা দ্বারা অপরের দেহে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন।"

যা হোক, উভয়ের ইচ্ছা যখন এক হল, তখন গৌর ও গৌর-প্রিয়া নিদ্রিত হলেন। গৌরপ্রিয়া নিদ্রিত গৌরেরই কোলে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এত বাকযুদ্ধ, এত অশ্রুপাত, তাই গভীর ঘুমে ঘুমোচ্ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। রাত্রির ছয়দণ্ড বাকী। নিমাই আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করে শয্যায় বসলেন। সন্তর্পণে নিজের পা থেকে প্রিয়ার বাঁ পা-টি সরিয়ে নিয়ে বালিশের উপর রাখলেন।

"নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবাম চরণে
পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে।"

বিষ্ণুপ্রিয়াকে কি কাল ঘুমে পেয়েছিল ? হ্যাঁ, কাল ঘুমই

বটে, নইলে কি প্রিয়তমের কোল হারাতেন চিরতরে ?

বধূরানীর অঙ্গ মুক্ত হলেন নিমাই। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন দ্বারের দিকে। যাবার আগে পরম সোহাগে চুম্বন দিলেন প্রাণপ্রিয়াকে।

দরজা খুললেন অতি সন্তর্পণে। না, নিমাই যাঁকে ভয় করছিলেন. তিনি তখনও গভীর ঘুমঘোরে। প্রিয়াজী টের পেলেন না। গৃহাঙ্গনের অন্য পাশে মায়ের শয়ন ঘর। সেখানে মা-ও নিদ্রাচ্ছন্ন। অঙ্গনে দাঁড়িয়ে নিমাই বাসী বাস ত্যাগ করলেন। পরিধান করলেন অতি সাধারণ একবস্ত্র। তাঁর দৃঢ় আশ যেন পূরণ হতে চলেছে।

"শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর উঠিলা রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস ঘুচাব এসব বেশে॥"

মাঘ মাস। শুক্ল পক্ষ। যামিনীর শেষ যামও অস্তপ্রায়। এ দিনটার কথা জানতেন শুধু তার পাঁচ পার্ষদ ঃ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, আচার্য্য চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ দত্ত, পণ্ডিত গদাধর আর ব্রহ্মানন্দ।

'ঘুচাব এসব বেশে'— না, শুধু বেশ কেন। গৃহাশ্রমের সব কিছুই ত্যাগ করলেন নিমাই। ত্যাগ করলেন স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকে, প্রাণাধিক জায়াকে, চব্বিশটি বসন্তের সুখ স্মৃতি মাখা নিজ নিকেতন। এতকাল ধরে যে গৃহাশ্রম ধর্ম পালন করে এসেছেন, সেই ধর্ম।

শুধু কি এই ? যে স্থানে আজ থেকে চব্বিশ বৎসর আগে এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই শ্রীধাম নবদ্বীপ

পড়ে রইল পশ্চাতে। নিত্য দিন যে তিনি কীর্তন করতেন তাঁর প্রাণপ্রিয় শ্রীবাস অঙ্গনে, তাঁর বাধনও ছিন্ন করলেন। শত শত ভক্তের আকুতি আনুগত্য বিস্মৃত হলেন সেই মুহূর্তের জন্য। তাঁব পাণ্ডিত্য, পঠন পাঠন, টোল সবই অসার মনে হলো। সার বস্তু একটিই চোখের সামনে ভেসে উঠল। কি সে সার বস্তু?— না, কাটোয়ার শ্রীল কেশব ভারতী।

গীতা যে স্থিতপ্রজ্ঞের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার চিহ্ন কি পাওয়া যায় নিমাইয়ের মধ্যে? হ্যাঁ, পাওয়া যায় বৈ-কি।

ষড়রিপু সংযত, সংযত তাঁর চতুর্দশ ইন্দ্রিয়— অথচ প্রিয়াব বাঁধন ছিন্ন করতে হবে বলে আগে থেকেই তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিসদৃশ ব্যবহার করেন নি ঃ এই তো কিছুক্ষণ আগেও তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয়াকে আলিঙ্গন করেছেন, ওষ্ঠে এঁকে দিয়েছেন সোহাগ চুম্বন। কিন্তু পরমাশ্চর্য তাঁর দার্ঢ্য শক্তি। সেই শক্তি ঋদ্ধিতেই এখন তাঁব একতম লক্ষ্য হয়েছে সংকল্পের রূপায়ণ।

তাই তো তাঁর এই ত্যাগ। সব কিছুই ত্যাগ। সঙ্গে শুধুমাত্র একখণ্ড বস্ত্র। একটা কথা আছে মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে। আর সেই শীতেই কিনা নিমাই গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। সাঁতরে পার হলেন গঙ্গা।

এই তো গঙ্গার এপারেই না কাটোয়া। নিমাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। কেশব ভারতীর দর্শন লাভের আর বাকী কি? আর দর্শন লাভ হলেই না দীক্ষাও হবে। তিনি সন্ন্যাসী হতে পারবেন। অবশ্য প্রাগুক্ত পাঁচ পার্ষদও নিমাইকে অনুসরণ করে

কাটোয়ায় উপস্থিত হলেন।

নিমাইয়ের এই সন্ন্যাস সংকল্প থেকে কি তাঁর মধ্যে কোন ভগবৎ গুণের লক্ষণ দেখা যায়? হ্যাঁ, যায় বৈকি।

ভগ শব্দের অর্থ কি? না, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য— এই ষড়্গুণ যাঁর মধ্যে আছে, তিনিই না ভগবান। আবার ভগর "ভ" মানে কি? — না; "ভেতি ভাসয়তে লোকান" অর্থাৎ— যিনি নিজের আলোকে সর্বলোক আলোকিত করেন।

আবার 'গ' এর অর্থ হচ্ছে "ইত্যাগচ্ছত্য জস্রং গচ্ছতি যস্মিন ইমা প্রজা আগচ্ছতি যস্মাৎ" সব জীব পরিশেষে যাঁর মধ্যে চলে যায় এবং যাঁর মধ্য থেকে আবার চলে আসে।

ঐ ছ'টি গুণের কোন কোন গুণ নিমাইয়েব সন্ন্যাস সংকল্পের মধ্যে পাওয়া গেল? — না, বীর্য, জ্ঞান আর বৈরাগ্য।

বীর্য অর্থে তার সংকল্পের অমোঘতা ও পুরুষকার। তাঁর পৌরুষ ও সংকল্পের অমোঘতা বলেই না নিমাই মধ্য মহোদধির মত স্থির, শান্ত-অনড়-অটল।

আর জ্ঞান? এ জ্ঞান কোন জ্ঞান? না, "আত্মজ্ঞানং বিদুর্জ্ঞানং জ্ঞানান্যানি যানি তু। তানি জ্ঞানাব ভাসানি সারস্য নৈব বোধনাৎ।" 'আত্মজ্ঞানই আসল জ্ঞান। অন্য সব জ্ঞান, জ্ঞান নয়। জ্ঞানের অবভাস মাত্র।

বৈদগ্ধের বৈদুর্য ভগবান বুদ্ধ যখন সিংহ শয়নে শয়ান হলেন, তখন শিষ্যরা বুঝতে পারলেন তাঁদের গুরুর মহাপরি নির্বাণ উপস্থিত।

তাই তাঁরা কাতর কণ্ঠে শুধোলেন, 'প্রভু, আমাদের কি গতি হবে ?' স্মিত হাসি হেসে কম্বু কণ্ঠে বুদ্ধ বললেন, 'আত্মদীপো ভব।'

কারারুদ্ধ সক্রেটিস যখন হেমলক লতার বিষের বাটিটি অধরে ধরলেন, তখন অনুগামীরা কান্না ঝরা কণ্ঠে শুধোলেন, 'প্রভু, আমাদের কি হবে ?' স্থিতপ্রজ্ঞ সক্রেটিস শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'নো দাই সেলফ্।' এই হচ্ছে আত্মজ্ঞান।

যে নিমাই তাঁর পরমাশ্চর্য অপরা বিদ্যা, মান, যশ, জননী জায়া, জন্মভূমি ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণে ব্রতী হয়েছেন, সেই নিমাই আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন বৈ কি ?

বৈরাগ্য মানে কি ? বি পূর্ব্বক রনজ ধাতু ঘঙ। আর রনজ ? — না, মন থেকে রঙ মুছে ফেলা। কিসের এই রঙ ? না, কামনা বাসনার। আবার বৈরাগ্য হচ্ছে বিশেষ রাগ বা অনুরাগ— সেই অচ্যুত চরণে অনুরাগ।

একখণ্ড নগণ্য বস্ত্র পরিধান করে মাঘের শীতে যিনি গঙ্গা সাঁতরে পার হন, তাঁর মধ্যে আর কী কামনা বাসনা থাকতে পারে ?

কিন্তু নিমাই গৃহত্যাগ করলেন কেন ? কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য ? কৃষ্ণ লাভের জন্য গৃহত্যাগ করতে হবে কেন ? কৃষ্ণ তো নিজেই সংসারী। তিনি রাজা দ্বারকাধিপতি। রুক্মিনী, সত্যভামাদি তাঁর ষোল হাজার আটজন মহিষী। প্রদ্যুম্ন, শাম্বাদি রাজপুত্র।

কৈ, তিনি তো প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নি ? প্রব্রজ্যা তো দূরের কথা। বিভিন্ন মহিষীর গৃহে কৃষ্ণচন্দ্র কি কি করতেন,

তা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল দেবর্ষি নারদের। ষোল হাজার আটটি গৃহের কার্য কলাপের বর্ণনা প্রায় নিরুপাখ্য। তাই নীরত থাকলেন শুকদেব সে কাজ থেকে। পরিবর্তে পঁয়ত্রিশটির আলেখ্য আঁকলেন। প্রসঙ্গের অনুষঙ্গ হিসেবে মাত্র কয়েকটি কাজ হচ্ছে :—

কৃষ্ণচন্দ্র শয্যায় শয়ান। সসখী রুক্মিনীদেবী চামর ব্যজন করছেন ('গৃহিন্যা সাত্বত পতিং পরিবীজয়ন্ত্যা'), শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহিষী ও উদ্ধবের সঙ্গে পাশা খেলছেন ('দীব্যন্তম কৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ'), দ্বারকাধিপতি স্বীয় পুত্রদের লালন পালন ও স্নেহাদর করছেন ('লালয়ন্তঃ. সুতান শিশূন'), বাসুদেব মৌনী হয়ে গায়ত্রী জপ করছেন ('জপন্তং ব্রহ্ম বাগযতম'), আবার সেই বাসুদেব অসি চালনা চর্চা করছেন, (চরন্তমসি বর্ত্ম সু) আবার 'হসন্তং হাস্য কথায়া কদাচিৎ প্রিয়াগৃহে'— প্রিয়ার সঙ্গে মধুর আলাপনে হাসছেন, গুরু সেবাও করছেন ('শুশ্রূষন্তং গুরূণ') ঝগড়া বিবাদও করছেন (কুর্বন্তং বিগ্রহং), আবার যেহেতু তিনি পিতা, তাই পুত্র কন্যাদের বিবাহাদি সম্পন্ন করছেন (পুত্রানাং দুহিতৃনাঞ্চ কালে বিধ্যুপ যাপনম্), জামাতা বিদায়ও করেছেন।

আর অন্যান্য রাজধর্ম যেমন, কূপ খনন, মৃগয়ায় গমন, যজ্ঞে পশু বধ ইত্যাদি তো করেছেনই।

তা হলে নিমাই যে গৃহত্যাগ করলেন? তবে কি 'জগদ্ধিতায়'? কিন্তু এর পূর্ব্বক প্রশ্নটি হচ্ছে কোন্ প্রেক্ষাপটে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব হয়েছিল? মধ্যযুগের বঙ্গে প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমিটি কি রকম ছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পটভূমি

দ্বাদশ শতকের শেষ দশক।

শুধু বাংলা কেন, সমগ্র পূর্ব ভারতই মুসলমান শাসনে কবলিত হয় এই সময় থেকে। শাসন বলতে শোষণ তো বটেই, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুর ধর্মনাশ। একশ' নয়, দু'শ নয়, প্রায় তিনশ' বছর ধরে চলেছিল এই বীভৎস তাণ্ডব লীলা।

নবদ্বীপে নিমাইয়ের আবির্ভাব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় গৌড়ের মসনদে হুসেন শাহ্। বখতিয়ার খিলজি ১৩ শ শতকের গোড়াতে গৌড়ের সিংহাসনে। এই সময় থেকে হুসেন শাহী শাসনের পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল ধর্মান্তরকরণের এবং হিন্দু নিধনের নাটকীয় ও পৈশাচিক চণ্ডলীলা।

হতমান ও হতসহায় হিন্দুর সামনে দুটো পথ খোলা ছিল তখন : 'হয় গোমাংস খেয়ে কোরাণ বুকে তুলে নাও, নয়ত বুকের রক্তে রাঙ্গা কর খরধার তলোয়ার।'

বীর কে ? —না যিনি নারীর মর্যাদা রক্ষা করেন। এতেই না তাঁর শিভালরি। কোথায় গেল বীরের ধর্ম আর কোথায় শিভালরি ? একটা ধর্মই এদের সার হল। তা হল হিন্দু নারী ধর্ষণ।

ধর্ষণের উদ্দেশ্য কি ? — নারীদেহ ভোগ ? —না, বা হলেও তা গৌণ। প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মান্তরকরণ। এই ধর্ষণই হল ধর্মান্তরকরণের প্রশস্ত পথ। এরা জানত, নিশ্চিন্ত ভাবেই জানত, গোড়া হিন্দু সমাজ ধর্ষিতা নারীকে ফিরিয়ে নেবেনা। ফলে সংখ্যা স্বল্পতা দেখা দিল হিন্দু সমাজে। এ যে এক বিষম অপায়। তাহলে উপায় ? উপায় উদ্ভাবন করলেন স্মৃতি পারীণ রঘুনন্দন। অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত বিধি সামান্য পালন করলেই ধর্ষিতা নারী সমাজে গৃহীত হবে। পণ্ডিতবর বড়মুখে বর দিয়েই বেরিয়ে গেলেন। সমস্যার মূল যে শাসকের শাসানি, তার তো কোন নিরাকরণ করলেন না। ফলে রাজরোষে আতঙ্কিত কোন অভিভাবকই ঐ ধর্ষিতাকে ঠাঁই দিলনা।

শাসকের রোষারুণ লোচন কিরকম ছিল ? তাহলে সেই বদনার কাহিনীই স্মরণ করতে হয়। ধর্মান্তরিতের ঘরের চালে বদনা বসিয়ে দিলেন এক মৌলবী সাহেব। উনি একবার স্থানান্তরে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন ধর্মান্তরিতের ঘরের চালে বদনাটি নেই। বিরাট বিস্ফোরণ দেখা দিল। মৌলবী সাহেব ফৌজের বলে গোটা গ্রামের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে ফেললেন।

না, নিপীড়ন, নিষ্পেষণ, নির্যাতনের কাহিনীর শেষ এইখানেই নয়। শাসকের আসুরিক হাত আরো নির্মম হল যখন এর হাতের সঙ্গে হাত মেলালেন পীর, ফকির, আউলিয়া, মুরশিদ প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকেরা।

পীর, ফকিরের প্রভাব প্রাধান্য কি রকম ছিল ! ঘটনার

ঘনঘটা থেকে একটা বিঘটনের কথা স্মরণ করলেই যথেষ্ট। সুলতান ফকিরুদ্দিন সৈদা ফকিরের একজন বড় ভক্ত। ভক্তির বান ডাকল তাঁর মনে। তাই সৈদাকে তিনি গ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ফেললেন। বানরের হাতে ক্ষুর পড়লে যা হয় সৈদারও হল তাই। হাতে হিন্দুর মাথা কাটতে কাটতে একদিন সুলতান পুত্রেরই মাথা কেটে ফেললেন। এবার আঁতে ঘা পড়ল। সুলতানের পীরভক্তির বানে চড়া পড়ল। ফকিরের মুড়োটা তিনি ধড় থেকে নামিয়ে দিলেন।

অথচ এহেন পীর ফকিরই ছিল ধর্মের ধ্বজাধারী। ধর্ম মানে ইসলাম ধর্ম। ইসলাম শব্দটির অর্থ কি? — না, আল্লাহয় আত্ম সমর্পণ। ভালো কথা। গীতাও তাই বলেন: 'সর্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' তাহলে তো ধর্মের বিধান উভয় সম্প্রদায়েরই এক। অথচ কী বীভৎস বিকৃতি। সেই আত্ম সমর্পণ হয়ে গেল আত্মসাৎ অর্থাৎ বাজশক্তি আত্মসাৎ করল পীর ফকিরের দল।

আল্লাহ রসুলের বাণী রসাতলে তলিয়ে গেল। প্রফেটের বাণীর এক আধটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। যেমন "চেনা অচেনা সবাইকে সম্ভাষণ জানাবে।", "সব ধর্মেরই একটা বিশেষ গুণ আছে। এবং ইসলামের সেই বিশেষ গুণটি হচ্ছে বিনয় বা শিষ্টতা।", "সেই হচ্ছে প্রকৃত মুসলমান যার মুখ ও হাত থেকে মানুষের জীবন নিরাপদ।", "তাঁর অন্যতম কানুন হচ্ছে সকাল থেকে রাত্রি, আবার রাত্রি থেকে সকাল পর্যন্ত দ্বেষমুক্ত থাকবে এবং তাঁর এই কানুনটি মানলে তাঁকেই ভালবাসা জানান হবে।",

"কারুকে আঘাত করা থেকে তোমার হাত সরিয়ে নাও।", "নিপীড়িত জনকে, সে মুসলমানই হোক, আর অমুসলমানই হোক, সাহায্য করবে।"

দৃষ্টান্ত পল্লবিত করা নিষ্প্রয়োজন। সম্ভাষণ জানাবে এরা? হ্যাঁ, জানিয়েছে বটে। কাকে? — না, হিন্দুকে — ঐ কোরাণ বুকে নিতে, আর গোমাংস মুখে নিতে। আর বিনয়? হিন্দুর রক্তে গোছল করে পৈশাচিক উল্লাসে উলঙ্গ নৃত্যে যারা উদ্দাম হয়েছে, তারা বিনয়ীই বটে। আর জীবনের নিরাপত্তা? হাজারো হিন্দুর মাথা আনাজ তরকারীর মত হাতে কেটে যারা বিজয়োল্লাস করেছে, তাদের হাতে জীবন তো নিরাপদই! প্রকৃত মুসলমানের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে গেছে বটে।

তাহলে রসুলের হেতুগর্ভ হিতোপদেশের কি হল? কি আর হবে? গ্রন্থ বস্তু গ্রন্থেই রয়ে গেল। ও তো পঠনীয় মাত্র। তবে করণীয় কি? কেন, হিন্দুর মঠ-মন্দির গুড়ো করে ফেলে তার মাল মশলা দিয়ে তারই ওপর মসজিদ গড়ে তোলা। গৌড় এবং পাণ্ডুয়ার মসজিদগুলোই তো তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। হিন্দু দেবদেবীর চিহ্ন যে আমরা এখনও দেখতে পাই এই মসজিদগুলোতে।

হিন্দুর কাছে মুসলমান যেমন যবন, তেমনি মুসলমানের কাছে হিন্দু হচ্ছে কাফের। হিন্দুর মধ্যে বর্ণ বৈষম্য, জাত-পাতের সংকীর্ণতা এবং এর অপায় স্বরূপ যে সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছিল, তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল এই যবন। যেমন হুসেন শাহের (মতান্তরে তার পুত্র নসরৎ শাহর) রাজত্বকালে এক নৃশংস

ঘটনা ঘটে বেনাপোলে। অবশ্য এর জন্য হুসেনকে সরাসরি দায়ী করা যায় না।

বেনাপোলের জমিদার তখন রামচন্দ্র খান। সুলতানের উজীর এসে হাজির হল মূর্ত্তিমান যমরূপে। রাজকর নাকি বাকী পড়েছে। বাস্, শুরু হয়ে গেল পৈশাচিক ও নারকীয় নিপীড়ন ও বিঘটন। উজীর প্রথমেই শৃঙ্খলিত করল রামচন্দ্রকে। না, শুধু খানকেই নয়। শিকার হল তাঁর পুত্র-কলত্রও। উজীরের উৎপীড়নের যেন শেষ নেই। রামচন্দ্রের দুর্গা মণ্ডপে গোবধ করে গোমাংস ভক্ষণ চলল সমানে তিনদিন ধরে। না, এত অত্যাচারেও উজীরের লোলুপতায় ভাটা পড়লনা। শুরু হল লুণ্ঠন। লুণ্ঠনের কবলে পড়লেন রামচন্দ্র। পড়ল গোটা গ্রামটাই। নিঃশেষে লুণ্ঠন করে তাঁর জাতি, সম্পত্তি হরণ করে, এমন কি তাঁকেও বন্দী করে নিয়ে গিয়ে ক্ষান্ত হল উজীর।

এই সঙ্গে উজীরের আরেক কীর্তিও উল্লেখ্য। গ্রামের নাম সপ্তগ্রাম। ইজারাদার হচ্ছেন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার। এক মিথ্যা অছিলায় উজীর চলে এল দুভাইকে বন্দী করতে। তাঁদের অনুপস্থিতিতে গোবর্ধনের পুত্র হল বন্দী। নাম রঘুনাথ। এই রঘুনাথ গৌর সুন্দরের চরণাশ্রয়ে কিভাবে ব্রজের ষড় গোঁসাইয়ের অন্যতম গোঁসাই হলেন, সে অমৃত কথা যথাস্থানে আলোচ্য।

এতো গেল সম্প্রদায়গত কলুষ-কলহের একদিক. নিপীড়ন-নিধন চিত্রের এক পিঠ। অন্য পিঠে যে চিত্র পাই, সে সব হচ্ছে হিন্দু জাতির আত্মকলহ. বর্ণ বিভেদের বিষবৃক্ষ, আচার-আচরণের পঙ্কিলতা

ও কদর্য তামসিকতা।

'চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ'— এক থেকে চার অর্থাৎ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এর উদ্ভব হয়েছিল ব্যবহারিক জীবনে কাজের সুবিধার জন্য। অর্থাৎ বৃত্তিগত বিভাগের ফলে মানুষ নিজ নিজ পেশায় কর্ম দক্ষতা লাভ করবে। কিন্তু এখানেও সেই একই বীভৎস বিকৃতি। ধর্মগ্রন্থের কথা গ্রন্থেই গ্রথিত রয়ে গেল। হীন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেতে ফেলল সমাজে। এই শ্রেষ্ঠত্বে আসন শুধু আসনই নয়; আসন হয়ে গেল শাসন ও শোষণ। এই বর্ণশ্রেষ্ঠ জীবটি অন্য তিন বর্ণের ওপর জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল। এ এক জুগুপ্সিত জলৌকা বৃত্তি। তিন বর্ণই বা রইল কোথায়? তিন ত্রিশে গিয়ে ঠেকল। যেমন,

'কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেনে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তাম্বুলী তিলি তাঁতি মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী (চাষা) কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি (ময়রা) আর নাগরি যতেক।
যুগি চাষা ধোবা চাষা কৈবর্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর॥

বাইতি পটুয়া কান কসধি যতেক ।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক ॥"

হ্যাঁ, অনেকই বটে । একেবারে অগণন । এই অগণন জন অপাংক্তেয় তো বটেই, নব শাকরাও ব্রাহ্মণের জল-অচল । দীক্ষাদান হল এই বর্ণ শ্রেষ্ঠের মৌরসী পাট্টা । একেবারে একচেটিয়া বাণিজ্য । গুরুগিরি ব্যবসা ফেঁপে উঠল । শিষ্য কিন্তু অচ্ছুৎ । গুরু শিষ্যের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন । শুরু হল ষোড়শোপচারে তাঁর সেবার আয়োজন । শিষ্য তার কষ্টার্জিত টাকায় তাঁর ভোজনের ব্যবস্থা করতে পারবে, কিন্তু রান্না করে দিতে পারবেনা । পাত পাততে পারবে, কিন্তু পাতে দিতে পারবেনা । দিলে প্রভুর সেবা হবে না । কি বীভৎস গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ! না, এইখানেই সমাপ্তি ঘোষিত হবে না । গুরুর বিদায় আদায় আছে না ? শিষ্যের যে অর্থের অনটন । তা হোক । অর্থের কথা ভাবলে তো পরমার্থ লাভ হবেনা । কাজেই সেই পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য শিষ্যকে ঘটি, বাটি, জমি জিরাত, গরু-ভেড়া, বিক্রি করেও প্রভুর প্রণামী, বস্ত্র, তৈজসপত্রের ব্যবস্থা করতেই হবে । যে শিষ্য যথাসর্বস্ব খুইয়ে প্রভুর বিদায়ের ব্যবস্থা করল, সে কিন্তু তখনও রয়ে গেল সম্পূর্ণ অচ্ছুৎ । মানুষ হয়ে তিনি মানুষের হাতে অন্ন গ্রহণ করবেন না । কেন ? —করলে যে যজমানি ব্যবসায় ভাঁটা পড়বে । তাই না তৈরী হয়েছে অজস্র নিয়মবিধি, আচার-আচরণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে । এক বিধান রক্ষার্থে তৈরী হয়েছে সহস্র বিধান । ফলে "সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে ।"

এই নিয়ম নিগড়ে না আছে প্রেম, না প্রাণ, যেন অচল পাথর। এ দৃশ্য দেখে কবি হাহাকার করে উঠেছেন ঃ

"যে জাতি জীবন হারা অচল অসার,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।"

কোন্ সময় থেকে শুরু হয় এই শোষণ ? জন্মের পর থেকেই ? — না, না, জন্মের আগে মাতৃগর্ভ থেকেই বেচারাকে মাশুল গুণতে হয়। শুরু হয় পঞ্চামৃত থেকে। তারপর আবার জিজিয়া কর ষষ্ঠী পূজোতে। এমনি করে হিন্দুর বার মাসে তের পার্বণে ব্রাহ্মণকে টাকাকড়ি, সোনাদানা, অশন-বসনের ব্যবস্থা করতে করতেই জীবনের অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। এরপর গতাসু হয়েও বেচারার রেহাই নেই। এবার ওপার থেকেও মৃত্যুর মাশুল গুণতে হয় ভাগ্যহত জীবটিকে। সে আবার কি ? কেন, শ্রাদ্ধ, সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ড করণ, আরো কত কি ? শ্রাদ্ধেরও আবার রকম আছে, যথা দানাদি, বৃষোৎসর্গ। অর্থবলে দুর্বল, তাই লোকটি দানাদি করতে চাইল। অমনি হুঙ্কার এল তাহলে তার জন্য স্বর্গ সরণী অবরুদ্ধ। বৃষোৎসর্গ না করলে ভব নদী পার হওয়া যায় না। ঐ ষাড়ের লেজ ধরেই না বৈতরণী পার হতে হবে। অতএব স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে বৃষোৎসর্গেই উৎসর্গ করতে হবে সব কিছু। বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতার বীজ উপ্ত হয়েছিল এমনি করেই এবং পরবর্তীকালে তা যখন পল্লবিত বৃক্ষে পরিণত হল, তখন কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হল সাবধান বাণী ঃ

"যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে ফেলিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে॥

এত উপকরণ, উপচার, উপঢৌকন ও উপায়নে সাজিয়ে দেওয়া হল যে ব্রাহ্মণ নামধেয় জীবটিকে, সেই জীবটির জ্ঞানের দৌড় কতদূর ? জ্ঞানের তো দরকার নেই। দরকার শুধু পুরোহিত দর্পণ গোছের একটি বই। ওতেই না নিখিল বিশ্বের ছবিটি পরিষ্কার দেখা যায়।

ধর্মের নামে নিয়ম নিগড়ে নিগৃহীত করার কারদানি-কারবরাই কি এইখানেই শেষ ? — মোটেই না। ঐক্য-সংহতি জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্ম জগতে পাঁচরকম ভক্ত দেখা দিল : বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। একে অপরের দ্রোহী। সমাজ জীবন হল ছিন্ন-ভিন্ন। আসল বস্তুর বিকৃতি যে কত বীভৎস হতে পারে, তার একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। শাক্তেরা কিভাবে শক্তির সাধনা করত ? সাধনার কথা পরে হবে। আগে ভাগ-বিভাগ। শাক্তেরই সাত ভাগ : বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তচারী এবং কৌলাচারী। একব্যক্তি এই সম্প্রদায় ভুক্ত হতে চাইল। তাহলে ঐ সম্প্রদায়ের একজনের কাছে দীক্ষা নিতে হবে এবং দিনের বেলায় নানারকম ক্রিয়াকলাপের পর ঘোষণা করতে হবে যে পূর্ব্বের ধর্ম সংস্কার সে ত্যাগ করেছে। না, ঘোষণাতেই এষণার ইতি নয়। এটা তো অনুমান। অনুমানই তো প্রমাণ নয়। কাজেই প্রমাণ পত্র দাখিল করতে হবে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ সমাধা করে।

দিন গেল। রাত্রি এল। এই নিশাকালটাই আসল কাল। গুরু ও শিষ্য আটজন বামাচারী পুরুষ ও আটজন নারী যথা, নর্তকী, তাঁতীর মেয়ে, বেশ্যা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা কন্যা, ব্রাহ্মণী, ভূস্বামীর কন্যা ও গোয়ালিনী নিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকল এবং নারী পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় বসল। গুরু তখন শিষ্যকে উপদেশ দিলেন, 'আজ থেকে লজ্জা, ঘৃণা, শুচি-অশুচি, জাতিভেদ ত্যাগ করবে। মদ্য, মাংস ও স্ত্রী সম্ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করবে, তবে সর্বদাই তোমার ইষ্টদেবতা শিবকে স্মরণ করবে এবং মদ্য-মাংস ইত্যাদি ব্রহ্মপদে লীন হবার উপাদান স্বরূপ মনে করবে।"

এরপর নানা প্রক্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সবাই মদ্যপান ও মাংস মায় গোমাংস ভক্ষণ করে। অনভ্যস্ত চেলাটি মদ খেতে খেতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। বেহুঁশ হয়েই সে চেলাটি কামাল করে ফেলল। সে হয়ে গেল অবধূত। অজ্ঞানের অমাতে অবলুপ্ত হল তার পূর্বাশ্রমের নাম, প্রেমাতে এল এই নতুন নাম। এটা একটা বাণিজ্যিক তকমাও বটে। যাহোক, ঐ ঘর থেকে তখন সবাই বেরিয়ে গেল, থাকল শুধু ঐ চেলা ও এক নারী।

স্থূল মাংসলতার এটাই শেষ কথা নয়। এতক্ষণ তো গেল নারীদেহ উপভোগ এবং মদ্যপান ঘরের মেঝেতে। এরপর আসন পাতল শবদেহের ওপর। দুজনেই উতুমথুমা, ঐ তান্ত্রিক প্রবর আর তার স্ত্রীলোকটি। এখন আধার ও আধেয় দুইই বিচিত্র ও বীভৎস। আধার মরার মাথার খুলি, আর আধেয় ঐ মদ।

বৃন্দাবন কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছেন ঃ

"রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মালা বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবাসঙ্গে বিবিধ রমণ॥"

সুতরাং বাংলা তথা নদীয়ার আকাশে এই রাহুগ্রস্ত চাঁদ দেখলেন নিমাইচাঁদ। তবে কি এর আগে কৃষ্ণনাম তথা প্রেম ধর্ম্মের প্রচার হয়নি? হয়েছে বৈ কি। মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারাই হয়েছে। মাধবেন্দ্র পুরী কে? এক পয়ারেই তার পরিচয় ঃ

"মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥"

নবঘনের মধ্যে নবঘন শ্যামকে দেখে যিনি জ্ঞান হারান, সে হেন মাধবেন্দ্র পুরী তাঁর উনিশজন শিষ্য নিয়ে নাম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। এঁর শিষ্যরাও যথা ঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী, শ্রীরঙ্গ পুরী, কেশব ভারতী ও অদ্বৈত আচার্য ছিলেন বৈষ্ণব জগতের বিরাট স্তম্ভ এবং পরবর্তী জীবনে নিমাইয়ের শ্রদ্ধেয় অন্তরঙ্গ জন এবং কেশব ভারতী হন দীক্ষা গুরু। তবুও বৈষ্ণব ধর্ম লোকের মনে আসন পাততে পারেনি। যদি পারত, তাহলে সমাজ প্রেক্ষাপট এমনি করে কলুষক্লিন্ন হতনা, যেমন ঃ

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোনজন্ ?
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥"

এ না হয় গেল আবর জনের কথা। কিন্তু জ্ঞানী জনের কি হল ? হ্যাঁ, জ্ঞানী জনই বটে। জ্ঞানের শুষ্ক কাষ্ঠই চর্বণ করতেন ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী ও মিশ্ররা ; কিন্তু

"না বাখানে যুগ ধর্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরি ধ্বনি ॥
গীতা ভাগবত যে জানে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
... ...
... ...
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥" —নইলে,

বাংলার সিংহাসনে তো আসীন ছিলেন সুবুদ্ধি রায়, হুসেন শাহ নয়। হুসেন ছিলেন রায়ের এক নগণ্য কর্মচারী, অথচ চক্রান্ত জালে রায়ের শুধু তক্তই গেল না, গেল জাতও। হুসেন রাজপদ লাভ করলেন অমাত্যদের লোভ দেখিয়ে। কি সে লোভ ? —

না, তিনি অমাত্যদের বললেন, 'যদি তোমরা আমাকে মসনদে বসাও, তাহলে গৌড়ের মাটির ওপরের সব ধন তোমরা পাবে, আর নীচেরটা আমার থাকবে।' অবশ্য অমাত্যদের আশার আলো আলেয়া হয়ে গেল। হুসেন একাই ওপর নীচ, দুই-ই গ্রাস করলেন। কিভাবে এবং কেন করলেন, সে কথা অপ্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক যা, তা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাক্লিষ্ট ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু জাতির এক জীবেরও সুবুদ্ধি হল না, সুবুদ্ধি রায়কে সহায়তা করতে। তবে তাঁরা একটি কাজ করতে এগিয়ে এলেন। তা হচ্ছে রায়ের প্রাণনাশের ব্যবস্থা। হুসেন, রায়ের মুখে কিঞ্চিৎ বদনার জল দিয়েছিলেন মাত্র, প্রাণে মারেন নি। আর হিন্দু পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের কদর্য ব্যাখ্যা করে বিধান দিলেন রায়ের প্রাণনাশের। কদর্য ব্যাখ্যা নয়তো কি? এক ফোঁটা জলে একটি লোকের জাতি চলে যায় যেখানে, সেখানে তো কোন জাতিই নেই, আছে জাতির নামে বজ্জাতি।

একদিকে যবনের জঘন্য নারকীয় নিপীড়ন ও নিধন, আবার অন্যদিকে পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত নিয়ম নিগড়ের নিষ্পেষণ। এ ছাড়াও বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত দেখা দিয়েছিল তৎকালে রচিত একাধিক গ্রন্থ। এই সব গ্রন্থ সমাজ জীবনকে এত কলুষিত করেছিল যে মানুষ রুচি বিকৃতির শিকার হয়ে যৌন রস ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন রসের কথা ভাবতেই পারত না। ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা এবং প্রধানা গোপী শ্রীরাধা এবং অন্যান্য গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ভাগবতকার গীতার সেই 'সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' এর কথাই বলেছেন;

কিন্তু সে কথাটা সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেল। বিকৃতি ঘটালেন এই মহাজনেরা এবং বীভৎস বিকৃতি ঘটাল সাধারণ পাঠক। রাজা বৃষভানুর রাধা নামধেয় কোন তনয়া ছিলেন কি ছিলেন না, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে রাধা (যাঁর নাম সমগ্র ভাগবতে, এমনকি রাস পঞ্চাধ্যায়েও নেই) হলেন ভক্তের প্রতিভূ বা প্রোটোটাইপ। সে ভক্ত নারীও হতে পারেন, পুরুষও হতে পারেন কারণ বৃন্দাবনে একমাত্র ব্রজেন্দ্র নন্দনই পুরুষ, আর সবাই প্রকৃতি, তা তিনি পুরুষই হোন, আর নারীই হোন।

তাহলে গোলযোগটা কখন দেখা দিল ? দেখা দিল তখনই, যখন কিছু মহাজন যুগল কিশোর বিগ্রহের শ্রীকৃষ্ণের পাশে শ্রীরাধাকে ভক্তের প্রতিভূ না ভেবে, ভাবলেন স্ত্রীলোক, এই গোলযোগে গলা যোগ করল জনসমাজ। ষড়রিপুর মধ্যে কামই সর্বপ্রথম ও উগ্রতার নিরিখে সর্ব প্রধান এবং মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সুতরাং এই আদিরসেই গা ভাসিয়ে দিল হিন্দু লোক সাধারণ। কাজেই তারা আর শাসনভার গ্রহণ করবে কি ? কবি হক কথাই বলেছেন 'আদি রসে দেশ ভাসে অজয়ে জোয়ার।
বঙ্গভূমি পদে দলে তুরস্ক শোযার।'

যা হোক, দু' একটা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও পরকীয়া তত্ত্বকে বিকৃত করে চণ্ডীদাস লিখলেন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। কাব্যটিতে আগাগোড়া আদিরসের এত বেশী ছড়াছড়ি যে এটি একটি পার্নোগ্রাফীতে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থটিতে কবি নায়ক কৃষ্ণের এমন বিকৃত রূপ দিয়েছেন যে নায়ক বারংবার

নায়িকা রাধাকে বলছেন যে তাঁর দেহ সম্ভোগ করার জন্যই তিনি ভূমণ্ডলে অবতার হয়ে এসেছেন। যেমন, 'অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আসে।'

ব্যাখ্যা যতরকম ভাবেই দেওয়া যাক জয়দেবের কাব্যে এই আদিরসের প্রাবল্য ও প্রাচুর্য। স্পিরিচুয়াল অ্যালেগোরি বা আধ্যাত্মিক রূপকের স্পিরিট সাধারণ লোক বুঝবে আশা করাটা ফল্গু বল্পন মাত্র। বাস্তবে হলও তাই। একশ নয়, দু'শো নয়, তিনশটি বছর ধরে আদি রসের নগ্নরূপে মগ্ন রইল সমগ্র সমাজ।

অবশ্য তৎকালে রামী চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম নিকষিত হেমও ছিল, আর ছিল হুসেন শাহের রাজসভায় হিন্দু সংস্কৃতির সৌরভ। এখানে দুভাই ও এঁদের ভগ্নীপতির কথাই বলি। বড় ভাই সনাতন ছিলেন প্রধান অমাত্য সাকর মল্লিক বা ছোট রাজা, আর ছোট ভাই রূপ ছিলেন দবীর খাস বা অর্থ সচিব এবং শ্রীকান্ত ছিলেন এঁদের ভগ্নীপতি। অনেকটা সভাকবির পদে সম্মানিত ছিলেন কবি শেখর, দামোদর ও যশোরাজ খান। চিকিৎসক ও ছত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যথাক্রমে মুকুন্দ ও কেশব খান

এতো গেল হিন্দুর কথা। শাসন দণ্ডের অধিকারী একাধিক মুসলমানও ছিলেন হিন্দু সংস্কৃতি প্রেমী। যেমন, পরাগল খান। ইনি ছিলেন সেনাপতি। চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসন দণ্ড ছিল এঁরই হাতে। এঁরই সপ্রেম সহায়তায় সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় রচিত হয় মহাভারত। রচয়িতা হচ্ছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

পরাগলের পরবর্তী কালে বাংলাভাষায় আবার মহাভারত

রচিত হয় শ্রীকর নন্দীর সোনার দোয়াত-কলমে। এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন পরাগল পুত্র নসরৎ খান যাঁর লোকপ্রিয় নাম ছুটি খান।

তবে ঐ যে একটা কথা আছে না, **Bad money drives out good money.** এ ক্ষেত্রেও হল তাই।

এ হেন ভঙ্গপয়ার সমাজের সম্মুখীন হলেন শচীনন্দন।

শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি কেমন ছিল? এটি বৃন্দাবন এঁকেছেন এইভাবে ঃ

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাত সবে মহাদক্ষ।।
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।।
নানাদেশ হইতে লোকে নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।।"

সুরধুনীর বক্ষে সুরের লহর, আর তার তটে টোলের বহর। নব-ন্যায় ও স্মৃতির অনুশীলন। নৈয়ায়িক রঘুনাথের নাম আজও

স্মরণীয়। কিন্তু সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নাম। এঁর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হলেন উড়িষ্যাধিপতি মহারাজ প্রতাপ রুদ্র। সভাপণ্ডিত পদে বরণ করে নিয়ে গেলেন নবদ্বীপ থেকে। নবদ্বীপ তখন ন্যায় চর্চায় পীঠস্থান, কিন্তু গ্রন্থ যে নেই সারা নদীয়ায়। তাহলে গ্রন্থ কোথায়? না, মিথিলায়। গ্রন্থ দেওয়া দূরের কথা, গ্রন্থের নকলই করতে দেবেন না মিথিলার পণ্ডিতেরা। এক বিষম সমস্যা। নিরাকরণ করলেন সার্বভৌম। মিথিলায় গিয়ে গোটা ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠে ধারণ করে নিয়ে এলেন। গ্রন্থ লেখা হল তাঁরই কণ্ঠ নিঃসৃত বাণী থেকে।

নিমাইয়ের পিতা জগন্নাথও ছিলেন সুপণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি পুরন্দর অবতংস লাভ করেছিলেন। পণ্ডিতের যতখানি মান ছিল, ততখানি ধন ছিল না। না থাকলেও ধনীই মানীর কাছে নত মস্তক হত। ধনের বলে ধনী যাচ্ছেন পাল্কীতে, আর জ্ঞানী-মানী যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে। কিন্তু দর্শন মাত্রই ধনী নেমে এলেন পাল্কী থেকে জ্ঞানীকে নমস্কার জানাতে।

তখন কলকারখানার কলরোল ছিল না। প্রথাগত কিছু পেশা জাতিগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন, তাঁতী, কুমার, কামার, গন্ধ-বণিক, স্বর্ণবণিক ইত্যাদি। শিল্প বলতে এইটুকুই যা। তাই সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা সাধারণই ছিল। তবুও সবাই

সুখেই ছিল। অভাব বোধ ছিল না। ছিল না কামনা-বাসনার আদাড়-পাঁদাড়। অনাড়ম্বর ও সরল জীবন। অনেকের আবার কোন পেশাই ছিল না, যেমন ছিলনা শ্রীবাস পণ্ডিতের। পণ্ডিত সর্বদাই কীর্তনানন্দে মেতে থাকতেন। নিজ গৃহে নিয়মিতভাবেই করতেন নিত্যকীর্তন।

এ হেন সমাজ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন গৌর সুন্দর।

তৃতীয় অধ্যায়

নদীয়া লীলা

শস্ত্র ও শাস্ত্র—এই দুই আয়ুধের ব্যবহার কত বিসদৃশ, বিকৃত ও বীভৎস ছিল, তা কিঞ্চিৎ চিত্রিত হয়েছে পটভূমির পটে।

শস্ত্র বলে বলী যবন, আর শাস্ত্র বলে বলী ব্রাহ্মণ। যবনের নিপীড়ন নৃশংস, কিন্তু অধিক নৃশংস নিজ জাতির অনাদর, অবহেলা, অপমান, অনাচার, কদাচার ও অবাচ্য অত্যাচার। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কলুষ পঙ্কিলতা ও সোঽহং এর বিষ বাষ্প ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলেছিল গোটা হিন্দু সমাজ।

এ হেন অবস্থায়ও তাঁর আগমন হচ্ছিল না কেন? "···সম্ভবামি যুগে যুগে।"— তাঁর এই প্রতিজ্ঞা বাক্য কি অনৃত? না, তাঁর প্রতিজ্ঞা বাক্য সর্ব যুগেই অবিতথ। তাহলে তিনি অবতরণ করছিলেন না কেন? কাল পক্ক হলেও স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। এটাই রীতি। সর্ব যুগে একই রীতি।

তাহলে স্মরণ করিয়ে দিলেন ক'জন?- ক'জন কেঁদে আকুল হয়ে ব্যাকুল প্রার্থনা জানালেন? ক'জন নয়—জন মাত্রই একজন। সেই সুজন, সেই সুভগ সুজন হচ্ছেন আচার্য অদ্বৈত। আচার্যের

আকুল আহ্বানে সাড়া দিলেন যিনি সেই গৌরচন্দ্র কোন আয়ুধটি ধারণ করলেন— শস্ত্র, না শাস্ত্র ? না, এ দুটোর কোনটিই না। না শস্ত্র, না শাস্ত্র। তাহলে ভগ্ন মেরুদণ্ড, হৃতস্বাতন্ত্র্য আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতির মধ্যে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের প্রত্যয় কিভাবে ফিরিয়ে আনলেন ? কি উপায় তিনি উদ্ভাবন করলেন যাতে জীব জাতির কথা, বর্ণের কথা, উচ্চ নীচের কূট-কচাল ভুলে গিয়ে ভাবতে পারল তারা সবাই সমান— সমান তারা অশনে বসনে, শয়নে, স্বপনে যাতে তাদের মধ্যে জাগল আত্মস্মৃতি, আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরতা ও আত্মানুভূতি এবং যাতে তারা মুক্ত হল দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতার মহাপাপ থেকে।

আচ্ছা, শাস্ত্রের আশ্রয় তিনি নিলেন না কেন ? যে বিষয়টিতে দুর্বলতা থাকে, মানুষ তা পরিহার করে। তবে কি জগন্নাথ-সুত শাস্ত্র পারীণ ছিলেন না ? পিতৃদেব তো স্বয়ং পুরন্দর। আচ্ছা, নিমাইয়ের টোল জীবন কেমন ছিল ?

মায়াপুরের কাছেই গঙ্গানগর। সেখানে টোল খুলেছেন ব্যাকরণ পণ্ডিত গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য। গঙ্গাদাসের পাণ্ডিত্য কেমন ? সে সংবাদ দিচ্ছেন বৃন্দাবন ঃ

"নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যেহেন সান্দীপনি ॥

পুত্রের ইঙ্গিত বুঝে পিতা মিশ্রবর গঙ্গাদাসের টোলে নিয়ে গেলেন। কি না ব্যাকরণ পড়বেন নিমাই। জগন্নাথও পাণ্ডিত্যে পুরন্দর। তাই ঃ

"মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি এক আসনে বসিলা ॥"

মিশ্র এবার আসল কথাটি পাড়লেন, 'লোকে বলে পাণ্ডিত্যে তুমি সান্দীপনি। তাছাড়া ছেলেও তোমার কাছেই পড়তে চায়। কাজেই ব্যাকরণ শিক্ষার ভার তুমিই নাও।' গঙ্গাদাস আনন্দে উচ্ছল হয়ে বললেন, 'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।' আরও বললেন, 'পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার।'

বেশ, সর্বশক্তি তো আচার্য প্রয়োগ করলেন, কিন্তু শিষ্য গ্রহণ করল কতটুকু? এ সংবাদ জানাচ্ছেন কবিরাজ:

"গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্র বৃত্তিগণ ॥"
"অল্পকালে হৈল পঞ্জী টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥"

কবিরাজের আগে বৃন্দাবনও একই সংবাদ দিয়েছেন:

"দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব শিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত ॥"

"চিরকালের পড়ুয়া জিনে………" অর্থাৎ প্রবীণরাও এই নবীনের পশ্চাতে পড়ে রইলেন। অথচ নিমাইয়ের কতটুকুই বা বয়স তখন? সবে তো চোদ্দ। আর প্রবীণ ছাত্রদের বয়স কত? অনেকেই তাঁর চেয়ে বড়। কারুর তিরিশ, কারুর বা বত্রিশ। অর্থাৎ দ্বিগুণাধিক। তবে কি এই সব ছাত্ররা মস্তিষ্ক শক্তিতে দুর্বল ছিলেন? তা বললে হয়, যেখানে তাঁর সতীর্থ রয়েছেন

কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি আর এঁদের শিরোমণি হয়ে রয়েছেন রঘুনাথ।

স্বল্প সময় কাটল। সাবাস! এরই মধ্যে নিমাই একটি ব্যাকরণের টীকা লিখে ফেললেন। কি রকম সে টীকা? —না, অনন্য সে টীকা। এ রকম টীকা এই প্রথম। সবাই বললেন ভাল, খুব ভাল, কিন্তু একজনের মুখ হল কালো, বড়ই কালো। কে সে একজন? — রঘুনাথ সেই জন। কারণ কি? রঘুনাথ যে আবাল্য আকাঙ্খী। যশের আকাঙ্খী। কি রকম যশ? — না, তিনি হবেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। কিন্তু নিমাই চাঁদের ব্যাকরণ টীকা কৌমুদী যে তাঁকে হীনপ্রভ করল।

ব্যাকরণ পাঠ তো সমাপ্ত হল। এরপর ন্যায় শাস্ত্র। এরজন্য তিনি বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে আচার্য পদে বরণ করলেন। ও হরি! এখানেও সেই একই কাণ্ড। পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেই ন্যায় শাস্ত্রের ওপর টীকা লিখতে আরম্ভ করলেন। সংবাদটি চৌপাঠিতে ছড়িয়ে পড়ল। সবারই ভারি আহ্লাদ; কিন্তু দীধিতি প্রণেতার হল শিরে বজ্রাঘাত।

বেদনাহত কণ্ঠে রঘুনাথ নিমাইকে শুধোলেন, 'ভাই, তুমি নাকি ন্যায়ের ওপরেও একটা টীকা লিখেছ?'

নিমাই নম্রকণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, একটু চেষ্টা করছি।'

-- 'তা তোমার পুঁথিটা আমাকে একটু দেখাবে?' রঘুর কণ্ঠে আতঙ্কের সুর।

- 'এটা আর বেশী কথা কি? কালই নিয়ে আসব। এক

সঙ্গেই তো গঙ্গা পার হব, তখন নৌকোয় বসে তোমাকে শোনাব। গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়াও খাবে, আর তোমার শোনাও হবে।'

পরের দিন শচীনন্দন পাঠ আরম্ভ করলেন। গঙ্গা বক্ষে নৌকোতে বসে। কলনাদিনী সুরধুনীর কলতান, আর বইছে দেহ-জুড়োনো সমীরণ। কিন্তু তবুও যে রঘুনাথের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। যতই শুনছেন ততই রঘুনাথ যেন দু চোখে আঁধার দেখছেন। শেষকালে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। এ এক বিসদৃশ দৃশ্য। বিশ্বম্ভর বিস্মিত। শুধোলেন, 'কি ভাই রঘু কাঁদছ কেন?'

কান্না ঝরা কণ্ঠে রঘু বললেন, 'ভাই নিমাই, আমি আর পণ্ডিতের মান পেলাম না।'

নিমাই শুধোলেন, 'কেন?'

—'আর কেন? যে কথাটা প্রকাশ করতে আমি নিয়েছি দশ পাতা, সেই ভাবটা প্রকাশ করতে পাতা তো দূরের কথা, তুমি নিয়েছ দু/একটি ছত্র মাত্র। এর পরেও কি তুমি বলতে চাও, আমার গ্রন্থ লোকে পড়বে?' — বলার সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের কান্নার বেগ বেড়ে গেল। নিমাই তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি কান্না থামাও। আমার টীকা আমি এই মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি।' — বলেই গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন টীকা আর আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি আর টীকা লিখব না। এমনকি ন্যায়ের মত নিষ্ফল শাস্ত্র আর চর্চাই করবনা।'

ন্যায় যে নিষ্ফল শাস্ত্র এই বোধের বীজ উপ্ত হয়েছিল নামকরণ

কালেই। একান্ত সহজাত ভাবেই। নামকরণের সময় শিশুর সামনে সোনা, ধান, খৈ, রূপো, কড়ি, পুঁথি দেওয়া হয়। এটা একটা প্রচলিত প্রথা। নিমাইয়ের সামনেও সাজিয়ে দেওয়া হল। সব ছেড়ে শিশু নিমাই কি করলেন? — না,

"সকল ছাড়িয়া প্রভু শচী নন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন।"

এতে কি হল? যে ভাগবত একমাত্র নিত্যবস্তু, সেই ভাগবতই অঙ্গে ধারণ করলেন। ভাগবত একমাত্র নিত্যবস্তু কেন? — না, একমাত্র ভাগবতেই আছে প্রেমকুম্ভের সন্ধান। প্রেমময় ভগবানের লীলা কথা। বড়ই মধুর সে কথা, যে কথার ওপর আর কোন কথা নেই আর কোন শাস্ত্রে, আর কোন গ্রন্থে।

নিমাই এখন অধ্যাপক। তাঁর টোলে অনেক ছাত্র। দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন কেশব কাশ্মীরী। গোটা দেশটার পণ্ডিত সমাজ পরাজিত তাঁর কাছে। বাকী শুধু নবদ্বীপ। অদ্বিতীয় অভিধার অভিলাষে এসেছেন নবদ্বীপে। অত বড় পণ্ডিত! তিনি কি আর একা চলতে পারেন? একা চললে যে মান থাকে না। তাই সঙ্গে রয়েছেন কত লোকজন, হাতী, ঘোড়া আরো কত কী। এসেই 'রণং দেহি' বলে হুঙ্কার দিলেন। নবদ্বীপের জয়তিলক ললাটে ধারণ এক অসাধারণ ঘটনা। কেন? রঘুনাথ আর রঘুনন্দন রয়েছেন যে! নিমাই পণ্ডিতের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল, কিন্তু কেশবের সঙ্গে সংগ্রাম সরাসরি সরস্বতীর সঙ্গে সংগ্রাম, তাই, না এলেন নৈয়ায়িক, না স্মার্ত।

শেষকালে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গেই সাক্ষাৎকার। একেবারে আচম্বিতে। স্থানটি বড়ই মনোরম। সুরধুনীর তীর। গ্রীষ্মকাল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। শরীর সুপবনে জুড়িয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ সত্যি সুখপ্রদ ও সুন্দর। যেমন,

"পরম নির্মল নিশা পূর্ণ চন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী॥"

নিমাই পণ্ডিত বড়ই কৌতুক প্রিয়। পড়ুয়ারা পড়ছে পরম পরিতোষে। কিঞ্চিৎ দূর থেকেই লক্ষ্য করলেন কেশব। এ তো ব্যাকরণের প্রাথমিক পাঠমাত্র। বয়সেও একেবারে নবীন। এঁর আর কি পাণ্ডিত্য থাকতে পারে? নিশ্চিন্ত হলেন দিগ্বিজয় গর্বী। বিজয় মালা গলায় পরে, অদ্বিতীয় আখ্যায় ভূষিত হয়ে নিজ নিকেতনে ফিরবেন। না, আর বিলম্ব নয়। নিমাই পণ্ডিতকে আহ্বান করলেন তর্ক যুদ্ধে। নিমাই বিনাযুদ্ধে জয়পত্র দিতে চাইলেন। নিজ অক্ষমতা জানিয়ে নিবেদন করলেন:

"কাঁহা তুমি সর্ব শাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি নব শিষ্য পড়ুয়া নবীন॥"

কেশব মানলেন না তাঁর নিবেদন। বিনাযুদ্ধে জয়পত্র নিলে কি মান থাকে? আর উপায় কি? আহব আরম্ভ হল। নিরুপায় নিমাই নিবেদন করলেন:

"তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥"

কেশব সত্যি সরস্বতীর বরপুত্র। এক লহমায় এক শত শ্লোক রচনা

করে বলে গেলেন। বিজয় গর্বের হাসিতে মুখটি ঝলমল করছে। শুধোলেন, 'স্তব তোমার কেমন লাগল' গৌরসুন্দর বিনয়-নম্র কণ্ঠে বললেন, 'কবিত্বে আপনি সত্যি অদ্বিতীয়। তবুও বিচার বিশ্লেষণ না করলে কাব্যের রসাস্বাদন হয় না। আপনি যে কোন একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করে আমাদের পরিতৃপ্ত করুন।"

— 'কোন শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে বলছ?' — পাল্টা প্রশ্ন করলেন কেশব।

নিমাই এই শ্লোকটির কথা বললেন ঃ

"মহত্ত্বং গঙ্গায়া সততমিদমাভাতি নিতরাম।
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা॥
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনৈররর্চ্চরণা।
ভবানী ভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥"

কেশব বিস্মিত। তাইতো, শত শ্লোকের মধ্যে এই একটির উল্লেখ কবলো কি করে এই বালক? — ভাবলেন কেশব ভট্ট। আবার ভাবলেন হয়ত বা বালকটি শ্রুতিধর। শ্লোকের ব্যাখ্যা করলেন ভট্ট।

নিমাইয়ের পাল্টা প্রশ্ন, 'দোষ গুণ বিচার করুন।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ভট্ট বললেন, 'আমার শ্লোকে দোষ?'

নিমাই তাঁর স্বভাব সিদ্ধ দীনতা নিয়ে বললেন, 'পঞ্চদোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলংকার।' আরও বললেন,

"ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্তা জানি॥"

দিশাহারা ভট্ট নানাভাবে চেষ্টা করলেন ব্যাখ্যা করতে। না, পারলেন না। কিছুতেই পারলেন না। অপমানে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন কেশব। জগন্নাথসুত সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনি এত বিব্রত বোধ করছেন কেন? ভুল কালিদাসেও আছে, আছে ভবভূতিতেও।' সান্ত্বনায় সাময়িক শান্তি লাভ করলেন কেশব: নিতান্তই সাময়িক শান্তি। ঘরে ফিরে আসার পরই অন্তরে দেখা দিলে অশান্ত তরঙ্গ। আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হলেন কেশব: 'সারাটা জীবন শুধু অসার অতর্কে কাল যাপন করেছি। আমার এই যে বিজয় তিলক, বিজয় কেতন, বিজয় মাল্য এ সবই তো ঐ অফল জ্ঞানের অভিজ্ঞান। কিন্তু যে জ্ঞান লাভ করলে, আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, সেই জ্ঞান তো লাভ করিনি। সেই জ্ঞান তো লাভ করেছে এই বালক। আর, তাই আজ তার কাছে আমি হলাম পরাজিত। প্রেমময়কে জানাই হচ্ছে সেই জ্ঞান। জ্ঞানের পথে নয়— এই প্রেমের পথে অগ্রসর হতে হলে চাই শরণাগতি। এই নিমাই পণ্ডিতই হচ্ছে সেই প্রেম ভক্তির ধুর্য আমার একমাত্র শরণ্য।' এইভাবে আত্মান্বেষণেই নিশি পোহাল নিদ্রাহীন। না, আর ক্ষণকালও বিলম্ব নয়। তাই অরুণোদয় হতে না হতেই ছুটলেন গৌর গৃহে। সাষ্টাঙ্গে পতিত হলেন গৌরপদে। হেমদণ্ড বাহু বাড়িয়ে প্রেমালিঙ্গন দিলেন গৌর সুন্দর। যথার্থ বলেছেন বৃন্দাবন:

"জিনেও না করেন কারো তেজ ভঙ্গ।
সবাই পায়েন প্রীত হেন তার রঙ্গ॥"

এহেন শাস্ত্রজ্ঞ নিমাই পণ্ডিত কেন শাস্ত্র নামধেয় আয়ুধটি ধারণ করলেন না ? অথচ নদীয়া লীলায় একমাত্র ধ্রুবতারা হচ্ছে জনসমাজ. জনসমাজের অনাময়, ঐক্য ও সাম্য।

শাস্ত্র বলতে তখন যা ছিল. তার বীভৎস চিত্রটি কিঞ্চিৎ অঙ্কিত হয়েছে পটভূমিতে। জলাতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল জনমানসে এই শাস্ত্র। নাম শুনলেই অগণন জন যোজন দূরে চলে যেত।

শাস্ত্র বলতে কিসের চর্চা হত নিশিদিশি ? — না, ন্যায় আর স্মৃতির। ন্যায়েরই কতটুকু চর্চা হত ? কিছুই না। অলস সময় যাপনের অবলেহ মাত্র। কিছু কূট-কচালে তর্ক। ব্যস্ ! দিনমান কেটে গেল। টিপ করিয়া তাল পড়িল, না তাল পড়িয়া টিপ করিল। বীজ আগে, না বৃক্ষ আগে জাতীয় অতর্কে দিনপাত হত ঘটপটিয়ার মত।

নৈয়ায়িকপ্রবর শয্যায় শয়ান। এক শিষ্য এসে নিবেদন করল, 'আচার্য দেব, গাত্রোত্থান করুন।'

পণ্ডিত প্রবর প্রশ্ন করলেন, 'কেন ?'

শিষ্য জানাল, 'অরুণোদয় হয়েছে, প্রভু।'

পণ্ডিতের পাল্টা প্রশ্ন, 'কি করে বুঝলে ?'

শিষ্যটি বলল, 'পূবের আকাশ লাল হয়েছে।'

শায়িত অবস্থাতেই পণ্ডিত বললেন, 'আগুন লাগলেও লাল হয়।'

ব্যস্, এক বেলার আহার সংগৃহীত হয়ে গেল। এরপর মধ্যাহ্ন ভোজন। ভোজনান্তে দিবানিদ্রা। তারপর আরেকটি ব্যাসকূট সৃষ্টি করতে পারলেই পণ্ডিত পুঙ্গবের রসনা চালনার ব্যবস্থা

হয়ে গেল।

আর স্মৃতি? আচার-আচরণের কথা। স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্মার্তশার্দুল কথায় কথায় প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেন। সঙ্গে দিতেন শতাধিক দ্রব্যের এক সুদীর্ঘ সারণী। ধন, গোধন, কাঞ্চন, বসন, বাসন, রসনার রসায়ন ইত্যাদি। অথচ শাস্ত্রের সব বিধানই তাঁর নিজ আচরণে নিশ্চিহ্ন। শুধু অপরের আচরণে বিকৃত প্রয়োগের কারদানি। উদ্দেশ্য? ঐ স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি।

একজন এসে শুধোলো, 'আচ্ছা, পণ্ডিত মশায়, মাকড় মারলে কি হয়?'

পণ্ডিত হাহাকার করে উঠলেন, 'অ্যা, করেছিস কি? পাপ-মহাপাপ করেছিস বাবা। সহস্র বৎসর নরকবাস। তবে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। —বলেই তিনি ঐ শতাধিক দ্রব্যের বিতং ফর্দটি ধরিয়ে দিলেন।

লোকটি হিসেব করে বলল, 'তাহলে তো আপনাকেই পাঁচশ টাকা দিতে হয়'। বিস্মিত পণ্ডিত শুধোলেন, 'কেন?'

—'মাকড় তো মেরেছে আপনারই ছেলে।' — লোকটির মুখে বড়ই তৃপ্তির হাসি।

পণ্ডিত আর কি করেন? ভাঁতে ঘা পড়েছে। বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বললেন, 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়।'

এ না হয় গেল ন্যায় আর স্মৃতি? কিন্তু বেদান্ত? বেদান্তের অনুশীলন কি ছিলনা? ছিল। অতি সামান্য। তাও কদর্যভাবে বিবৃত এবং

"গীতা ভাগবত যে জানে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাঁহার জিহ্বায়।'

অথচ ঈশোপনিষদ প্রথম শ্লোকেই বলেছেন,

" ঈষাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধ কস্য সিদ্ধনম॥"

ভক্তি ? ভক্তি তিনি করবেন কাকে ? তিনি না নিজেই ভগবান। তাই তার মুখে সদাই সোচ্চার সোঅহং-এর সোল্লাস। তাহলে সারাৎসার কি দাঁড়াল ? —হৃদয় মেল বন্ধনের অভাবনীয় অভাব। সমগ্র জনসমাজের সঙ্গে শাস্ত্রধারীদের হৃদয়ের কোন যোগই ছিল না। ছিলনা মানুষের মর্যাদা এই জনসাধারণের, পণ্ডিতদের চোখে।

জনসমাজকে এক সূত্রে বাঁধতে গেলে সর্বাগ্রে কোন বস্তুটির প্রয়োজন ? —না, প্রেমের আসন পাততে হবে জনগণমনে। একাজ শাস্ত্র বচনে সম্ভবপর নয়। সম্ভবপর নিজ আচরণে। গৌরসুন্দর তাই বললেন,

"আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সবারে।"

মাঠে ময়দানে জ্বালাময়ী বক্তৃতা নয়। কোন সভা আহ্বান নয়। এমন কি কোন গ্রন্থ রচনাও নয়। তাঁর সব কিছুই নিজ আচরণে। সেই আচরণই দেখাবে দিশারী আলো। জন সমাজের এহেন প্রেক্ষা-পটে এই সংকল্পই নিলেন প্রেমময় গৌরসুন্দর।

শাস্ত্র গেল। তাহলে শস্ত্র ? অর্থাৎ হিংসাত্মক আন্দোলনে ব্রতী হলেন না কেন ? শস্ত্রধারী রাজা বাদশাহের কি কার্যধারা

লক্ষ্য করলেন গৌরচন্দ্র ?

রাজা কে ? রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"পৃথিবীর দুঃখ হরণ করে যে, সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ করে যে সে তো দস্যু। সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে। সেই অভিশাপ ধারা হইতে কোন রাজা রাজতন্ত্র রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসী ক্ষুধা লুকাইয়া আছে। অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলঙ্কার করিয়া পরে। তাহার ভূমি বিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন বস্ত্র ছিন্ন কন্থা রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলেনা, পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।"

যিনি পৃথিবীর দুঃখ হরণ করেন, তিনিই রাজা। আর এতকাল রাজারা কি হরণ করেছেন জনসমাজের ? — না, যথাসর্বস্ব এমনকি প্রাণও। রক্তের আলপনায় আঁকা সে ইতিহাস। শস্ত্র প্রয়োগে কি পৃথিবীকে বশ করা যায় ? হয়ত যায়। তবে সে বশ্যতা এই আছে, এই নেই। অবশ্য মানুষ মান্য করে শস্ত্রধরকে। হ্যাঁ, করে, তবে প্রীতিতে নয়, ভীতিতে। প্রীতি জন্মে হৃদয়ে। সেই হৃদয়ের রাজা যিনি, তিনিই না আসল রাজা। হৃদয়ের রাজার আয়ুধ কি ! — না, প্রেম। প্রেমের শিখা কি রকম ? — না, অনির্বাণ। জীবনে মরণে।

প্রেম। প্রেমের অপর নাম ব্রজেন্দ্র নন্দন। কি রকম তাঁর প্রেম ? মধ্য মহোদধির মত নিতল। অমেয়। তাঁর প্রিয়ানুষ্ঠানে

কি লাগে ? কিছুই না। শুধুমাত্র "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং··· ।" কিংবা যেমন মহাজন বলেন, "দেই তুলসী তিল। এ দেহ সমর্পিলু।' হ্যাঁ, লাগে শুধু এই সমর্পণ— আত্মসমর্পণ। তাইতো প্রেমের ঠাকুর রাজা দুর্যোধনের রাজভোগ উপেক্ষা করে প্রেমানন্দে সেবা করেন বিদুরের খুদ। এ খুদ যে প্রেম-মাখা।

মলিন বসন। দীনহীন কাঙাল বেশ। দ্বারী তো তাই সুদামাকে প্রায় দূর করেই দিয়েছিল। সুদামা কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ প্রার্থী। ব্রজের নর্ম সহচর তো। তাই এই সাক্ষাতের বাসনা।

বাসুদেব দ্বারকাধিপতি। স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন। বন্ধুপ্রীতি হৃদয় আকর্ষণ করল। সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সুদামাকে বসালেন সেই সিংহাসনে। নিজ হাতে পাদ প্রক্ষালন করলেন, আর পট্ট মহিষী রুক্মিণীদেবী মুছে দিলেন পদযুগল স্বীয় কেশকলাপে। রসিক নাগর কৃষ্ণচন্দ্র সখাকে শুধোলেন, 'উপায়ন কোথায়— রাজ দর্শনে এসেছ যে।

দ্বিধা-দীর্ণ দীন সুদামা। সেই ব্রজের পুরনো দিনের সখ্যরস আস্বাদন করলেন সেই বেণুকর কানু: সুদামার কাপড়ের খুঁট খুলে নাড়ুটি কেড়ে নিলেন। সে কি! উনি না দ্বারকাধীশ। হলেনই বা। উনি যে ভক্তাধীন। রাজবেশ তো ঐশ্বর্য, আর ভক্তাধীন-বেশ মাধুর্য। মাধুর্য অনেক বড়। আর এই মাধুর্যেরই লীলাভূমি ব্রজভূমি। শ্রেষ্ঠত্ব ঐশ্বর্য লীলায় আর প্রেষ্ঠত্ব মাধুর্য লীলায়। তাইতো তিনি দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, আর

ব্রজে পূর্ণতম। কেন? ব্রজে মাধুর্য প্রধান, ঐশ্বর্য অপ্রধান, মথুরায় সমান সমান, আর দ্বারকায় ঐশ্বর্য প্রধান, মাধুর্য অপ্রধান। তাই দ্বারকা ধর্মভূমি, মথুরা কর্মভূমি আর ব্রজ লীলাভূমি।

ব্রজে তিনি পূর্ণতম। সেই পূর্ণতম ভগবানের চেয়েও ভক্ত বড়। কি রকম? রকম ভারি মধুর। যেমন, ভগবান নিজেই বলেছেন ভক্ত উদ্ধবকে:

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতি।"

আমার ভক্তের পূজো আমার পূজোর চেয়েও বড়। বৃন্দাবন মুখেও একই কথা:

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ়॥"

ব্রহ্মসংহিতা বলেন,

"ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।"

তিনি সচ্চিদানন্দ। সৎ-চিৎ-আনন্দ। যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি থাকবেন, তিনিই সৎ। কি তাঁর রূপ? — না, তিনি প্রতাপঘন। চিৎ হচ্ছে জ্ঞান অর্থাৎ তিনি প্রজ্ঞাঘন। আনন্দ অর্থে প্রেম অর্থাৎ তিনি প্রেমঘন। এই প্রেমঘন রূপই শ্রেষ্ঠতম। দ্বাপরের অবতার লীলাপুরুষোত্তম। লীলাভূমি ব্রজধাম। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানাংশটি হচ্ছে রাসস্থলী। নন্দলালা রাসলীলা করলেন সগোপী ভানুবালার সঙ্গে। গোপী প্রেম অর্থাৎ কান্তা প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেন? ভানুনন্দিনী ও গোপীদের কাছে ব্রজেন্দ্র নন্দন তো কৃপাময় নয়। কে চায় তাঁর কৃপা? তাঁরা

যে কিছুই চান না। তাঁরা শুধু দেন, নেন না। কি দিয়েছেন তাঁরা? কি দেননি তাঁরা? সবই তো দিয়েছেন। দেহ, গেহ, মান, লজ্জা, ভয়, পতি-পুত্র এমনকি কাম পর্যন্ত নিবেদন করেছেন ঐ বংশীধারীকে। তাইতো শ্যামচাঁদ চাঁদমুখে বলেন রাইধনীকে ঃ

"তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥"

না, শুধু জীবনই নয়,

"রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু।"

ভক্তি ঘনীভূত হয় প্রেমে। আর এই ভক্তির রূপান্তর নেই যুগান্তরেও। যেমন বঙ্কিম চন্দ্র বলেন, "অতি বিস্তৃত অরণ্য ... ...। সেই অনন্ত শূন্য অরণ্য মধ্যে, সেই সূচী-ভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্য কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" এইরূপে তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল "তোমার পণ কি?" প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবন সর্বস্ব।' প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" "আর কি আছে? আর কি দিব?"

উত্তর হইল, "ভক্তি।"

সবই গোবিন্দের ইচ্ছা। কথাটা যথার্থ। এটাই নিয়ম। নিয়ম আছে। ব্যতিক্রমও আছে। সর্বদা ও সর্ব্বথা গোবিন্দের ইচ্ছায়

ঘটনা ঘটেনা। তবে কোন বস্তু ঘটায়? — না প্রেম। ইচ্ছাটা গোবিন্দের অধীন। আবার সেই গোবিন্দই প্রেমের অধীন। তাহলে কে বড়? কৃষ্ণ না প্রেম? —কেন, প্রেম। কৃষ্ণ এলেই প্রেম আসে না. যেমন আসেনি কংস. কাল যবন, শিশু পালাদির বেলায়। কিন্তু প্রেমেব উদয় হলে কৃষ্ণ আসেন। প্রেমের উদয় হয় কোথায়? — না, ভক্তের মনে। আর সেই ভক্তের স্থান কি রকম? — যে নারদের মুখে 'কানু ছাড়া গীত নাই' সেই কানু অর্থাৎ কৃষ্ণই নারদকে প্রণাম পূজো করলেন।

তাহলে শস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, প্রেমই বলী, মহাবলী, সার্বভৌম বলী।

না, তাঁর কপিলাবস্তুর সিংহাসন চাইনা. চাইনা তাঁর রাজ-প্রাসাদ, চাইনা রাজবেশ। সিদ্ধার্থের চাই শুধু প্রেমাবেশ সিদ্ধার্থ কথাটির মানে কি? সিদ্ধ হয়েছে অর্থ যাঁর। অর্থ অর্থে উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কি? — না, মানুষ হয়ে মানুষকে প্রেমদান। হিংসা নয়, দ্বেষ নয়। শুধু মানুষে কেন? কোন জীবেই হিংসা নয়। সর্ব জীবেই প্রেম! এমনই প্রেম বিগ্রহ ভগবান তথাগত। অন্যতম অবতার। জয়দেব গাইলেন:

"কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীরে/ জয় জগদীশ হরে।"

কলিঙ্গ যুদ্ধে শত শত জনের শোণিতে রাঙ্গা হল রণভূমি। অশোক বিজয়ী হলেন। কিন্তু বিজয়ের উল্লাস নেই কেন? লোক যে তাঁকে বলে চণ্ডাশোক। ব্যথাহত হলেন বিজয়ী বীর রক্তের বীভৎস বন্যা দেখে। পট পরিবর্তন। হৃদয়ের পট পরিবর্তন।

না, আর হিংসা নয়, দ্বেষ নয়, শোণিতপাত নয়। শুধু প্রেম। কে যেন তাঁর অন্তরের অন্তঃপুরে বদ্ধের প্রেম বীণা বাজাল। আর অমনি কম্বু কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধম্মম্ শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। এই ত্রয়ীর শরণ নিলেন। অনুসরণ করলেন বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মচক্র, যে চক্র গ্রাস করতে পারল না মহাগ্রাসী মহাকাল। তাই না সেই চক্র বর্তমান ভারতের জাতীয় পতাকার মধ্যমণি হয়ে আছে। শস্ত্র সংবরণ করলেন। গাঁথলেন প্রেম কুসুমের মালা। বাঙ্গাবাসীদের বললেন, 'তোমরা আমার সন্তান।'

প্রেমায়ুধ বলে হলেন বলী, মহাবলী, হলেন মহামতি। চণ্ডাশোক হলেন প্রেমাশোক।

সুগত এসেছিলেন "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়।" সত্যিই তাই, নইলে শুধু ভারতের জন কেন, ভারতের বাইরের একাধিক দেশ যেমন, চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়ার জনসমাজও সমস্বরে গেয়ে উঠল: 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। আয়োজনের জটিলতা নেই, আচারের আবর্জনা নেই। শুধুমাত্র ত্রিশরণ মাত্র: 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,' 'ধর্ম্মম শরণং গচ্ছামি', এবং "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।" মন্ত্র তো নয়— এক দিশারী দীপ শিখা এক পরমাশ্চর্য স্বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা সরণীর।

যথার্থ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, "সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা; বহু আয়োজনের-জটিলতা, বর্বরতা, বস্তুত তাহা গলদঘর্ম অক্ষমতার স্তুপাকার জঞ্জাল।"

ত্রিপিটকের অন্যতম পিটকের নাম বিনয়। বিনয় এখানে শৃঙ্খলা। মডেস্টি নয়। আর তথাগত সেই শৃঙ্খলার স্বর্ণশৃঙ্খলে বেঁধেছিলেন আগণন জনের মন যাতে উদয় হয়েছিল মৈত্রী প্রেম ও ঐক্য। বুদ্ধানুরাগী কবি শান্তিনিকেতনের অন্যতম ভবনের নাম রেখেছিলেন বিনয়। ভারতের সঙ্গে ভারতের বাইরের এতগুলো দেশকে বেঁধেছিলেন প্রেমের বাঁধনে।

সাহিত্য হচ্ছে সহৃদয় হৃদয় সংবাদী। লোক হৃদয়ে যখন বুদ্ধের মৈত্রী বাণীর ঐক্যতান বেজে উঠল, তখন সাহিত্যের সৌরভও ছড়িয়ে পড়ল। সংস্কৃত সাধারণের দুর্বোধ্য। পালি লোকভাষা। তাই এই লোকভাষাতেই উপদেশ দিতেন বুদ্ধ। জাতক, অবদান, গাথা এবং বুদ্ধজীবন কাহিনী নিয়ে সৃষ্টি হল অনবদ্য সাহিত্য। যুগ-যুগান্তর আমোদিত হল এই সাহিত্য সুরভিতে। কবিরও সোনার কলম খুলে গেল। সৃষ্টি হল এযুগে অনবদ্য 'চণ্ডালিকা'।

আর শিল্প? স্থাপত্য শিল্পের শত শত সৃষ্টি। শত মুখে বলেও শেষ করা যায় না। কি দিশী, কি বিদিশী হাজারো স্থপতি প্রাণদান করেছেন এই শিল্পের। বৌদ্ধস্তূপ, চৈত্য, বিহার, গুহা ইত্যাদি তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে হাজারো বছর ধরে। বিশ্ব মৈত্রীর এ এক পরমাশ্চর্য আয়ুধ— শিল্পায়ুধ।

নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয় আজ অরব। আরব, কিন্তু অস্পষ্ট অতীত নয়।

অথচ কেটে গেল পঁচিশটি শতক। আচার্যের অপর নাম শীলভদ্র। তাই না যোজন দূর থেকে এসেছিলেন হিউয়েন সাং

তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে। আরেক কীর্তিবাস বাঙালির নাম তো আজও মুখে মুখে ফেরে। ইনি অতীশ দীপঙ্কর।

বুদ্ধের প্রেম অয়স্কান্ত মণি। তাঁদের কাছে দূরত্বের বাধা নেই, নেই পরিবহনের প্রতিকূলতা। আছে শুধু বুদ্ধের প্রেম প্রেরণা। তাঁরা অর্থাৎ ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং এবং ফো-কুয়ো ভারতবর্ষে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য ত্রয়ীরই এক। প্রাপ্তি যতটা নিয়েছেন, ততটাই দিয়েছেন।

তথাগত তাঁর দশশীলে যেমন, প্রাণীহত্যা করবেনা, অপহরণ করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, মিথ্যা কথা বলবে না, সুরাপান করবেনা ইত্যাদি নির্দেশ দিয়েছেন। দিয়েছেন, চাপিয়ে দেননি। একথা তিনি তাঁর শ্রীমুখেই সর্বজনকে শুনিয়েছেন :

তাপাচ্ছিদাচ্চ নিকষাৎ সুবর্ণমিব পণ্ডিতৈঃ।
পরীক্ষ্য ভিক্ষবো গ্রাহ্যং মদ্বচো ন তু গৌরবাৎ॥"

— নিকষ পাথরে স্বর্ণকার যেমন সোনাকে পরীক্ষা করে, তাঁর শিষ্যরা যেন তাঁর উপদেশ সেইভাবে পরীক্ষা করে পালন করে।

লোক চরিত্রের এত বড় বিচারক বড়ই বিরল। আচারের নামে অনাচার, অত্যাচার নয়, তাই মধ্যপন্থা। এই ক্রান্তদর্শীর ধ্যানে ধরা পড়েছিল সেই নিয়মবিধি যা জনমানস গ্রহণ করবে, করলে অপায় হবে অপসৃত আর সুগম হবে অনাময়ের পথ।

তাই প্রেম ও মৈত্রীর জ্যোতির্ময় বিগ্রহ বুদ্ধ। শুধু এশিয়ার আলো নন, বিশ্বের আলো, দিশারী আলো।

ভগবান নন। ভগবান পুত্র। প্রতীপ পরিস্থিতি জীবনে :

আবির্ভাব প্রাচ্যে, প্রভাব পাশ্চাত্যে। আজ যারা তাঁর অনুগামী, তাদেরই পূর্বগামীদের চক্রান্তে তাঁর ঘটে জীবনের অবসান। শিষ্যের কাজ কি ?— না, গুরুর ভজন। যীশুর জীবনে শিষ্যই হল তাঁর নিধনের কারণ।

জন্ম সাযুজ্য কিন্তু অদ্ভুত ঃ মেরী নন্দনের সঙ্গে যশোদা নন্দনের। যীশুর জন্ম হল। জন্মের পরই প্রাচ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক জ্ঞানী এলেন রাজার কাছে। সিংহাসনে আসীন তখন হেরড্। হেরড্ কিরকম প্রকৃতির লোক ? নৃশংসতা ও ক্রূরতার যদি অপর নাম থাকে, তা হচ্ছে এই হেরড্। প্রাচ্যের প্রাজ্ঞজন রাজার কাছে এলেন, শুধোলেন, 'তিনি কোথায়, যিনি জন্ম লগ্নেই ইহুদিদের রাজা। আমরা প্রাচ্যে তাঁর স্টার দেখতে পেয়েছি। আমরা তাই তাঁর পদপঙ্কজে অর্ঘ্য নিবেদন করতে এসেছি।'

বাস ! একেবারে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। হেরডের মনে তখন দ্বন্দ্বভাবের দ্বন্দ্ব। একদিকে আশঙ্কা— তাঁর সিংহাসন বুঝিবা টলমল, অন্যদিকে আগুন— রোষের আগুন শিশুহত্যার চণ্ডলীলার জন্য।

ব্রজমণ্ডলের সকল শিশুর প্রাণনাশের আদেশ দিয়েছিলেন কংস। রাজা হেরডও আদেশ দিলেন শিশুকুল নিধনের। উভয়েই ব্যর্থ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিধনে, কংস শ্রীকৃষ্ণের আর হেরড যীশুর।

ব্যর্থ তো হতেই হবে ; উভয়েই যে এসেছিলেন জীবত্রাতা রূপে। ব্রজেন্দ্র নন্দনের ব্রজপুরে লীলাবিলাস হচ্ছে প্রেম মাধুর্য আর ঠিক সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন যীশু। শস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, শুধু প্রেম। তিনি সত্যের সন্ধানী। সে সত্য কি ? —না,

প্রেম। জীবে প্রেম। প্রেমই একমাত্র বলাধান। এই বলাধানে বলীয়ান হয়ে জীবকে করবেন তিনি উদ্ধার। পাপী পাষণ্ডের উদ্ধার। তাইতো তিনি বললেন, 'পাপকে ঘৃণা করবে। পাপীকে নয়।' কৃষ্ণ আর খ্রীস্ট বাণীতেও এক। গীতায় কৃষ্ণ বলছেন,

'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

আবার বলছেন,

"যেন ভূতান্যশেষানি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।"

আরও বলছেন,

"ময়ি তে তেষু চাপ্যহং"

যীশুরও একই বাণী যেমন,

"And that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you."

আবার যেমন গীতায় বলছেন,

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম॥"

তেমনি বাইবেল বলছেন, "তোমরা যাহা আহার কর, যাহা পান কর, বা যাহা কিছু কর, ঈশ্বরের জন্যই করিবে।"

গীতা বলছেন, "প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়।"

যীশুরও আশার বাণী:

"If a man love me, he will keep my words; and my Father will love him and we will come

unto him and make our abode with him."

প্রেম বিগ্রহ বুদ্ধের সঙ্গেও এই প্রেমময় পুরুষের সাদৃশ্য। ভগবান তথাগত নির্দেশ দিলেন, প্রাণী হত্যা করবেনা. অপহরণ করবেনা, ব্যভিচার করবেনা·········।"

যীশুও তাঁর কমাণ্ডমেণ্টে বললেন,

"Thou shalt do no murder. Thou shalt not Commit adultery. Thou shalt not steal."

জীবের প্রতি কি অসীম প্রেম! দুষ্কৃতীরা যখন তাঁকে ক্রুশ বিদ্ধ করছেন, অসহ্য যন্ত্রণায় পীড়িত হচ্ছেন, তখন এক পরমাশ্চর্য প্রশান্তিতে, প্রীতিতে বলছেন, 'Father, forgive them, for they know not what they do."

এ কাজ কে করতে পারেন ? পারেন একমাত্র ভগবান। যথার্থ বলেছেন বিবেকানন্দ,

"If I, as an oriental, am to worship Jesus of Nazareth, there is only one way left to me, that is to worship Him as God and nothing else"

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি ?— না, প্রেম। একমাত্র প্রেম। সে প্রেমের স্বরূপ কি ? মানুষ নিজেকে যেমন ভালবাসে, ঠিক তেমনিভাবে ভালবাসবে তার প্রতিবেশীকে। তাই যীশু বলছেন,

And the second is like namely this : Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is

none other Commandment greater than this."
কিন্তু এই প্রেমের উদয় হবে কিভাবে? তারও দিশারী আলো দেখিয়েছেন মেরীনন্দন এবং এটাই হচ্ছে প্রথম কমাণ্ডমেণ্ট। হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উদয় না হলে মানুষ অপর মানুষকে ভালবাসতে পারে না। তাই

"And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strenght: this is the first commandment."

জন্ম লগ্নের অনেক আগেই পিতৃহীন। মাকে হারালেন বয়স যখন মাত্র ছয়। এহেন মহম্মদ ধনী হলেন পরিণয় সূত্রে; কিন্তু ধনের আকর্ষণও রইল না। আকৃষ্ট হলেন ধনে নয়-- ধ্যানে। কিসের এই ধ্যান? — না, মানুষের মন কোন্ ডোরে বাঁধা যায়? কি পেলেন তিনি এই ধ্যানে? শস্ত্র? — না। শাস্ত্র? — তাও না। তবে? পেলেন এক পরম অস্ত্র— প্রেমাস্ত্র।

প্রেমের উদয় হবে কিভাবে? — না, ভগবানকে ভালবাসলে। আল্লাহর রসুল বললেন, 'ভগবানকে ভালবাসলে, ভগবানও তাকে ভালবাসবে।' এতে কি হবে? এই ঈশ্বর প্রীতিই আনবে প্রতিবেশী প্রীতি এবং বিশ্বপ্রীতি। প্রীতির পাত্র কে?— সবাই-- "ভালমন্দ মিলায়ে সকলি।" মন্দকেও ভালবাসতে হবে? এ আবার কেমন কথা? হ্যাঁ মন্দকেও ভালবাসতে হবে। লাভ কি? — লাভ ভালোকে ভালবাসার চেয়েও অধিক হবে মন্দকে

ভালবাসলে। ভালবাসার কস্তুরীতে মন্দের মন্দতা দূর হবে। মন্দও ভাল হবে। দুঃশীল সুশীল হবে। সকলের মধ্যে ঐক্যের ঐকতান বেজে উঠবে।

শুধোলেন, 'তুমি কি তোমার স্রষ্টাকে ভালবাস?' বললেন, 'যদি ভালবাস, তাহলে তার প্রমাণ পাব যদি তুমি আগে তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।'

কি পরমাশ্চর্য বিনয় প্রফেটের। সত্যিই তো বিনয় বিনা কি ঈশ্বর প্রীতি লাভ করা যায়? আবার ঈশ্বর প্রীতি বিনা কি মানুষকে ভালবাসা যায়? তাই বললেন, 'না, না, সীমা সরহদ ছাড়িয়ে আমার প্রশংসা করোনা। আমি যে আমার প্রভুর দাস। তাঁরই প্রেরিত দূত।'

অগ্রগামীদের মতই বললেন, 'মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, অপহরণকারী বা লুণ্ঠনকারী হচ্ছে পাষণ্ড।'

সবচেয়ে বড় জিহাদ কি? যুদ্ধ জয়? রাজ্য জয়? আল্লাহর রসুল বললেন, 'না, না, নিজেকে জয়। জিতেন্দ্রিয় হওয়াই বড় জয়।' আরও বললেন, প্রাকৃত জগতের প্রতি উদাসীন হও। কামনা বাসনার ন্যূনতাই প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাক।'
— ঠিক যেন গীতার সেই নিষ্কাম কর্মযোগের কথা।

ধর্মের নিরিখে বিশ্ববাসীকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টান জগৎ সবচেয়ে বড়, তারপর মুসলিম, তৃতীয় বৌদ্ধ, এবং চতুর্থ হচ্ছে হিন্দু জগৎ। এই চার জগতের জগদগুরুর জীবন বেদ কি? না, প্রেম।

তাই তো গৌরসুন্দর প্রেমের ভিয়ান খুললেন নদীয়ায়। প্রেমের উদয় কখন হল তাঁর হৃদয়ে ? বীজ উপ্তই ছিল। যুগলপত্র দেখা দিল গয়াধামে পিণ্ডদানের পর। আশ্চর্য যোগসূত্র। গয়াক্ষেত্রে নিমাই দর্শন পেলেন ঈশ্বর পুরীর। পুরীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। নিষ্প্রয়োজন কেন ? তিনি যে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। এটাই তাঁর শেষ পরিচয়. আবার এটাই তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার নিমাইয়ের সঙ্গে। পুরী দর্শনে গৌরের সে কি আনন্দ! যেমন,

"প্রভু বলে গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেইজন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটী পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ব বন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রসপান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥"

মণি মাণিক চেনে। আন জন চেনে না। আবরজন আঁধার দেখে চোখ থাকতেও! ঈশ্বরপুরী গৌরসুন্দরকে চিনেছিলেন প্রথম দর্শনেই— নবদ্বীপে। বহিরঙ্গে নয়, অন্তরঙ্গে। তাই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে উভয়ে মিলিত হলেন প্রেমালিঙ্গনে।

পুরীজী নির্ব্যাজ কণ্ঠে বললেন,

"কৃষ্ণ দরশন সুখ তোমা দেখি পাই ।"

উভয়ের এই সাক্ষাৎকার কিসের সূচনা করল ? বড়ই শুভ সূচনা। গৌর জীবনের গতি পথ যে এক মস্ত বাঁক নিতে যাচ্ছে । কিসের এই বাঁক ? তিন বাঁকা কালাচাঁদকে যে পথে গেলে পাওয়া যায়, সেই পথের বাঁক ।

এরপর কি হল ? এক জীবন থেকে আরেক জীবনে হল উত্তরণ । সম্পূর্ণ ভিন্ন সে জীবন। এ জীবনের সঙ্গে পূর্ব জীবনের কোন সাদৃশ্য নেই ।

পিণ্ডদান করতে গেলেন গৌরসুন্দর। এলেন চক্রবেড়ে । উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল দর্শন । গয়াসুরের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ রেখেছিলেন তাঁর পদ পুণ্ডরীক । দর্শন মাত্রই ভাবান্তর । কোথায় আর সেই নিমাই ? নিমাই না সবসেরা পণ্ডিত নদীয়া নগরে ? তাঁর টোলই না পড়ুয়াদের সবসেরা আকর্ষণ ? কোথায় গেল তাঁর হাস্য পরিহাস আর কৌতুক ? সদা-চঞ্চল দ্রুতগতি নিমাই হলেন স্তব্ধ গতি । নিশ্চুপ। নিশ্চল । ধমনীর গতিও যেন স্তব্ধ । আবার এক সময়ে স্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। দেহে দেখা দিল কম্পন । ওষ্ঠাগ্রে কম্পন। কম্পন নাসাগ্রেও । আর আঁখি যুগলে বর্ষার ধারা । নয়ন পল্লব ধারা বেগ আর ধরে রাখতে পারছে না । অঝোরে ঝরে পড়ছে। পড়ছে নয়ন থেকে কপোলে । না, কপোলও আর ধরে রাখতে পারছে না । পারবেই বা কিভাবে ? ঢল নামছে যে ! নামল বক্ষস্থলে। বক্ষস্থল থেকে ভূমিতলে । এত অশ্রুও মানুষের চোখে থাকতে পারে ! নিমাই এখন অর্ধ-

চেতন। পূর্ণ চেতনা ফিরে পেতেই 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলে হুঙ্কার দিয়ে ছুটলেন। ছুটলেন তাঁর সঙ্গীরাও। তাঁর সঙ্গীরা অর্থাৎ মেসো চন্দ্রশেখর এবং অন্যান্য প্রিয়জন। কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসায় নিমাইচাঁদ বললেন, 'আমি আর বাড়ী ফিরব না। তোমরা সবাই ফিরে যাও। আমি জানি মা বড়ই কষ্ট পাবেন; কিন্তু আমি নিরুপায়। আমি আর আমার মধ্যে নেই। আছি আমার সাধ্য বস্তুর মধ্যে। আমি তাই যাব তাঁর লীলাভূমিতে—ব্রজধামে। মা'কে তোমরা বুঝিয়ে বলো। তোমাদের মিনতি করে বলছি আমার প্রিয়জন হিসেবে এটুকু কাজ নিশ্চয়ই করবে।'

এতো এক মহাসংকট। ভাবলেন সঙ্গীরা। পরিশেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিমাইকে বৃন্দাবন যাত্রা থেকে নিরস্ত করলেন।

এইখানেই ঈশ্বরপুরী তাঁর কানে দিলেন দশাক্ষর মন্ত্র। মন্ত্র তো নয়—মন্ত্রণা। একেবারে কান মন্ত্রণা। কেউ জানতে পারলনা। জানলেন শুধু দু'জন— দাতা ও গ্রহীতা। দাতার কাছে এ বস্তু নতুন নয়। তাই তিনি উদধির মত স্থির; কিন্তু গ্রহীতার মধ্যে যে নবোদ্গম। তাই তিনি এত অস্থির। যেমন বৃন্দাবন বলছেন,

"যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥"

নিমাই সহ সবাই ফিরলেন। গয়াধাম থেকে নবদ্বীপ ধামে। সংবাদ পেয়ে শচীমাতার বদন আলো-ঝলমল হল; কিন্তু পরক্ষণেই যে সে আলো নিবে গেল। এ তাঁর কোন্ নিমাই! শচীমাতা

তো আছেনই। আর এসেছেন প্রিয়জনেরা। কিনা নিমাইয়ের মুখে তীর্থকথা শুনবেন। তীর্থ কথা তো, তাই নিমাইয়ের ভারি আহ্লাদ হল। ওষ্ঠাধরে হাসির ঝিলিক। আরম্ভ করলেন। শ্রোতাদের চোখ মুখও আনন্দোজ্জ্বল। ও হরি! দু-চার মিনিট তীর্থ কথা, শ্রীপাদপদ্মের কথা বলতে না বলতেই একেবারে অরব হয়ে গেলেন। যেন সেই বৃষভানু তনয়ার ভাব ঃ

"এই যে ধনী কৃষ্ণ কথা কহিতেছিল।
কথা কইতে কইতে নীরব হইল॥"

ওষ্ঠাধরে কম্পন, নাসাগ্রে কম্পন, কম্পন সর্বশরীরে। তার পরেই অবিরল অশ্রুধারা। যেন বাঁধ ভাঙ্গা তটিনীর স্রোতধারা। কথাবার্তাও অসংলগ্ন। ক্ষণে ঠিক। ক্ষণে বেঠিক। ছেলে কি তাঁর পাগল হল নাকি? এই জন্যই তো তিনি সন্ন্যাসীদের আমল দিতে চান না। এঁদের টানেই না বিশ্বরূপ ঘর ছেড়ে চলে গেছে। তবে কি এ ছেলেও চলে যাবে! বড় আক্ষেপে বললেন,

"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কি বা মন্ত্র দিল।
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল॥"

অবশ্য গৌরচন্দ্র যথারীতি টোলে গেলেন। নিজ বাড়ীতে জায়গা অকুলান। তাই টোল খুলেছেন মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে। সবসেরা টোল তাঁর। কত শত পড়ুয়া সেই টোলে! যথারীতি পাঠ আরম্ভ হল। দুই-এক ছত্র মাত্র। তারপর কেবল কৃষ্ণ কথা। শুধুই কৃষ্ণকথা। 'কানু ছাড়া গীত নাই।' আর আঁখি পাতে আষাঢ়ের আসার; কিন্তু দূরাগত বিদ্যার্থীদের কি হবে?

আচার্যের না হয় শাস্ত্র জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। তিনি তো শাস্ত্র পারীণ; কিন্তু পড়ুয়ারা যে পড়ে আছে প্রবাসে বিদ্যালাভের জন্যই। কি ধন নিয়ে তারা গৃহে ফিরবে? তারা গেল তাই গঙ্গাদাসের কাছে। বলল, 'আচার্যের তো পাণ্ডিত্যের তুলনা নেই, কিন্তু তিনি যে গ্রন্থের বিষয় পড়ান না, পাঠও দেন না। শুধু কৃষ্ণ কথা বলেন।"

গঙ্গাদাস এমন এক ব্যক্তি যিনি জীবনে সার করেছেন একটি মাত্র বস্তু, তা হচ্ছে জ্ঞান চর্চা। কোন পড়ুয়া প্রণাম করলে বলেন, 'বিদ্যালাভ হোক।' বলেন না, 'কৃষ্ণে মতিরস্তু।" গঙ্গাদাস বিরক্তির সুরে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা ওকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি যা বলার বলে দিচ্ছি।"

পড়ুয়াদের কাছে সংবাদ পেয়ে গৌরসুন্দর গেলেন তাঁর পূর্ব গুরু গঙ্গাদাসের কাছে। গঙ্গাদাস তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'শুনলাম তুমি নাকি হরিভজা হয়েছ। ও সব পাগলামি ছেড়ে দাও। আচার্যের কর্ত্তব্য বড়ই কঠিন হে। তোমার বাবা ছিলেন পুরন্দর। তোমার বাবা আর আমার মান রক্ষার্থে অধ্যাপনা সুষ্ঠুভাবে কর। এতগুলো ছাত্র এসেছে দূর দেশ থেকে। মনে তাদের কত বাসনা— বিদ্যালাভ করবে। সেই বাসনা কি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে— তারা কি হরিবোলা হয়ে ফিরবে।'

নিমাই নত মস্তকে 'যে আজ্ঞে' বলে চলে এলেন; কিন্তু যে আজ্ঞে বললে কি হবে? পরের দিন যে কে সেই। সেই হরি কথা— শুধুই হরিকথা।

বিশ্বম্ভর বিবেচক, সবই বুঝলেন। বুঝলেন পড়ুয়াদের অবস্থা। কিন্তু তিনি যে কিছুতেই নীরত থাকতে পারছেন না কৃষ্ণকথা থেকে। শেষকালে কৃষ্ণই জয়ী হলেন। টোল ভেঙ্গে দিলেন। বিদায় দিলেন বিদ্যার্থীদের।

গৌর সুন্দরের এই ভাবান্তরের কথা বায়ু বেগে ছড়িয়ে পড়ল। জানলেন অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর, শুক্লাম্বর, মুকুন্দ সঞ্জয়, মুরারি, হরিদাস, পুরুষোত্তম আচার্য এবং আরও অনেকে। গদাধর তো ভারি তুষ্ট। তুষ্ট হবেনই। ইনি যে আশৈশব কৃষ্ণ ভক্ত। আর নিমাইয়েরই সঙ্গে থাকেন ছায়ার মত। যেখানে নিমাই, সেখানে গদাই। আর আহ্লাদে আটখানা হলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। হবেনই, কারণ পণ্ডিতের তো কোন পেশাই নেই। আছে নেশা— কৃষ্ণ নামের নেশা।

শ্রীবাস পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু। পরম আগ্রহে এলেন নিমাইয়ের বাড়ী। নিমাই জননী দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন পণ্ডিতকে দেখে, বললেন, 'পণ্ডিত, দেখ ছেলের কি অবস্থা হয়েছে। সেই আগের মত বায়ু রোগ ধরল বুঝি।' মৃদু হেসে পণ্ডিত বললেন, 'এ রোগ যাকে ধরে, তাকে আর ছাড়ে না। তবে কি জানেন এ রোগ যাকে তাকে ধরে না। ধরে লাখে একজনকে। ভালই হল। আমার বাড়ীতে তো নিত্য কীর্তনের আসর।' বলেই নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আমার বাড়ীতে আমাদের সঙ্গেই নিত্য কীর্তন করবে।'

ব্যস্! লব্ধকাম হলেন নিমাই। তিনি যে এমনই এক

আসরের সন্ধানেই ছিলেন। এরপর হল মণি কাঞ্চন যোগ। নিতাই চাঁদ ব্রজে খুঁজছিলেন ব্রজেন্দ্রনন্দনকে। আচম্বিতে দর্শন লাভ করলেন ঈশ্বর পুরীর। পুরীজী বললেন, 'তুমি যাঁকে খুঁজছ, তিনি তো নবদ্বীপে। এখানে বনে জঙ্গলে খুঁজে তাঁকে পাবে কি করে?' অবধূত অমনি পথ ধরলেন নবদ্বীপের।

নিমাই-নিতাই মিলন হল। সে এক পরমাশ্চর্য মিলন। মহামিলন। মিলন স্থল নন্দন আচার্যের গৃহ। ধন্য নয়ন নন্দন নন্দন নিকেতন। এ মিলন কিরকম? সংবাদ দিচ্ছেন বৃন্দাবন:

'নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহ কিছু না বোলয়ে ঝরে মাত্র আঁখি॥"

আলাপ বিনিময় কিভাবে হল? সে সংবাদও দিচ্ছেন বৃন্দাবন:

"নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ॥"

মুখে কোন কথা নেই। চোখে চোখেই কথা। কত কথা! সেই কথাই তো শেষ হয় না। মুখে আর কি বলবেন? চোখে চোখে কথা। অন্তরে অন্তরে কথা। মুখের কথা বাহ্য কথা। বাহ্য কথার শেষ আছে। অন্তরের কথার শেষ কোথায়?

তবুও নিমাই শ্রীবাসকে ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করতে ইঙ্গিত দিলেন:

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতু প্রবাল
নটবেশমনুব্রতাং সে।
বিন্যস্ত হস্তমিতরেন ধুনাম মবুম কর্ণোৎ পলাল কপোল
মুখাব্জ লাসনা॥"

ব্যস্ ! নিতাইয়ের হৃদয় প্রেমার্ণবে তরঙ্গ উঠল। অস্থির-উত্তাল। প্রেমসুন্দর গৌরসুন্দর কোলে তুলে নিলেন নিতাই চাঁদকে। তরঙ্গ-স্তব্ধ হল।

নিত্যানন্দ এক পরমাশ্চর্য চরিত্র ; বৈপরীত্যে ভরা। হারো পণ্ডিতের পুত্র। নিবাস বর্ধমানের এক চক্রায়। পূর্বাশ্রমের নাম কুবের। বিশাল বপু। উজ্জ্বল শ্যামল কান্তি। কমল নয়ন ; বয়স ত্রিশ/বত্রিশ। এই বয়সে এলেন নবদ্বীপে। জীবনে কোন গৃহিণীপনা নেই। বার বছর বয়সেই গৃহত্যাগ। প্রব্রজ্যা গ্রহণ। পরিভ্রমণ। কত জায়গায় যে ঘুরেছেন ! স্থানাস্থান নেই। নেই কোন কালাকাল। পাত্রাপাত্রের বিচার নেই। নেই কোন মিত্রামিত্র বোধ। ভাবনা নেই বর্ণ ভেদের। সবার হাতেই খাচ্ছেন কেনই বা খাবেন না ? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তো লোকের দেওয়া নাম। ভগবানের দেওয়া নাম যে একটাই। সে নামটি কি ? — না, মানুষ। সবাই মানুষ। সবাই সমান।
দণ্ড কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী। একদিন কি হল— দণ্ড ভেঙ্গে ফেললেন। দণ্ড কমণ্ডলু ঠাঁই পেল নবদ্বীপ গঙ্গায়। প্রাকৃত কোন বস্তুতেই আকর্ষণ নেই। কেমন যেন আলাভোলা।

নিমাই বললেন, 'শ্রীপাদ, আগামীকাল ব্যাস পুজো। আপনি তো অনিকেত। কোথায় করবেন পুজো ?' জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে শুধু চারদিক তাকাতে লাগলেন। শ্রীবাস ছিলেন নিকটেই। শেষকালে তাঁকেই দেখিয়ে বললেন, 'কেন এঁর বাড়ীতেই করব।'

পণ্ডিত ব্যাস পুজোর আয়োজন করলেন। কার জন্য যে

করলেন। কার পুজো কে করে ? পুজোর ঠাঁইতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন নিতাই চাঁদ। শ্রীবাস তাঁর হাতে ফুলের মালা দিয়ে বললেন, মালা দিন। মন্ত্র বলুন। বলুন 'নমো ব্যাস দেবায়।'

কিছুই বললেন না। হুঁ-হাঁ অস্পষ্ট উচ্চারণ। তার ওপর আবার তোতলা। হাতের মালা হাতেই রয়ে গেল। কেবল ইতি-উতি তাকাচ্ছেন। কিসের ভাবে নেন বিভাবিত। ভাবের বিভাব কোন্ বস্তু ? সেই বস্তু গোচরে এল, যখন গোরাচাঁদ এলেন নিতাই চাঁদের কাছে। নিত্যানন্দ মালা দিলেন গৌরচন্দ্রেরই গলায়।

এহেন আলাভোলা, খেপা নিতাই চাঁদকে হাজির করলেন নিমাই চাঁদ তাঁর মা'র সামনে। কি আশ্চর্য ! শচীদেবী আর লোক পেলেন না। এঁরই মধ্যে খুঁজে পেলেন তাঁর হারাধন বিশ্বরূপাকে। কেন ? প্রেমের একটা শুচিস্মিত সুরভি আছে। তবে সে সুবাস সবাই পায় না। প্রেমের উদয় কি সবার হৃদয়ে হয় ? যাঁর হৃদয়ে হয়, তিনিই পান। যেমন পেলেন শচীদেবী। সংবাদ দিচ্ছেন লোচন :

"নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাঞা শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে জল, গদগদ বাণী ॥
এই মতে স্নেহরসে সভে গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়াইল অন্তর ॥"

এই এক কথাই লাখ কথা। এই এক কথাতেই নিত্যানন্দের শেষ পরিচয়।

নৃত্য, গীত ও বাদ্য— এই তিনের সমন্বয়ে যে কীর্তন, তাই সংকীর্তন। নর্তনে বরিষ্ঠ কে? — না, নিত্যানন্দ। নিতাইয়ের উদ্দণ্ড নৃত্য। এ নৃত্য কি রকম? – না, উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত দণ্ডের মত। নিতাইচাঁদ তাই শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্তনের বিশেষ অঙ্গ। এ হেন নিতাইকে পেলেন পার্ষদ রূপে নিমাই।

আর কাকে পেলেন গৌরসুন্দর? পেলেন অনেককে। নিতাইয়ের পর যিনি, তিনি অদ্বৈত। প্রেম কল্পতরু গৌরসুন্দর। তরুর শাখা প্রশাখা অনেক। কিন্তু স্কন্ধ মাত্র দুটি। একটি নিত্যানন্দ, অপরটি আচার্য অদ্বৈত। এ কথার প্রমাণ? প্রমাণ স্বয়ং মাধবেন্দ্র পুরী। মাধবেন্দ্র পুরীর দীক্ষাধন্য হয়ে কমলাক্ষ হলেন অদ্বৈত।

স্থানেরও একটা আকর্ষণ আছে। যেমন, গৌর পিতা জগন্নাথ ও কুবের নন্দন অদ্বৈত উভয়েই শ্রীহট্টীয়। নাভা দেবী হচ্ছেন কমলাক্ষ জননী। শ্রীহট্ট ত্যাগ করে কমলাক্ষের শান্তিপুরে আগমন। নবদ্বীপে অধ্যয়ন। এই ধামে তাঁর দ্বিতীয় নিকেতন। গৌরসুন্দরের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান প্রায় বাহান্ন বছর। ব্যবধান দূর হল ভক্তি সুরধুনীর ধারায় অবগাহন করে।

প্রেমময় পুরুষ অদ্বৈত। শাস্ত্রের কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা অন্তরে ভক্তির আলোকে আলোকিত না হলে অন্ন জল ত্যাগ করতেন। এও এক তপস্যা। ভক্তের তপস্যার নাম সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধকাম হতেন অদ্বৈত।

গৌরসুন্দরের যেমন জাত-পাতের বালাই নেই, তেমনি শ্রেণী

নির্বাসন দেন অদ্বৈত ।

স্মার্ত সমাজের চিরায়ত প্রথা ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন অদ্বৈত। না, স্মার্তের রোষাগ্নি অগ্নিতেজসন্নিভ অদ্বৈতকে স্পর্শ করতে পারেনি। পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ পাত্র দিতে হয় শ্রদ্ধাচারী ব্রাহ্মণকে। আর অদ্বৈত দিতে গেলেন কাকে ? — না, যবন হরিদাসকে। আচার্যের ওপর অকথ্য অত্যাচারের আতঙ্কে পাত্র নিতে অনিচ্ছুক হলেন হরিদাস। ঋজু পুরুষ অদ্বৈত। সংকল্পে অটল। এক পরমাশ্চর্য বৈপ্লবিক দার্ঢ্য নিয়ে,

"আচার্য কহেন, 'তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্র মত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন'।
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইলা ভোজন॥"

হরিদাস নামাচার্য। তিন লক্ষেরও ওপর নাম নেন প্রতিদিন। সে হেন হরিদাস আচার্য সর্বশ্ব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেমন পদ্ম পুরাণ বলেন,

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি স্বপচাধম॥"

আরও বলেন,

" ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব বর্ণেষু তে শূদ্রা যেন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

সমাজ সংস্কারের এই বৈপ্লবিক তত্ত্বটি প্রকাশ করলেন আচার্যদেব স্বীয় আচরণে। কলুষক্লিষ্ট সমাজের শাসন-গর্জন অগ্রাহ্য

করলেন এই বীর্যবান পুরুষ।

আবার এঁর আরেক নাম মঙ্গল। যথার্থ। কবিরাজ গোস্বামী তাই সুললিত সুরে বলছেন,

"জগৎ মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা, "মঙ্গল" যাঁর নাম॥"

যোগসূত্রও বিস্ময়কর। সবটাই সার্বভৌম নিয়ামকের পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত। যে ঈশ্বরপুরীপাদ গৌরসুন্দরকে দিয়েছিলেন দশাক্ষর মন্ত্র, সেই পুরীজীর সতীর্থই হচ্ছেন অদ্বৈত। অদ্বৈত চিনেছিলেন গৌরহরিকে, আবার গৌরহরি চিনেছিলেন অদ্বৈতকে। অভিজ্ঞান কি? — না, কৃষ্ণ প্রেম। তাই গৌরসুন্দর বললেন,

"সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ ভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব অদ্বৈত আচার্য তাঁর নাম॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁহার বৈষ্ণবতা শক্তি॥"

তেমনি আবার অদ্বৈত বললেন,

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম।
যথাসাধ্য প্রচারিবা এই মোর মর্ম্ম॥"

এক বিরল ক্রান্তদর্শী পুরুষ এই অদ্বৈত। সমাজের কলুষ-পঙ্কিলতায়, বিবাদ-বিভেদে ব্যথাহত হয়েছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন অচিরেই এক পরিত্রাতা আসবেন কলিহত জীবকে উদ্ধার করতে। এই পরিত্রাতার আগমনের জন্য আকুল প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনার প্রসাদও পেলেন। সেই পরিত্রাতা এলেন

গৌরসুন্দর রূপে। তাই না জনসমাজ তাঁকে বলল, আজও বলে, গৌর আনা ঠাকুর।

এ হেন পার্ষদ পেলেন প্রেমসিন্ধু গৌরসুন্দর।

ভাল নাম গদাধর। ডাক নাম গদাই। আর কুল নাম মিশ্র। নিমাইয়ের কুলপদবী সদৃশ। পিতা মাধব মিশ্র। গৌরসুন্দরের চেয়ে বয়সে একটু ছোট। সুদর্শন দেখতে গৌরসুন্দরের মতই সুন্দর।

এতো গেল বাইরে। ভেতরে কেমন? অন্তর কেমন? —না, অন্তরটি সখ্য রসের মধুচক্র। সখা কে? না, নিমাই স্বয়ং। সেই অধ্যয়ন কাল থেকেই। একে অপরের যেন কায়া-ছায়া। তাই যেখানে নিমাই, সেখানে গদাই। দুটি নাম উচ্চারিত হয় এক নিঃশ্বাসে: গৌর-গদাধর। কম্বু কণ্ঠে জানাচ্ছেন বৃন্দাবন:

"নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কভি॥"

একই সুর লোচন কণ্ঠে:

"পণ্ডিত শ্রীগদাধর সর্ব্বগুণধাম।
প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম॥"

গতিকৃষ্ণ গদাধরের কৃষ্ণ ধ্যান সেই শৈশব থেকেই। বিদ্যার কারদানি-বড়ফট্টাই নেই। মনটি সদা-সর্বদা ভাদ্র দিনের নদীর মত ভরপুর প্রেমে। শাস্ত্র কথার খুনসুটি আরম্ভ হলে নিমাই পণ্ডিতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বলেন, 'শ্রুতি স্মৃতির মধ্যে আমি নেই। কৃষ্ণ নামই আমার একমাত্র সম্বল।' —বলেই পালিয়ে বাঁচেন।

নিমাই গয়া থেকে ফিরেছেন। নিমাই এখন অন্য নিমাই। ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অচেতন হয়ে পড়েন। যেন পেয়েও পাননা তাঁকে। তাই গৌরহরি গদাধরকে বলেন, 'গদাধর, সার্থক তোমার জীবন। শৈশব থেকেই তুমি কৃষ্ণগত প্রাণ।' এমনি 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা'য় পূর্ণায়ত তাঁর হৃদয় শতদল।

নদীয়া নগরে প্রেমের খেলা খেলতে গৌরহরির সখা হলেন এ হেন গদাধর। আর সখাকে চিনলেন অচিরেই প্রেমের জহুরী গৌরচন্দ্র। চিনলেন বলেই না অঙ্গমালা দিলেন গদাধরের গলায়। লোচনের মানসপটে ছবিটি ভেসে উঠতেই সুরেলা কণ্ঠে গাইলেন,

"ইহা বলি অঙ্গ মালা দিলা তার গলে।
প্রভাতে আইলা সভে প্রভু দেখিবারে॥"

এমনি করেই প্রেমের খেলা জমে উঠল।

"রাধা সনে যদা ভাতি তদা মদনমোহন।"

— সেই পূর্ণতম প্রেম দেখলেন ভক্তেরা উভয়ের মধ্যে যখন,

"নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস বিনোদিয়া॥
গৌর দেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধা রূপ হইলা তখন॥"

গদাধর যেন তাঁব ইষ্ট বস্তুর দর্শন পেলেন গৌরসুন্দরেরই মধ্যে। তাই,

"এই মত প্রতিদিন করে পরিচর্যা।
শয়ন মন্দিরে করে শয়নের শয্যা॥

চরণ নিকটে নিতি করয়ে শয়ন।
নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি পূর তার মন॥"

তাই গৌর গদাধরকে বলেন,

"তুমি যে আমার বন্ধু প্রাণ সম জানি।
তোর প্রেমে বশ আমি শুন দ্বিজমণি॥
তোর নাম মুই হও তুমি মোর প্রাণ।
গদাইর গৌরাঙ্গ বোলে কর অবধান॥
মোর যত ভাব তোথে নহে অগোচর।
আমার অন্তর শক্তি তোর কলেবর॥
রাত্রিদিন মোর সঙ্গ তিলেক না ছাড়।
তোমা বিনা মোর কথা জানে কেবা দঢ়।"

নামের সার্থকতা জীবনে ক'জনের? — না, এমন জন কোটিতে গোটিক। সেই কোটির একজন হচ্ছেন শ্রীবাস।

শ্রী শব্দে ভক্তি, আর বাস অর্থে আবাস — কি না ভক্তির আবাস। আহা! কি হৃদয় রসায়ন ভাষ্য। হবে না কেন? ভাষ্যকার কে দেখতে হবে তো। ভাষ্যকার যে পণ্ডিতের পণ্ডিত স্বয়ং গৌরসুন্দর। তাই না এমন মধুর ভাষ্য। নামের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন গৌরহরিই শ্রীবাসকে। যেমন, লোচন গাইছেন,

"শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু করিল এ ভক্তি।
তোমার নামের তুমি কি জান উৎপত্তি॥
শ্রীভক্তির তুমি কেবল আবাস।
এতেক বলিয়ে তোর নাম সে শ্রীবাস॥"

ভজ্ ধাতু থেকেই ভক্তি। ভজ অর্থ সেবা করা। সেবা করা মানে কি? — না, সেব্যের সুখ বিধান করা। কি ভাবে করতে হবে? ফোঁটা-তিলক কেটে, ফুল জল ফল দিয়ে? — না। তবে কিভাবে?

"অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥"

পয়ারটির প্রতিটি পদেরই প্রয়োগ আছে শ্রীবাসের আচার-আচরণে, ভজনে-সাধনে। তাই কবিরাজ নতি-প্রণতি জানাচ্ছেন:

"ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তা সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম॥"

শ্রীবাস গৃহী, অথচ কোন পেশা নেই। নেশা আছে। কি সে নেশা? — না, কৃষ্ণপ্রেমের নেশা। নিশিদিশি মশগুল সেই নেশায়।

গৌরচন্দ্র ও শ্রীবাসের মধ্যে বয়সের কতই না বিসদৃশ ব্যবধান। হবেনা কেন? শ্রীবাস যে গৌর পিতা জগন্নাথের বন্ধু।

গয়া থেকে ফিরে এলেন নিমাই। ফিরে তো এলেন, কিন্তু এ যে অন্য নিমাই। সংবাদ পেয়ে শ্রীবাস দেখতে এলেন।

ভক্তের চোখে ভক্তির চিহ্ন ধরা পড়ে। পড়লও। তাই নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রতি সন্ধ্যায় তুমি আমার অঙ্গনে কীর্তন করবে।'

এ হেন ভক্ত পার্ষদ পেলেন গৌর হরি তাঁর নদীয়া লীলায়। আর পেলেন নামাচার্য হরিদাসকে। যথার্থই— নামাচার্য।

তিন লক্ষেরও অধিকবার নাম নেন প্রতিদিন। মাসে কোটি। আর এই কৃষ্ণ নামেই মাতোয়ারা হয়েছেন গৌরসুন্দর। কৃষ্ণ প্রেমীর কতই না পরীক্ষা! সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নাম জপে চললেন হরিদাস।

হরিদাসের মত কৃষ্ণভক্তকে পেলেন গৌরসুন্দর নদীয়ায়। প্রেমময় গৌরসুন্দর। প্রেমময় তাঁর পার্ষদবৃন্দ। প্রেমের খেলা তাই জমে উঠল। আরও কত ভক্ত যে এলেন! কোথায় এলেন? কেন, শ্রীবাস অঙ্গনে। এমন হরিবাসর ভূমণ্ডলে আর কোথায়? এইসব ভক্তরা কি সবাই জাতিতে ব্রাহ্মণ? — না, আদৌ না। ব্রাহ্মণ আছেন, বৈশ্য আছেন, জল-চল আছেন, আছেন জল-অচলও। আছেন কামার, কুমোর, তাঁতী, আছেন নাপিত, বারুই, কুরী, আর আছেন চাড়াল, বাগদী, হাড়ী, ডোম, মুচী, শুঁড়ী। এঁদের কি কোন জাতের বিচার নেই? না, নেই। পরিচয়ও কি নেই? — আছে। অবশ্যই আছে। কি সে পরিচয়? সে পরিচয় বিলেত ফেরৎ ডাক্তার, ব্যারিষ্টার নয়। জমিদার নয়, নয় ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, বা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তাঁদের একমাত্র পরিচয় তাঁরা বৈষ্ণব, কৃষ্ণের নিত্যদাস।

গৌরসুন্দর নিজে ব্রাহ্মণ। সেই গৌরহরি বললেন,

"নাহং বিপ্র, ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যোন ন শূদ্রো,
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে-র্গোপীভর্তুঃ
পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

— আমি ব্রাহ্মণ নই, রাজা নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই, বর্ণী নই, গৃহী নই, বানপ্রস্থী নই, নই যতিও, কিন্তু আমি উন্মীলিত পরমানন্দপূর্ণ সুধা সাগররূপ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের দাসের দাসানুদাস।

এ হেন বিশ্বম্ভরের লোকপালের মত লোকবল নেই, শস্ত্রবল নেই, অর্থ বল নেই— আছে শুধু নামের বল, মুখে শুধু হরিবোল। নামটা কি ? - না, ষোল নাম, বত্রিশ অক্ষর ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

বিবাদ-বিভেদ বিদায় করলেন কিভাবে ? — না, এই নামেরই এক চন্দ্রাতপ তলে। সাম্য ও ঐক্যের জয়গান গাইলেন এই নামেরই বলে। সর্ব বর্ণের সর্ব স্তরের, সর্বজনকে সমবেত করলেন সংকীর্তনের অঙ্গনে। এই অঙ্গনে রাজা নেই, উজিব নেই, প্রজা নেই, পণ্ডিত নেই, মূর্খ নেই, নেই ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ। এখানে সবাই সমান। সবাই এক পংক্তিভুক্ত হয়ে ভোজন করে, এক শয্যায় শয়ন করে, প্রেমালিঙ্গনে মিলিত হয়ে নাচে, গায়, — হরিনামের একই অভিযাত্রায়। যথার্থ বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তির জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়।"

তাহলে কি চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হয় ? নিশ্চয়ই। এমনকি যে চণ্ডালের হরিপ্রীতি আছে, তিনি অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যেমন,

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।"

আর্য শাস্ত্রে জাতি ভেদের উল্লেখ নেই, আছে বর্ণ ভেদের। বর্ণভেদ কি রকম? — না, গুণানুগত। আর একে বিকৃত করে সৃষ্টি হল জাতি ভেদ। কেন? কেন আবার কি? উদ্দেশ্য স্বার্থ সিদ্ধি। একে করা হল বংশানুগত। যথার্থ বলেছেন ভাগবত :

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥"

— অর্থাৎ যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলা হল, তা যদি অন্য বর্ণেও দেখতে পাও, তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণের জন্য সেই বর্ণ বলে নির্দেশ করবে অর্থাৎ যদি শম দমাদি লক্ষণ ব্রাহ্মণেতর জাতিতেও দেখা যায়, তবে সেই লক্ষণ দ্বারাই তাকে ব্রাহ্মণ বলে নির্দেশ করবে, তার জাতি অনুযায়ী বর্ণ নির্দেশ হবেনা।

এই কূট প্রশ্নটির নিরাকরণ করেছেন যুধিষ্ঠির স্বয়ং। যেমন,

'শূদ্রেতু যস্ত বেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥"

— যে শূদ্রে শম দমাদি লক্ষণ থাকে, সে শূদ্র শূদ্র নয়, ব্রাহ্মণই; আর যে ব্রাহ্মণে তা না থাকে সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্রই।

উমা-মহেশ্বর সংবাদও একই সংবাদ দিচ্ছেন : দেবাদিদেব মহাদেব বলছেন,

'ন যোনিনাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম॥"

— ব্রাহ্মণ যোনিতে জন্ম, উপনয়নাদি সংস্কার, বা বেদাধ্যয়নাদি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয়, একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের কারণ।
ব্রহ্মার অনুশাসনও তাই ঃ

"শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য।
ইতি ব্রহ্মাঽব্রবীৎ স্বয়ং॥"

ঐ একই কথা বললেন মহাভারত অনুশাসন পর্বে গিয়ে।
যেমন,

"বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণ ত্বং নিযচ্ছতি।"

— অর্থাৎ সচ্চরিত্র শূদ্র ব্রাহ্মণত্বই লাভ করে।

শাস্ত্র কথা ভাল কথা। ভাল কথা তখনই ভাল যখন জীব জীবনে তার প্রয়োগ দেখা যায়। এতকাল দেখা যায়নি। শাস্ত্র বচন শাস্ত্রেই গ্রথিত ছিল। নিজ আচরণে প্রয়োগ করলেন সুন্দরাকর গৌরসুন্দর।

আচ্ছা, গৌরচন্দ্র না হয় শস্ত্রের পথে গেলেন না, গেলেন না তিনি শাস্ত্রের পথেও; কিন্তু নাম কীর্ত্তনের পথেই বা গেলেন কেন?

কৃষ্ণনাম নিলেই কি সাম্য ও ঐক্য আসবে? বর্ণ বিভেদ দূর হবে? বিচ্ছিন্নতা নেবে চির বিদায় জনসমাজ থেকে?

ঐক্য ও সাম্যের গঙ্গোত্রী কি? — না, প্রেম। প্রেমের সুরধুনী ধারায় স্নাত হলেই মানুষ মানুষকে ভালবাসে। ভগবানের প্রিয়তা বোধ আছে। প্রেমময়কে ভালবাসলে, মানুষের মনও হয় প্রেমময়। মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালবাসে নিজেকে, নিজ আত্মাকে, জনসমাজের প্রতি অনুরাগে জনসমাজ প্রিয় হয় না। সেই আত্মাকে

ভালবাসলেই পরমাত্মাকে ভালবাসা হয়। মনটি হয় তখন হিরণ্ময়। হিরণে কলুষ-পঙ্কিলতা থাকে না। তখন সে কি ভাল কি খারাপ, সবাইকে ভালবাসে। মন্দ ব্যক্তিও ভালবাসা পেতে পেতে মন্দ মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়। তখন সবাই এক হয়ে ভালবাসার আলোকে আলোকিত দেখে জনসমাজকে। অমা থেকে প্রমায় উত্তরণ হয় সমগ্র জনসমাজের।

যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন,

"ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়াভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।"

"ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্তি ॥"

— জনসমাজের প্রতি অনুরাগ বশত জনসমাজ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অর্থাৎ নিজের প্রতি অনুরাগ বশতই জনসমাজ প্রিয় হয়। সর্বভূতের প্রতি অনুরাগ বশত সর্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অনুরাগ বশতই সর্বভূত প্রিয় হয়।

একই কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ,

"ধর্ম সাধনায় ব্রহ্মবিদ্যার সেই একই কাজ। যখন প্রত্যেক স্তবকারী আপন স্তবমন্ত্র ও বাহ্যপূজা বিধির মায়াগুণে আপন দেবতার উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তারের আশা করত, তখন দেবত্ব বোধের ভিতর দিয়ে মানুষ আত্মায় আত্মায় এবং আত্মায়-পরমাত্মায় মিলনের ঐক্য বোধ সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ করে লাভ করেছিল।"

একই সুরে বলেছেন **Dr. Duessen,**

"The highest and purest morality is the immediate Consequence of the Vedanta. The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality.

— "Love your neighbour as yourself"

But why should I do so, since by the order of nature, I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbour? The answer is not in the Bible, but it is in the Vedas in the great formula "That thou art."

[তৎ-ত্বম-অসি], which gives in the three words metaphysics and morals together.

নির্যাসটুকু দিয়েছেন আরেক বিদিশী মনীষী Sir John Woodroffe :

"The Vedanta gives profoundly based reasons for charity and brotherliness."

তবুও একটা প্রশ্ন রয়ে গেল যে ! কৃষ্ণানুশীলনে নাম কীর্তন করতে হবে কেন ? নামের গুরুত্ব কোথায় ? মাহাত্ম্যই-বা কি ?

কলিযুগে উপাসনার কোন পথটি প্রশস্ত ? — না, কীর্তনই সহজতম ও সরলতম পথ। পুজো-অর্চনার বাহ্যাড়ম্বর নেই, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিয়ম-নিগড় তথা নিগ্রহ নেই, নেই উপকরণের উৎপীড়ণ। আছে শুধু নিরন্তর নাম গ্রহণ। ষোল নাম, বত্রিশ অক্ষর। ফুল-

ফল-জল, ধুপ-দীপ বা ভোগের বালাই নেই। তুমি স্নাত, কি অস্নাত, শুদ্ধ কি অশুদ্ধ বাসেই থাক, বা অশৌচেই থাক, বা যে কোন অবস্থায় থাক, সংকীর্তনে শত শত কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ যোগ কর, ব্যস! তোমাকে আর কিছু করতে হবেনা। তুমি দীক্ষিত নও, দীক্ষার জন্য তথা কথিত শাস্ত্র বিধান মতে একাধিক দ্রব্যের জন্য কাড়ি কাড়ি কড়ি প্রয়োজন। তুমি কড়িহীন। তাতে কি হয়েছে? ভাবনার কোন কারণ নেই। দীক্ষারই তো প্রয়োজন নেই নাম নিতে।

গৌরসুন্দর বললেন,

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হইতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥"

সহজ, সরল, সুলভ ও সুগম করলেন কৃষ্ণানুশীলনের পথ। কেন করলেন? না করে যে উপায় ছিলনা। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন শাস্ত্রের জট-জটিলতাই জনসমাজে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিমুখতা নিয়ে আসছিল এবং ভবিষ্যতে আরও আনবে।

তাই না মধুমাখা নামের নিস্বনেই গৌরসুন্দর আনলেন এক নতুন সভ্যতা স্তূপীকৃত জঞ্জালে ভারাক্রান্ত সমাজে। নাবালকত্ব থেকে সমাজ উত্তীর্ণ হল সাবালকত্বে — এক পূর্ণ মানুষের প্রত্যয় নিয়ে। ভাগবত পুরুষ ভাগবতের অমৃত নিস্যন্দী বাণীকেই অনুসরণ করলেন। যেমন,

"কৃতে যদ্ধায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্তনাৎ॥"

— সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরিসংকীর্তন দ্বারাই তা লাভ হয়ে থাকে।

তাইতো বিশ্বম্ভর গেলেন না সভা ডেকে চিরাচরিতভাবে বাণী বর্ষণের পথে। এই পথে নিজ আচরণে মানুষকে শেখান যায় না, কারণ এক্ষেত্রে বক্তা-শ্রোতা সম্পর্কই শেষ কথা। যাননি তিনি গ্রন্থ রচনার পথেও। লোক সাধারণ তৎকালীন সমাজে বিষয়ের বিষেই জর্জরিত। কার বই কে পড়ে? তাই গৌরসুন্দর বড় সুন্দর কথা বললেন, "আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সবারে।" না, শুধু বললেন না। করলেনও তাই। নিজে নর্তন-কীর্তন করে আনলেন অগণন জনকে সুগম সরণীতে। পুরোভাগে কে? — না. তিনি নিজে।

নাম কীর্তন বা নাম যজ্ঞের মাহাত্ম্য কি? তার কি কোন যজ্ঞ ছিল না। হ্যা, ছিল। একাধিক যজ্ঞই ছিল। যেমন, দ্রব্য যজ্ঞ, জ্ঞান যজ্ঞ, ব্রহ্ম যজ্ঞ, তপো যজ্ঞ ইত্যাদি। বৈদিক যুগে ছিল দ্রব্য যজ্ঞ বা পশু বলি। উপনিষদের যুগে পট পরিবর্তন। দ্রব্য যজ্ঞ গেল। এল জ্ঞান যজ্ঞ। গীতা বললেন নামযজ্ঞই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন,

"মহর্ষীনাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকক্ষরম।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরণাং হিমালয়ঃ॥"

ভাগবত বাণী আরও বিশদ ঃ

"কলের্দ্দোষনিধেঃ রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত বন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"

— কলি যুগ অশেষ দোষে দুষ্ট, তবুও এ যুগের একটি মহৎ গুণ এই যে কৃষ্ণনাম কীর্তন করলেই ভববন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে পরম গতি লাভ করা যায়।

নামেই ডাকি আমরা নামীকে। ভূমণ্ডলবাসীই তাই করে। না করে উপায় কি? ধরাধামের সব কিছুই আমরা ব্যক্ত করি একটা অভিধায়। এই অভিধাই নাম। মানুষ যেমন আছে, তেমনি তার ভাবও আছে। ভাব ছাড়া মানুষ নেই। আবার ভাব যেমন আছে, তেমনি আছে তার প্রকাশও। সেই প্রকাশই হয় নামে। এই নামই শব্দ ব্রহ্ম। হিন্দু এঁকে বলে ওঁ। এই ওঁকারই জগতের সমষ্টিভাব যাঁর অপর নাম ঈশ্বর। এই মন্ত্র বারবার উচ্চারণ করলে ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তি থেকেই প্রেম। আর এই প্রেম থেকেই আসে ঐক্য, সাম্য, মিলন — মহামিলন মানুষে মানুষে। তখন যোজন দূরে চলে যায় বিবাদ, বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা।

তাই গৌরসুন্দর গ্রহণ করলেন নাম সংকীর্তনের এই মহামন্ত্রটি। যুগে যুগে একই কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখেও একই কথা। বলছেন ঠাকুর, 'যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ আছে; তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে।' সত্ত্বগুণ কি রকম? বলছেন ঠাকুর, 'এ দিকে শরীরের

উপর আদর কেবল পেট চলা পর্যন্ত। শাকান্ন পেলেই হল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ির আসবাবের জাঁক জমক নাই··· ··· ··· ··· ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পরে পূজা করে। ········· ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। "মারো, কাটো, বাঁধো এইরূপ ডাকাতি পড়া ভাব।" এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদ মা'কে ভয় দেখাচ্ছেন, 'যদি দেখা না দাও, তাহলে তোমার নামে মোকদ্দমা করব।' মায়ে পোয়ে বিবাদ। আহা কত মধুর!

এই তিনকে ছাড়িয়ে আরেক ভক্তের কথা বলছেন ঠাকুর, 'আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তাঁর বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তার পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।"

হ্যাঁ, শুধুই তাঁর নাম। স্নাত কি অস্নাত, শুচি কি অশুচি, — বিচার নেই। ফুল-ফল, আড়ম্বর, বাহ্যাচার কিছুই নেই। বদনে আছে শুধু নাম।

সবই তো হল। সবই বোঝা গেল ; কিন্তু আসল প্রশ্ন যে রয়ে গেল : কৃষ্ণনাম নিলে কি পেট ভরবে? পেটে দানা-পানি না পড়লে আর কিসের নাম? পেটে দানা পানির কথা অর্থাৎ অভাব। মানুষের কত রকমের অভাব আছে? — না, তিন রকমের। যেমন, জৈবিক অভাব (**Physical want**), জৈবিক-

মানসিক অভাব ((**Psycho-Physical want**), এবং মানসিক-আধ্যাত্মিক অভাব (**Psycho-spiritual want**) জৈবিক অভাব কতটুকু ? - না, যতটুকু দানা পানি তার পেটে ধরে। পেটের ভেতরটা তো সীমায়িত, তাই চাহিদাও সসীম। এক ব্যক্তি সহস্রাধিক রসগোল্লা কিনতে পারে, তাই বলে কি এত রসগোল্লা খেতে পারে ? কতটুকু পারে ? হয়ত এক কেজি প্রতিদিন। তাও নিত্য খেতে খেতে আর খেতে পারবে না। পারলেও আরেক অপায় দেখা দেবে : শর্করার আধিক্য হেতু দেহে দেখা দেবে শর্করা।' ব্যস ! একেবারেই বন্ধ। এটাই বিধির বিধান। অর্থাৎ চাহিদাটা সসীম।

দ্বিতীয় চাহিদাটাও সসীম। এ চাহিদায় ষড়রিপু প্রকট হয়। প্রথম রিপু কাম। উপভোগ করতে করতে স্থূল মাংসলতায় আসে বিতৃষ্ণা ও ব্যাধি। তখন মানুষ নীরত হতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ কিনা এ চাহিদাটাও সসীম। এমনই বিধির বিধান। প্রাকৃত জীবের কী সাধ্য আছে এ বিধান কাটার ? তৃতীয় চাহিদাটা হচ্ছে মানসিক-আধ্যাত্মিক। এ চাহিদাটা অসীম। কাম্য বস্তুটি যেমন অসীম, তেমন অসীম প্রাপ্তি বাসনাও। যতই পাও আশ মেটেনা। বরং বাড়ে। বস্তুও ফুরোয় না, আশাও ফুরোয় না। তিলে তিলে বাড়ে, নতুন হয়। "সখিরে ! কি পুছসি অনুভব মোর / সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হয়।" আবার "কানের ভিতর দিয়া / মরমে পশিল গো / আকুল করিল মোর প্রাণ।" কই, চণ্ডীদাস তো বললেন না "তৃপ্ত করিল মোর প্রাণ।"

বলবেন কি করে? কৃষ্ণ প্রেমে তো তৃপ্তি নেই। শুধু আকুলতা বাড়ায়। ইক্ষুরসের মত। দন্ত ঘর্ষণে যতই রসনার স্পর্শ পাচ্ছে, ততই আস্বাদনের ইচ্ছা বাড়ছে। আবার চর্বিত হচ্ছে, এষণাও জাগছে পুনর্বার চর্বণের। এক জামবাটি চিনি একবারে খেলে কি রকম হয়? বিতৃষ্ণা জাগে শর্করায়। ইক্ষুও শর্করাই। হলে কি হবে? আস্বাদন পদ্ধতি যে আলাদা।

কিন্তু নির্ধনের দানাপানির ব্যবস্থা কি হবে? ব্যবস্থা তো আছেই। সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ভিন্ন জীব, ভিন্ন ব্যবস্থা। পাখির জন্য রয়েছে শাখী এবং তার ফল। মানুষের জন্য আছে আদিগন্ত শ্যামল প্রান্তর। এ সব তো সেই সার্বভৌম নিয়ামকেরই দান। তাঁর চরণে আশ্রয় নিলে নিত্য আহার্য বস্তুর ভাবনা আর থাকেনা। যেমন ছিলনা শ্রীবাসের। গৌরসুন্দর একদিন বললেন, 'পণ্ডিত, তোমার তো বড় পরিবার। তুমি শুধু কীর্তন নিয়েই আছ। সংসার চলবে কিভাবে?'
—'একদিন দেখব। ত্ব'দিন দেখব। তিনদিনের দিনও যদি আহার না জোটে, তাহলে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, তবুও কৃষ্ণনাম অবিরামই গাইব।' —বজ্র-দার্ঢ্য কণ্ঠে উত্তর দিলেন শ্রীবাস। পরমাশ্চর্য পরীক্ষা। পরীক্ষায় শ্রীবাসকে উত্তীর্ণ দেখে পরীক্ষকের ওষ্ঠাধরে প্রশান্ত হাসি দেখা দিল।

কিন্তু কৃষ্ণনাম নিলে সাম্য আসবে কেন? গো গোবর্ধন, গোপ, গোপী ও গোকুলের অধিপতি গোবিন্দকে স্মরণ করলে সাম্য আসবে স্বাভাবিকভাবে। নিখিল ভূমণ্ডলে সাম্যের স্থান

তো ঐ একটিই অর্থাৎ ব্রজধাম। কেন? ব্রজজনের যে কেউ কারোর ওপর আধিপত্য করে না। একটি পরিবারে গৃহকর্তাই সর্বেসর্বা। সেই স্থানটিতে এমন গৃহকর্তা শতশতই আছেন। কিন্তু অখিল ব্রজ মণ্ডলে একজনই পতি অর্থাৎ ঐ ব্রজেন্দ্র নন্দন। ইনি গৃহপতিরও পতি, আবার গৃহপত্নীরও পতি, পতি এঁদের পুত্র কন্যারও। "সর্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ" – ই এঁরা অনুসরণ করেন। একা-একেশ্বরের যখন আশ্রয় নিয়েছেন এঁরা, তখন দুই বা ততোধিক তো সেখানে নেই। একা-একা বিবাদ হয় না। তাহলে বিবাদ-বিভেদ, অসাম্য আর দেখা দেবে কিভাবে? ব্রজধামে ব্রজেন্দ্র নন্দন যে মাধুর্যময়। তাঁর কাছে ছোট বড় নেই। সব সমান। এটা যে প্রেমরাজ্য। এই প্রেমপুরে প্রেমার্ণব গোবিন্দের নাম কীর্তনে যাঁরা মেতে আছেন, তাঁদের চাওয়া পাওয়া নেই, আছে শুধু দেওয়া। দেন তাঁরা উজার করে। তাইতো গোপীদের নিজের বলে কিছু নেই। তাঁদের দেহ-গেহ, পতি পুত্র, এমন কি কাম পর্য্যন্ত তাঁরই চরণে নিবেদিত।

তাই এই নাম মহামন্ত্রে মুখর হল শ্রীবাস অঙ্গন। হলে কি হবে? অগণন জনের মধ্যে দুর্জনেরও তো অভাব নেই। সেই দুঃশীল-দুর্জনের সংবাদ দিচ্ছেন বৃন্দাবন:

"অতি পরমার্থশূন্য সকল সংসার।
তুচ্ছ রস বিষয়ে সে আদর সবার॥
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে যে জন।

তাহা না বোলে না বোলায় সঙ্কীর্তন ॥
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ।
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্তন ॥
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে।
ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ ॥
এগুনার ঘর দ্বার পেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মেলিযা ॥"

বিসদৃশ মননের মানুষ নিয়ে কীর্তন চ'লে না। তাই শ্রীবাস সদর দরজা বন্ধ করে অঙ্গন মধ্যে কীর্তন করেন। নিজ গৃহের দ্বার নিজে বন্ধ করেন। দোষটা কোথায়? আর যাবে কোথায়?

"সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
কীর্তন দেখিব ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে ॥
... ...
যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার ॥"

না, এইখানেই ক্ষান্ত হলনা এরা। চরিত্র হননেরও চেষ্টা করল। যেমন, সংবাদ দিচ্ছেন বৃন্দাবন :

"কেহ বলে এগুনা সকল মাগি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায় ॥"

বদনে বল্গা নেই। তাই,

"কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥"

কত লোকের কত কদর্য কথা। একেক জনের একেক রকম উক্তি হঠোক্তি ও কটূক্তি। কেউ কেউ গৌরসুন্দরের চরিত্র হননের চেষ্টাও করল। যেমন,

"কেহ বলে হেন বুঝি পূর্ব অসংস্কার।
কেহ বলে সঙ্গ দোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গ দোষে ঠেকিলা নিমাঞি॥
... ...
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥"

কটূক্তি, হঠোক্তিতেই এরা ক্ষান্ত হলনা। আর কি করল? — না,

"কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥"

এবং তাদের ষড়ের নারকীয় বাস্তব রূপ দিল এক ব্রাহ্মণ। যেমন, কবিরাজ বলছেন,

"একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥
... ...

মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস আসি তাহা ত দেখিলা॥"

সেই চাপালের কি হল? কারোকে কিছু করতে হল না; কারণ,

"তিনদিন বহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার॥"

দুষ্কৃতীর যা গতি হয়, চাপালেরও তাই হল।

যাহোক, কীর্তনে গৌরসুন্দর রইলেন অনড়, অটল। কীর্তন যথারীতি চলতে থাকল। আহা! সে কি আনন্দ। প্রেমানন্দের সুরধুনী বইতে লাগল শ্রীবাস অঙ্গনে।

নাম সংকীর্তনে শ্রীবাস অঙ্গন নিত্য আমোদিত। সাধু! সাধু!! কিন্তু নাম যে ঘরে ঘরে বিতরণ করার সংকল্প গোরা-চাঁদের। তাই ডাকলেন তাঁর প্রধান পার্ষদদের দুজনকে নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে। বললেন, 'তোমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবে। কি সে ভিক্ষা জান? হরিনাম ভিক্ষা। গৃহীর দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা চেয়ে বলবে, 'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ।' পার্ষদদ্বয় কি করলেন? সংবাদ দিচ্ছেন বৃন্দাবন :

"আজ্ঞা পাই দুইজন বুলে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ায় দুই জগত ঈশ্বরে॥"

ফল কি হল ? সফল-বিফল দুইই হল। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে দ্বারে দ্বারে গেলেন। গৃহবধূ একটি মাটির সরায় কিছু চাল আলু নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই বললেন, 'বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ।' সীমন্তিনী নাম নিয়ে সরা থেকে ঝুলিতে চাল দিতে হাত বাড়াতেই ঝুলি সরিয়ে নিলেন, বললেন, 'আমরা ভিক্ষা পেয়ে গেছি।'

এটা তো গেল চাঁদের আলোর পিঠ। কালোর পিঠও তো আছে। অনেক গৃহীর কাছে নিগৃহীতও হলেন। না, কিছু মনে করলেন না এঁরা। ভাবলেন কৃষ্ণনাম শুনতে শুনতে কালোও ভাল হবে একদিন।

স্রোত একভাবে বয়ে চলে না। বাঁক নেয়। এঁদেরও নাম বিতরণ ধারা বাঁক নিল একদিন, যেদিন এঁরা মুখোমুখি হলেন দুই দুষ্কৃতীর।

জমিদারের নাম শুভানন্দ রায়। কুলীন ব্রাহ্মণ। মর্যাদা সুমেরু প্রমাণ। এঁর দুই পুত্র। রঘুনাথ ও জনার্দন। রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ, আর জনার্দনের পুত্রের নাম মাধব। বিকৃত-রুচির এই দুই দুষ্কৃতী তাদের দুষ্কৃতির জন্য লোক মুখে বিকৃত নাম পেল জগাই মাধাই। কাড়ি কাড়ি কড়ি। এই কড়ি দিয়েই কিনে নিয়েছিল নগর কোতোয়ালি চাঁদ কাজীর কাছ থেকে। নিজ দেহে বিশাল বলী, তার ওপর ছিল সশস্ত্র লোক বলে বলী। হেন নারকীয় কাজ নেই যা এরা করেনা। এটা হল প্রতিদিনের ঘটনা। ঘটনা ঠিক নয়। বিঘটন। পঞ্চ 'ম' কারের মূর্ত প্রতীক

এই দুই দুষ্টাশয়। সকাল থেকেই চলত মদ্য ও মাংস। অষ্টক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকত। লোক হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীহরণ, নারী-ধর্ষণ ইত্যাদি ছিল নিত্যকার ব্যাপার।

নদীয়াবাসী এদের ভয়ে থরথর করে কাঁপে কলাপাতার মত। সর্বদাই সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত। প্রতিবাদ করে না কেউ? নদীয়া নগরে না এত লোক! আর প্রতিবাদ? কার প্রতিবাদ কে করে, আর কেই বা শোনে? কাজী তো কড়িতেই কাত হয়ে আছে। একে ডিঙ্গিয়ে বাদশাহকে জানানো তো না জানানোরই সামিল।

নিত্যানন্দ দুঃখক্লিষ্ট হলেন এই দুই দুরাশয়ের দুরবস্থা দেখে। সবচেয়ে বেশী ব্যথাহত হলেন। ভাবিত হলেন গৌরচন্দ্রের স্কন্ধ পার্ষদ। পরিণামে এরা কিভাবে পরিত্রাণ পাবে? এ যেন তাঁর নিজের ব্যাপার। একান্ত নিজের। একেবারে মাটির মানুষ তো। মনটি বড়ই নরম। নরম মনে ঘা লেগেছে। শুকোতে চায়না। দ্বারে দ্বারে তো নাম বিতরণ করছেন। তা, এদের দ্বারে একবার গেলে কেমন হয়? হরিদাসকে বললেন। বিস্মিত ও শঙ্কিত হলেন হরিদাস। প্রমাদ গণলেন। বললেন, 'দু-ভাই-ই তো দুরাত্মা। এদের ভয়ে কুলবধূ গঙ্গার ঘাটে শান্তিতে স্নান করতে পারেনা। সন্ধ্যে হতে না হতেই— লোকে একা পথ চলে না। দল বেঁধে যায়। তাদের তুমি দেবে কৃষ্ণপ্রেম। হিতে বিপরীত হবে। অকারণে অপদস্থ হতে হবে।' নিতাইচাঁদ নাছোর বান্দা। বললেন, 'চল না যাই একবার। কত ঘরেই ঘুরলাম, আর কত দ্বারেই না লাঞ্ছনা পেলাম। না হয় লাঞ্ছনা আরেকটু বাড়লই।

চল. পায়ে পায়ে যাই একবারটি।'

দুই পাবন পার্ষদ চললেন দুই পাষণ্ডের কাছে। দেখলেন নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। তবুও নিতাই হাল ছাড়লেন না। বললেন, 'একবার কৃষ্ণনাম নাও, পতিত জীবন থেকে মুক্তি পাবে।'

আর যাবে কোথায়? ক্রোধোন্মত্ত দুই ভাই গর্জে উঠল, 'কি এত বড় আস্পর্ধা! নিজেরা হরিবোলা হয়েছে, তাতে শখ মেটেনি। আবার এসেছে আমাদের হরিভজা করতে। ধর তো ব্যাটাদের' — বলে তাড়া করল। পড়ি কি মরি করে ছুটলেন দুই ঠাকুর। এক ছুটে হাজির হলেন গৌরচন্দ্রের কাছে। সব কথা খুলে বললেন। নিতাইচাঁদ কাকুতি মিনতি করে বললেন, 'প্রভু, এই দুই পতিতকে যে উদ্ধার না করলেই নয়। এদের পরিণাম কি হবে? কৃষ্ণ তো সবাইকে আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণ-ভক্তও তাই সবাইকে আকর্ষণ করেন, সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক। ভক্তি জগতে শুধুই যোগ, বিয়োগ তো নেই। ভালর বেলায় করণীয় আর কি আছে? করণীয় সব কিছুই তো মন্দের জন্য। মন্দকে ভাল করলেই না তোমার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাবে।'

গৌরসুন্দর মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার দর্শন যখন ওরা একবার পেয়েছে, উদ্ধার ওরা পাবেই।' উৎসাহিত হলেন নিত্যানন্দ। বড়ই উৎফুল্ল। নেচে নেচে গাইতে গাইতে গেলেন আবার। দেখেই রাগে ফেটে পড়ল আকণ্ঠ সুরাপানে উন্মত্ত দুভাই। গর্জে উঠল, 'ও, আবার এসেছে। দাঁড়াও, শেষ শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি।"

— বলে মাধাই হাতের কাছে থাকা কলসীর কানা দিয়ে নিতাই চাঁদের মাথায় আঘাত হানল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। নিত্যানন্দের তবুও হাসি ভরা বদন। বললেন, 'না, আমার কিছু হয়নি. তবুও তুমি একবার কৃষ্ণ বল। শুধুমাত্র একটি বার।' এবার দ্বিগুণ রোষে মাধাই প্রহার করতে গেল। জগাই হাত ধরে ফেলল। রক্তধারা দেখে জগাইর মনটা একটু নরম হল। বলল, 'এই করছিস কি? বিদিশী সন্ন্যাসী যে!'

বায়ু বেগে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। গৌরসুন্দর ছুটে এলেন সপার্ষদ। নিত্যানন্দকে রুধিরাপ্লুত দেখে রোষারুণ নয়ন নিক্ষেপ করলেন তুই পাষণ্ডীর ওপর। 'চক্র' 'চক্র' বলে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করলেন সুদর্শনকে। সুদর্শন উপস্থিত হল তার রুদ্র মূর্তি নিয়ে। দেখেই তুই দুষ্কৃতী পতিত হল গৌরহরির চরণে। নিতাইচাঁদ উদ্বিগ্ন। মিনতি-মাখা গলায় বললেন, 'প্রভু, এই অবতারে তো তোমার অস্ত্রধারণ নয়, প্রেম দান। কলিতে তুমি যে প্রেমাবতার, প্রেম পুরুষোত্তম। তাছাড়া জগাই তো আমাকে দ্বিতীয় আঘাত থেকে বাঁচিয়েছে। চক্র তুমি ফিরিয়ে দাও— এদের তুমি ক্ষমা কর।'

শান্ত হলেন গৌরসুন্দর। বললেন, 'জগাইকে না হয় ক্ষমা করলাম; কিন্তু মাধাইর অপরাধ তো তোমার চরণে। তাকে তো আমি ক্ষমা করতে পারিনা।' মৃদু হেসে নিত্যানন্দ বললেন, 'বুঝেছি প্রভু, ভক্তের মান রাখতেই তোমার এই লীলা। আমি মাধাইকে ক্ষমা করেছি। মাধাই ততক্ষণে নিতাই চরণে পতিত হয়েছে। অবধূত তাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাধাই

অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ওদিকে জগাইও অচেতন। বিশ্বম্ভর সপার্ষদ নিজ গৃহে ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ গৌরসুন্দর ও অন্যান্য ভক্তরা দেখলেন দ্বারে জগাই মাধাই হাজির। চোখে অঝোরে জল ঝরছে। ক্ষণে-ক্ষণেই অচেতন হয়ে পড়ছে। সপার্ষদ গৌরচন্দ্র এঁদের নিয়ে এলেন গঙ্গার ঘাটে। অবগাহনান্তে সবাই ফিরে এলেন। ফিরলনা শুধু জগাই-মাধাই নিজ প্রাসাদে। এক ভক্তের বাড়ীতে রয়ে গেল। সব পড়ে রইল পশ্চাতে। পড়ে রইল প্রাসাদ, শস্ত্রধারী প্রহরী, সোনার পালঙ্ক, সুখময় শয্যা, স্বর্ণ ভৃঙারে সুরা আর অগণন স্বর্ণ মুদ্রা। এক লহমায় সব ত্যাগ। মুখে সদাই শুধু হরিনাম। নিতাইচাঁদ নাম নিতে বলেছিলেন একবার, মাত্র একবার। এখন মাধাই নিচ্ছে একবার নয়, একশ বার নয়, এক হাজার বার নয়, এক লক্ষবারও নয়— একেবারে দু লক্ষবার। প্রতিদিন। বসন বলতে ছিন্ন কৌপীন, অশন নেই। শুধু রোদন। অহঙ্কার কলুষ থেকে মুক্তির জন্য। ভার মুক্ত হতে চায় মাধাই চোখের জলে। হ্যাঁ, চোখের জলেই কলুষের শোধন হয়। হয় আত্মার শুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"

না, মাধাই এইখানেই থামলনা। নিত্যানন্দকে বলল, 'প্রভু. তোমার চরণে যে অপরাধ করেছি, তার জন্য আমি আর ভাবিত নই। তুমি তো ক্ষমা না চাইতেই ক্ষমা করেছ। ক্ষমা করেছেন মহাপ্রভুও। কিন্তু আমি হাজারো লোকের কাছে অপরাধী।

আমি তাদের কাছে এখন ক্ষমা প্রার্থী হব।'

না, এখন কথায় আর কাজে ব্যত্যয়-ব্যতিক্রম নেই। যেমন কথা, তেমন কাজ। কি সে কাজ? মাধাই নিজ হাতে কোদাল নিল। সেই কোদাল দিয়ে নিজ হাতে ঘাট তৈরী করল গঙ্গার তীরে। নিজ প্রাসাদে নয়। অন্যের গৃহেও নয়। মাধাইয়ের বাস হল এখন ঐ ঘাটে। ঘাটে কেন? ঘাটে স্নান করতে লোক আসে। প্রতিটি লোকের পায়ে পতিত হয়ে বলে, 'যদি আপনার কাছে কোন অপরাধ করে থাকি, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন।'

একদিন নয়, দুদিন নয়, দিনের পর দিন চলল এই তপস্যা। মুখে তো দু লক্ষ নাম আছেই। এমনি করে অনুতাপানলে দগ্ধ হল মাধাই। পরিশুদ্ধ হল তার দেহ মন। পরিত্রাণ পেল দুভাই। পতিত জীবন পতিত পাবন কৃপায় সফল হল। বৈষ্ণব পরিমণ্ডল তাদের আসন দিলেন চৌষট্টি মোহান্তের মধ্যে।

সুদর্শনের কথা বলতে গিয়ে বৃন্দাবন বলেছেন,

"রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথেব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥"

বৃন্দাবন পরম ভাগবত। অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, কিন্তু প্রাকৃত জনের কাছে তো এ দৃশ্য বিসদৃশ। অবিশ্বাস্য। বেশ, হল অবিশ্বাস্য; কিন্তু প্রাকৃত জনের কাছে আধ্যাত্মিক রূপক (স্পিরিচুয়াল এ্যলেগরি) নিশ্চয়ই গ্রাহ্য। চক্র রুদ্রের প্রতীক। বিঘটন

ঘটায়। বিশ্বম্ভর বিশাল দেহী। মাথায় ছ ফুটের ওপর। নধর কান্তি। আয়ত নেত্র। সে হেন পুরুষ সিংহ অগ্নি বর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন দুষ্কৃতীদের ওপর। এই দুই দুষ্টাত্মা জানে তারা অগণন অপরাধে অপরাধী। তাই কাপুরুষ এবং মনে প্রাণে দুর্বল। সে হেন দুরাত্মাদের কাছে রোষাবিষ্ট পুরুষের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি কি রকম? — না, তাঁর ঐ দর্শনই সুদর্শন।

এ তো গেল ভাগবত পুরুষের কথা। মায়িক জগতেই কি সকল ব্যক্তির একই রকম ব্যক্তিত্ব? অনিল বাবুর বাড়িতে এলেন একজন দেখা করতে। এসেই তারস্বরে 'ও মশায়, ও মশায়' করে চিৎকার করতে লাগলেন। দরজা খুলে দিতেই অনিল বাবুরই পাশে গিয়ে দন্ত বিকশিত করে বললেন, "কি মশায়, এক জামবাটি মচমচে মুড়ি খাচ্ছিলেন বুঝি কচকচে শশা দিয়ে" এ রকম দৃশ্য কি চিন্তা করা যায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে? কি করে যাবে? সেখানে থাকতেন সার্বভৌম গুণাকর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ দেহী শালপ্রাংশু হস্ত। সিংহদ্বার পেরিয়ে পরিচারকের কাছে পরিচয়ের পালা। একটা সময় নির্ধারণ। তারপর দর্শন লাভ। দর্শনে 'হ্যাঁ মশায়, ও মশায়' তো দূরের কথা দর্শন প্রার্থীর মাথাটি নত হত ঐ অতিমর্ত্য পুরুষের চরণে।

দুভাই পড়ে রইল। মাটিতে অচেতন। এদিকে পার্ষদবৃন্দসহ গৌরসুন্দর চলে এলেন। কাজটি কেমন হল! যথার্থই হল। এক্ষেত্রে বড়ই অর্থপূর্ণ নরোত্তমের এই অর্ধ পথারটি :

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।"

ঘরণীর ঘরে ধন এলে, বিতরণ করে ঘরণী। আর অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ করে গৃহপতি। প্রেমধন বিতরণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তার নিয়ন্ত্রণও। অনিয়ন্ত্রিত বিতরণে বস্তু তার গুরুত্ব হারায়। এক যুগেই হয় নিঃশেষ। যুগ জয়ী হয় না। উপযাজক হয়ে বিতরণ চলতে পারে, কিন্তু তারও যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, নইলে অহঙ্কারী অপাত্র অমর্যাদা করে সেই প্রেমের। তাই গৌরসুন্দর করলেন পতির কাজ। ফল ফলল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সেই পতিত দুই ভাই স্বপ্রয়াসে উপস্থিত হল গৌরচন্দ্রের গৃহে। শ্রীরামকৃষ্ণেরও একই কথা: কৃপা পেতে হলে কিছু করতে হয়। কৃপার কৃ ধাতু মানে হচ্ছে কিছু করা।

পোষাকী নাম কাজী মৌলানা সিরাজুদ্দিন। আটপৌড়ে নাম চাঁদ কাজী। নবদ্বীপের প্রশাসক। কাজীয়ত করেন। ইনি নাকি আবার বাদশাহ্ হোসেন শাহ্‌র গুরু। দোর্দণ্ড প্রতাপ।

পেশা, জাতি, কুল, মান, মর্যাদা ধুয়ে মুছে ফেললেন গৌরসুন্দর। ভক্তকে কলুষ মুক্ত করে তার নাম, একটি মাত্র নাম দিলেন বৈষ্ণব। কৃষ্ণের নিত্যদাস। মানুষের এই একটিমাত্র পরিচয়। সমাজদেহ কোনকালেই ব্যাধিমুক্ত থাকেনা। গৌরচন্দ্রের কালেও ছিলনা। দেহের আংশিক ক্ষত বীভৎসরূপে দেখা দিল। প্রতীপ মানসিকতার হিন্দুর একাংশ নালিশ করল কাজীর কাছে। এদিকে সংকীর্তন তো চলছেই।

গৌরসুন্দর বললেন,

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
... ...
ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ॥"

কিভাবে? কোথায় জপতে হবে?

"দশে পাঁচে নিজ গৃহ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্তন করহ সভে হাতে তালি দিয়া॥"

শুধু শ্রীবাস অঙ্গন নয়। পাড়াকে পাড়া মুখর হল সংকীর্তনে। যেমন, বৃন্দাবন বলেন,

"এইমত নগরে নগরে সংকীর্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥"

কিভাবে করাতে লাগলেন? শুধুমাত্র উপদেশ দিয়ে? না. আদৌ না। নিজ আচরণে করাতে লাগলেন। কি রকম?

"সভারে আসিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেই সভাকারে॥"

এদিকে দ্রোহী দলের উষ্মাও বাড়তে লাগল। যথা,

"পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥"

বর্ষিত হল বিদ্রূপ বাণও:

কোন পাপী বলে হের দেখ ভাই সব।
খোলা বেচা মিনসাও হইল বৈষ্ণব॥"

কৃষ্ণ বিমুখ এই সব লোক শুধুমাত্র শিশ্নোদর পরায়ণ। যেমনি

মনন, তেমনি বচন। ঐ খোলা বেচা শ্রীধরকেই লক্ষ্য করে বলল,

"পরিধান বস্ত্র নাহি পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত॥"

আবার খেউড়ও গাইল :

"নগরিয়াগুলা বোলে মাগি খাই মরে।
অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥"

চাঁদ কাজীর কাছে তো নালিশ পেশ করাই ছিল। কাজী দলবল নিয়ে নগর ভ্রমণকালে সংকীর্তনের উচ্চরোল শুনতে পেলেন। ব্যস্! আর যাবে কোথায়? ক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে কীর্তনের আসরে ঢুকে পড়লেন। ভেঙ্গে ফেললেন সব খোল। না, এতেই ক্ষান্ত হলেন না। অগ্নিবর্ষী চোখে গর্জন করে বললেন, 'আজকের মত এইখানেই ছেড়ে দিলাম। এরপর যদি কীর্তন শুনি, তাহলে সব বৈষ্ণব ব্যাটাদের জাত মেরে দেব।'

ভীত হলেন সবাই। সদা সন্ত্রস্ত। সংকীর্তন করতে সাহস হয় না। তখন তাঁরা ছুটলেন গৌরচন্দ্রের কাছে। না ছুটে আর উপায় কি? তিনি না তাঁদের অগতির গতি, সংকীর্তন পতি। তিনিই যে তাঁদের প্রেমদাতা, মহামন্ত্রদাতা।

গৌরসুন্দর কীর্তনানন্দেই মগ্ন ছিলেন। কাজীর অকাজের কথা শোনামাত্রই অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। সে কি রুদ্ররূপ! একটু আগেই না ছিলেন প্রেমঘন। এখন হলেন প্রতাপঘন।

ভগবানের তিনরূপ। তাই না তাঁকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ— 'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।' সৎ অর্থে প্রতাপঘন,

চিৎ অর্থে প্রজ্ঞাঘন, আনন্দ অর্থে প্রেমঘন। প্রেমসিন্ধু গৌরহরির এখন আর নয়ন নন্দন প্রেমঘন রূপ নেই। বজ্রাদপি কঠোরানি রূপ ধরলেন প্রতাপঘন রূপে। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন আগামী কালই কালরূপে কাজী দলন করবেন।

না কোন কথাই ভাবলেন না। কাজীর লোকবলের কথা বললেন না। ভাবলেন না এক লহমার জন্য সশস্ত্র সৈন্য দলের কথা। স্মরণে আনলেন না কাজীর প্রশাসন ক্ষমতার কথা। নির্দেশ দিলেন সব ভক্তদের প্রস্তুত হতে। কিসের প্রস্তুতি? —না, কীর্তনের প্রস্তুতি। বিশ্বম্ভর আগামীকাল সন্ধ্যায় কীর্তন করবেন সারা নবদ্বীপে। যেমন, বৃন্দাবন বলেন:

"সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম করে কোনজন?"

কি রকম সে কীর্তন? —না,

"প্রেমভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীগণের হইমু আজি কাল॥"

ভক্তদের সাজসজ্জা কি রকম হবে? —না, সব ভক্তই তাঁদের গৃহদ্বার সজ্জিত করবে মঙ্গল ঘটে। সঙ্গে নেবে কড়ি আর খৈ। কীর্তন শোভাযাত্রা পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে। নিজ অঙ্গ চর্চিত করবে চন্দনে— অঙ্কিত করবে অলকা-তিলকায়। গলায় দুলবে ফুলমালা। আর পায়ে বাজবে নূপুর। আরেকটি জিনিস সঙ্গে নিতে হবে বিশেষভাবে। তা হচ্ছে:

"কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
একা মহাদীপ লঞা আসিবেক সে॥"

নির্দেশ নিয়ে ভক্তরা চলে গেলেন। তাঁদের মনে আর কাজী ভীতি নেই, আছে প্রীতি, গৌর প্রীতি। তাঁরা সবাই প্রীত এমনই প্রীত যে, "আনন্দে ডুবিলা সব কিসের ভোজন।" কারণ

'নিমাঞি পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন ধ্বনি তুলি প্রতি ঘরে ঘরে॥'

এবং নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কীর্তন করে সবশেষে যাবেন হাজারো মানুষের মিছিল নিয়ে কাজীর ঘরে। লোক কত হবে? বলছেন বৃন্দাবন :

'অনন্ত অর্বুদ লক্ষ-লোক নদীয়ার।
এ দিউড়ি সংখ্যা করিবার শক্তি কার?'

গৌরহরির গৃহদ্বার। হাজারো সুসজ্জিত ভক্তের সমাবেশ সেখানে। সন্ধ্যা বেলা। সংকীর্তন যাত্রা আরম্ভ হবে। কিন্তু এই আরম্ভেরও আরেক আরম্ভ আছে, তা হচ্ছে কীর্তন দলের বিন্যাস। কোন দলে কে দলপতি থাকবেন? নির্দেশ দিলেন সংকীর্তন পিতা। প্রথমে থাকবেন আচার্য অদ্বৈত। প্রধান পার্ষদদের ভার দিলেন একেকটি দলের। দ্বিতীয় দলটির ভার ন্যস্ত হল হরিদাসের ওপর। এবং পরের দলটির ভার পড়ল শ্রীবাস পণ্ডিতের ওপর। এরপর থাকবেন গৌরহরি নিজে। ডানে-বাঁয়ে থাকবেন কে কে? ঐ 'আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই'-- সেই নিতাই চাঁদ থাকবেন নিমাই চাঁদের ডানে, আর বাঁয়ে থাকবেন গৌরের নামের সঙ্গে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়। সেই পণ্ডিত গদাধর। থাকবেনই তো। যেখানে গৌর, সেখানেই যে গদাধর। এই মহাবিপ্লবে আর কে কে যোগ দিলেন? যোগ দিলেন

প্রায় সর্বজন। বিয়োগের মধ্যে ছিল অঙ্গুলিমেয়জন। তবুও প্রধান ভক্তদের মধ্যে ছিলেন ঃ

"... ... ...।
গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাস॥
রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ মুকুন্দ শ্রীধর॥
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে রহকার্য॥"

আন্দোলন সংকীর্তন এগিয়ে চলল। আর তখন নগরী দেখতে কেমন হল?

"হইল দিউড়িময় নবদ্বীপপুর।
স্ত্রী বাল বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥"
... ...
"লক্ষকোটি দীপ সব চতুর্দিগে জ্বলে!
লক্ষ কোটি লোক চারিদিগে হরিবোলে॥'

এতো গেল মহানগরের কথা। আর এই মহাবিপ্লবের মহানায়ককে দেখাচ্ছিল কেমন? বৃন্দাবনের বিনোদ বাণীতে যেমন ঃ

"জ্যোতির্ময় কণকবিগ্রহ বেদসার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে।

বাহু তুলি হরি বোলে শ্রীচন্দ্র বদনে ॥

... ...

... ...

... ...

সভা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর ॥"

আচ্ছা, সবাই তো গেলেন সেই সংকীর্তন শোভাযাত্রায়। সবার ঘর দোর যে খালি পড়ে রইল। তাহলে তো চোর-ডাকাতের মহা-মউকা মিলে গেল। না, নিখিলবঙ্গের এই প্রথম গণ আন্দোলনের রাত্রিতে চোরও তো তার পেশা ভুলে গেল। শুধু ভুলেই গেলনা— এরাও এ শোভাযাত্রার শরীক হল। দীর্ঘ প্রপীড়িত জনসমাজের আজ কি হল ?

এই ভঙ্গপয়ার সমাজ পেল আচম্বিতে সাবালকত্ব। বীর্যবান বিশ্বম্ভরের তেজময় নায়কত্বে তারা পেল এমন এক নতুন জীবন, যে জীবনে জীব মেরুদণ্ড সোজা করে সুমেরুর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। তাদের মূক মুখ হল মুখর-আইন-অসিদ্ধ আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে। এ জীবন তাদের চিত্ত ভরে তুলেছে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে। শস্ত্র বল নয়, মসনদ বল নয়, দৈহিক বল নয়; চিত্ত বলই আসল বল— একমাত্র বল। এ চিত্ত কেমন ? — না, এ চিত্তে চিত্রিত আছে ঐ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। চিত্র শিল্পী কে ? — না, গৌর সুন্দর স্বয়ং। বিশ্বম্ভর তাদের বলীয়ান করেছেন কেন ? — না, মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য। মানুষ হয়ে যে মানুষের জন্মগত অধিকার হরণ করে, সে তো মানুষ

নয়। সে যে মানুষ নয়, এটা তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দেবার জন্য। রাজ্য, রাজত্ব, রাজদণ্ড— সব কিছুই না মানুষেরই জন্য। আর রাজকোষ? মানুষের মাশুলেই না রাজকোষ। আর সেই বাজকোষের কল্যাণেই রাজদণ্ড, রাজ মর্যাদা, রাজসুখ। আর সেই মানুষেরই জন্মগত অধিকার কেড়ে নিচ্ছে যে মানুষটি, আজ তাকেই শিক্ষা দিতে চলেছে এই মানুষের দল।

সংকীর্তন দল এগিয়ে চলল। মিছিল কি সরাসরি কাজীর বাড়ী ঢুকল? —না, আদৌ না। প্রশাসকের সঙ্গে সম্মুখ সমর শুধু নদীয়ায় কেন, সমগ্র বঙ্গেই এই প্রথম। তাও মসনদে আছেন কে? —না, এক যবন।

জানুক, জানুক সবাই এই বিধিহীন বিধির বিরুদ্ধে জেহাদের কথা। তাই প্রথমে শোভাযাত্রা শোভা পেল গঙ্গার ঘাটে, যে ঘাটে গৌর চন্দ্র স্নান করেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য মুখর হল ঘাট। আলোয় আলোময় হল সুরধুনী তট। জলেও আলোর ছবি। হাজারো মশালের আলোয় চারদিক ঝলমল। সারা নবদ্বীপ টলমল। অটল শুধু এই বিপ্লবী ভক্তদল তাঁদের সঙ্কল্পে। এগিয়ে চলল মিছিল। এল মাধাইয়ের ঘাটে। মাধাইয়ের ঘাটে মহা কলরোল। সবারই মুখে হরিবোল। হাজারো খোল করতালের রোল। যোজন দূরের মানুষও শুনতে পাচ্ছে এই কলঘোষ। দর্শকও অগণন। দর্শকদের মধ্যে আছে দ্রোহীরাও। এরা ভাবছে আজ একটা বিঘটন ঘটবেই। কাজী যা তেজী! তার ওপর তাঁর সশস্ত্র সান্ত্রী। আর কীর্তনীয়াদের সম্বল তো ঐ খোল-করতাল।

আর ফুলের মালা। ফুলের মালায় কেউ লড়াই লড়ে? কাজী কি ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাবে? যত সব! কি দরকার ছিল আগবাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনার? ঐ গয়া থেকে ফিরে আসার পরই নিমাইয়ের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে।

মিছিল থেমে নেই। এগিয়ে চলেছে। এবার এল বারকোণা ঘাটে। এই ঘাট দিয়ে দল এল সিমলায়। তাহলে কি বিশ্বম্ভর কীর্তনানন্দে কাজীর বাড়ীর কথা ভুলে গেলেন? না, আদৌ না। কাজীর বাড়ী তো তাঁর চোখে স্থির হয়ে আছে— স্থির হয়ে আছে ধ্রুবতারার মত। শোভাযাত্রা এখন কাজীর বাড়ীর পথ ধরল। কাজীর বাড়ীর চারদিকে সে কি কলরোল! মুখে শুধু হরিবোল। হাতে শুধু খোলের বোল। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন কাজী। সান্ত্রী ডাকলেন, বললেন, 'দেখতো বাইরে এত কিসের গোল? নিশ্চয়ই ঐ বৈষ্ণব ব্যাটাদের হট্টগোল। কীর্তন করতে বারণ করে দিয়েছিলাম। বারণ শুনল না। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। এবার সব ব্যাটাদের জাত মেরে দেব।' সান্ত্রী হুকুম তামিল করে ঐ অগণন লোকের কথা বলল। কাজী দমবার পাত্র নন। হাজার হোক তিনি প্রশাসক। একদল সৈন্য পাঠালেন। সে দল আর ফিরল না। এদিকে মিছিলের একদল কাজীর ফুলবাগান তছনছ করে দিল। কেউ কেউ বা গাছের ডাল ভেঙ্গে মরমর ধ্বনি তুলল। মরমর তো নয়, মার কাজী, মার কাজী রব। কাজী মহাফাপড়ে পড়লেন। না, তবুও দমলেন না। আবার আরেকদল পাঠালেন। না, সে দলও ফিরল না। তাইতো এরা যাচ্ছে কোথায়?—

ভাবছেন কাজী। যাবে আর কোথায়? প্রাণ বাঁচাতে দলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু কাজীর আদেশ? আর কার আদেশ, কে মানে? চাচা আপন প্রাণ বাঁচা! কাজীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করলে চাকরী যাবে। যাক্, প্রাণটাতো বাঁচবে! আচ্ছা, এরা কীর্তন দলের হাতে ধরা পড়ছে না? না, ধরা পড়ছে না। কেন? উত্তর দিচ্ছেন বৃন্দাবন,

"অনন্ত অর্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহমাত্র কেহ নাহি জানে॥"

নাঃ, আর এভাবে থাকা যায় না। ঝালাপালা হয়ে গেল কান। জানও লবেজান। কাজী বাইরে এলেন। এসে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন। অসংখ্য লোক। অগণন মশাল। নবদ্বীপে এত লোকের বাস! এই প্রথম জানলেন কাজী। দিশাহারা হলেন। পলায়নই একমাত্র গত্যন্তর, কিন্তু পালাবেনই বা কোন পথে? সব পথেই তো ঐ কীর্তনীয়ার দল। হাজারে হাজারে। কাতারে কাতারে। তাহলে উপায়? উপায় অন্তঃপুর। অন্তঃপুরেই লুকোলেন কাজী।

গৌরচন্দ্র সবাইকে শান্ত হতে বললেন। কাজীকে ডেকে পাঠালেন। সন্ত্রস্ত কাজী সাহস পেলেন না বাইরে আসতে। তখন সান্ত্রী জানাল গৌরসুন্দরের নির্দেশে সবাই শান্ত। আশ্বস্ত হয়ে কাজী বাইরে এলেন। গৌরচন্দ্র বরাবরই কৌতুকপ্রিয়, বললেন, এ তোমার কেমন ব্যবহার, কাজী সাহেব? বাড়ীতে তোমার অতিথি। অতিথিকে অভ্যর্থনা না জানিয়ে অন্তঃপুরে লুকিয়ে রয়েছ? তুমি কাজিয়ত কর. তোমার কাছেই না আদব কায়দা শিখব?"

বাক চাতুর্যে কাজীও কম যান না। বললেন, "দেখ গৌরহরি, তোমার নানা নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সম্পর্কে আমার চাচা। কাজেই তুমি তো আমার ভাগনে গো। ভাগনে এসেছে মামার বাড়ীতে। সে অতিথি হতে যাবে কেন? মামার বাড়ী তো তারও বাড়ী। সে বাড়ীতে সে যখন খুশি আসবে। যেখানে খুশি সে বসবে। এতে আর কার কি বলার আছে? নিজের বাড়ীতে নিজে আসবে, এতে অভ্যর্থনারই কি আছে?"

নিমাই বললেন, 'যাক্, এখন আসল কথায় আসি। তুমি প্রশাসক। প্রশাসক কি কারুর ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেয়? অথচ তুমি সেই আঘাতই দিয়েছ। খোল ভেঙ্গেছ। এতেও ক্ষান্ত হওনি। কীর্তন বন্ধের ফতোয়া দিয়েছ। তোমার উদ্দেশ্য কি?"

কাজী বললেন, 'উত্তরটা গোপনে দিতে চাই। চল, একটু ভেতরে যাই।'

গৌরহরি দেখলেন এটা গণআন্দোলন। কথাবার্ত্তা খোলাখুলি সেই গণের সামনেই হওয়া প্রয়োজন। তাই বললেন, 'তুমি ভাবছ কেন, মামা। এরা আমারই গণ। তুমি খোলা মনে খুলে বল।' কাজী বললেন, 'দেখ এসব ধর্মীয় ব্যাপারে হাত দেবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিলনা। দুই দলের যাঁতা কলে পড়ে আমি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। মুসলমানরা বলল কীর্তন বন্ধ না করলে আমার ওপর অলা বাদশাহ্‌কে জানাবে। আবার ওদিকে হিন্দুরা এসে বলল তুমি যে সাধন-ভজনের পথ ধরেছ, তা নাকি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। হিন্দু শাস্ত্রে নাকি জপ আছে— উচ্চরোলে নর্তন কীর্তন নেই। এখন আমি যাই

কোথায় ? বন্ধ করতেই বাধ্য হলাম। তবে বিশ্বাস কর, গৌরহরি, আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাজটা করেছি। 'সরল মনে সত্য কথা বলছি কাজটা করেই মনে আমার বড়ই অশান্তি। কে যেন আমার বুকটা চিরে ফেলছে।'

নিমাই বললেন, 'তোমার অনুতাপের কথা শুনে তুষ্ট হলাম। অনুতাপে সব দোষেরই ক্ষালন হয়। তুমিও দোষমুক্ত হলে। এখন কথা দাও কীর্তনে আর বাধা দেবে না।'

কাজী হা হা করে উঠলেন, 'তোবা, তোবা, আর বাধা দিই ? আমি তো দেবই না, আমার বংশে যে বাধা দেবে, তাকেও আমি তালাক দেব।'

গণশক্তির কাছে শস্ত্র শক্তিহীন। শক্তিহীন রাজদণ্ড। কাজী জনগণের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা। অর্থাৎ মুণ্ডটি নিতে পারেন এক কোপে ! কিন্তু হৃদয় ? হৃদয় তো নিতে পারেন না। কাড়ি কাড়ি কড়ি দিয়ে লোককে কেনা গোলাম করে রেখেছেন। হৃদয় তো কিনতে পারেন নি। পারবেন কি করে ? হৃদয় যে কেনার বস্তু নয়। হৃদয় যে দেয়, সে জীবনও দেয়। সান্ত্রীদল হৃদয় দেয়নি কাজীকে। তাই জীবন বিপন্ন করল না কাজীর বিপদে, বরং বিপরীত কাজই করল তারা ; জীবন তারা বাঁচাল কীর্তনীয়াদের দলে ভিড়ে গিয়ে।

আর এদিকে বিজয়ী বিপ্লবী বিশ্বম্ভরের কি আছে ? শস্ত্র নেই, অর্থ নেই, নেই হাতে কোন প্রশাসন দণ্ড। আছে একমাত্র মহামন্ত্র নামের বল। এই নামের বলাধানেই তিনি হয়েছেন জন সমাজের হৃদয় রাজ্যের অধিপতি।

কাজী নবদ্বীপের অধীশ্বর. আর গৌরচন্দ্র নবদ্বীপজনের হৃদয়েশ্বর। তিনি রাজা নন -- রাজা থাকে নীচে। তিনি চন্দ্র। থাকেন ওপরে। ওপরে থেকে সবাইকে সমানভাবে আলো দেন। নদীয়া নগরে বিহার করেন কাজী সাহেব। সেটা তাঁর সান্ধ্য ভ্রমণ — বিলাস মাত্র। আর গৌরহরি বিহার করেন নদীয়ার ঘরে ঘরে। তাইনা তিনি নদীয়া বিহারী। হ্যাঁ, তিনি যান ঘরে ঘরে। নরে নরে। উচ্চ নীচ নেই। ছোট বড় নেই। নেই ধনী নির্ধন. সবার ঘরেই যান। আজকের আন্দোলনের জয় তো জনগণের জয়। তাই পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তিনি জয়তিলক পরাবেন জনগণভালে। সেই মিছিলের এখন ফেরার পালা। প্রথম কোন পাড়ায় প্রবেশ করল শোভাযাত্রা ?

"অনন্ত অর্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খ বণিক নগর॥"

এতে বণিক পল্লীতে কি হল ?

"শঙ্খ বণিকের ঘরে উঠিলা আনন্দ।
হরিবলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ॥"

এরপর ?

"আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে।"

ফল কি হল ? ধ্বনি উঠল বিজয়োল্লাসের :

"উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় কোলাহল।
তন্তুবায়ে সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥"

এরপর শচীসুত নির্দেশ দিলেন মিছিলকে, "চল শ্রীধরের ঘর।"

মিছিল এগিয়ে চলল শ্রীধরের ঘরের দিকে। শ্রীধরের ঘর? তাঁর ঘর আবার ঘর নাকি? ঘরের চাল ফুটো। তালি মারা। হোক। তবুও এই ঘরই গৌরসুন্দরের মনের মত ঘর। শ্রীধরের ঘরে গিয়েই গৌরহরি জলপান করতে চাইলেন। দ্বিধা-দীর্ণ শ্রীধর। তাঁর যে জলপাত্রই নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা লোহার কড়াই। সে কড়াইটাও ফুটো-ফাটা। তালিমারা। তাছাড়া, শ্রীধর যে ব্রাহ্মণের জল-অচল। জল-অচল? সে আবার কি? গৌরসুন্দরের কাছে সবাই চল। ভক্তিটাই আসল। বাকী সবই নকল। আর এই আসল বস্তুটাই আছে শ্রীধরের। তাই

"ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী নন্দন।
লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥
জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।
কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার॥"

এ দৃশ্য দেখে শ্রীধরের কি হল?

"মইলোঁ মইলোঁ বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
... ...
বলিয়া মূর্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর॥"

আর জলপান করে

"প্রভু বোলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥"

বৈষ্ণবের আহার্য গ্রহণ ও জলপানের যে একাধিক বিধি-নিয়ম আছে। এসব তো বাহ্যাচার। শুদ্ধাচার কোনটি? — না, একমাত্র অন্তরের ভক্তি। তাই

"যে সে দ্রব্য সে দ্রব্য সেবকের সর্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চায়॥"

এই জলপান দৃশ্য দেখে বৈষ্ণববৃন্দের কি হল? তারা কি বিধি-নিয়মের কথা স্মরণ করলেন? সংবাদ দিচ্ছেন বৃন্দাবন:

"ভক্ত বাৎসল্য দেখি সর্ব ভক্তগণ।
সভায় উঠিল মহা আনন্দ ক্রন্দন॥
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমেতে পড়িয়া॥
কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর।
মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর॥
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান।
কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম॥
জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর গরুড় কান্দে সর্বজন॥"

নদীয়া লীলায় কত বিচিত্র লীলা গৌরসুন্দরের। লীলা বৈচিত্র্যে প্রেমাবিষ্ট পার্ষদেরা গৌরচন্দ্রকে 'প্রভু' বলে। নিমাই নাম আর নাই। ভক্ত শুক্লাম্বরের সঙ্গেও প্রভুর এক পরম সুখকর লীলা। এ লীলা কি রকম? নদীয়া লীলায় অনুপম।

একদিন "বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর আবেশে।
ঝুলি কান্ধে করি বিপ্র নাচে কান্দে হাসে॥"

বিপ্র বলতে ঐ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। প্রভু কি করলেন?

আচম্বিতে "......হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতরে।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায়ে বিশ্বম্ভরে॥"

হায় হায় করে "শুক্লাম্বর বলে প্রভু কৈলা সর্বনাশ।
ও তণ্ডুলে খুদকন্ন বহুত প্রকাশ॥"

উত্তরে মৃদু হেসে "প্রভু বোলে তোর খুদ কন মুঞি খাঁও।
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঁও॥"

প্রশ্নটি— আহার্যের নয়, ভক্তির। দুঃশীল দুর্যোধনের রাজভোগ বাসুদেব গ্রহণ করলেন না। দীনভক্ত বিদুরের ভক্তিমাখা খুদে অমৃতের আস্বাদন করলেন। আনন্দোজ্জ্বল বদনে বললেন,

"দ্বারকার মাঝে খুদ কারি খাইল তোর।"

নগরের প্রতি পল্লীই মুখর হল আনন্দে। কেন? কাজীর যে দলন হল। ভয় গেল, জয় এল। তাইতো এত আনন্দোল্লাস — বিজয়োল্লাস।

না, নজির নেই। নজির নেই গোটা দেশটায় এই গণ আন্দোলনের। যথার্থই বলেছেন ডঃ সুকুমার সেনঃ "It was perhaps the first act of civil disobedience in the history of India." - ভারতের ইতিহাসে এটাই সম্ভবত প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন। আর এই আন্দোলনই সময়ের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে দিশারী দীপ শিখা হল গান্ধীজীর গণ আন্দোলনের। গৌরচন্দ্রের এই আন্দোলনকে মহাত্মাজী দেখেছেন এই চোখেঃ

"Ram Mohan and Tilak (leave aside my case) were so many pigmies who had no hold upon the people compared with Chaitanya, Shankar and Nanak."

— আমার কথা বাদ দিয়েই বলছি চৈতন্য, শঙ্কর ও নানকের সঙ্গে তুলনা করলে রামমোহন ও তিলক অতিক্ষুদ্র বামন জাতীয় ব্যক্তি। কারণ এরা জনগণমনে আসন পাততে পারেননি।

গান্ধীজীর ঐ যে 'hold upon the people" অর্থাৎ কিনা রবীন্দ্র কথায় জনগণমন অধিনায়ক হওয়া সম্ভবপর হয়নি রামমোহন ও তিলকের পক্ষেও। কেন? শুধু একটি বস্তুর বৈগুণ্যে। কি সে বস্তু? - না, একমাত্র প্রেমই সে বস্তু। চিরসুন্দর গৌর সুন্দরের এই যে কাজী বিজয়—এর মূলে রয়েছে একটিমাত্র— একমাত্র অস্ত্র— প্রেমাস্ত্র। যে কোন অস্ত্রই ব্যর্থ ও অব্যর্থ, দুইই হয়, কিন্তু প্রেমাস্ত্র অমোঘ সর্বকালে ও সর্বাবস্থায়। তবে অস্ত্রটি অতি দুর্লভ। কোটিতে গোটিক। যথার্থ বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "প্রেম সকলের হয়না। গৌরাঙ্গের হয়েছিল।" ড° দীনেশ চন্দ্র সেনের মুখেও— একই কথা: "প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল— তাহা বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য রূপে।"

ভক্ত ও ভগবান। উভয়েই তপস্যা করেন। ভক্ত চান ভগবানকে। আবার ভগবানও চান ভক্তকে। ভক্তের তপস্যাকে বলে সাধনা। আর ভগবানের তপস্যা হল করুণা। করুণায় ভগবান যতখানি অবতরণ করেন, সাধনায় ভক্তের হয় ততখানি উত্তরণ। তাই উভয়ের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান আর থাকে না। ঘটে মিলন। ভক্ত ভগবানের মিলন—মহামিলন।

সাধন ভজন পদ্ধতি প্রতি যুগে একরকম হয় না। যুগে যুগে তার পরিবর্তন। যুগের প্রেক্ষাপটেই এই পরিবর্তন। দিগদর্শন

করেছেন ভাগবত ঃ

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্তনাৎ॥"

— সত্যেতে ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞ ও দ্বাপরে অর্চনা দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে কেবল হরি সংকীর্তনে তা লাভ হয়।

ক্রান্তদর্শী পুরুষ বেদব্যাস। প্রতি যুগের পটভূমি প্রতিফলিত তাঁর চিত্ত দর্পণে। সত্যযুগে জটিলতা-কুটিলতা নেই, নেই কোন লোক সংঘট্ট, নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবন। তাই ধ্যানই প্রশস্ত এই যুগে। ত্রেতাতে এলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম। এলেন সরযূতট আলো করে অযোধ্যায়। বিরাট তাঁর রাজপাট। রাজধর্ম পালন করতে— করলেন যজ্ঞানুষ্ঠান।

দ্বাপরে এলেন লীলা পুরুষোত্তম। ব্রজেন্দ্র নন্দনরূপে যমুনা-পুলিনে ব্রজমণ্ডলে। লীলারস আস্বাদন করলেন সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের। অবশ্য এই তিনেরই নাভিমূলে রয়েছে দাস্য অর্থাৎ অর্চনার কস্তুরী।

আর সবশেষে কলিযুগ। জট-জটিলতা, কূট-কচালের জীবন। জীবের সময় বড়ই সঙ্কীর্ণ। ধ্যান মগ্ন হওয়া তো তার কাছে শশশৃঙ্গ। আর যজ্ঞ? যজ্ঞের আচার বিধি পালনও আয়াস সাধ্য। তেমনি আয়াস সাধ্য তার পক্ষে উপকরণ সংগ্রহ করে অর্চনা করা। তাই সবচেয়ে প্রশস্ত পথের সন্ধান দিয়েছেন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। কি সে পথ? —না, নাম সংকীর্তন। এটাই একমাত্র ধর্ম। সে ধর্ম নিজে পালন করে জীব শিক্ষার্থে কে

এলেন ? —

"কলিযুগে সংকীর্তন ধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু সর্ব পরিকরে॥"

আবার

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম।
হরিপুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

— শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য স্বীয় কৃষ্ণ বর্ণ লুকিয়ে ও রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু নিয়ে, যা আগের তিন যুগে দেওয়া হয়নি, সেই অমূল্য উন্নত উজ্জ্বল কৃষ্ণ প্রেমরস রূপ স্বভক্তি সম্পদ জীবকে দেবার জন্য কলিযুগে সুন্দর দ্যুতিমান হয়ে শচী-নন্দনরূপে এলেন। সেই গৌর সুন্দর আমাদের হৃদয় কন্দরে সর্বদা স্ফুরিত হোক।

নদীয়া সত্যি সত্যি সেই প্রেমরসে ভেসে গেল। কবি গাইলেন "শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়।" — ঠিক এই অবস্থা হল। সেই প্রেম মধু চক্রের সুধা নিজে পান করে পান করালেন গৌড়জনকে গৌরসুন্দর। শ্রীবাস অঙ্গনে পার্ষদবৃন্দ নিয়ে সংকীর্তন করলেন একটি বছর। অগণন গণের সঙ্গে কীর্তনানন্দ আস্বাদন করলেন নদীয়ায়। যেচে যেচে, নেচে নেচে, ঘরে ঘরে, নরে নরে, যারে তারে, জীবের জীবাতু যে কৃষ্ণ প্রেম, সেই কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করলেন। এই প্রেম বলেই না উদ্ধার করলেন জগাই

মাধাইকে। কাত করলেন কাজীকে এই নামের বলেই সার্বভৌম বলী হয়ে। আর এই নাম বলেই এক সূত্রে বাঁধলেন সহস্র জীবন। এই নামেই গাইলেন সাম্যের সামগান। যে সাম্যের গান গাইতেন মুরলীধর তাঁর মুরলীর তানে, যে তান টানতো সব গোপীকে সমানভাবে। সবাই বলত সমস্বরে :

"আর তো ঘরে রইতে নারি, কেমন করে প্রাণ।
কোন বিজনে ডাকছে আমার শ্যামের বাঁশির গান।"

সমানভাবে আকর্ষণ করতেন কি সেই বেণু বিনোদিয়া শুধু মাত্র গোপীদের? — না। তবে আর কাদের? উত্তর দিচ্ছেন ভাগবত :

"গাবশ্চ কৃষ্ণমুখ নির্গত বেণু গীত পীযূষ মুত্তভিত
কর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তন পয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি
দৃশাশ্রু কলাঃ স্পৃশন্তঃ॥"

— কোন গোপী বললেন, গাভীকুল শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বংশীগান অমৃত, কান খাড়া করে পান করতে করতে গোবিন্দকে নয়নপথে মনের মধ্যে আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের স্তন ক্ষরিত দুগ্ধ মুখে নিয়ে বৎসগণও অনুরূপভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ব্রজের সাম্যই আজ নদীয়ায়।

তবুও গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের এটি হচ্ছে গৌণ কারণ। তবে মুখ্য কারণ কি? সন্ধান দিয়েছেন স্বরূপ :

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো
যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"

শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কি রকম, আবার অদ্ভুত মধুরিমা যা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাই বা কি রকম, আর আমার মধুরিমার অনুভূতি থেকে শ্রীরাধারই বা কি সুখ হয়, এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ গৌরচন্দ্ররূপে শচীগর্ভ সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করলেন।

এই কথাটির ভাবটি বাসুদেব ঘোষ গেয়েছেন এইভাবে ঃ

"(যদি) গৌর না হইত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে'
শ্রীরাধার মহিমা প্রেমরস সীমা,
জগতে জানাত কে ?"

এই তিন বাঞ্ছার পূরণই মুখ্য উদ্দেশ্য। পূরণ হল কখন কিভাবে ? — না, পূরণ হল গম্ভীরা লীলায়। তবে এই বাঞ্ছাপূরণ বা ব্রজরস আস্বাদনের আরম্ভ নদীয়া লীলায়। তাই না রাস-বিহারী হলেন নদীয়া বিহারী। যিনি যশোদানন্দন, তিনিই শচী-নন্দন। বৃন্দাবন চন্দ্রই নবদ্বীপ চন্দ্র। তিনিই ইনি, ইনিই তিনি।

কিন্তু সেই কালাচাঁদ গোরাচাঁদ হয়ে এলেন কিভাবে নবদ্বীপে ? এলেন দণ্ডিত হয়ে। সে কি ! দণ্ডিত হয়ে। ভগবান দণ্ডিত হন— এ আবার কেমন কথা ? — হ্যাঁ, এ বড় মধুর কথা। ভগবানও দণ্ডিত হন, তাও আবার ভক্তের দ্বারা।

কি সে দণ্ড ? দণ্ডটি বড়ই কঠোর। একেবারে দ্বীপান্তর।

এমন দণ্ড কে দিলেন? কেমন সে অপরাধ?

দণ্ডদাত্রী রাইকিশোরী। চুরির অপরাধ করেছিলেন ঐ নবকিশোর নটবর, ঐ চতুরের শিরোমনি। চুরি করেছিলেন মাদনাখ্য মহাভাব, যে ধনে ধনী একমাত্র রাইধনি— একা একেশ্বরী।

আচ্ছা, এই ভানুবালা আর গোপবালাদের সঙ্গে নন্দলালার সম্পর্কটি কি রকম? অপরে আর কি বলবে? ব্রজেন্দ্র নন্দন নিজের সম্পর্কের কথা নিজেই বলেছেন শ্রীরাধাকে ঃ

"ব্রজবাসী যতজন
মাতাপিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণ সম।
তার মধ্যে গোপীগণ,
সাক্ষাৎ মোর জীবন
তুমি মোর জীবনের জীবন।"

জীবনের জীবন হলেন কি করে বিধুবদনী রাই বিনোদিনী? একদিন যমুনায় জলকে যেতে শ্রীমতী দেখলেন শ্যাম নাগরকে। অমনি 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।' প্রথম দর্শনেই প্রেম। পূর্বরাগ। ভারি মধুর।

সেই রূপতৃষ্ণাই তৃপ্ত করতে এলেন রাস বিনোদিয়া এক 'শরদ চন্দ পবন মন্দ/বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ" রাতে রাসস্থলীতে। রাসলীলা করলেন রাসবিহারী সরাধা গোপ রামাদের সঙ্গে। করলেন মধুর রসের— কান্তা প্রেমের আস্বাদন। গর্বিতা হলেন গোপবালারা। আর অমনি অদৃশ্য হলেন চিকন কালা। অনুতাপানলে

দগ্ধ হলেন ব্রজললনারা। আর তখনই ফিরে এলেন রসিক নাগর। হৃষ্ট হলেন গোপীরা। আবার ততখানি স্পৃষ্ট হলেন অভিমানে। তাঁদের কালাঠাকুর কতই না নিঠুর! কেন তিনি তাঁদের এত কষ্ট দেন? তাঁরা কি তাঁর কাছে কোন কৃপা চেয়েছেন? তাঁরা তো কিছুই চান না— নেনও না। শুধু দেন। কি দিয়েছেন? কি না দিয়েছেন? সবই তো দিয়েছেন। দিয়েছেন তাঁদের দেহ, গেহ, পতি, পুত্র, মান, লজ্জা, ভয়। তাঁদের নিজের বলে তো আর কিছুই নেই। আর এই চতুরের রাজাটি কি ত্যাগ করেছেন? ত্যাগ আর কোথায়? বংশীবটে এসে বংশীবাদন করেন। এতে লোকলজ্জা আর লোক ভয়ের কি আছে? তবুও কত নিঠুর তাঁদের প্রাণবল্লভ! না, আর সহ্য করা যায় না। এই নিঠুরালির একটা বিহিত ব্যবস্থা করতেই হবে।

শলা করলেন গোপীরা। শলার ফল কি? — না, প্রশ্নমালা। তিনটি প্রশ্ন সাজালেন তাঁরা। প্রথম প্রশ্ন: এক রকমের লোক আছেন যাঁকে ভালবাসলে ভালবাসেন, দ্বিতীয় প্রশ্ন: আরেক রকমের লোক আছেন ভাল না বাসলেও ভালবাসেন, তৃতীয় ও শেষ প্রশ্ন: আবার আরেক রকমের লোক আছেন ভালবাসলেও ভালবাসেননা, ভাল না বাসলেও ভালবাসেননা। এত তো চতুরালি শিখেছে। দিক এবার উত্তর। একটা না একটায় ধরা পড়তেই হবে।

মাধুর্যের ধুর্য চাতুর্যেও কম যান না। উত্তর দিচ্ছেন শ্যামচাঁদ প্রশ্ন ক্রম বজায় রেখে: যিনি ভালবাসলে ভালবাসেন, তিনি

ব্যাপারী। তাঁর ভালবাসা স্বার্থগন্ধী। আর যাঁরা প্রত্যাশা না করে ভালবাসেন, তাঁদের ভালবাসা নির্মল, তবে উপাধি মুক্ত নয়। যেমন, মায়ের ভালবাসা তাঁর সন্তানের জন্য। এই উপাধি আবার চার রকম: রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য ও সম্বন্ধ।

আর সবশেষে হচ্ছে যিনি ভজলেও ভজেন না, না ভজলেও ভজেন না। এঁরা আবার চার রকম: আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও দ্রোহী। যাঁরা আত্মানন্দে থাকেন, তাঁদের তো কোন কর্মই নেই। — 'আত্মন্যেব য সন্তুষ্ট স্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।' আপ্তকামের তো যোগসিদ্ধিই লক্ষ্য। তৃতীয় হচ্ছেন অকৃতজ্ঞ। সর্বৈব অনুভূতিহীন। শেষজন হচ্ছেন দ্রোহী। অকৃতজ্ঞের তলায় ইনি। গোপীরা এবার আসল কথাটি বললেন— মুখে নয়, চোখে। ঠারাঠারি বুঝেই সোচ্চার হলেন চতুর শিরোমণি: 'নাহং নাহং তু সখ্যঃ।'

'নাহং নাহং' বলে না হয় নাগর সাফাই গাইলেন; কিন্তু তাঁর প্রেমের রীতি তো বোঝা গেল না। দয়িতাকে চোখের জলে ভাসিয়ে চোখের বাইরে চলে যান। কৃষ্ণচন্দ্রের এ এক অভিনব প্রেম। কান্তা প্রেম হচ্ছে মাধুর্য রস—বরিষ্ঠতম রস— 'শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।' কেন? দয়িতা যখন দয়িতের অঙ্গ সঙ্গ লাভ করেন, তখন তাঁর জ্ঞানেন্দ্রিয় হয় সক্রিয়, আর অন্তরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়। ফলে প্রেম হারায় তার তীব্রতা ও নিত্য নবীনতা। আর দয়িত যখন অন্তরালে চলে যান, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ করে না, সজাগ হয় অন্তরিন্দ্রিয়। আকুতি আকুলতা জাগে, প্রেম ঋদ্ধ

হয় তীব্রতায় ও নবীনতায়। তাই কালিয়া বঁধুর এই অভিনব ভজন। ভজন? --হ্যাঁ ভজন। কিন্তু তিনি যে স্ববদনে এই ভজনের কথা গেয়েছেন গীতায়ঃ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।' এখন যদি অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যান, তাহলে তো তাঁর ঐ প্রতিজ্ঞা বাক্য ঠিক থাকে না। অথচ তাঁর আরেক নাম অচ্যুত। তাঁর কি কথার, কি কাজের কোন চ্যুতি বা পরিবর্তন নেই। তাই না তিনি অচ্যুত।

তাহলে এখন তিনি কি করবেন? তাই ঘাট স্বীকার করলেনঃ

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্ব সাধুকৃত্যং
বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন দুর্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

"ন পারয়েঽহং"— 'না, আমি পারলাম না।' কি পারলেন না? ঋণ পরিশোধ করতে পারলেন না। কার কাছে এই ঋণ? — কেন, গোপীদের কাছে, বিশেষ করে গোপীঠাকুরানীর কাছে। ঋণী তো বটেই। সত্যিই তো সগোপী রাধা যা দিয়েছেন, শ্যাম-চাঁদ কি তাঁদের তা দিতে পেরেছেন? বড়ই দুরুহ সমস্যা। বড়ই দুর্ভাবনায় পড়লেন নবকিশোর নটবর। ভাবতে ভাবতে পথ খুঁজে পেলেন। হ্যাঁ, তিনি অনৃণ্য লাভ করবেন, যদি ভক্ত হতে পারেন। না, না, যে সে ভক্ত না। ভক্ত শিরোমণি হতে হবে তাঁকে? কে সেই ভক্ত শিরোমণি? সেই ভক্ত শিরোমণি হচ্ছেন রাইধনি। একমাত্র রাধারানীর মধ্যেই না আছে মাদনাখ্য মহাভাব। যেমন,

"সর্ব ভাবোদ্গমল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনী সারো॰ রাধায়ামেব যঃ সদা॥"

সাধন সরণী বড়ই দীর্ঘ। প্রথমে রতি। রতি সঞ্চার করে প্রেম। প্রেম থেকে সঞ্জাত হয় স্নেহ। এরপর পর্যায়ক্রমে উত্তরণ ঘটে মান, প্রণয় ও রাগে। রাগ ঋদ্ধ হয় অনুরাগে। অনুরাগ পরিপক্ক হয় ভাবে। ভাব গাঢ়তা লাভ করে মহাভাবে। একমাত্র গোপীরাই এই মহাভাব ধনে ধনী। মহাভাবের উত্তরণ ঘটে মাদনাখ্য মহাভাবে, যে ধনে ত্রিভুবনে একমাত্র ধনী রাইধনি। হ্লাদিনী শক্তির চরমতম ও পরমতম প্রকাশ হচ্ছে এই মাদনাখ্য মহাভাব।

এই ধনে ধনী হয়ে যদি তিনি ভক্তের রূপে এসে শ্রীরাধার মহিমা জগতে জানাতে পারেন, তবেই রাই ঋণ শোধ হবে। তাই নন্দলালা প্রার্থী হলেন ভানুবালার কাছে। রাইকিশোরী মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি সত্যি সত্যি রসিকনাগর। মহাজনের টাকায় মহাজনের ঋণ শোধ করতে চাও? তা কি কখনো হয়? আমি কি করে দেব?'

মরিয়া হয়ে নন্দ নন্দন বললেন, 'তাহলে যদি চুরি করি?'
— 'দণ্ড পাবে।' — ভানুনন্দিনী সাফ জবাব দিলেন। সব চাতুর্যই যখন ব্যর্থ হল, তখন অব্যর্থ পথ হল চৌর্য। দণ্ডও হল চরমতম : দীপান্তর। নয় দ্বীপের সমাহার নবদ্বীপে হলেন দ্বীপান্তরিত। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু নিয়ে বৃন্দাবন চন্দ্র এলেন নদীয়ায় নবদ্বীপ চন্দ্র হয়ে। কালাচাঁদ হলেন গোরাচাঁদ। শ্যাম

সুন্দর হলেন গৌরসুন্দর।

কান্তাপ্রেমের আস্বাদন হয়েছিল লীলা পুরুষোত্তমের ব্রজধামে। তারপর এতকাল এই প্রেম ছিল গ্রন্থেই গ্রথিত। আস্বাদনের প্রক্রিয়া ও আনন্দানুভূতি আর কেউ প্রকাশ করতে পারেন নি। পারলেন কে? — না, সেই লীলা পুরুষোত্তম যখন প্রেম পুরুষোত্তম হয়ে এলেন গৌরসুন্দর রূপে নদীয়ায়। অবশ্য চরমতম আস্বাদন গম্ভীরালীলায়, যে লীলার কথা যথাস্থানে আলোচ্য।

দ্বিবিধ ভাবের প্রকাশ গৌরচন্দ্রের মধ্যে। কখন ভক্ত, কখন ভগবান। প্রবলভাবে প্রকট হলেন শ্রীবাস গৃহে ভগবান রূপে।

গ্রীষ্মকাল। বেলা দ্বিপ্রহর। শ্রীবাস যথারীতি তার ঠাকুর ঘরে আছেন। পুজোয় বসেছেন। তাঁর ইষ্ট বস্তু শ্রীনৃসিংহ-দেব। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। পুজোয় ব্যাঘাত। শ্রীবাস কিঞ্চিৎ বিরক্ত। দরজা খুলেই দেখেন দাঁড়িয়ে আছেন গৌরহরি। বাক্য ব্যয় না করে গৌরসুন্দর বিষ্ণুখট্টার শালগ্রাম সরিয়ে একপাশে রাখলেন। আর খট্টায় উপবেশন করলেন স্বয়ং। স্তম্ভিত হলেন শ্রীবাস আর তাঁর তিন ভাই শ্রীপতি, শ্রীরাম ও শ্রীনিধি। স্তম্ভিত আর সবাই। বিস্মিত হবেন বৈকি। এতকাল যে তাঁরা নিমাইকে দেখে এসেছেন ভক্তভাবে। নিত্যানন্দ এলেন। এলেন গদাধর। এঁরাও বিস্মিত। কই, এর আগে তো নিমাইয়ের এভাব দেখা যায়নি। আজ তাঁরা কি ভাব দেখছেন! তবে কি তিনিই ইনি? — হ্যাঁ, ঠিক তাই নিশ্চিত হলেন সবাই। না, আর দ্বন্দ্ব-ধন্দ নয়। কলিযুগে প্রেম পুরুষোত্তম হয়ে এসেছেন ব্রজের প্রেমরস

আস্বাদন করতে আর তা বিতরণ করতে নাম কীর্তনের মাধ্যমে।

গৌরহরির মস্তকের চারদিকে এত জ্যোতি এল কোত্থেকে? আর ঘরটিও তো আলোয় আলোময়। শত সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। না, আর কিসের দ্বিধা, কিসের সংশয়। নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের শিরে ছত্র ধারণ করলেন। শ্রীকরে তাম্বূল দিলেন গদাধর। আরেক ভক্ত চামর ব্যজন করতে লাগলেন। এমন সময় বিশ্বম্ভর জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'শ্রীবাস আমার অভি-ষেকের ব্যবস্থা কর।' অমনি শ্রীবাসের ভাইয়েরা ছুটলেন লোকজন নিয়ে গঙ্গাজল আনতে। নতুন ঘট কেনা হল। একশটি। সেই ঘটে জল আনা হল গঙ্গা থেকে। মহাস্নান পর্ব চলল। সঙ্গে পাঠ করা হল পুরুষসূক্ত মন্ত্র। এরপর পরিধান করান হল নব বস্ত্র। পরিধান করান হল পুষ্পালঙ্কার— হাতে, গলায়, কানে মাথায়। ধূপদীপ, গন্ধপুষ্প, নৈবেদ্যাদি দিয়ে ষোড়োশোপচারে পুজো করা হল। পুজো শেষ হল। গৌরসুন্দর বললেন, 'এখন তোমরা বর প্রার্থনা কর।' না, ভক্তরা টাকা পয়সা, ধন-দৌলত, মান, যশ, প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই চাইলেন না। চাইলেন শুধু অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি।

এরপর গৌরহরি স্মরণ করলেন শ্রীধরকে। বললেন, 'যাও, শ্রীধরকে এখানে নিয়ে এস। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই পরম ভক্তটি আপন মনে আপন গৃহে কীর্তন করে চলেছে।'

তড়িৎ বেগে ছুটলেন ভক্তেরা। একেবারে মাথায় করে নিয়ে এলেন শ্রীধরকে। আনবেন না? ভগবান যাঁকে চান, তাঁর মত

ভাগ্যবান আর কে? তাঁকে তো শিরেই ধারণ করতে হবে। নিমাইয়ের এই অভিনব ভাব দেখে শ্রীধর বিস্মিত হলেন। তাইতো, তিনি এ কোন্ নিমাইকে দেখছেন। কলার খোলা মোচা নিয়ে কতই না খুনসুটি করেছেন নিমাই, কিন্তু আজ এ কোন্ নিমাই? তিনি যেন দেখতে পেলেন তিনি বৃন্দাবনে আছেন। বেণুধর বেণুধ্বনি করছেন, দক্ষিণে রয়েছেন বলরাম। নিত্যানন্দ ছত্রধর ধরে আছেন? — না, না, অনন্তদেব স্বয়ং শত সহস্র ফণা বিস্তার করে ছত্রাকারে বিরাজ করছেন। এ এক দিব্য দৃশ্য। ব্রহ্মা, শিব, সনক, নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব আরও কত ঋষি, কত দিকপাল, লোকপাল স্তব-স্তুতি করছেন। না, শ্রীধর আর ঠিক থাকতে পারলেন না। সংজ্ঞা হারালেন। গৌর স্পর্শে জ্ঞান ফিবে পেলেন।

গৌরহরি বললেন, 'শ্রীধর, তুমি আমার স্তব কর।' শ্রীধরেব নয়নে তখন আষাঢ়ের আসার। কণ্ঠ রুদ্ধ। তবুও অতি কষ্টে বললেন, 'প্রভু, আমি মূর্খ। স্তব-স্তুতি জানিনা।'

গৌরসুন্দর আবার বললেন, 'আমি বলছি তুমি চেষ্টা কর। নিশ্চয়ই পারবে।' কৃপায় কি না হয়। 'মূকং করোতি বাচালং।' মূকও মুখর হয়। হলও তাই। এই তো শ্রীধর বলতে আরম্ভ করলেন, 'তুমি নিত্য, নিরঞ্জন, সনাতন। তুমি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি কর, বিষ্ণুরূপে পালন কর, শিব রূপে সংহার কর।' শুধু কি শ্রীধরেরই মূক মুখ মুখর হল?

"মধু কণ্ঠ হইল সর্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায়, সেই হইল গায়ন॥'

শ্রীধরের স্তবে তুষ্ট হলেন গৌরহরি। বললেন, 'শ্রীধর, আমি তোমাকে বর দেব। বল কি চাই তোমার? সাম্রাজ্য চাই তো, সাম্রাজ্যই পাবে, অথবা অষ্ট সিদ্ধি, বা ইন্দ্রত্ব— যা চাও, তাই পাবে।' রোদনভরা কণ্ঠে শ্রীধর বললেন, 'প্রভু, আমি কিছুই চাই না। তুমি বিষ্ণু সেবার জন্য আমার কলাপাতা, মোচা, থোড় কেড়ে নিয়ে কত রঙ্গ করেছ। সেই তুমি জন্মে জন্মে আমার প্রভু হও। আমি তোমার চরণ সেবা করে ধন্য হই।'

গৌরহরি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে বললেন, 'তথাস্তু।' ভক্তেরা জয়ধ্বনি দিলেন। সপ্ত প্রহর পর চিরসুন্দর গৌরসুন্দর তাঁর মহৈশ্বর্যের মহাপ্রকাশ সংবরণ করলেন। তখন নিমাই আগের নিমাই হয়ে গেলেন। স্মৃতির রেশ টেনে বললেন, 'আচ্ছা, আমি কতক্ষণ এখানে আছি? আমি কি কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করেছি?''

ভক্তেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ঠারা ঠারি হল। বললেন, 'না, না, কোন চপলতা তো দেখাওনি।' নিমাই নিজ গৃহে চলে গেলেন। ভগবান ভাব থেকে ভক্তভাবে ফিরে এলেন নিমাই।

যীশুখ্রীষ্টও কখনও ভগবদ্ভাব, আবার কখনও ভক্তভাব উপলব্ধি করতেন। যেমন, ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট যীশু বলছেন,

"I and my Father are one."

আবার ভক্তভাবে বলছেন,

"I came forth from my Father, and come into the

world, And I leave the world and I go to the Father."

ভক্ত গৌর আর ভগবান গৌরের মধ্যে ব্রজলীলার কি পেলাম? পেলাম গৌর ভক্তদের মধ্যে গোপী প্রেম। কি রকম সে প্রেম? — না, সে প্রেম ঋদ্ধি যিনি লাভ করেন, তিনি তাঁর ইষ্ট বস্তুর কাছে কিছু চান না, শুধু দেন। কি দেন? কি না দেন? তাঁরা দেহ, গেহ, মান, লজ্জা, ভয় সব কিছু তাঁরই চরণে নিবেদন করেন। গোপী প্রেম লাভ করেছেন গৌর ভক্তেরা। তাইতো ভগবান গৌর যখন বর দিতে চাইলেন, ভক্তেরা কিছুই চাইলেন না। শুধু চাইলেন অহৈতুকী ভক্তি। লীলাকথা শুধুমাত্র গ্রন্থে গ্রথিত রইল না। বাস্তব রূপ পেল গৌরসুন্দরে। শ্যামসুন্দরই গৌরসুন্দর হয়ে এলেন। ব্রজের সেই লীলাপুরুষোত্তমই নদীয়ায় লীলা করলেন প্রেম পুরুষোত্তম হয়ে।

কিন্তু ব্রজরসের বাস্তব আস্বাদনের কি হল? — না, সেই রসও আবদ্ধ রইল না শুধুমাত্র গ্রন্থে। অপরাধ ক্ষালনের জন্য এবং আনৃণ্য লাভ করার জন্য গৌরসুন্দর বাস্তবে সেই রসের আস্বাদন করলেন যাতে "শ্রীরাধার মহিমা / প্রেমরস সীমা" তিনি জগতে জানাতে পারেন। এই রসাস্বাদনে গৌরহরি কি হলেন? এতক্ষণ তো ছিলেন ভক্ত গৌর ও ভগবান গৌর। এখন কি হলেন? এখন হলেন অন্তঃ কৃষ্ণ, বহিঃ রাধা। রাধাভাবে প্রকট হলেন। কৃষ্ণ আর কৃপাময় রইলেন না। হলেন প্রাণবল্লভ। এখানেও ভাব দ্বিবিধ। কখনও 'হা রাধা হা রাধা' বলে বিলাপ করে বুক ভাসাচ্ছেন, আবার

ভাবান্তর হলে 'হা কৃষ্ণ, 'হা প্রাণগোবিন্দ' বলে কেঁদে আকুল হচ্ছেন। কারোর সঙ্গে কথা বলছেন না। নিকটে থাকছেন নিত্যানন্দ। অঙ্গ সঙ্গী গদাধর। আর আছেন নরহরি ও বাসু ঘোষ। কথা কইতে ভাল লাগছে না। অশন, বসন ও শয়নও অনিয়মিত। চোখের তারা ক্ষণে ক্ষণেই স্থির হয়ে যাচ্ছে। ক্ষণে হাসছেন, ক্ষণে কাঁদছেন, যেন

"বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে॥
না চলে নয়ন তারা॥

এ ভাব দেখে মুরারী গুপ্ত গাইলেন,

'গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণগান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য না জানে।
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে॥"

ব্রজের সেই অষ্টবিধ নায়িকার ভাবের রসাস্বাদন করছেন গৌরসুন্দর। যেমন উৎকণ্ঠিতা নায়িকার ভাবে ভাবিত হলেন। বার বার ঘর-বাহির করছেন। দোষারোপ করছেন বিধিকে। দয়িত আর আসবেন কি? —বিধিই যে বাম। তাহলে কালার পিরিতি আমায় দিল কেন? যামিনীর মধ্য যাম যে পার হয়ে গেল। কখনো পুরুষোত্তমকে বলছেন, 'যা, যা সখি দেখে আয়— ঐ বুঝি এল আমার শ্যামরায়।' পুরুষোত্তম আশ্বাস দিয়ে বলছেন, আসবে গো,

আসবে তোমার রসিক নাগর। অত অধীর হচ্ছ কেন?' এই ভাবটার কিঞ্চিৎ প্রকাশ জ্ঞানদাসের কলমে ঃ

'কি লাগি গৌর মোর।
নিজ রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পুরুব দুখ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজরসে ভেল ভোরা॥

আবার কলহান্তরিতা নায়িকার ভাবরসও আস্বাদন করে দেখালেন গৌরসুন্দর। এই অবস্থার পূর্বাবস্থা হচ্ছে খণ্ডিতা অর্থাৎ প্রতি নায়িকার কাছ থেকে প্রভাতকালে নায়ককে আসতে দেখে রুষ্টা, আর সেই খণ্ডিতার আশ্রয় হচ্ছে মান। সে মান কি যে সে মান— দুর্জয় মান। সেই মানে নায়ককে ফিরিয়ে দিয়ে এখন অনুতপ্তা। এই অবস্থাটি সোনার কলমে ধরেছেন নরহরি। যেমন,

'কণক চম্পক গোরাচাঁদে।
ভূমেতে পড়িয়া কেন কান্দে॥
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি।
কে করিল আমারে বাউরি॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥

কহে ধিক বিধির বিধানে।
এমত ঘটনা করে কেনে॥
কোনভাবে কহে গোরা রায়।
নরহরি সাধিয়া বেড়ায়।"

রাসলীলাও আস্বাদন করলেন গৌরহরি। ব্রজ রস আস্বাদনের এটি হচ্ছে পরমতম ও চরমতম রস। রাসস্থলীর রাসলীলা গোবিন্দদাস এঁকেছেন এইভাবে ঃ

'শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত মধুকর ভোরনি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যামমোহন মদনে মাতি
মূরলি গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরনি॥"

আর নবদ্বীপের গোরাচাঁদের রাসলীলার চিত্র আঁকলেন বাসু ঘোষ ঃ

'বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপীগণ অনুমান॥
খোল-করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥

বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ॥"

এই রসাস্বাদনের পূর্ণতা কোথায়? —না, নীলাচলে গম্ভীরায়। এক নয়, দুই নয়, দীর্ঘ-সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সেই আস্বাদন লীলা। এসব কথা যথাস্থানে আলোচ্য।

এহেন অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত জীবের অনীহা। যুগল কিশোর প্রেম এতকাল ছিল বিসদৃশ ধারণায় বিকৃত। নিজ আচরণে গৌরসুন্দর সেই প্রেমের উত্তরণ ঘটালেন অমা থেকে প্রমায়। তার অনাঘ্রাত সৌরভে চারদিক করলেন আমোদিত। যেমন রায় বসন্ত গাইছেন:

"আলো ধনি সুন্দরি, কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিলন মোর পুণ্য পুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দ মন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছা কল্পলতা মোর কামনা মূরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ধাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধানাম॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥"

রায়ের এই গানটির ভাষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ এইভাবে:
"এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোনপদে প্রকাশ

পাইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহার কয়টি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন— তুমি আমার কামনার মূর্ত্তি, আমার মূর্ত্তিমতী কামনা— অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছ মাত্র, ইহা কি সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্ত হয়: না; তুমি তাহারও অধিক— তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই— না শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব্বশরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে। তুমি সেই প্রাণ, রায় বসন্ত কহিলেন না, তুমি তাহারও অধিক, তুমি প্রাণেরও গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ। তুমি আছ বলিয়াই প্রাণ আছে। ঐ যে বলা হইয়াছে "মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি", ইহাতে হাসির মাধুর্য্য কি সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে। বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, সুদূর বাঁশির ধ্বনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়। পদ্ম মৃণাল কাঁপিয়া সরোবরে একটুখানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখানি হাসি— অতি মধুর, অতি মৃদু, একটি হাসি মরমে আসিয়া লাগিতেছে, বাতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে। হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত— প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।"

এই ভাবে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে, জয় রাধে জয় রাধে বলে,

স্বীয় মননে ও আচরণে রাই প্রণয় মহিমা জগতে জানালেন। আর কি করলেন? --না, রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা প্রকাশ করলেন কলিহত জীবের মধ্যে।

এখন সেই জটিল প্রশ্নটি যা দেখা দিয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। —অর্থাৎ নিমাই কেন গৃহত্যাগ করলেন: কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে গেলেন? পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই বলেছেন, 'কি ছার সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।' আবার তিনিই নিত্যানন্দের জীবনে পালা বদল করালেন। এ সবই পরের কথা। আগে বলতে হচ্ছে সূত্রাকারে প্রশ্নটির নিরাকরণের জন্য। তিন তিনবার পালা বদল। গৃহে ছিলেন হাড়ো পণ্ডিতের ছেলে। নাম ছিল কুবের। সন্ন্যাসাশ্রমে এসে হলেন নিত্যানন্দ। গৌরসুন্দরেরই এষণায় ও প্রেরণায় ফিরলেন গৃহাশ্রমে। হ্যাঁ, বিপ্লবাত্মক এই আশ্রম পরিবর্তন। যে পার্ষদবৃন্দ তাঁর নিত্য কীর্তন সঙ্গী, তাঁদের অনেকেই গৃহী, বিশেষকরে পঞ্চতত্ত্বের দুই তত্ত্ব অর্থাৎ অদ্বৈত ও পণ্ডিত শ্রীবাস। আচার্যের তো বিরাট সংসার: দুই স্ত্রী সীতা দেবী ও শ্রীদেবী। সাত পুত্র। কই, গৃহ তো এঁদের জীবনে ভজনপথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায় নি। ব্রজধামে গোপীরা কি গৃহিনী ছিলেন না? গীতার কর্মযোগে তো প্রকারান্তরে সন্ন্যাসবাদকে অগ্রাহ্যই করা হয়েছে। শান্তিপুরে সে কি মর্মস্পৃক্ দৃশ্য! 'কোথায় গেল আমার নিমাইয়ের চাঁচর কেশ। কোথায়ই বা গেল আলো ঝলমল বেশ। এ আমার কোন্ নিমাই'— বলেই সংজ্ঞাহারা হলেন শচীমাতা।

মায়ের এই বিসদৃশ ও বিবশ অবস্থা দেখে আর নিজেকে

ধরে রাখতে পারলেন না নিমাই। মায়ের ছেলে মায়ের কোলেই ফিরে যেতে চাইলেন। বললেন 'মা,॰ সমাজের নিন্দা গ্রাহ্য করি না। নিয়ম-বিধান মানি না। তুমি শুধু একবার আমাকে ঘরে ফিরে যেতে বল। আমি এক্ষুনি, এই তোমার সঙ্গেই ফিরে যাচ্ছি।'

তাছাড়া নিমাই তো একথাও বুঝতে পারছিলেন তাঁর পিতৃদেব গতাসু হয়েছেন। তাঁর দাদা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হয়েছেন নিরুদ্দেশ। সংসারে পুরুষ বলতে তিনি একা। 'সাত নয়, পাঁচ নয়, আমার 'একেলা কানাই'য়ের মত তিনিও 'একেলা' নিমাই। বংশ রক্ষা বলে একটা কথাও তো আছে। কুলরক্ষা যে এক গুরুভার কর্তব্য। বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না— এ কথা কেউ ভাবতে পারে?

তবুও নিমাই সংসার ত্যাগ করলেন? কেন? তাহলে গৌরচন্দ্রেরই একটি হেঁয়ালি দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। কি সে হেঁয়ালি? —না,

"করিলুঁ পিপ্পলীখণ্ড কফ্ নিবারিতে।
উলটিয়া আরও কফ্ লাগিল বাড়িতে॥"

সমাজের কোন্ চিত্র দেখে গৌরচন্দ্র এই হেঁয়ালিটি বেঁধেছিলেন? সাম্যের সামগান গাইলেন নাম কীর্তনের মাধ্যমে। সমাজে যারা জল-অচল, নিজে অযাচিতভাবে তাদের ঘরে গিয়ে স্বেচ্ছায় নিজ হাতে জল পান করে তাদের করলেন জল-চল। অহৈতুকী ভক্তি বিতরণ করলেন অকাতরে। নাম কীর্তনের মাধ্যমে ব্রজরস আস্বাদন করলেন নিজে। সবটাই নিজে করলেন, মুখে নয়, কাজে! 'আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সবারে"— স্বীয় উক্তির প্রমাণ দিলেন।

তবুও তো সবাই কৃষ্ণ নাম নিল না। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের দল এবং আরও কত জনই যে রইল ভিন্ন মেরুতে। তাহলে তো জনসমাজে বিবাদ-বিচ্ছেদের সমাধান হল না। এই যে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা— এ তো সমাজ দেহে এক দুষ্ট ক্ষত। এ ক্ষত যে ক্ষয়-ক্ষতি করবে দেহের অন্যান্য অঙ্গেরও। তাই এর নিরাময় বড়ই প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে এই বিবাদ-বিভেদ আসে কোন ইন্দ্রিয় থেকে? —না, অন্তরিন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় অহংকার থেকে। অহং এর কলুষ থেকে জীব কিভাবে মুক্ত হয়? —না, চোখের জলে। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।'

তাই গৌরসুন্দর স্থির করলেন নিজে কেঁদে, নিজ জনকে কাঁদিয়ে জগতকে চোখের জলে ভাসাবেন। তবেই তারা কলুষমুক্ত হবে। তখন তারা এক নামের চন্দ্রাতপ তলে একাসনে বসবে।

অনবদ্যাঙ্গ যুবাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ। নাক তাঁর তিল ফুলের চেয়েও সুন্দর। সুন্দর তাঁর আয়ত নয়ন যুগল। ওষ্ঠাধর হিঙ্গুলের রঙে রাঙা। বর্ণ কাঁচা সোনার মত। নধর কান্তি। চাঁচর কেশ কলাপ। আর মাথায় ছ ফুটের ওপর 'সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।' ঘরে আছে তাঁর রূপঋদ্ধা ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া। আবার গৌর সুন্দর পাণ্ডিত্যে বরিষ্ঠ। তাই তাঁর টোলও এনেছে আর্থিক আনুকূল্য।

এহেন গৌরচন্দ্র যখন ঝলমল পট্টবস্ত্র পরে কীর্তন করেন,

তখন তো তাঁকে অন্যান্য বিষয়ী লোক থেকে আলাদা করা যায় না। তাহলে তিনি কি ত্যাগ করিলেন? তাহলে তো তিনি ত্যাগী নন। তিনি তো ভোগী। এহেন পুরুষ যতই মুখে নামকীর্তন করুন, তাঁকে দেখে মানুষের মন গলবে না।

লোক চরিত্র বড়ই বিস্ময়কর। পাঁচশ বছর পরেও একই রকম। সে লোক দেশীই হোক, আর বিদেশীই হোক। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম। এখানে এলেন এক ফরাসী ভদ্রলোক। আশ্রম দেখছিলেন। দেখাচ্ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের গুণকীর্তন শুনে তিনি হঠাৎ মন্তব্য করলেন: 'But he looks smug.' স্বামীজীর নধর কলেবর এবং মুখাবয়বে তৃপ্তির নিদর্শন দেখেই এই মন্তব্য।

কাজেই মন না গললে কি চোখে জল ঝরে? বৈষ্ণবের যে বড় গুণ ত্যাগ, কিন্তু গৌরসুন্দর কি ত্যাগ করলেন? কামিনী রইল, কাঞ্চন রইল, পাণ্ডিত্য রইল, রইল মান যশ। এ সবই যদি রইল, তাহলে তিনি 'জগদ্ধিতায়' কি করে অগ্রসর হবেন? বৈষ্ণবের এ সবই যে মায়ার নিগড়। সেই নিগড়ে পা দুটো ছিল বাঁধা। বৃহৎ জগৎ পথে তিনি পা বাড়াবেন কি করে?

গৌরসুন্দর একটি পরিবারভুক্ত। তাঁর একটা কুল পরিচয় আছে। শ্রীহট্টের মধুকর মিশ্রের মধ্যম পুত্র উপেন্দ্র মিশ্র। উপেন্দ্রের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ মিশ্র। সেই জগন্নাথেরই দ্বিতীয় পুত্র গৌরসুন্দর। তাঁর একটা জাতি গোত্র আছে। সেটা কি? — না, বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁর একটা নিবাস আছে। নিবাসটি

নবদ্বীপে। যিনি 'জগদ্ধিতায়' নিখিল বিশ্বে চলিষ্ণু হবেন, তাঁর পক্ষে তো এই নির্দিষ্ট পরিবার, বিশিষ্ট কুল, উপাধিযুক্ত জাতি গোত্র এবং নির্দিষ্ট নিবাস নিঃসন্দেহে নিগড়মালা রচনা করে।

নিজে মুক্ত না হলে কি অপরকে মুক্ত করা যায়? তিনি তো এক বিশেষ দলভুক্ত হয়ে পড়বেন। পারিবারিক জীবন যে সৃষ্টি করে একের পর এক বন্ধন। পুত্রের প্রতি কর্তব্য, কলত্রের দায়িত্ব আর কন্যার দায় থেকে মুক্ত হতে হতে জীবন রবি পাটে বসবে। আর কখন তিনি ভাববেন দশের ভাবনা, দেশের ভাবনা, বিশ্বের ভাবনা? ঘরের মা-ই-তো তাঁর একমাত্র মা নন। সেটা তাঁর কুলগত পরিচয়। বিশ্ব মাতৃত্বই যে আজ তাঁকে কোল দিতে চাইছেন। তাকে তিনি ফেরাবেন কিভাবে? তিনি যে জেনেছেন 'ভূমৈব সুখম। নাল্পে সুখমস্তি।' আরও যে জেনেছেন 'দেশে দেশে আছে মোর ঘর।' মায়াপুরের ঘর তো মায়া মাত্র! বন্ধন। নিবিড় বন্ধন। পায়ের বেড়ি। হাঁটতে দেয় না। তাঁকে যে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে ভবেরহাটে। যেতে হবে সেই বিশ্ব মেলায়-- মেলা লোকের মেলামেশায়। তবেই না হবে মেল বন্ধন। প্রেম বন্ধন। আর এই প্রেমই আনবে মানুষে মানুষে প্রিয়তা বোধ— যোজন দূরে চিরতরে চলে যাবে বিবাদ-বিভেদ।

সন্ন্যাসীর তো কোন বিশেষ পরিচয় নেই। জাতি নেই, কুল নেই, নেই কোন গোত্র, নেই কোন পরিবার। এমনকি নেই তাঁর পিতামাতারও পরিচয়। পুত্র-কলত্রের তো প্রশ্নই নেই। জীবনমুক্ত পুরুষ। 'জ্ঞেয় স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।' কামনা

বাসনার আদাড়-পাঁদাড় নেই। নেই কারুর প্রতি কোন দ্বেষ। পেছু টান নেই। কলত্রের **কঠিন** পীড়ার চিন্তা নেই। নেই পুত্রের স্বর্ণোজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন। নেই কন্যা দায়ের দুর্ভাবনা। মুক্ত জীবন। বিলিয়ে দিতে পারেন বিশ্বজনের হিতকল্পে।

যথার্থ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'যাঁহাদের বড় প্রাণ তাঁহারা বেশীদিন নিজের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না। জগতে ব্যাপ্ত হইতে চান। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ।' সেই প্রমাণই দিলেন এই ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল পুরুষ গৃহত্যাগ করে।

চতুর্থ অধ্যায়

সলীল শচীসুত কাটোয়ায়

"ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো, বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাত্মা।
রাঢ়ে ভ্রমণ শান্তিপুরীময়িত্বা, ললাস ভক্তৈরিহতং নতোঽস্মি॥"

— যিনি সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করে উৎকট প্রেমের প্রাদুর্ভাব বশতঃ শ্রীবৃন্দাবন গমনের অভিলাষী হয়ে পথ ভ্রান্তির জন্য রাঢ়-দেশে ভ্রমণ করতে করতে শান্তিপুরে আগমন করে শোভমান হয়েছিলেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে প্রণাম করি।

সন্ন্যাসী গৌরকে ভক্তি নিবেদন করেছেন ভক্তরাজ কবিরাজ।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাস। মাসের শেষ দিন—সংক্রান্তি। হাড়-কাঁপানো শীত। এই সংক্রান্তির দিনই গৃহত্যাগ করবেন বলে সংকল্প নিলেন নিমাইচাঁদ:

"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশায় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥"

সংকল্পের প্রথম প্রকাশ কার কাছে? — না,

"যেদিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥"

নিভৃতে কেন? সাধু সংকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণে বিঘ্ন ঘটে ঘাটে ঘাটে। সাধারণ গৃহীর মনের ব্যাপ্তি নেই। গৃহ কোণটিই তার যথাসর্বস্ব। অশন, বসন, শয়ন আর সন্তান পালনের পরিধির মধ্যেই সীমায়িত তার জীবন। সুতরাং এহেন জন সমাজের কাছে তাঁর সংকল্প প্রকাশ মানেই তাঁর যাত্রাপথ কণ্টকিত করা। সাধারণ মানুষ বাক্ বিন্যাসে উন্মুখ, আচরণে বিমুখ। ঠিক এর বিপরীত চিত্র চিত্রিত ছিল গোরাচাঁদের মানস পটে। সবটাই আচরণে প্রকাশ। বক্তৃতা নেই, বাক্ চাতুর্য নেই, নেই কোন বাহ্বা স্ফোটন। নিভৃতে বললেন নিত্যানন্দকে। নির্দেশও দিলেন আর কে কে জানবেন তাঁর এই সংকল্পের কথা:

"আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য অপর মুকুন্দ॥"

এই গোপ্যটি জানবেন মাত্র এই পাঁচজন। পঞ্চজনের মধ্যে জননীও আছেন। নিমাই বাদে গৃহে তো মাত্র দুটি জন। সেই দুজনের মধ্যে জননী জানবেন, ঘরণী জানবেন না কেন? এই দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য যে বিসদৃশ। জননীর সাতষট্টি আর জায়ার মাত্র চোদ্দ। শচীমাতা তাঁর এই সুদীর্ঘ জীবনে বহুবিধ তাপ-পরিতাপে ক্লিষ্ট হয়েছেন, লাভ করেছেন হৃদয় দহনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে দিয়েছে সহনশীলতা। দুঃখই যে দুঃখ দূর করে। অবিতথ রবীন্দ্রবাণী: "দুঃখ যদি না পাবে তো / দুঃখ তোমার ঘুচবে কিসে?" কিন্তু এই বালিকা বধূ যে ধনী নন্দিনী। দুঃখ-তাপের অভিজ্ঞতা তাঁর কোথায়? বিপদ তো তাঁর কাছে

এক আতঙ্ক। তিনি তো প্রার্থনা জানাতে পারবেন না, "বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা/বিপদে আমি না যেন করি ভয়।" সুতরাং এ হেন কিশলয়-কোমল কিশোরীর কাছে এ সন্ন্যাস তো দশা বিপর্যয়। কাজেই আগে জানালে সেই যে "মনে ছিল আশ/করিব সন্ন্যাস।" — এই মনের আশ মনেই থেকে যাবে। অবশ্য প্রিয়াজী জানতেন না, আবার জানতেনও। জানা-না জানাব দোলায় ছিলেন।

জলপথই সহজতম। পুণ্যবতী সুরধুনী। সেই পুণ্যবতী পুণ্যব্রতীকে সহায়তা করলেন সংকল্প সাধনে। লোক স'ঘট্ট পরিহার করলেন গৌরহরি। সন্তরণে এলেন কাটোয়াতে। ভারি সুন্দর আশ্রম কেশব ভারতীর। সুরধুনীর তীরে। বটবৃক্ষ তলে। "ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু" এলেন ন্যগ্রোধ তলে। তখন কি হল? ভাবী গুরু কি করলেন?

> "অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান।
> উঠিলেন কেশব ভারতী পুণ্যবান॥"

আর ভাবী শিষ্য কি করলেন?

> "দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
> করযোড় করি স্তুতি করেন আপনে॥"

ভাবী গুরু শিষ্যের তো মিলন হল। সমগ্র জন সমাজেরও মহা-মিলনের বীজ উপ্ত হল। কিন্তু নদীয়া নগরে কি হল? এদিকে এক প্রতীপ পরিস্থিতি। সুরধুনীর একদিকে মিলন, অপর দিকে বিরহ। এক পারে বাজছে মিলনের রাগ, আর অপর পারে বাজছে, সে নাই,

সে নাই, নাই, নাই, নিমাই নাই — সুরে যেন বিরহের সানাই। নদীয়া নগর প্রাণহীন। দেহটাই যা আছে। গৌরশূন্য গৌরের ঘরের কি দশা হল? সে ঘরে আছে দুটি প্রাণী। তাঁর মাতাঠাকুরানী আর ঘরণী। শচীদেবীর কি দশা? বেদনাহত লোচন বাঁ হাতে চোখ মুছছেন, আর ডান হাতে লিখছেন:

"শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া।
আগুনে পুড়িল যেন ধক ধক হিয়া॥
দশদিক শূন্য হইল অন্ধকার ময়।
কেমন বঞ্চিব মুঞিঃ ঘর ঘোরময়॥
কিবা দুঃখ পাই পুত্র ছাড়িলা আমারে।
হাপুতি করিয়া মোরে গেল কোথাকারে॥"

আর বিষ্ণুপ্রিয়ার?

লোচনই তাঁর কম্পমান কলমে লিখলেন:

"বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে— হিয়া নাহিক সম্বিৎ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে— উনমত চিত॥
বসন না দেয় গায়ে— না বান্ধয়ে চুলি।
হাকান্দ কান্দনা কান্দে- উন্মতি পাগলি॥"

আর নগর বাসীর?

— তাদের হাহাকার বিলাপ জানাচ্ছেন বৃন্দাবন:

"ভূমেতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
আর না দেখিব বাপ সে চন্দ্রবদন॥
... ...
... ...

হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আর কেনে আছে আমা সভার জীবন॥"

বিশেষতঃ, দ্রোহীর মধ্যে দেখা দিল দশা বিপর্যয়ঃ
"তখন সে হায় হায় করে সর্বলোক।
পরম নিন্দুক পাষণ্ডীও পায় শোক॥
... ...
... ...
নিন্দা দ্বেষ যার যার মনেতে আছিল।
প্রভুর বিরহে সর্ব জীবের খণ্ডিল॥"

এখন গঙ্গার ওপারের চিত্র। কেশব ভারতীর আশ্রম। আশ্রমাচার্যকে স্তব-স্তুতির পর দীক্ষা প্রার্থনা করলেন গৌরহরি। সর্বশেষ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হচ্ছেন ভারতী। দশনামী সন্ন্যাসীদের পংক্তিক্রম হচ্ছে ঃ "তীর্থাশ্রম বনারণ্য গিরি পর্বত সাপরাঃ। / পুরিঃ সরস্বতী চৈব ভারতী।" এখানেও সেই শ্রেণী বিভাগ। বিভাগ মানেই বিভেদ-বিবাদ। অথচ গীতা বলছেন ঃ "জ্ঞেয় স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।" তাঁর কোন কাম্য বস্তু নেই, নেই তাঁর কোন ভেদ বুদ্ধি। মিত্র-অমিত্র সমান। ষড়রিপু সংযত তিনি। হিংসা দ্বেষ থেকে মুক্ত। প্রাকৃত বস্তুতে তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। বাসনা বাসা বাঁধেনা তাঁর মনে। তবে যে এই শ্রেণী বিভাগ? নিজেদেরই দশভাগ। তাঁরা আর জনসমাজের ভাগ—বিভাগ রোধ করবেন কিভাবে? আচার্য শঙ্কর তো মায়াবাদীঃ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। মিথ্যা। তবুও শ্রেণী বিভাগ কেন? অবশ্য

দশ সম্প্রদায়ের জন্য সরাসরি শঙ্করকে স্মরণ করা যায় না। করতে হয় চার প্রধান শিষ্যদের। এঁরা হচ্ছেন পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। এঁদের আবার দশ শিষ্য। এই দশ থেকেই দশনামী সম্প্রদায। কে তব, আব কে তম— তার নিরাকরণ হয়েছে লক্ষণানুসারে।

যা হোক, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি ইত্যাদি সম্প্রদায়েব সন্ন্যাসীদের কাছে গেলেন না কেন গৌরসুন্দব? কি করে যাবেন? তিনি যে নিজেকে দীনাতিদীন মনে করেন। তাছাড়া শ্রেণী দ্বন্দ্ব দূর করতে হলে শেষ পংক্তি থেকে শুরু করাই যে বিধেয়। অবশ্য স্থান নৈকট্য ও পূর্ব পরিচিতিও ভারতীর প্রতি আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা আজও প্রশ্নাতীত হয়নি: কেশব ভারতীর গুরু হচ্ছেন মাধবেন্দ্র পুরী। তাহলে কেশব কেন ভারতী উপাধি পেলেন?

যা হোক, আর কি কোন আকর্ষণ ছিল ভাবতীর প্রতি গৌর সুন্দরের? দশনামী সন্ন্যাসীরা মায়াবাদী। সোঅহং-এর সোচ্চার ধ্বনি তাঁদের কণ্ঠে। এটিই নিয়ম। নিয়ম আছে, আবার নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। সেই ব্যতিক্রম হচ্ছেন মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁর শিষ্য কেশব। কি রকম সে ব্যতিক্রম?— জানাচ্ছেন বৃন্দাবন:

"মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥"

নবঘনের মধ্যে নবঘন শ্যামকে দেখে সংজ্ঞাহারা হন পুরীজী।

ভগবানের চিহ্ন চরণে, ভক্তের চিহ্ন মরণে। আর এই মথুরানাথ ভক্ত অপ্রকট হলেন কি ভাবে? —না, এই শ্লোকটি উচ্চারণ করতে করতে :

"অয়ি দীন দয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্য সে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

গুরুর চিহ্ন শিষ্যে। তাই এই বাঙালি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কেশবেরও ইষ্ট-বস্তু মথুরানাথ। এও এক বড় আকর্ষণ দীক্ষা গুরু নির্বাচনে।

দীক্ষা প্রার্থনা করলেন কেশবের কাছে গৌরসুন্দর। আচম্বিতেই এই আগমন ও প্রার্থনা। স্তম্ভিত হলেন ভারতী। যতটা স্তম্ভিত, ঠিক ততটাই দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধা দ্বন্দ্বের কারণ একাধিক। ভারতী এর আগে একবার জগন্নাথ-গৃহে গিয়েছিলেন। পরিবারবর্গ পরিচিত। তাই ভারতী ভাবছেন গৌরচন্দ্রের মা ও স্ত্রীর কথা। নিমাই সন্ন্যাস নিলে এঁদের কি দশা হবে? তাই শুধোলেন, 'তুমি সন্ন্যাসী হতে চাইছ কেন? অবিরাম কৃষ্ণ নাম তোমার মুখে। মনে তোমার কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়েছে। উত্তম, কিন্তু গৃহাশ্রমে থেকেও তো কৃষ্ণানুশীলন করা চলে। বাধা কোথায়?'

স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন নিমাই, 'বাধা আছে বৈ কি। গৃহে থাকলে আমি আমার কুলে আবদ্ধ থাকব। ব্যাপ্ত হতে পারব না। নিজের সংসারে মায়াধীন হয়ে তার জট-জটিলতার নিরাকরণ করতে-করতেই আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাবে। তাহলে তো কলিহত জীবকে উদ্ধার করতে পারব না।'

—কিন্তু যে জীবের উদ্ধার তোমার জীবন মন্ত্র, তারা তো সবাই গৃহী।

গৃহী হয়ে গৃহীর অনাময় সাধনই সহজতম পথ। গৃহী সেক্ষেত্রে তোমার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাবে এবং তোমার ব্রত সাধনে এগিয়ে আসবে। —বললেন কেশব।

মৃদু হেসে বললেন গৌরসুন্দর, 'হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক, কিন্তু পন্থা নির্ভর করে পটভূমির ওপর। বর্তমান সমাজের পটভূমি যে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার অন্তরঙ্গ জন নিয়ে ঘরে ঘরে নাম বিতরণে প্রয়াসী হয়েও সার্বিক সাফল্য লাভ করলাম না। কাজেই আমাকে সব কিছুই ত্যাগ করতে হবে। গৃহী তো ভোগী। আমি যদি গৃহীই থাকি, তাহলে অন্যান্য গৃহীরা আমাকে তাদের মত ভোগীই মনে করবে। সন্ন্যাস ছাড়া ত্যাগী হওয়া যায় না। আমি সন্ন্যাসী হলে আমার নিজ জন কাঁদবে। আমার এবং আমার নিজজনের চোখের জলে দ্রোহীর মন দ্রবীভূত হবে। তখন তাদের চোখের জলে তারা কলুষ মুক্ত হবে এবং জাতপাতের বিচার ভুলে গিয়ে সমস্ত জনসমাজ আসবে ঐ এক নামের চন্দ্রাতপ তলে। তাদের থাকবে মাত্র একটি পরিচয়ঃ তারা সবাই কৃষ্ণের নিত্য দাস।'

যুক্তিতে চমৎকৃত হলেন ভারতী। দ্বিধামুক্ত হতে পারছেন না তবুও। দীক্ষা ক্রিয়াটি পরিহারই করতে চান। তাই বললেন, 'তুমি গৃহে ফিরে গিয়ে তোমার মাতা ঠাকুরানী ও গৃহিণীর অনুমতি নিয়ে এস।'

মনে মনে মতলব আঁটছেন কেশব অর্থাৎ

"মনে আছে— গোরাচাঁদ করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্য ঠায়॥"

কিন্তু গৌরচন্দ্রের মুখাবয়বে চোখ পড়তেই দেখলেন,

'............করুণ অরুণ দু'নয়ান।
ছল ছল করে অশ্রু কাতর বয়ান॥

....

'হরি হরি' বলি ডাকে মেঘের গর্জনে।
অবিরাম প্রেমবারি ঝরে দু'নয়ানে।'

চমৎকৃত হলেন কেশব। না, আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নয়। দীক্ষায় সম্মতি দিলেন। ব্যস্! আনন্দ আর ধরে না গৌরসুন্দরের। কিরকম সে আনন্দ?

---না, 'কণ্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ মস্তক।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক॥'

এদিক থেকে সেই পঞ্চগণ অর্থাৎ

'শ্রীঅবধূত চন্দ্র গদাধর মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য আর ব্রহ্মানন্দ॥' নিমাইয়ের নিকট উপস্থিত হলেন। গৌরসুন্দর স্মিত হাস্যে আলিঙ্গন দিলেন। না, অপেক্ষা আর সয় না। তাই চন্দ্রশেখরকে বললেন, 'আপনি আমার মেসো। আমি আপনার পুত্র তুল্য। সেই পুত্রের সংকল্প সাধনে সহায়তা করুন কৃপা করে। দীক্ষার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করুন।'

আচার্য সংগ্রহ করতে গেলেন; কিন্তু এদিকে আরেক কাণ্ড। বিশাল লোক সংঘট্ট। সধবা-বিধবা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা সবাই সমবেত হয়েছে ঐ বটবৃক্ষ তলে। আকর্ষণ ও কৌতূহলের

বস্তু গৌরসুন্দর। যে দেখে, সে আর চোখ ফেরাতে পারে না। একসঙ্গে এত রূপ! অনবদ্যাঙ্গ অবয়ব। অয়স্কান্ত মণি। সবাই আকৃষ্ট হচ্ছে। গোটা দেহটাতে যেন ফাঁদ পাতা আছে। কৃষ্ণ প্রেমের ফাঁদ। তাই 'পড়িলেন সর্বজীব চৈতন্যের ফাঁদে।' ভক্ত-প্রাণ লোচন মুগ্ধ চিত্তে গেয়েছেন ঃ

'কাঞ্চন নগরের লোক দেখিবারে ধায়।
যে দেখয়ে — তার হিয়া নয়ন জুড়ায়॥
কিবা বৃদ্ধ, কিবা অন্ধ, কি নারী, পুরুষ।
কিবা সে পণ্ডিতজন এ গণ্ড মুরুখ॥
....
... .
....
... .

পঙ্গু সে আতুর কিবা গর্ভবতী নারী।
শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসীরে পাড়ে গালি॥"

এ তো গেল এক দলের কথা। আরেক দলের বিলাপ গেয়েছেন বৃন্দাবন ঃ

'কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল রজনী॥
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন্ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥'

সবই তো শুনলেন। শুনে গোরাচাঁদ কি করলেন? চির বিনয়ী

নিমাই চাঁদ

"দন্তে তৃণ করি সভা স্থানে দাস্য মাগে।"

আর কি করলেন ?

" ... ...

ডাকিয়া কহয়ে প্রভু না করিহ শোক ॥
আশীর্বাদ কর মোরে শুন মাতা পিতা।
সাধ লাগে কৃষ্ণের চরণে দেঙ মাথা ॥
... ...
... ...
... ...

কৃষ্ণপদ বিনু মোর নাহি অন্য গতি।
নিজ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব প্রাণপতি ॥"

দীক্ষাদ্রব্যে দীক্ষাস্থল ভরে উঠল। কিভাবে ভরে উঠল ? — "নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন। / আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন ॥" শেষে এমন হ'ল যে দ্রব্য রাখারই আর ঠাঁই রইল না। যে যা পারছে, নিয়ে আসছে। কত যে জিনিস :

"দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি তাম্বুল চন্দন।
পুষ্প যজ্ঞ সূত্র আনে সর্বজন।"

কিন্তু এ সব আয়োজন তো বহিরঙ্গ মাত্র। লোকাচার। নিমাই কীর্তনানন্দে নৃত্য করলেন পঞ্চ পার্ষদ নিয়ে যখন 'পরম আনন্দে সভে করে হরিধ্বনি।'

গৌরসুন্দরের এখন ক্ষৌর কর্ম। কিন্তু এ কর্মটি করে কে ?

গৌরসুন্দর দর্শনে নরসুন্দরের অদর্শন হল। অনেক বলে কয়ে একজনকে ধরে আনা হল. কিন্তু তার যে হাত কাঁপে। চাঁচর কেশ কলাপ দেখে চোখ জোড়া জলে ভরে যায়। আর কিছু দেখতে পায় না। ভাবছেন নিমাই। না আর পারা যায় না। ঘাটে ঘাটে বিঘ্ন। আযোজন তো পূর্ণ। শুধুমাত্র ক্ষৌর কর্ম। অনেক কাকুতি মিনতি করলেন গৌরচন্দ্র। অবশেষে মন গলে গেল ক্ষৌরকারের।

দীক্ষা ক্রিয়া আরম্ভ হল। বীজমন্ত্র কার কানে কে দেয়? গুরুই না দেবেন গোপিত মন্ত্রটি দীক্ষিতের কানে। বিপরীত বিধান বিশ্বম্ভরের বেলায়। নিমাই বললেন,

"একদিন রাত্রি শেষে দেখিলুঁ স্বপন।
সন্ন্যাসীর মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মণ।।
দেখ দেখি এই বটে হয় কিবা নহে।
ইহা বলি ভারতীর কর্ণে মন্ত্র কহে।"

বিস্মিত হলেন ভারতী। তাইতো। এই মন্ত্রই না তিনি বীজমন্ত্র বলে ঠিক করে রেখেছেন।

দীক্ষা ক্রিয়া প্রায় সমাপ্ত। এখন নামকরণ। পূর্বাশ্রমের নাম আর থাকবে না। সে নাম তো একাধিক। নিমগাছের তলায় জন্ম বলে এবং আরেক কারণে নিমাই। মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী নামকরণের সময় নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর। পর পর খরার পর জন্ম সালে দেশ হল শস্যশ্যামলা। তাই নাম বিশ্বম্ভর। গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত। তাই গৌরাঙ্গ, গৌর বা গোরা। একই হোক, আর একাধিকই হোক, সব নাম হল লুপ্ত। গুরু অভিখ্যা দিলেন

'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।'

কেন? ভাষ্য করলেন ভারতী :

'যত জগতের তুমি কৃষ্ণ, বলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হইতে যাতে হইল ধন্য॥'

মুক্ত হলেন নিমাই। না, নিমাই আর এখন আর নিমাই নন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কুলনাম অদৃশ্য হল অকূল অর্ণবে। ছিলেন নবদ্বীপবাসী, হলেন বিশ্ববাসী। নদীয়া বিহারী হলেন বিশ্ববিহারী। বিষ্ণুপ্রিয়া পতি হলেন বিশ্বপতি। তিনি এখন শুধু জায়া-জননীর আপনজন নন, বিশ্বজনের আপন জন। এখন তাঁর বৃহৎ জগতে বিচরণ। নিজ গৃহের খড়ির দাগের মধ্যে আর আবদ্ধ নন। এই তো বাঁচার মত বাঁচা। যথার্থ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ,

"স্বার্থ মগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে
সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।"

মুক্তির আনন্দে প্রেমাবিষ্ট হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তক্ষনি 'হরি' 'হরি' বলে হুঙ্কার দিলেন। পঞ্চ পার্ষদ তো সদা প্রস্তুত। তাঁরাও খোল-করতাল নিয়ে কীর্তনানন্দে মেতে উঠলেন :

"হরি হরি বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দিগে সংকীর্ত্তন করে সব ভৃত্য॥"

না, গুরুও বাদ গেলেন না। পূর্বাচার ভুলে গিয়ে "কেশব ভারতী নাচে প্রেমানন্দে সুখে।" এমন কি সন্ন্যাসীর অভিজ্ঞান যে

দণ্ড-কমণ্ডলু, তাও

"পাক দিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি॥"

ভারতী এমন কাজ কেন করলেন? —সবই প্রভুর প্রভাব। একটু আগেই "পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেম ভক্তি হইল তখন॥"

যেখানে প্রভুর গমন, সেই খানেই নিয়ম নিগড়ের বন্ধন মোচন। স্কন্দ পুরাণ বলেন,

'শিখী যজ্ঞোপবীতি স্যাৎ ত্রিদণ্ডী কমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥'

সদা-সর্বদা যেখানে গায়েত্রী জপ করবার কথা, সেখানে অষ্টক্ষণ জপছেন কৃষ্ণনাম কেশব। আচরিত বিধিটা বড় কথা নয়, সারবস্তু মুকুন্দ সেবা। মুকুন্দ সেবাতেই যে হবে জীবের উদ্ধার— 'মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ।' ভাগবতেও সেই একই আশ্বাস :

"অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।"

প্রভুর একমাত্র লক্ষ্য আচরিত নিয়ম নিগড়ের বন্ধন মোচন এবং সর্বদা ও সর্বথা সর্বপ্রথার সরলীকরণ।

কীর্তনানন্দে সবাই মেতে আছেন। আচম্বিতে প্রভুর ভাবান্তর। 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' হুঙ্কার দিয়ে ছুটলেন। কি ব্যাপার? গোপীনাথের জন্য তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। অপেক্ষা আর সয় না। ব্রজধাম পানে ছুটছেন ব্রজেন্দ্র নন্দনের জন্য :

আবার সেই লোক সংঘট্ট। সঙ্গে চলল সেই অগণন জন।

চললেন গুরু স্বয়ং। শ্রীচৈতন্য সান্নিধ্য যেন সদাই সৌরভ ছড়াচ্ছে। প্রেমের সৌরভ। আঘ্রানে আসক্তি বাড়ে। অবিরাম বাড়তেই থাকে। আশ মেটে না। তৃপ্তি নেই। শুধুই আকুলতা ঃ

'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোব প্রাণ।'

আকুল ব্যাকুল হয়ে হাজারো জন ছুটছে। তবুও বাঁচোয়া এবা কিছুদূর গিয়ে ঘরমুখো হল। আশ্রমে ফিরলেন ভারতীও, কিন্তু নিত্যানন্দ যে ফাঁপরে পড়লেন। মহা ফাঁপর তাঁর। প্রভুকে ফেরান কিভাবে? ষড় করলেন। তিনে মিলে ষড়। কোন তিনজন? —না, "নিত্যানন্দ, আচার্যরত্ন, মুকুন্দ তিনজন।
প্রভু পাছে পাছে তিন কবেন গমন॥"

'......পাছে পাছে তিন করেন গমন।' —সামনে আসছেন না কেউ। প্রভুর বাহ্য জ্ঞান নেই তো। তাই এঁরা কিঞ্চিৎ দূরত্ব রেখে লক্ষ্য রাখছেন। বাহ্যজ্ঞান থাকবে কি কবে? প্রভুব যে প্রেমোন্মাদ অবস্থা। কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। চলছেন তো চলছেনই। লক্ষ্য বৃন্দাবন। নিশিদিশি চলছেন। ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে লক্ষ্য নেই ঃ

"এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক-বিদিক জ্ঞান নাহি চলে রাত্রি দিন॥"

চলছেন, আর দুঃখ পাচ্ছেন। রাঢ়দেশ এমন কেন? একটা লোকও তো কৃষ্ণনাম নেয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিন গেল। একদিন গেল, দু দিন গেল। তিন দিনও

যায় যায়। না, প্রভুর এ দশা আর সইতে পারলেন না নিত্যানন্দ। আবার ষড় করলেন। এবারের ষড় একাধিক। গোটা কতক বালক গরু চড়াচ্ছিল। অবধূত তাদের বললেন হরিনাম নিতে। ছেলেগুলোও তাই করল :

"গোপ বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলে উঠে উচ্চ করিয়া॥"

ব্যস্‌! ইন্দ্রজালের মত কাজ হল। প্রভুর সব দুঃখ দূরে গেল। অপার আনন্দ হল। তাই

"শুনি তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
বোল বোল বলে সবার শিরে হস্ত ধরি॥
তা সবারে স্তুতি করে তোমরা ভাগ্যবান।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম॥"

আরেকটি কান মন্ত্রণা দিলেন। বালকদের কানে কানে বললেন, 'ঐ যে ঠাকুরকে দেখছ, উনি যদি জিজ্ঞেস করেন বৃন্দাবন কোন্ পথে, তাহলে গঙ্গার ধার দেখিয়ে দেবে! ঘটলও তাই। শিশুর মধ্যে শিশু হয়ে গেছেন শ্রীচৈতন্য। প্রেমাবিষ্ট তো। প্রেমাবিষ্ট পুরুষ শিশুর মতই সরল হন। প্রাকৃত জগতের আর জ্ঞান নেই, যেমন নেই শিশুর। বালকদের প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা' তোমরা তো হরিনাম শুনিয়ে আমাকে খুশি করলে— এবার বল তো বৃন্দাবনের পথ কোন্‌টা?'

অবধূতের শেখানো বুলি মনে আছে বালকদের। বালক তো, বাস্তব বোধ নেই নেই সত্য-মিথ্যার জ্ঞান। যা খুশি বলিয়ে নেওয়া

যায়। বললও তারা তাই, 'ঐ যে নদীটা দেখছ ঠাকুর, ওটার ধার দিয়ে চলে যাও— ঠিক বৃন্দাবনে পৌঁছে যাবে।'

প্রভু প্রেমাবিষ্ট। বালক-বাক্য বিশ্বাস করেই দ্রুতপদে চলতে থাকলেন। পথ বিভ্রম তো ঘটালেন নিত্যানন্দ; কিন্তু প্রভুকে ফেরাবেন কি করে? তাহলে তো আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হ্যাঁ, তাই করবেন। তবে তার আগে আরেকটি কাজ করা যে প্রয়োজন। খুবই প্রয়োজন। তাই,

'আচার্য রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্যের ঠাঞি॥
প্রভু লঞা যাব আমি তোমার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥'

আরও নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'এরপর শান্তিপুর থেকে তুমি যাবে নবদ্বীপে। আমি প্রভুকে নিয়ে অদ্বৈত গৃহে থাকব, আর তুমি শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্ত নিয়ে চলে আসবে।' নির্দেশ পালনে ব্রতী হলেন চন্দ্রশেখর। এই এতক্ষণে নিত্যানন্দ 'মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয়।'

এ পরিচয় প্রভুর কাছে আচমকা চমক। বাহ্য ফিরে পেলেন। আর বিস্ময়ে বললেন, 'সে কি! শ্রীপাদ, তুমি এখানে?'' নিত্যানন্দ বড়ই কৌতুকী পুরুষ। শ্রীচৈতন্যের মতই। বললেন, 'শুধু কি তুমিই ব্রজেন্দ্র নন্দনের দেখা পাবে? আমরাও তো পেতে পারি। তাই তোমার সঙ্গ নিলাম।' প্রভু মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ তো, ভালোই করেছ। তা বৃন্দাবন আর কতদূর?'

অবধূত অতি সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'এই তো যমুনা। যমুনায় অবগাহন কর।' গঙ্গাকে করলেন যমুনা। শুনেই প্রভুর বাহ্য দূরে গেল। আবার আবিষ্ট হলেন। যমুনা স্তব করলেন ঃ

"চিদানন্দ ভানোঃ সদানন্দ সূনোঃ পরপ্রেম পাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রি জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রী ক্রিয়ান্নোরপুর্মিত্রপুত্রী॥"

—যিনি চিদানন্দ প্রকাশক নন্দনন্দনের পরম প্রেমের পাত্র, চিন্ময় জল স্বরূপে অবস্থান করছেন, যিনি দর্শন মাত্রই সর্বপ্রকার পাপ-চ্ছেদন করে থাকেন, সেই জগতের মঙ্গল বিধায়িনী সূর্যতনয়া যমুনা আমাদের শরীর পবিত্র করুন।

স্তবান্তে অবগাহন করলেন প্রভু। সিক্ত কৌপীন। এই কৌপীনই একমাত্র বসন। আর তো বসন নেই। অবশ্য অশনও হয় নি এই তিন দিন। পরমাশ্চর্য সময়ের যোগসূত্র। ঠিক সেই সময়েই ঘাটে বসন নিয়ে বসে আছেন অদ্বৈত।

এবার শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় চমক। বাহ্য ফিরে পেলেন অদ্বৈতকে দেখে। পরম বিস্ময়ে বললেন, 'আচার্য, তুমি এখানে! আবার আমার জন্য বসন নিয়ে নৌকোয় প্রস্তুত হয়ে আছ। আমি যে ব্রজে যাচ্ছি। তাই বা জানলে কি করে? হুঁ, বুঝলাম অবধূতের অদ্ভুত কৌশল। মিথ্যার জাল। গঙ্গাকে বানাল যমুনা।"
অদ্বৈত বললেন, 'শ্রীপাদ তো মিথ্যা বলেন নি। তুমি তো এখন যমুনাতেই স্নান করলে। পশ্চিমে যমুনা বয়ে চলেছে। আর পূর্বে গঙ্গা। সেই পশ্চিমের যমুনার জলেই তোমার ক্লান্ত দেহ শীতল হল। ওসব কথা এখন থাক। এই নাও কাপড়। ভিজে কৌপীন

বদলাও। দেহধারী জীব—অন্নগত প্রাণ। তিনদিন তো পেটে অন্নজল পড়ে নি। চল, আমার ঘরেই দুটি শাকান্ন মুখে দেবে।'

আচার্য প্রভুকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে, আর এদিকে আরেক আচার্য এলেন শচীমাতার ঘরে -- নদীয়া নগরে। এখন নগরবাসীর বিশেষ করে শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা দেখলেন চন্দ্রশেখর? — নগরজীবন স্তব্ধ। সমাজ দেহটাই আছে। সে দেহে প্রাণ নেই। সেই যেদিন নিমাই গৃহত্যাগ করেছেন, সেইদিন থেকেই অন্নজল ত্যাগ করেছেন তাঁর জননী ও গৃহিনী। শচীমাতার 'হা নিমাই, 'হা নিমাই' হাহাকারে সারা নবদ্বীপ হাহাকার করছে / আর 'বিষ্ণু প্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। / পশু-পক্ষি-লতা-তরু এ পাষাণ ঝুরে॥" নিশিদিশি মুখে শুধু ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

এই দশা-বৈগুণ্য দ্বিগুণিত হল চন্দ্রশেখরকে দেখে। যেমন, শচীদেবী চন্দ্রশেখরকে বলছেন,

"কোন ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ।
বিশ্বম্ভরে মন্ত্র দিতে না হইল করুণ॥
সে হেন সুন্দর কেশ লাবণ্য দেখিয়া।
কোন্ ছার নাপিত সে নিদারুণ হিয়া॥
সুন্দর বদনে চুম্ব না দিব মো আর।
ক্ষুধার সময় কেবা বুঝিবে তোমার॥"

সমস্ত নদীয়াবাসী ছুটে এল চন্দ্রশেখরকে দেখে। আচার্য কি অবস্থায় পেলেন তাঁদের?—

"নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া।
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ ধক ধক হিয়া॥"

আহারে! তাঁদের প্রাণ গৌর আবার ফিরে আসবেন তাঁদের মাঝে — এমনি কতই না আশা তাঁদের। তাঁদের প্রাণে আবার প্রেম বীণা বাজাবেন নতুন সুরে। তাই, 'পুছিতে না পারে কিছু মুখে নাহি রায়ে।' জিজ্ঞেস করতে পারছেন না কেন? কি জানি জিজ্ঞাসার উত্তরে যদি আশা ভঙ্গ হয়. কিন্তু এ আশা যে ভ্রান্তি। হোক। এই ভ্রান্তিই তাঁদের শান্তি।

এ হেন নদীয়া দৃশ্য দেখলেন চন্দ্রশেখর। এখন তিনি কি করেন? কি বলেন? কি সান্ত্বনাই বা দেন? তিনি আর দেবেন কি? তাঁরই তো বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। কান্নায় কান্না আনে। আচার্য রত্নেরও অঝোরে জল ঝরতে লাগল।

নিত্যানন্দ প্রভুকে ফেরালেন বৃন্দাবন যাত্রা থেকে। বৃন্দাবন চলে গেলে বাংলার সঙ্গে যোগ থাকত না প্রভুর। ফলে গৌড় বঙ্গের দবির খাস হতেন না সনাতন. আর সাকর মল্লিক হতেন না রূপ। ছয় গোসাঁইয়ের সৈনাপত্যও বৈষ্ণব মণ্ডল পেতেন না ব্রজ উদ্ধারের জন্য। নিত্যানন্দই প্রভুর সাক্ষাৎকার ঘটালেন শচীমাতার সঙ্গে শান্তিপুরে। ফলে মাতৃবাক্য রক্ষার্থে প্রভু রইলেন প্রতিবেশী রাজ্য উৎকলে। বৃন্দাবনের পথ তো বহুদূর— মাসের পর মাস লাগে সে পথ অতিক্রম করতে। আর বাংলা থেকে উড়িষ্যার পথ পদব্রজে মাত্র বিশ দিনের। তাই প্রতি বছর নীলাদ্রির রথযাত্রা উপলক্ষে দুশ ভক্ত যেতেন রথযাত্রা দেখতে এবং মহাপ্রভুর সঙ্গ-সান্নিধ্য

লাভ করতে। চাতুর্মাস্য পালন করে তাঁরা ফিরতেন বাংলায়। এই নীলাচলে অবস্থানের ফলেই প্রভু পেলেন রামানন্দ ও স্বরূপকে আর এঁদের সঙ্গেই করলেন গম্ভীরালীলা সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা। এর আগে প্রভুর পরমাশ্চর্য অবদান পেলেন বৈষ্ণব সমাজ অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। সত্যিই শুধুমাত্র প্রেমালিঙ্গন তো ক্ষণস্থায়ী। স্থায়ী একটি পোক্ত ভিত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সাধন কল্লেই উক্ত তত্ত্ব, আর ব্রজ গোস্বামীদের দ্বারা বিকিরণ করলেন বৈষ্ণব দর্শনের অজস্র দীধিতি। ফলে ভঙ্গপয়ার বৈষ্ণব সমাজ এক নতুন জীবনের স্বরলোক খুঁজে পেলেন।

অপরপক্ষে, বৃন্দাবনে প্রভুর স্থায়ী অবস্থান হলে, শত শত ভক্তের পক্ষে ব্রজধামের সুদূর পথ হত দুস্তর পারাবার। প্রভু তাঁদের হিতকর ও হেতুগর্ভ উপদেশ দিয়ে নিজ চিন্তাধারায় শিক্ষিত করে তুলতে পারতেন না। ফলে বাংলার সৈনাপত্য গ্রহণ করতে পারতেন না নিত্যানন্দ, আর এই সাম্যকামী বৈষ্ণব সমাজের নির্মিতি হত শশশৃঙ্গের মতই কপোল কল্পনা। এ সবই পরের কথা। আগে আভাস দেওয়া হল প্রসঙ্গ প্রয়োজনে।

পঞ্চম অধ্যায়

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু........."

নিমাই গৃহত্যাগ করলেন। কাটোয়ায় এলেন। ভারতীর দীক্ষায় হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কাটোয়া থেকে এলেন অদ্বৈতগৃহে —নবদ্বীপ থেকে আট/দশ মাইল দূরে। এলেন মানে অবধূত নিয়ে এলেন। দুজন সঙ্গীও এলেন। এঁরা হলেন হরিদাস ও মুকুন্দ।

বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন অদ্বৈত, কিন্তু এঁরা যে অনাহারে আছেন। একদিন নয়, দুদিন নয়, তিনদিন। তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আচার্যদেব। আচার্যানী সীতাদেবী রন্ধনক্রিয়া সমাপ্ত করেই রেখেছিলেন। অপেক্ষা শুধু গোবিন্দে নিবেদন। অদ্বৈত নিবেদন করলেন। ঝটিতি ব্যবস্থা করলেন প্রসাদ পরিবেশনের। প্রসাদে কত রকম পদ ছিল? ছাপ্পান্ন ভোগ— ছত্রিশ ব্যঞ্জন? —হ্যাঁ, তাই -- বেশী ছাড়া কম নয়। বর্ণনাটি বড়ই দীর্ঘ, সুদীর্ঘ। সংক্ষেপে দিলেও তা দাঁড়ায় এই রকম ঃ

"মধ্যে পাত্ত ঘৃত সিক্ত শাল্যান্নস্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুগ স্থপ॥
বাস্তুৰ শাক পাক বিবিধ প্রকার।
পটল কুষ্মাণ্ড বড় মানকচু আর॥

চই মরিচ সূক্তা দিয়া সব ফল মূলে।
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
ফলবড়ী ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেল শস্যছানা শঙ্গরা মধুর।
মোচা ঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥

... ...

... ...

মুদগ বড়া মষ বড়া কলা বড়া মিষ্টান্ন।
ক্ষীর পিুল নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥

... ...

... ...

'পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পুরিয়া।
তিন ভোগের আশ পাশে রাখিল ধরিয়া॥
সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া।
তিনপাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখে ত' ধরিয়া॥

... ...

... ...

দুই পাশে ধরিলা সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥
অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী।
তিন জল পাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥

পিড়ি পাতা হল। দুটি। গোরাচাঁদ আর নিতাইচাঁদের জন্য। 'দুটি আসন কেন? তুমি বসবে না?' শুধোলেন প্রভু আচার্যকে। — 'না, আমি পরিবেশন করব। নিজ হাতে খাওয়াতে আমার পরম সুখ।' —স্মিত হেসে উত্তর দিলেন অদ্বৈত।

একটার পর একটা পদ পরিবেশন করতে লাগলেন অদ্বৈত। প্রথম গ্রাস মুখে তুলতে গিয়েই প্রভু হাঁক দিলেন, 'হরিদাস, হরিদাস গেল কোথায়?'

হরিদাস নিকটেই ছিলেন। চির-দীন হরিদাস করজোড়ে বললেন, 'প্রভু ক্ষমা দাও। তুমি শান্তিতে আহার কর। তোমার আহারেই আমার পরম শান্তি। তোমার সেবার পর দাওয়ায় বসে আমি দুটি অন্ন মুখে দেব।'

উপকরণের যেন শেষ নেই। তার ওপর প্রতিটি পদই পরিবেশন করছেন আচার্য উজার করে। প্রভু আহার করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলেন। বললেন, 'আচার্য, এই কি তোমার সামান্য শাকান্ন? আর প্রতিটি পদই দিচ্ছ দশ জনের পরিমাণ। না, এত খেতে পারব না।' অদ্বৈত বললেন, 'বেশ তো, না পার পাতে পড়ে থাকবে।' উত্তরে

"প্রভু কহে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥"

যা হোক, আহার জমে উঠল অদ্বৈত-নিত্যানন্দের প্রণয় কলহে। এমন মধুর কোন্দল প্রভুর অন্য পার্ষদদের মধ্যে ভাবাই যায় না, অথচ এঁরা দুজন অসমবয়সী। পিতা-পুত্রের মত।

বয়স কিন্তু প্রতিবন্ধ হয় নি প্রণয় কলহের বেলায়। অদ্বৈতকে দেখলে নিত্যানন্দ যাবেনই তাঁর কাছে, আর যাওয়া মানেই খুনসুড়ি বাঁধানো। আচার্যের মনটি রসে ভরা। আস্বাদন করতেন এই প্রেম কলহ। এই আহার কালেও বাঁধলো কোন্দল। পর্বত প্রমাণ আহার্য। এহেন আহার্য গ্রহণ করেও অবধূত বললেন,

"আজি উপবাস হৈল আচার্য নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিল এই গ্রাসেক অন্নে॥"

কার না হাসি পায় এ কথা শুনে। হাসলেন আচার্যও। বললেন, 'রাখ, রাখ তোমার বাকচাতুরী। ভারি তো অবধূত সন্ন্যাসী। খাও ফলমূল তাও কখনও জোটে, কখনও জোটে না।

নিত্যানন্দ ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, 'বেশ তো, তা না হয় মানলাম। তাই বলে নিমন্ত্রণ করে তুমি অর্ধভুক্ত রাখবে?' অদ্বৈত কপট রোষে উত্তর দিলেন, 'তুমি ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী। শুধু উদর পূর্তির জন্যই সন্ন্যাসী হয়েছ। মানলাম দশ/বিশ সের চালের অন্নে উদর পূর্তিতেই তোমার স্ফূর্তি; কিন্তু আমি গরীব মানুষ। অত চাল পাব কোথায়?'

কথায় আর পেরে উঠলেন না অবধূত। মনে মনে কিন্তু অন্য বুদ্ধি আঁটছেন। আহার যখন প্রায় শেষ, তখন হঠাৎ হাতে এক মুঠো অন্ন নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন অদ্বৈতকে লক্ষ্য করে। অদ্বৈতের মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হল। তিনি যেন আরেকটি খুনসুটির বাণ খুঁজে পেলেন। বললেন, 'কি, এঁটো ছিটিয়ে দিলে আমার গায়ে।'

এই এতক্ষণে নিত্যানন্দ জুতসই জবাব খুঁজে পেলেন, 'কি'

গোবিন্দের প্রসাদকে বলছ এঁটো ? অপরাধ-মহাঅপরাধ হল তোমার, তবে অপরাধের ক্ষালন হবে যদি তুমি একশ সন্ন্যাসী ভোজন করাও।' জবাব যেন ওষ্ঠে এসেই ছিল অদ্বৈতের, 'এর পরেও আবার সন্ন্যাসীর কথা। সখ মেটেনি নিমাইকে সন্ন্যাসী করে।'

এই হাস্য পরিহাসের মধ্যে আহার পর্বের সমাধা হল। আচমনের জল দিলেন অদ্বৈত। আচমনের পর দুই সন্ন্যাসী বসলেন। আচার্য এলাচদানা, লবঙ্গ, তুলসী মঞ্জরী ইত্যাদি মুখবাস দিলেন। এখন শয্যার আয়োজন। উত্তম সে শয্যা। শঙ্খশুভ্র শয্যা। দীর্ঘ তিনদিন অনশনে ও পথশ্রমে প্রভু ক্লান্ত। শয়ন ও বিশ্রাম তো একান্তই প্রয়োজন। তাই এই উত্তম আয়োজন। ভক্তের বড়ই নয়নসুখ এই শয্যা দর্শনে। না, এইখানেই শেষ নয়। আচার্য 'সুগন্ধি-চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।

সুগন্ধি মাল্য আনি দিল হৃদয় উপর॥'

পুষ্পমালায় মন আনন্দে ভরে যায়, আর চন্দন দেহে আনে শিশিরতা। ফলে পরিপাকে সহায়তা হয়। না, এত করেও আচার্যের মন ভরছে না! তাই গৌরসুন্দরের পদ সংবাহন করতে চাইলেন। পদ সংবাহনে ক্লান্তি অপগত হয়। কিন্তু, না, আর না। প্রভু বাধা দিলেন, বললেন,

'বহুত নাচাইলে আমা ছাড় নাচায়ন।

মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন॥''

মুকুন্দ-হরিদাস সহ আচার্য আহার্য গ্রহণ করলেন। এখন এল আরেক চিন্তা অদ্বৈতের মাথায়। গৌরচন্দ্রের আনন্দ তো ভোজনে

নয়, শয়নেও নয়। তাঁর অপার আনন্দ কীর্তনে। তাই অদ্বৈত তাঁর গণ আর খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন আরম্ভ করলেন। বিদ্যাপতি গৌরসুন্দরের বড়ই প্রিয়— এ সংবাদ আচার্যের জানা। অদ্বৈত তাই বিদ্যাপতির এই পদটি গাইলেন :

"কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥
আর হাম প্রিয় দূর দেশে না পাঠাও।
আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাও॥"

গান শুনে শয্যায় উঠে বসলেন প্রভু। মুকুন্দ সর্বক্ষণের সঙ্গী। সময়ের সঙ্গে মানুষের মন-মেজাজের নিবিড় যোগ। প্রভুর মন মেজাজের ছবি যেন মুকুন্দের মন মুকুরে। তাই তিনি গাইতে লাগলেন :

'আহা প্রাণপ্রিয়া সখি কি না হৈল মোরে!
কানু-প্রেম-বিষে-মোর তনুমন জরে॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
কাঁহা গেলে কানু পাই তাঁহা উড়ে যাই॥"

গানটি যতই শুনছেন, ততই নয়ন বারি ঝরছে প্রভুর। রোদন করতে করতে সংজ্ঞা হারালেন প্রভু। তখন সবাই গান বন্ধ করে প্রভুর সেবায় যত্নবান হলেন। কানে দিলেন কৃষ্ণনাম। সর্ব জীবের জীবাতু এই নাম 'কানের ভিতর দিয়া' যখন 'মরমে পশিল···' তখন প্রভু বাহ্য ফিরে পেলেন। পেয়েই নৃত্য করতে লাগলেন। নৃত্য দর্শনে সবার আহ্লাদ হবার কথা, কিন্তু তা হল না। হবে কি করে?

প্রভুর সেই কতদিন থেকে অশন নেই, শয়ন নেই, নিদ্রা নেই, নেই কোন বিশ্রাম। চিন্তাকুল হয়ে সবাই প্রভুকে ধরলেন। বুঝিয়ে ক্ষান্ত করলেন।

অদ্বৈতের অতিথি সৎকার অনবদ্য। নিত্যানন্দের সঙ্গে বাক বিতণ্ডায় আচার্য বললেন তিনি গরীব ব্রাহ্মণ। ওটা কথার কথা। প্রণয়-কলহ কথা। আসল কথা অদ্বৈত যেমন জ্ঞানী-মানী, তেমনি ধনী, আবার তেমনি বিনয়ী। তাঁর তো লোকজনের অভাব নেই, তবুও নিজে অভুক্ত থেকে নিজ হাতে পরিবেশন করলেন। কত আদরে, কত আন্তরিকতায়। কত আকুতিতে, কত আহ্লাদে, আর কত আনন্দে ভোজন করালেন প্রভুকে। একেকটা পদ দিচ্ছেন, আর অনুনয় বিনয় করে বলছেন, 'খাও, খাও!' এ আপ্যায়ন তো সুরলোকেও সুলভ নয়। প্রভু যেই বলছেন, 'খেতে পারছি না' অমনি অদ্বৈত বলছেন, 'বেশ তো, তাহলে এই পদটির আধখানা খাও, আর এই উপকরণটি চেখে দেখ।' —এমনি করে ধৈর্যের সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে বাৎসল্য রস উজাড় করে প্রভুর রসনার রসায়ন করলেন। ভোজনান্তে আচমনের জল ঢেলে দিলেন নিজ হাতে। মুখশুদ্ধিও নিজ হাতে দিলেন। নিজ হাতে চন্দন চর্চিত করলেন প্রভুর সর্ব শরীর। ফুলমালা পরালেন নিজ হাতে। স্বহস্তেই শয্যা প্রস্তুত করলেন। এ তো গেল দেহের আরাম। এহ বাহ্য। মনের আরামই বড় কথা। তাই কীর্তনানন্দও দিলেন। এ বস্তু ভূমণ্ডলে পাওয়া যায় না। দেখা যায় না; এমন কি শোনাও যায় না। তাই জগতে অদ্বিতীয় হয়ে রইলেন অদ্বৈত অতিথি সৎকারে।

'সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে'— প্রভুর এ এক অভূতপূর্ব দিগদর্শন। সন্ন্যাসী বলতে প্রভু এক অনুসরণ যোগ্য পুরুষের কথাই বলেছেন। আসলে সন্ন্যাসীই হোন, আর গৃহীই হোন, লোকমান্য সব ব্যক্তিরই জীবনে এই দিগদর্শনটি আচরণীয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায় এক বিপরীত চিত্র। বাড়ীতে গুরু এলেন। অমনি বাড়ীশুদ্ধ লোক ছুটল, আর গুরুর শ্রীচরণতলে ধরল এক জামবাটি জল। সেই পাদোদক পান করে তারা স্বর্গ গমনের সোপান তৈরী করল।

এক পাট চুকল। এবার দ্বিতীয় পাট আরম্ভ হল। শ্রীগুরুদেব একা। তাঁকে আহার্য দেয়া হল দশ জনের পরিমাণ। এটা ইচ্ছাকৃত। ভোজনপর্ব সমাধা হতে না হতেই কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ঐ উচ্ছিষ্টের জন্য। কার আগে কে এঁটো খেতে পারে। ঐ সুরলোক প্রাপ্তির বাসনা। প্রভুর চিন্তাধারা এই লোকাচারের প্রতীপ। এ সব লোকাচার তো স্বার্থগন্ধী বাহ্যবস্তু মাত্র। এতে তো অহৈতুকী ভক্তি নেই। যেখানে এই ভক্তি নেই, সেখানে প্রভুও নেই। দীর্ঘকাল ধরে একটা প্রথা চলে আসছে— অমনি সেটা শাস্ত্রের বিধান হয়ে যাবে? না, প্রভু তা মানেন না। যুক্তির নিকষ পাথরে সেটি পরখ করে নিতে হবে। ভগবান বুদ্ধও একই দিশারী আলোর দীপ জ্বেলে শিষ্যদের বলেছিলেন,

'তাপাচ্ছেদাচ্চ নিকষাৎ সুবর্ণমিব পণ্ডিতৈঃ।
পরীক্ষ্য ভিক্ষবো গ্রাহ্যং মদ্বচো ন তু গৌরবাৎ।"

—স্বর্ণকার যেমন সোনাকে পুড়িয়ে, ঘষে, মেজে তার সত্যতা পরীক্ষা করে, তাঁর শিষ্যরা যেন তাঁর উপদেশ বাণী সেইভাবে পরীক্ষা করে

সত্যাসত্য যাচাই করে। প্রভুর ইষ্টবস্তু অর্থাৎ সেই 'নবকিশোর নটবর / গোপবেশ বেণুকর'ও এই লোকাচার ধারাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। না, শুধু প্রত্যাখ্যান কেন— প্রতিরোধও করেছেন।

নিত্যানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য ব্রজবাসীরা ইন্দ্র পুজোর আয়োজন করলেন। বিপুল আয়োজন। প্রতুল উপকরণ। পুজো আরম্ভ হবে— এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ পিতা নন্দকে শুধোলেন,

"জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়ম স্থ তিষ্ঠতি।
বিদুষঃ কর্মসিদ্ধিঃ স্যাত্তথা নাবিদুষো ভবেৎ॥
তত্রতাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভনতাম॥"

—এই জগতে কেউ জেনে, আবার কেউ না জেনে কর্মানুষ্ঠান করেন, বিজ্ঞব্যক্তির কার্যসিদ্ধির মত কিন্তু অজ্ঞের কার্যসিদ্ধি হয় না। সুতরাং আমি জিজ্ঞেস করছি, 'আপনাদের এই কর্ম কি বিচারপূর্বক কৃত, না লোকাচার মতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে? আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

নন্দমহারাজ বললেন, 'বৎস! আমাদের জীবন ও জীবিকার মূল হচ্ছে ধেনুকুল। সেই ধেনুগণ বাঁচে তৃণের ওপর, আর সেই তৃণের জন্য প্রয়োজন বারি, আর বারির জন্য প্রয়োজন মেঘ-বৃষ্টি, আর এই বৃষ্টির অধিপতি হচ্ছেন ইন্দ্র এবং মেঘকূল তারই মূর্তি -

"পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রাণীনং জীবনং পয়ঃ॥"

প্রতিবাদ করলেন শ্রীকৃষ্ণ,

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মনৈব বিলীয়তে।
সুখং দুখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মনৈবাভিপদ্যতে॥"

জীব কর্মের দ্বারাই জন্ম গ্রহণ করে, আবার কর্মের দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কর্মের দ্বারাই সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করে। আরও খোলসা করে বললেন,

"কিমিন্দ্রেনেহ ভূতানাং স্ব স্ব কর্ম্মানুবর্ত্তিনাম।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাব বিহিতং নৃণাম॥"

—নিজ নিজ প্রাক্তন কর্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগকারী প্রাণিগণের এবং মনুষ্যগণের প্রাক্তন সংস্কার বিহিত কর্মকে অন্যথা করতে ইন্দ্র অক্ষম। সেই ইন্দ্রের পুজো করলে কি ফল পাওয়া যাবে?

শ্রীকৃষ্ণের কথা নন্দ ও ব্রজবাসীরা মেনে নিলেন এবং ইন্দ্র পুজো বন্ধ করলেন। তখন ব্রজেশ তনয় বললেন, 'ধেনুই আমাদের জীবন রক্ষা করছে এবং সুখে রেখেছে, আর গোবর্ধনের তৃণভূমিতে চরে সেই ধেনু। সুতরাং আসুন, আমরা গো, গোবর্ধন ও ব্রাহ্মণের পুজো করি।' আরও বললেন, "……কর্মৈব গুরুরীশ্বরঃ" (কর্মই জীবের গুরু ও ঈশ্বর)

আরও বিশদভাবে বললেন, "অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম।" (কারণ যে ব্যক্তি যা দ্বারা সুখে থাকে, সেই ব্যক্তির সেই বস্তুই হচ্ছে দেবতা।)

ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা দীর্ঘ দিনের এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে পুজো অর্চনা চলে আসছে। ভ্রান্তিতে অপায়ই আসবে। সুখের উপায় হবে না। শ্রীকৃষ্ণের অকাট্য যুক্তি মেনে নিলেন সবাই। দীর্ঘদিনের লোকাচার লোকালয়ের অন্তরালে চলে গেল। দীর্ঘদিনের লোকাচার হলেও তা যুক্তিসঙ্গত না হলে প্রভু মেনে নিতে রাজী নন। তাই

উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে সোচ্চার হল প্রভুর কণ্ঠ।

যা হোক, নিতাই-গৌর শয়ন করলেন। নিত্যানন্দের নিদ্রা আসছে না। কেন? তিন দিনের পথশ্রম, তাও অনাহারে। তার ওপর আবার অদ্বৈতগৃহে সেবার পর উদণ্ড নৃত্য। শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই তো চোখজোড়া ঘুমে জড়িয়ে আসার কথা। না, চোখের দুই পাতা এক করতে পারছেন না। তাঁর বড় চিন্তা নদীয়াবাসীদের জন্য, বিশেষ করে শচীমাতা ও বধূমাতার জন্য। চন্দ্রশেখরকে পাঠিয়েছেন। হ্যাঁ, আচার্য যোগ্য ব্যক্তিই। শচীমাতা না হয় এলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া? সন্ন্যাসীর তো স্ত্রীর মুখদর্শন শাস্ত্র বিরুদ্ধ; কিন্তু প্রিয়াজীকে রেখে কি শচীমাতা আসবেন? আবার সপ্রিয়াজী শচীমাতা যদি আসেন, তা হলেও তো বিপদ। তখন যদি প্রভু সবাইকে ত্যাগ করে চলে যান? তাতে হবে বিপর্যয়-মহাবিপর্যয়, কারণ তাতে যে হবে বিষ্ণুপ্রিয়ার অবমাননা। চিন্তার এই কাঁটাগুলো তোলপাড় করছিল নিত্যানন্দের মন। পরিশেষে সব সংশয় কাটিয়ে দাদা ভাইকে শুধোলেন, 'আচ্ছা প্রভু, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' প্রভু কৌতুকের সুরে বললেন, 'একটা কেন, একাধিকই কর না।" নবদ্বীপের কথা তোমার মনে পড়ে?' জিজ্ঞেস করলেন অবধূত। প্রভু সোচ্চার হয়ে বললেন, 'আমি তো এখন বিভুঁয়ে আছি। 'নবদ্বীপই তো আমার আসল ভুঁই—আমার প্রাণ। প্রাণ ছাড়া কি জীব বাঁচে?' নিত্যানন্দ বললেন, 'আমি আচার্য চন্দ্রশেখরকে পাঠিয়েছি নবদ্বীপবাসীদের খবর দিতে। তাঁরা কি সবাই আসবেন?' প্রভু একটু আনমনা ছিলেন, বললেন,

নিশ্চয়ই। যাঁরা আসতে চান, তাঁরা সবাই আসবেন। এতে আর বাধা কোথায়?

নিত্যানন্দের ধন্দ-দ্বন্দ্ব কাটল না। তাই একটা শব্দের ওপর জোড় দিয়ে শুধোলেন, "সবাই?" এই 'সবাই' শব্দটির ওপর ধ্বনির চাপ সচেতন করল প্রভুকে। বললেন, 'একজন বাদে।' —এই একজন যে কোন জন তা বুঝতে বাকী রইল না অবধূতের।

আট মাইল। শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ— এই আট মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। তাই অরুণোদয়ের আগেই রওনা হলেন অবধূত। অবশ্য নিতাই চাঁদের বেশী সময় লাগবে না। ছুটতে-লাফাতে অবধূতের জুড়ি কোথায়?

যথাসময়ে পৌছালেন নবদ্বীপে। এ কী দশা নবদ্বীপের! এত বড় নগরে কি জন-প্রাণী নেই। মাত্র তো একটি মানুষ চলে গেছেন এখান থেকে। কিন্তু তিনি নিজে কেন ধীরগতি। বিদ্যুৎ গতিতে যিনি চলেন, তাঁর পদদ্বয়ে আজ দ্বন্দ্ব কেন? এক পা এগোচ্ছে তো অন্য পা পিছিয়ে যাচ্ছে। এ আবার কেমন চলা। এমনি করেই চলতে চলতে এলেন প্রভুর গৃহে। এ কী বাড়ীর হাল! গোটা বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। শচীমাতা নিমাইয়ের সেই গৃহত্যাগের দিন থেকেই অন্নজল ত্যাগ করেছেন। ভুঁয়ে পড়ে আছেন। তাঁর সেবা-যত্ন করছেন শ্রীবাস পত্নী মালিনী দেবী। আর প্রিয়াজী? সেই 'ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা'র এ কী মূর্তি! অবধূতের বাকরোধ হয়ে এল। চোখের জল ঝরতে লাগল অঝোরে। কিন্তু তাঁর যে সময় নেই। বেলা তো বসে নেই। নিত্যানন্দের আগমন

যেখানে অগণন জন সেখানে। কিন্তু এই যে একটু আগেই অবধূত দেখলেন জনশূন্য পুরী। ঠিকই দেখেছেন। অচলকে মানুষ বলে না। পর্বতের আরেক নাম অচল। চলমানকেই মানুষ বলে। নবদ্বীপচন্দ্র বিহনে তাঁরা সবাই আঁধার দেখছেন। তাই চলতে পারছেন না। তাঁদের অশন নেই। বসনও তাঁদের শ্লথ। গতি রুদ্ধ। কপাট রুদ্ধ। তাই এতক্ষণ তাঁদের দেখা যাচ্ছিল না। তবে যে এখন জনারণ্য? তাঁরা যে শুনেছেন অবধূতের আগমন বার্তা। তাই শুনতে এসেছেন তাঁদের প্রাণের ঠাকুরের সংবাদ। রুদ্ধদ্বার তাই অর্গল মুক্ত হল।

গৃহাঙ্গনে আর তিলঠাঁই নেই। সমস্ত অঙ্গন জুড়ে উঠল কান্নার কলরোল। কিন্তু নিত্যানন্দের যে সময় নেই— না, এঁদের সঙ্গে কাঁদবার, না এঁদের কান্না থামাবার। নিতাইচাঁদ তাই নিবেদন করলেন শচী মায়ের কাছে প্রভুর সন্ন্যাস আর শান্তিপুরে অবস্থানের কথা। আরও জানালেন, 'আমি প্রভুর অনুমতি নিয়েই এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। দোলা প্রস্তুত। আর দেরী করা চলে না।'

শচী দেবীকে মালিনী দেবী দোলার কাছে নিয়ে এলেন। এমন সময় শাড়ীর খসখস, চুড়ির রুনু-ঝুনু। বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। না, নিত্যানন্দের কপালে শুধু ফাঁপরেরই পাহাড়। পদে পদে, ঘাটে ঘাটে শুধু বাধা আর বাধা। এখন নিতাইচাঁদ কি করেন? ওদিকে বেলা যে বেড়ে যাচ্ছে। তাই সরাসরি আসল কথাটাই বললেন, 'মা, প্রভু এখন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর তো স্ত্রীর মুখ দর্শন চলে না। শচীদেবী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,

'তাহলে আমার যাওয়াও হবে না। বৌমার এমন কি অপরাধ—দূর থেকে একটুখানি দেখতেও পারবে না। বৌমা ওর স্ত্রী এটাই একটা অপরাধ হল। ও যে পথে চলে গেছে, সে পথের কাঁটা হবে বৌমা? আমার বৌমা তো সে মেয়েই নয়। নিতাই, তুমি দোলা ফিরিয়ে দাও। আমি যাব না। আমার আর কারুকে দেখার দরকার নেই। আমি শুধু আমার বৌমাকে নিয়েই থাকব। ওই আমার সব।'

এ যে আরেক ফেসাদ। না, আর পারা যায় না। অবধূতের অদৃষ্টে অবধারিতভাবে অপায়ের উদয় হবেই। নারীর সম্পদ তিনটি: হ্রী, শ্রী, ধী। এই তিন সম্পদেই ঋদ্ধা প্রিয়াজী। এখন ধী'র পরিচয় দিলেন: সরে গেলেন স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে। কি সে ইঙ্গিত? না, তিনি আদৌ ক্ষুব্ধ নন। মা তাঁকে ছাড়াই অনায়াসে যেতে পারেন।

নিত্যানন্দ চতুর শিরোমণি। প্রিয়াজীর গমন ভঙ্গিতেই তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলেন। ইতিমধ্যে শচীদেবী অঙ্গনের দোলা থেকে ঘরে চলে এসেছেন তার আদরের ধন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। ঘরের দিকে ছুটলেন অবধূত। বললেন, 'মা, বৌমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। তুমি চল। বিষ্ণুপ্রিয়া তোমাকে যেতেই বলছে। বেলা বেড়েই যাচ্ছে। ওদিকে গোটা শান্তিপুর ভেঙ্গে পড়েছে আচার্যগৃহে। নদীয়ার এত লোক ঢুকতেই পারবে না দেরী করলে।'

এই এতক্ষণে প্রিয়াজী মুখ খুললেন, 'হ্যাঁ, মা, তুমি যাও। আমার নাই বা হল যাওয়া। তবুও তো আমি ওঁর স্ত্রী। একথা

সবাই জানে। আজ হাজার হাজার লোক দেখতে যাচ্ছে আমারই স্বামীকে। এ কি আমার কম গর্ব? আমি খুশি মনেই বলছি মা, তুমি চলে যাও।' কে বলে নিতাইর বিপদ ঘাটে ঘাটে? এই তো মেঘ কেটে গেল; আকাশ নীল হল। শচীদেবী দোলায় চাপলেন। এদিকে শচীমাতার গৃহে জন সমুদ্র। অমিত্রের সংখ্যাও অগণন। তাদের চোখেও জল। অনুতাপানলে দগ্ধ এরা। তাই এত আগ্রহ প্রভুকে দর্শন করবার। সফল সন্ন্যাস গৌর গুণমণির। আজ এ কী বিসদৃশ দৃশ্য! দ্রোহীর চোখেও জল!! কই তিনি তো শস্ত্র-শাস্ত্রের লড়াই করেন নি তাদের সঙ্গে। করেন নি কোন কলহ। নীরবে ত্যাগ করেছেন সব কিছু। পরমাশ্চর্য ত্যাগ— যে ত্যাগ শত্রু-মিত্রকে সমানভাবে ভাসাল চোখের জলে। কই, তিনি তো অমিত্রকেও অবহেলা করেন নি। যেমনটি করেন নি যীশুও। যীশু বলেছেন, 'পাপকে ঘৃণা করবে। পাপীকে নয়।' প্রভুর এই অনবদ্য ত্যাগ দ্রোহীর মনের পাপ ধুয়ে ফেলল তাদেরই চোখের জলে। অভক্তও ভক্ত হল। ভক্তের জন্য আর কতটুকু করণীয় থাকে? তার মনোভূমি তো উর্বর ও কর্ষিত। কর্ষিত ভূমির আর কর্ষণের কী প্রয়োজন? বিজয়ীর সুখানুভূতি কোথায়? না, যেখানে পতিত জমির উদ্ধার হয় কর্ষণে। প্রভুর এই নিরুপাখ্য ত্যাগই আকর্ষণ করে কর্ষণ করল এই দ্রোহী দলের পতিত মনোভূমি। ফলে সোনা ফলল। তাই তারাও চলল। দোলা আগে যায়, আর পেছনে অজস্রজন ধায়।

যথাসময়ে দোলা এল অদ্বৈত আলয়ে। পেছনে জন সমুদ্র। আবার এখানেও আরেক জনার্ণব। নিত্যানন্দের অনুমান প্রমাণ

হয়ে গেল। রাতেই প্রভুর আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল বায়ুবেগে। বাঁচোয়া রাত্রে লোক সংঘট্ট দেখা দেয় নি। দিলে প্রভুর অশন-শয়ন বিঘ্নিত হত। কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই লোক আসতে লাগল কাতারে কাতারে। সারা শান্তিপুর ভেঙ্গে পড়ল আচার্য আবাসে। তবুও ভালো প্রভু ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান সমাপন করে রেখেছিলেন। চিন্তার বলি রেখা দেখা দিল আচার্য ললাটে। তাইতো, তাঁর এতকালের বসবাস শান্তিপুরে। শিষ্য-ভক্ত সংখ্যাও তো কম নয়। কিন্তু এই লোকসংঘট্ট তো কোনো দিন দেখেন নি তাঁর এই উত্তর পঞ্চাশ জীবনকালে। আহা! গৌরসুন্দরের আকর্ষণ অয়স্কান্ত মণিকেও হার মানায়!

যা হোক, তিনি একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন। আচ্ছা, যদি গৌরসুন্দর উঁচু জায়গায় দাঁড়ায়, তাহলে জনারণ্যের আড়ালে যারা পড়ে গেছে, তারাও গৌরহরিকে দেখতে পাবে। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। গৌরচন্দ্রকে নিয়ে তিনি ছাদে উঠলেন। অমনি জন সমুদ্রে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ দেখা দিল। ভক্তবৃন্দের আনন্দে প্রভুও প্রফুল্ল। পরম আহ্লাদ অদ্বৈতেরও।

এমন সময় নদীয়া এসে ভেঙ্গে পড়ল। মুখে অবিরাম হরিধ্বনি। যিনি যা ভালোবাসেন, তাই দিয়েই না তাঁকে বরণ করতে হয়। নদীয়া লীলায় প্রভু ঘরে ঘরে, নরে নরে, যারে তারে নাম বিলিয়ে এসেছেন। তাই জনগণ গাইছেন হরিনাম। অবিরাম গাইছেন। এমন সময় কে যেন বলল, ঐ তো দোলাতে এলেন শচীমাতা।

না, প্রভু আর থাকতে পারলেন না। বিদ্যুৎ বেগে নেমে এলেন।

সন্ন্যাসী তো সোঅহং। সন্ন্যাসী একমাত্র অপর সন্ন্যাসীকেই প্রণাম করে। না, প্রভুর কাছে এহ বাহ্য। চিরাচরিত আচার, আচার মাত্র। বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ সত্তার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। যুক্তিহীন নিয়ম নিগড় প্রভু বরাবরই ভেঙ্গে ফেলেন। সরলীকরণ করেন জন জীবন। তাই শচীদেবী দোলা থেকে নামা মাত্রই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন প্রভু। সাষ্টাঙ্গে। আদরাশিসে শচীদেবী পুত্রের শির স্পর্শ করলেন। করেই হাহাকার করে উঠলেন। কোথায় সেই চাঁচর কেশ কলাপ। চোখ জোড়া এতক্ষণ ছিল বাষ্পায়িত। সারাটা পথই তো কেঁদে ভাসিয়েছেন। এখন চোখ খুলতেই চমকে উঠলেন : এ কি! এ যে ডোর কৌপীন! কোথায় সেই আলো ঝলমল পট্ট বস্ত্র? এ তাঁর কোন নিমাই? এই নিমাইকে দেখার জন্য কি এই সাতষট্টি বছর বয়সকাল অবধি তিনি বেঁচে আছেন? হা কপাল! —এ হেন মনোবিলাপে কপালে করাঘাত করতে করতে শচীদেবী সংজ্ঞাহারা হলেন। শচীদেবীর এই অন্তর বিলাপের অন্তরঙ্গ রূপ দিয়েছেন সঙ্গী বাসু ঘোষ :

'নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে, আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্ন্যাসী বেশ, দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
করজোড়ি অনুরাগে, দাঁড়াল মায়ের আগে, পড়িলেন দণ্ডবৎ হয়ে।
দুই হাত তুলি বুকে, চুম্ব দিল চাঁদ মুখে, কান্দে শচী গলাটি ধরিয়ে॥
ইহার লাগিয়া যত, পড়ালাম ভাগবত, এ দুঃখ কহিব আমি কায়?
অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়?

এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ডধারী. ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।

জীবন্ত থাকিতে মায়. উহা নাকি দেখা যায়, কার বোলে হইলা বৈরাগী ?
গৌরাঙ্গের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে, আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে, ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥

বাহ্য ফিরে পেলেন শচীদেবী সবার যত্নে। ভাবছেন নিমাই তো এখন সন্ন্যাসী। সোঽহং। তার মা নেই, বাবা নেই, ঘর নেই, ঘরণী নেই। তিনকুলে কেউ নেই। কত আদরেই না এতকাল 'নিমাই' বলে ডেকেছেন। সে নামও এখন ধুয়ে মুছে গেছে। সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য লোককে, গৃহাশ্রমের লোককে তার প্রণাম চলে না। শচীদেবী তো সন্ন্যাসিনী নন। তবুও যে নিমাই তাঁকে প্রণাম করল, আর তিনিও তো সে প্রণাম গ্রহণ করলেন। এতে কি তাঁর অপরাধ হল ? এই চিন্তায় মনটি দ্বিধা দীর্ণ হল। আবার চিন্তা ধারা অন্য বাঁক নিল। হোক সে সন্ন্যাসী। নাই বা রইল তার ঘর ঘরণী। তবুও তো সে তাঁর পেটেরই ছেলে। পেটে যে তিনি ধরেছেন, দীর্ঘ তের মাস ধরে ধরেছেন, তা তো আর মুছে যায় নি। সান্ত্বনা পেলেন শচীদেবী।

রান্না কেমন ?— না, শচীমাতার রন্ধন। পরবর্তী জীবনে গৌরসুন্দরও বলেছেন. 'আমি থাকব চার স্থানে! শচীমাতার রন্ধনে, নিত্যানন্দের নর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে আর রাঘব ভবনে। নদীয়া লীলায় নিত্যানন্দের উদ্দণ্ড নর্তন ও শ্রীবাস অঙ্গনের রসাস্বাদন হয়েছে। এখন শচীমাতার রন্ধন। শচীমাতা অনশন ক্লিষ্টা। না, তাতে তাঁর

ক্লেশ নেই। বরং বড়ই আনন্দের দিন তাঁর আজ। তিনি যে ছেলেকে নিজ হাতে খাওয়াবেন। ছেলে তাঁর শাক-প্রিয়। তাও কি একরকম? এক নয়, দুই নয়, একেবারে বাইশ রকম। আবার ছেলে তাঁর মোচাঘণ্ট ভালোবাসে। এতকাল ধরে তিনি খাইয়ে আসছেন। তিনি ছাড়া আর কে ভালো জানে তাঁর ছেলে কি খেতে ভালোবাসে। না, আর দেরী নয়। গঙ্গাস্নানে গেলেন শচীদেবী। স্নানান্তে এসেই ঢুকলেন রন্ধনশালায়। পরম আহ্লাদে রন্ধন করলেন। কত রকম পদ যে রান্না করলেন! মনের সাধ মিটিয়ে রান্না করলেন। মনের সাধেই যে খাওয়াবেন। খাওয়াবেন নিজ হাতে নিজের ছেলেকে। তাঁর দুই ছেলেকে—নিমাই-নিতাইকে। নিমাই? নিমাই নাম তো আর নেই। কে বলে নেই। ঐ ভারতী ঠাকুর চৈতন্যচাঁদ দিয়েছেন বলে। তাঁর কাছে চৈতন্যচাঁদই নিমাইচাঁদ, চির দিনই নিমাইচাঁদ।

সময় শনৈঃ শনৈঃ কাটে। প্রভু শান্তিপুরে আসেন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের সাতাশে জানুয়ারী। পরের দিন থেকেই আকুল হয়ে উঠলেন। অস্থির হলেন বৃন্দাবন যাত্রার জন্য। ব্রজধামেই গেলেই না তিনি প্রাপ্ত হবেন তাঁর ব্রজেন্দ্র নন্দনকে। সর্বোত্তম ভজনস্থলই যে বৃন্দাবন।

কিন্তু বিঘ্ন যে একাধিক। প্রথমত তাঁর মা। ঐ যোজন দূরের বৃন্দাবনে গেলে কি তাঁর মা'র সঙ্গে যোগসূত্র থাকবে?—না, থাকবে না। বৃন্দাবন যে সেই বৃন্দাবন চন্দ্রের বৃন্দাবন নেই। এখন শুধু বন-বাদাড়। বন জঙ্গলে কি আর লোকের গতাগতি চলে? আবার অতদূরে গেলে নিতাই সান্নিধ্যও হারাতে হয়। নিতাই

ছাড়া কি নিমাইয়ের চলে ? নিত্যানন্দ যে তাঁর অগ্রজ। সেই বিশ্বরূপ। অবধূত তো তাঁর অভিন্ন আত্মা। নিমাই-নিতাই এক তনু। শুধু লীলার্থে দুই। পরবর্তী কালে প্রভু বলেছেন, 'যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।' বৃন্দাবনও বলেছেন,

"এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হইতে॥"

কবিরাজ গোস্বামী সাবধান বাণী শুনিয়েছেন তাঁর ভাইকে :

"দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দে না মান তোমার হবে সর্বনাশ॥"

সে হেন নিতাইচাঁদকে চোখের আড়াল করা একেবারেই দুঃসাধ্য। শুধু অবধূত কেন, কোন ভক্তই যে তাঁর দূর দেশে গমনের কথা ভাবতে পারেন না।

'শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।' পূর্ব-পূর্ব চার রসের গুণ মধুর রসের সঙ্গে মিশে যায়।

আর এই পঞ্চরসেরই রসাস্বাদন করেছেন প্রভু তাঁর নদীয়া লীলায়। শান্তরসের আশ্রয় হচ্ছে তাঁর অগণন ভক্ত। শ্রীবাসের মধ্যে দাস্য। গদাধরের মধ্যে সখ্য। বাৎসল্যে ভরপুর শ্রীঅদ্বৈত। আর এই চার রসের ধুর্য যে মধুর, সেই মধুর রসের আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ।

যথার্থ বলেছেন কবিরাজ,

"পঞ্চতত্ত্ব একরূপ নাহি কিছু ভেদ।
লীলা আস্বাদন তরে বিবিধ বিভেদ॥"

তাইতো বৃন্দাবন যাত্রা আর হয়ে ওঠে না। দিন যায় রাত্রি আসে। রাত্রি যায়-দিন আসে। আর প্রভুর প্রাণ আকুল হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশে। কিন্তু ভক্তরা যে ছাড়তে চাইছেন না। ছাড়তে চাইছেন না হরিদাসও। এই হতাদর ভক্ত প্রবর যে মান ও আদর পেয়েছেন প্রভুর কাছে, তা কি জগতে আর কারুর কাছে পাবেন ? পাবেন না। পাবেন না বলেই

"হেনই সময়ে সেই প্রভু হরিদাস।
দন্তে তৃণ ধরি পড়ে পদাম্বুজ পাশ ॥
অতি আর্তনাদে কান্দে সকরুণ স্বরে।
শুনিতে সকল লোক হৃদয় বিদরে ॥'

বড়ই প্রতিকূল পরিস্থিতি। তখন প্রভুই বললেন, 'তাহলে তোমরাই বল সমস্যার সমাধান কি? সন্ন্যাস গ্রহণ আমার হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী তো তাঁর পরিবার বর্গ ও আত্মীয় স্বজন নিয়ে নিজ ভুঁয়ে বাস করতে পারেন না। তাহলে এক কাজ কর —তোমাদের প্রতিবেশী একটি এমন রাজ্য ঠিক কর যেখানে বাংলার লোকের যাতায়াত আছে। তোমরাও খবর নিতে পারবে, আর আমিও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে অদূর পথ অনায়াসে অতিক্রম করে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারব।'

হৃষ্ট হলেন সবাই। সমাধানের পথ পেলে বড়ই শান্তি আসে মনে। সেই শান্তিতেই ছুটলেন সবাই শচীমাতার কাছে। নিবেদন করলেন প্রভুর ইচ্ছা। সব শুনে শচীমাতাই নিরাকরণ করলেন, বললেন, 'সে যদি এখানে থাকে, তাহলে আমার পরম সুখ। কিন্তু

তাতে যে তার নিন্দা হবে। আমার দুঃখ সইবার শক্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন; কিন্তু ওর নিন্দেতে তো আমার দুঃখই বাড়বে। তার সুখেই না আমার সুখ। আমার নিজের দুঃখ আমি দুঃখ বলে মনে করিনা।'

উদগ্রীব ভক্তরা শুধালেন, 'তাহলে উপায়?'

শচীমাতা বললেন,

"... ... ... ।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য হয়॥
নীলাচল-নবদ্বীপ সেই দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তার হবে আগমন॥'

আনন্দে ভরে গেল সবার মন। প্রভুকে জানালেন মায়ের সিদ্ধান্ত। শুনে এক দুর্বহ ভার যেন দূর হল মন থেকে। তাই প্রভু প্রফুল্ল বদনে বললেন,

"ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ সংকীর্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান।'

ভাসলেন সবাই সুখের সাগরে। কিন্তু দুঃখের পারাবার দেখলেন একজন। তিনি প্রভুগত প্রাণ হরিদাস।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন হরিদাস। কাঁদবেন বৈকি। তিনি যে

যবন। তিনি যে চির-হতাদর। বহু ভাগ্যে প্রভু আর আচার্যের আশ্রয় পেয়েছেন। প্রভু চলে গেলে কে আর এমন প্রেমাশ্রয় তাঁকে দেবেন? যবনের কি ঠাঁই হবে শ্রীক্ষেত্রে? তাই দুঃখক্লিষ্ট কণ্ঠে হরিদাস বলছেন,

"নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম না পাইয়া তোমার দর্শন।
কেমনে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥"

পরমাশ্চর্য দৈন্য হরিদাসের। এই দৈন্যই না বৈষ্ণবের পরম ধন। একমাত্র ধন বুঝিবা। প্রভু বাক্য 'তৃণাদপি সুনীচেন' কত সুঠাম, সুডৌল, সুন্দর মূর্তি পেয়েছে হরিদাসের মধ্যে। মুলুক পতির আদেশে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত খেয়েও যিনি হরিনাম বদন ছাড়া করেন নি, সেই তিনি বলছেন তাঁর 'পাপিষ্ঠ জীবন'। না, প্রভু আর সইতে পারলেন না। আকুল প্রাণে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে:

"প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥
তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥"

প্রভু বাক্যে সকল ভক্তের মন আহ্লাদে ভরে গেল। আচার্য বললেন, 'হরিদাস, আর চিন্তা নেই তোমার। প্রভু তোমার নীলাচল বাসের ব্যবস্থা করবেনই। প্রভু বাক্য শ্রুতি বাক্য। না, শুধু শ্রুতি বাক্যই না। উনি যে স্বয়ং মূর্ত, বাঙ্ময় শ্রুতি। শুধু স্বল্প

সময়ের অপেক্ষা মাত্র। প্রভু তোমাকে ঐ নীলাচলেই নিত্য দর্শন দেবেন. আর প্রভুর গণের নিত্য অঙ্গ সঙ্গ লাভ হবে তোমার। তুমি নামাচার্য। নাম শুধু তোমার প্রাণ নয়, প্রাণেরও অধিক। তোমার জীবন। সেই জীবনেরই রসাস্বাদন করবে তুমি ভক্তগণের সঙ্গে।"

সব সমস্যার সমাধান হল। শচীদেবী. নিত্যানন্দ. অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, হরিদাস সকলেরই মনের মেঘ কেটে গেল। সবাই এখন প্রফুল্ল চিত্ত। তবুও অদ্বৈতের প্রাণের আকুলতা মেটেনা। প্রভু সান্নিধ্যে কৃষ্ণানুশীলন মানেই প্রতিক্ষণে নামের মধুর আস্বাদন, যা অন্য কারুর সঙ্গে সঙ্গ লাভে হয়না। তাই আচার্য নিবেদন করলেন, 'যাক্, তোমাকে তো আর আমরা ধরে রাখছি না। সুনিশ্চিত তোমাব যাওয়া। আর মাত্র ২/৪ দিন যদি তোমার সঙ্গ পাই……।

অদ্বৈত বাক্য শেষ না হতেই প্রভু বললেন, 'বেশতো, তোমার কোন কথা তো আমি কোনদিন লঙ্ঘন করিনি. আজও করবনা। আমাব ইচ্ছেটা আমার বশ, কিন্তু আমি তো তোমাদেব বশ।

প্রভু বাক্য শেষ না হতেই চারদিক হরিধ্বনিতে মহা কলরোল পড়ে গেল।

আহার্যের অমৃতোপম স্বাদ মানেই শচীদেবীর রন্ধন। তাই নিত্য বন্ধন করেন শচীদেবী। নিজ হাতে খাওয়ান দুই ছেলেকে, আচার্যকে আর অন্যান্য ভক্তদের। নিত্যই মহোৎসব লেগে আছে আচার্য গৃহে। 'প্রতিদিন করে আচার্য মহামহোৎসব।'

পরম কৌতুকী পুরুষ প্রভু। তাই দিন কাটে কৌতুক আর

কৃষ্ণ কথার রসাস্বাদনে। অমরাবতীর সুখ কোন ছাড় এই সুখের কাছে? ভক্ত জীবনের, তাঁদের সারাজীবনের জীবাতু এই সুখ।

আর 'রবি যখন বৈসে পাটে',* আরম্ভ হয় সংকীর্ত্তন। সে এক মহামহোৎসব। 'রাত্রে মহা-মহোৎসব সংকীর্তন রঙ্গে।'

অদ্বৈতের সর্ব শরীর ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়। কদম্ব কেশরের মত অসীম পুলকে। এই সাধক প্রবরের গৃহে সংকীর্তন তো আজকের নয়। অগণন তাঁর শিষ্য ভক্ত। কৃষ্ণানুশীলনই তাঁর জীবন। কিন্তু রসের এত বড় ভিয়ান তো এর আগে কেউ দেখেন নি। প্রভু সঙ্গ তিনি এর আগেও লাভ করেছেন। কিন্তু এমন করে তো করেননি। তাই এত আহ্লাদ, এত আনন্দ অদ্বৈতের।

সন্ন্যাসীর ঠাঁই ঠিক হল। যাত্রার দিন কিন্তু ঠিক হয় না। অদ্বৈত আবাসে এসেছেন সেই জানুয়ারীর সাতাশ তারিখে। পরের দিন থেকেই প্রভুর মন আকুল হয়ে উঠেছিল বৃন্দাবন গমনের জন্য। সেই চিরবাঞ্ছিত-বৃন্দাবন যাওয়া হলনা এখনও। বৃন্দাবনের পরিবর্তে স্থান নির্ধারিত হল নীলাচল। বেশ, প্রভু তাই মেনে নিলেন। সবার কথায় স্বীকৃতি জানালেন প্রভু। তাদের আবার আবদার, বিশেষ করে অদ্বৈতের বাসনা আরো দু/চারদিনের বাস তাঁর গৃহে। এমনি করে দিন শুধু পিছিয়েই যায়। যাত্রার দিন আর স্থির হয়না। না, আর না। আর মন মানেনা। কবে তিনি জগন্নাথ দর্শন করবেন। কবে তিনি তাঁর আর্তি জানাতে পারবেন:

'জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে।' শেষকালে সেই শুভদিনটি এল: ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। দিন ঠিক হল। এখন

সঙ্গী নির্বাচনের পালা। আচার্যই নির্বাচন করলেন ঃ

'এই চারিজনে আচার্য দিল প্রভু সনে।' কোন্ চারিজনে ?

-- না, 'নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।

দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥'

না, আর বিলম্ব নয়। তাই প্রভু

"... ... ... ।

জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে॥" আর

'তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন।' ফলে কি হল ?

'এথা আচার্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥'

এ ক্রন্দন কি রকম ? — উপমায় বলেছেন বৃন্দাবন,

"যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।

ডুবিলেন মহাশোকে সমুদ্রের জলে॥"

মহাশোকে গোপীদের কি দশা হয়েছিল ? — না,

"গোপ্যস্তাস্ত দুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যাথিতা ভৃশম।

রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রুরং ব্রজমাগতম॥"

— তখন ব্রজগোপীরা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় অক্রুর নিয়ে যেতে এসেছেন শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

আর কি হল ?

"কাশ্চিৎ তৎকৃতহৃত্তাপ-শ্বাসম্লান মুখশ্রিয়ঃ।

স্রংসদ দুকুলবলয় কেশগ্রন্থশ্চ কাশ্চন॥"

— উক্ত সংবাদে কোন কোন গোপীর হৃদয়স্থ সন্তাপোত্থিত নিঃশ্বাসে মুখশ্রী ম্লান হল, আবার কোন কোন গোপীর বসন শিথিল ও কেশগ্রন্থি

স্খলিত হয়ে পড়ল। এঁরা ক্রন্দন করলেন না? —হ্যাঁ,

"এবং ব্রুবানা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্ত মানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ! দামোদর! মাধবেতি॥"

—কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজ নারীরা তাঁর বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে লজ্জা ত্যাগ করে, হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব! বলে উচ্চ কণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন।

এত তো ক্রন্দন রোল, তবুও

"অনাদ্র'ধীরেষ সমাস্থিতো রথং", তেমনি ক্রন্দনে কর্ণপাত করলেন না প্রভুও। দ্রুতপদে যাত্রা করলেন।

আবার বিঘ্ন! গমন দৃশ্য দেখে অদ্বৈত আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তাই

"কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পাছেতে লাগিলা।"

প্রভু ফিরে তাকালেন। গমন বিঘ্নিত হল। বললেন, 'আচার্য, তুমি বয়সে প্রবীণ, জীবনে অভিজ্ঞ। ভক্তিতে প্রবর। তোমার মত পুরুষ যদি ভেঙ্গে পড়ে, আর সবার দশা কি হবে? মা-ই বা কিভাবে বাঁচবেন?

"এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন॥"

কোন পথে নীলাদ্রি গমন করলেন?

— "গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে॥"

ষষ্ঠ অধ্যায়

নীলাদ্রি যাত্রা পথে লীলাবিলাস

পদব্রজে চলেছেন প্রভু। বদনে সুধামাখা ষোল নাম। সঙ্গী চার পার্ষদ। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর আর মুকুন্দ। হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে শুধোলেন,

"কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল॥"

চারজনই সমস্বরে বললেন, 'না, না, আমরা তো পাথেয় কিছু আনিনি। তোমার অনুমতি ছাড়া আমরা একদানা সুপুরীই কি আনতে পারি? তাছাড়া, তুমিই তো আমাদের পথের সম্বল। সর্ব বরিষ্ঠ সম্বল। তুমি যেখানে আছ, সেখানে আমাদের আর কোন কিছুরই দরকার নেই।'

আশ্বস্ত ও হৃষ্ট হলেন প্রভু। বললেন, 'দেখ, এই যে তোমরা সঙ্গে কিছু আননি, এতে আমার ভারি আহ্লাদ হল। কেন জান? এতে বুঝলাম তোমাদের কৃষ্ণ কৃপায় বিশ্বাস আছে। এই চরাচর তো তাঁরই। এখানে তিনি সবই দিয়েছেন। বৃক্ষে ফল দিয়েছেন, জলাশয়ে জল দিয়েছেন। ক্ষেতে শস্য দিয়েছেন। যার যতটুকু প্রাপ্য, সে ততটুকুই পাবে। অকারণে আকাঙ্ক্ষী ও সঞ্চয়ী হলে ইষ্টবস্তুর ধ্যান বিঘ্নিত হয়।'

যথার্থ বললেন প্রভু। গীতা সংবাদ দিচ্ছেন, 'জ্ঞেয় স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।' আকাঙ্ক্ষা থেকেই আসে সঞ্চয় প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি বিষ বাষ্পে ছেয়ে ফেলে মন। তখন সেই মনে ইষ্ট বস্তুর ধ্যান আর থাকে না। শুধুমাত্র থাকে ঐ পঙ্কিল বিষ বাষ্প। শ্বাস রোধ করে।

সঞ্চয় আর কোন্ ছার? কৃষ্ণগত প্রাণ হয়েইনা প্রভু আজ ঘরছাড়া হয়েছেন। বেছে নিয়েছেন বৃক্ষতল। অটল ভক্তি দেয় ভয় থেকে মুক্তি। ভয়ের কথা বলেছিলেন ভক্তেরা। উড়িষ্যা আর গৌড়। একে অপরের দ্রোহী। গৌড়েশ্বর যবন আর উড়িষ্যাপতি হচ্ছেন গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র। প্রান্তিক স্থানে অতন্দ্র প্রহরী। অথচ প্রান্তভূমি তো অতিক্রম করতেই হবে প্রভুকে। ভক্তেরা ভাবিত হয়ে তাই বলেছিলেন,

"দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাদস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥"

না, প্রভু-চিত্ত এ প্রস্তাব গ্রহণ করল না। তাঁর চিত্তভূমি যে অভীক হয়েছে ভাগবতের অভয় বাণীতে ঃ

"তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিদ ভ্রশন্তি মার্গাৎ ত্বয়িঃ বদ্ধ সৌহৃদাঃ
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায় কানীকপ মূর্ধস্বুপ্রভো॥"

—হে মাধব! যাঁরা আপনার ভক্ত, তাঁরা আপনাতে প্রীতিযুক্ত বলে কখনও মোক্ষ-পথ ভ্রষ্ট হন না। হে প্রভো! তাঁরা আপনার

দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে গুরুতর হেতু সমূহের ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন।

প্রভুরও যেন সেই বিচরণ। তাই—

"প্রভু বলে, যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য বলিব মুঞি কহিনু নিশ্চয়॥"

যাহোক কৃষ্ণকৃপা মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে প্রভু সপার্ষদ 'উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে।"

অনন্তের সুকৃতির অন্ত নেই। অনন্ত পণ্ডিতের গৃহ আটিসারা গ্রামে। বারুইপুরের কাছে। এখন লোকে বলে আটঘরা। তাঁরই গৃহে ভিক্ষা করলেন প্রভু সপার্ষদ। আজ তাই অনন্তের আনন্দের অন্ত নেই। যেমন,

বৃন্দাবন বলছেন,

"অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥" আর তাই—
'সন্তোষে ভিক্ষা সজ্জ করিতে লাগিলা।'

পার্ষদদের নিয়ে ভোজন করলেন প্রভু অনন্তের গৃহে। মধুর হরিনামে রাত কাটল। রাত বলতে সারারাত। বৃন্দাবন তাই আবার বলছেন,

"সর্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥"

ধন্য অনন্ত। ধন্য তাঁর গৃহ, সংকীর্তন পিতার সংকীর্তনে।

নামে মাতোয়ারা প্রভু। বিশ্রাম নিদ্রার বালাই নেই। ওদিকে মন সদা আকুল। কতক্ষণে জগন্নাথ দেবের দর্শন পাবেন।

তাই— "শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥"

সুরধুনীর কূল ধরেই প্রভু চললেন। পথে পেলেন খড়দহ, পানিহাটি। এরপরে পৌঁছুলেন ছত্রভোগ। পুরাণাখ্যান খ্যাত ছত্রভোগ। সেই সগর রাজার বংশধর উদ্ধার আর ভগীরথ কাহিনী। ভগীরথের ভজনে তুষ্ট হয়ে মন্দাকিনী এলেন মর্ত্যে। গঙ্গানুরাগে মিলিত হলেন মহাদেব। স্থানটি মাহাত্ম্য লাভ করল। নাম হল অম্বুলিঙ্গ ঘাট। শতমুখী গঙ্গা দর্শন করে বড়ই পুলকিত হলেন প্রভু। পুলকের প্রকাশ হল কীর্তনে। ক্ষণে ক্ষণে 'হা জগন্নাথ' 'হা জগন্নাথ' ধ্বনিতে হুঙ্কার দিচ্ছেন আর সংজ্ঞা হারাচ্ছেন। অঝোরে জল ঝরছে দু'নয়নে।

গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খান। জমিদার মানুষ! তিনি কি আর হেঁটে যাবেন? দোলায় যাচ্ছিলেন। হঠাৎ চোখ জোড়া প্রভুর ওপর পড়তেই আটকে গেল। তাইতো! কে এই নয়ন-নন্দন সন্ন্যাসী? এত রূপ! এ রূপ তো দূর থেকে দেখে আশ মেটে না। আর কি রামচন্দ্র দোলায় থাকতে পারেন? নেমে এলেন। প্রণত হলেন প্রভু পদে। প্রভু বললেন, 'বড়ই বাসনা জগন্নাথ দর্শনের। দুই রাজ্যের মধ্যে বিবাদ চলছে। যাত্রাপথ পদে পদে বিঘ্নিত। তুমি আমাদের যবন রাজ্য পার করে দাও।' রামচন্দ্র প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট। তবুও তৎকালীন পরিস্থিতির কথা প্রভুকে নিবেদন করলেন,

"পথিক পাইলে জন্তু বলি লয় প্রাণে।
... ...

"মুঞি সে নস্কর, এথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে, মাগে সংশয় আমার॥"

হোক সংশয় তাঁর ওপর। প্রভুর সেবায় যে তাঁকে আসতেই হবে। তাই বললেন,

'তথাপিও যে-তে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥'

তবে তাঁর একটি ভক্তি বিনম্র নিবেদনঃ প্রভুকে সপার্ষদ তাঁর গৃহে ভোজন করতে হবে। ঘোর বিষয়ী লোক, তবুও রামচন্দ্রের মনটি ভক্তিতে ভরপুর। এটি প্রভু প্রথম সাক্ষাতেই লক্ষ্য করেছেন। তাই আনন্দে সম্মতি জানালেন। জমিদারী ব্যাপার। রাজসিক আহারের আয়োজন। কিন্তু প্রভুর মন যে পড়ে আছে জগন্নাথ পদে। আহা! কতক্ষণে সেই শ্রীবদন দর্শন করে নয়ন মন সার্থক করবেন। না, প্রভুর এ ভাবটি রামচন্দ্রের গৃহেই দেখা দেয়নি। দেখা দিয়েছে সেইদিন, যেদিন তিনি শান্তিপুর ত্যাগ করেছেন। যথার্থ বলেছেন বৃন্দাবন,

"বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥"

নর্তনে কীর্তনে যামিনীর তৃতীয় যাম এসে গেল। না, আর দেরী না। প্রভুর তর সইছে না। বড় লম্বা পাড়ি যে! বিশ দিনের পথ। রামচন্দ্র নৌকার ব্যবস্থা করলেন। রাতের আঁধারই যাত্রার জন্য প্রশস্ত। দিনের আলোয় চোখে পড়লেই জানাজানি

হয়ে যাবে। তাতে বিঘ্ন আসবে। বিঘ্ন উভয়েরই। রামচন্দ্রেরও। প্রভুরও। ও হরি! নৌকোতে উঠেই মুকুন্দ কীর্তন ধরলেন। না ধরে আর উপায় কি? সবই প্রভুর ইচ্ছা। মুকুন্দের কাছে প্রভুর ইচ্ছা মানেই গোবিন্দের ইচ্ছা। তিনি কখন কি লীলা করবেন; তা প্রাকৃত জন কিভাবে বুঝবে? যেমন, ভাগবত বলেন,

"কো বেত্তি ভূমন! ভগবন! পরাত্মন! যোগেশ্বরোতীর্ভবতি
স্ত্রি লোক্যাম।
বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ণ ক্রীড়সি যোগমায়াম॥"

--হে ভগবন! হে অসীম স্বরূপ! হে যোগেশ্বর! হে পরমাত্মন! ত্রিলোক মধ্যে কোন্ স্থানে, কি প্রকারে, কোন কালে তোমার লীলা কে-ই বা জানতে পেরেছে? তুমি অচিন্ত্যশক্তি— যোগমায়া বিস্তার করে লীলা করে থাক।

বেশ, ভাল কথা, কিন্তু এত ভাল কথা মাঝি কি বুঝবে? সে তো আতঙ্কিত। একাধিক আতঙ্ক তার মনে। সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। ডাঙ্গায় বাঘ। জলে কুমীর। এই নিয়েই সুন্দর বন। কি ভীষণ! কীর্তন ধ্বনিতে এরা সজাগ হবে— সজাগ হবে জলদস্যু। লুটপাট, খুন-জখম করতে আসবে। এছাড়া আছে দ্রোহী পক্ষ। আক্রমণ করবে। মাঝির উভয় সঙ্কট। ঠিকমত পৌঁছে দিতে না পারলে জমিদারের হাতে প্রাণ হারাতে হবে। আবার আছে বিচার শাস্তির ভয়। শত্রুপক্ষ যবন শাসকের কানে দেবে সব কথা। কীর্তন বন্ধ করলে নীরবে নিরাপদে জল পথে পাড়ি দেওয়া যায়। মাঝি কীর্তন বন্ধ করতে

নিবেদন করল। কার নিবেদন কে শোনে? প্রভু কীর্তন চালিয়ে যেতে বললেন। তিনি যে সন্ন্যাসী। তাঁর আর ভয় কিসের? যেমন,

'ধৈর্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ সংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং,
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥"

— ধৈর্য যাঁর পিতা, ক্ষমা যাঁর জননী, চির শান্তি যাঁর গৃহিনী, সত্য যাঁর পুত্র, দয়া যাঁর ভগিনী স্বরূপিনী, মন সংযম যাঁর ভ্রাতৃ স্বরূপ, পৃথীতল যাঁর শয্যা, দিক সমূহ যার বসন এবং জ্ঞানামৃত যার আহার, হে সখে! বল দেখি, এঁরা যাঁর আত্মীয়, তাঁর আর ভয় কোথায়?

অভীক প্রভু অভয় দিলেন:

"কিছু চিন্তা নাহি, কর কৃষ্ণ সংকীর্তন।
তোরা কিনা দেখ-হের, ফিরে সুদর্শন॥"

একেবারে ভাগবতের অভয় বাণী। যেমন,

"তস্মাদ অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্।
একান্ত ভক্তি ভাবেন প্রীতো ভক্তাভি রক্ষণম॥"

— সেই হেতু হরিচক্র বিপক্ষের কাছে ভয়াবহ আর ভক্তের ভক্তিতে প্রীত হয়ে তাঁকে রক্ষা করেন। এবং—

"প্রাগদিষ্টং ভৃত্য রক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা।
দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ॥"

— পূর্বে দেখা গেছে ভৃত্যদের (অর্থাৎ ভক্তদের বা অনুগতদের) রক্ষার জন্য মহাত্মারা অগ্নির মত উত্তপ্ত হয়ে চক্র ধারণ করেন।

অতএব সংকীর্তন চলল। সপার্ষদ প্রভুর অন্তর আহ্লাদে ভরপুর। আনন্দে মাতোয়ারা হয়েই ঘাটে এলেন। এলে কি হবে— আর এগোতে পারলেন না। দানী এসে হাজির হল। পথরোধ করল। শুল্ক ছাড়া সে কারোকে যেতে দেবেনা। শুল্ক? এঁরা যে সম্বলহীন। প্রভুর সঙ্গীরা যে সঙ্গে কিছুই আনেন নি, তা তো প্রভু নিজেই যাত্রার আরম্ভেই পরীক্ষা করেছেন। তবে হ্যাঁ, তাঁদের সম্বল আছে। সে সম্বল হচ্ছে তাঁদের প্রভু।

এদিকে দানী তো দাঁড়িয়ে আছে। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে প্রভুর দিকে! ভাবান্তর হল দানীর। কত সন্ন্যাসীই তো সে জীবনে দেখেছে। কই, এরকম সন্ন্যাসী তো চোখে পড়েনি। প্রভুর অবয়ব যেন অয়স্কান্ত মণি। যে দেখে, সেই আকৃষ্ট হয়। সে যত ঘোর বিষয়ীই হোক। না, প্রভুর শুল্ক লাগবেনা। ফতোয়া দিল দানী, কিন্তু চার পার্ষদ রয়ে গেলেন যে! তাঁদের কি হবে?

সবাই নীরব। শেষে দানীই শুধোলো প্রভুকে, 'এরা তোমার কি হয়?' উত্তর দিলেন প্রভু। তত্ত্ব সুরভিত সে উত্তর। বললেন, 'আমি সন্ন্যাসী। আমার কেউ নেই। মাতা নেই, পিতা নেই। নেই দারা, দারক, দারিকা। জগতে আমি একা, শুধু কৌপীন সম্বল।' দানী বলল, তাহলে তুমি যাও। তোমার শুল্ক লাগবে না, কিন্তু শুল্ক না দিলে এদের ছাড়ব না।

পার্ষদদের মনে বিপন্ন বিস্ময়। সে কি! তাঁরা না প্রভুরই আশ্রিত। সেই আশ্রিতদের ছেড়ে প্রভু চলে গেলেন। এঁদের মনে বিস্ময়, কিন্তু এঁদের মধ্যে নিত্যানন্দের মনে বিশ্বাস। অবধূত যে প্রভুর অভিন্ন হৃদয়। অন্তরের কথা জানতে পেরেছেন। তাই এই বিশ্বাস।

প্রভুর এটি লীলা মাত্র। তিনি কি তাঁদের ত্যাগ করতে পারেন? পারেন না। কোনদিনই না। তিন পার্ষদেরই অভিমান ভরা কণ্ঠ। শুধোলেন নিত্যানন্দকে, 'আচ্ছা, প্রভু আমাদের এই বিভুঁয়ে ফেলে গেলেন কেন? তিনিই তো বলেছেন সন্ন্যাসীকে নিঃসম্বল চলতে হয়। আর নিঃসম্বল চলতে গিয়ে তো এই নির্যাতন।'

প্রবোধ দিলেন অবধূত, 'আহা, তোমরা ধৈর্য হারাচ্ছ কেন? প্রভু কি আমাদের ছাড়া চলতে পারবেন? দেখবে কিছুদূর গিয়েই আমাদের জন্য অঝোরে কাঁদবেন। আর এগোতে পারবেন না। আটকে যাবেন আমাদের প্রেমের আকর্ষণে।'

হলও তাই।

"কতদূরে প্রভু সব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেট মাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া॥"

সে ক্রন্দন কি রকম? - - না,

"কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবে শুনি সে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন॥"

তাইতো, এত জল কি মানুষের চোখে থাকতে পারে? দানীর মনে

ধন্দ। অন্তরে দ্বন্দ্ব। শুধোলো। 'সত্যি করে বলতো তোমরা কে? আর উনিই বা কে?

তখন সঙ্গীত্রয় সমস্বরে বললেন, 'ঐ যে ঠাকুরকে দেখছ, উনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আর আমরা তাঁর দাস।'

দানীব মনের আলো আঁধারি কেটে গেল। মন হল আলো ঝলমল। আলোকানন্দে জল ঝরতে লাগল। ছেড়ে দিল পার্ষদদের! ছুটে গিয়ে প্রভু পদে পতিত হল।

তখন প্রভু কি কবলেন? দানীব দুঃশীল আচরণ কথা স্মরণ করলেন? — না, তা করবেন কেন? তার জন্য তো তাঁর এ লীলা নয়। দুঃশীলকে সুশীল করবার জন্যই যে তাঁব এই লীলা। তাই না তিনি পার্ষদদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গোপন করলেন তত্ত্ব সম্পুটে। তাই

"দানী প্রতি করি প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।
হরি বলি চলিলেন সর্বজীব নাথ॥"

গৌড়বঙ্গের প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করলেন। উৎকল রাজ্যে —জগন্নাথস্বামীর রাজ্যে প্রবেশ করলেন। প্রথমেই নদী। নাম সুবর্ণরেখা। সুবর্ণ সলিল শরীর সুশীতল করে। তাই 'স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল।' পুণ্যতোয়া নদী পুণ্যতম হল।

না, আর অপেক্ষা সয় না। জগন্নাথ ভূমিতে পৌঁছে গেছেন। আনন্দে আত্মহারা। পথশ্রম ভুলে গেছেন। আনন্দ এনেছে আকুলতা। কতক্ষণে ইষ্ট বস্তুর দর্শন লাভ হবে। দ্রুত, অতি দ্রুত চলেছেন প্রভু। বাহ্যজ্ঞান নেই বললেই হয়। বিপরীত চলন

ভঙ্গি নিত্যানন্দের। শ্লথ গতি। ফলে নিত্যানন্দ পিছিয়ে পড়লেন। আপন মনে চলেছেন নিতাইচাঁদ। অতি অদ্ভুত তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড। বলা নেই-কওয়া নেই, হঠাৎ হুঙ্কার দিচ্ছেন। আবার হয়ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন। কখনো বা অকারণে অট্টহাস্য, আবার কখনো গর্জন। গায়ে ধুলো মাখতেই বা বলল কে, আবার সে ধুলো ধুয়ে ফেলারই বা কি দরকার হল? এত শত প্রশ্নের জবাব দেয় কে? কার কথা কে শোনে? তাই,

"ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব অঙ্গে ধুলা মাখেন অপার॥"

বৈষ্ণবের কোন আচরণ বিধিই মান্য করেন না অবধূত। কেমন যেন আত্মভোলা। আলাভোলা। কখনো নৃত্য করছেন। কই, কেউ তো তাঁর সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন না। না দিক। তাতে তাঁর কি? তিনি আপন মনে আপন ধ্যানে, আপন জ্ঞানে নৃত্য করে চলেছেন। উদ্দণ্ড নৃত্য। আনন্দে নৃত্য করছেন। কিসের এই আনন্দ? প্রভুর যে আনন্দ। প্রভু তো তাঁর ইষ্টবস্তুর নিকটতম হয়ে গেছেন। তাই নিতাইচাঁদেও আনন্দ। হবেই তো। উভয়ে যে অভিন্ন কলেবর। না, শুধু অভিন্ন কলেবর না। অভিন্ন হৃদয়। একের হৃদয় অপরজন জানতে পারেন। একের হৃদয় আনন্দিত, তাই অপরের হৃদয়ও সেই আনন্দে অনুরণিত।

প্রভুর বাল্যলীলা তবুও বোঝা যায়; কিন্তু অবধূতের অদ্ভুত লীলা দুরবগাহ। শ্রীবাস প্রিয়া মালিনী বয়োতীত মহিলা। তাই বলে কি বত্রিশ বছরের এক যুবক সেই মহিলার স্তন্য পান করতে

পারে? কেউ না পারুক, পারেন একজন তিনি অবধূত। কেনই বা পারবেন না? নিতাই যে তাঁর ছেলে। ছেলে মায়ের দুধ তো খাবেই। একশ বার খাবে। হাজারবার খাবে। স্তন্য দুগ্ধ যে অমৃত। অমৃত পানেই না অমৃত লোক পাওয়া যায়।

খেলা— ভাবের খেলা চলছিল গোরাচাঁদ আর নিতাইচাঁদের মধ্যে। এ খেলা বোঝা দুরূহ। কিন্তু খেলা নিয়ে থাকলেই তো চলে না। দেহধারী জীব— অন্নগত প্রাণ। তাই অন্নের অন্বেষণে বেরুতে হয় জগদানন্দকে। প্রভুর দণ্ড রক্ষার ভার জগদানন্দের ওপর। এখন দণ্ডের কি হবে? অনেক ভেবে চিন্তে দণ্ডের দায় দিলেন নিত্যানন্দের ওপর। নিত্যানন্দ দণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ কি হল, দণ্ডকে শুধোলেন, 'ওহে দণ্ড, তুমি কি জাননা দণ্ডধারীকে আমি ধরে আছি আমার অন্তরে। আমি যাঁকে ধরে আছি, সেই তিনি তোমাকে ধরে থাকবেন? না, তা হয় না। কখনই না। তাই,

"এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড॥"

সন্ন্যাসীর দণ্ড ভঙ্গ! এ তো বিধি-বিধানের বাইরে। হোক বাইরে। তাতে অবধূতের কি? বিধি-বিধানের বালাই নেই। নেই কোন শ্বাস কষ্ট শাস্ত্রের শাসানিতে। সামাজিক আচার আচরণের আদাড় পাঁদাড় নেই মনে। অবধূতের না থাকুক, কিন্তু প্রভুর যে দণ্ডভঙ্গ হল? তাতে কী অপরাধ হল? সন্ন্যাসীর দণ্ড কী? আচার্য শঙ্করের আগে সন্ন্যাসীরা তিন দণ্ড ধারণ করতেন। তাই ত্রিদণ্ডী।

শঙ্করের সময় থেকে তিনের স্থলে হল এক। তাই প্রভু একদণ্ডী। তিনদণ্ড কিসের প্রতীক? ইষ্টবস্তু লাভের উপায় হচ্ছে কায়, মন ও বাক্যের সংযম। তিন দণ্ড এই ত্রিবিধ সংযমের প্রতীক। যিনি এই সংযম অভ্যাস করতে পারেন নি, তিনি শুধুমাত্র বাহ্যাচার করেন তিনটি বাঁশ বহন করে। যথার্থ বলেছেন ভাগবত:

"মৌনানীহা নিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহ চেতসাম।
নহ্যেতে যস্য সন্ত্যাঙ্গ বেণুভির্নভবেদ যতিঃ॥

—মৌনই বাক্যের দণ্ড, কাম্য কর্মত্যাগই দেহের দণ্ড! এবং প্রাণায়ামই চিত্তের দণ্ড। এই তিন প্রকার সংযম যাঁর নেই, তিনি তিনটি বাঁশ বহন করেন— সন্ন্যাসী হতে পারেন না। মন সত্ত্বগুণের, বাক্য রজোগুণের এবং কায় তমোগুণের ক্রিয়া। সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের অধীন এই জগৎ। মায়াময় জগৎ। যিনি মায়াধীন তাঁরই প্রয়োজন এই তিন দণ্ডের সংযম শাসন। নিত্যানন্দের ধ্যানে গৌরচন্দ্র স্বয়ং ভগবান, মায়াধীন নন— মায়াধীশ। তাঁর কিসের দরকার দণ্ডের। নিতাইচাঁদ অবধান করেছেন প্রভুর নদীয়া লীলা। এ লীলায় তিনি প্রেমসিন্ধু অবতার। তাই কোন আয়ুধ নেই। এমন কি বংশদণ্ডও না। হেমদণ্ড বাহুই একমাত্র আয়ুধ- যে আয়ুধে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে জীবকে প্রেমপাশে বেঁধেছেন। এ হেন প্রভুর ঐ বাহ্যবস্তু বাঁশের কি প্রয়োজন? অতএব ভেঙ্গে ফেল ওটিকে। নিতাইচাঁদের যখনই ভাবা, তখনই কাজ। একেবারে তিন টুকরো করে ফেললেন। বহিরঙ্গ দূর করলেন। মনটি তাঁর ভরপুর অন্তরঙ্গ বস্তুতে। কি সে বস্তু? —না, হেম সম প্রেম। এই প্রেমেরই জয়গান গেয়েছেন

মীরা, আর দুয়ো দিয়েছেন বাহ্যবস্তুর। যেমন,

'নিত্ নাহানে সে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড়-বাঁদর হোই॥
তিরণ ভক্ষণ সে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুৎ রহে হ্যায় খোজা॥
দুধ পীকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম সে ন মিলে নন্দলালা॥''

যে চিন্তাধারা যুগে যুগে একই পথে বয়ে চলে, তাই না সনাতন ধারা। নিত্যানন্দের চিন্তাস্রোতও এমনই সনাতন। কিন্তু জগদানন্দের কি হবে? দণ্ডের দায় যে দিয়েছিলেন প্রভু জগদানন্দকেই। ভিক্ষা করে ফিরে এলেন জগদানন্দ। দেহে ক্লান্তি আর ক্লান্তির পর এই অশান্তি।

জগদানন্দ চিন্তিত। শুধু চিন্তিতই না, শঙ্কিত। প্রভুর দণ্ড বলে কথা! বিপন্ন বিস্ময়ে শুধোলেন নিত্যানন্দকে, 'দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে?' উত্তর দিলেন নিত্যানন্দ, 'দণ্ড ধরিলেক যে॥'

আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্যজনে॥

হেঁয়ালী উত্তরে ক্ষুব্ধ হলেন জগদানন্দ। বাদানুবাদে গেলেন না, দণ্ডের তিন খণ্ড নিয়ে সোজা এলেন প্রভুর কাছে।

প্রভুও বিস্মিত। শুধোলেন, 'এ কি! দণ্ড ভাঙ্গল কি করে? পথে কারুর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করেছ না কি?'

ক্ষুব্ধ জগদানন্দ বিনা ভূমিকায় বললেন, 'শ্রীপাদের কীর্তি।'

অবধূত তো অদূরেই। গৌরসুন্দর শুধোলেন, 'আমার দণ্ড ভাঙ্গার অধিকার তোমাকে কে দিল? আর কেনই বা ভাঙ্গলে?' নিত্যানন্দ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'দণ্ড? ভেঙ্গেছি তো একটা বাঁশ মাত্র। এতে রুষ্ট হবার কি আছে? তবে হ্যাঁ বাঁশটা তোমার। তোমার বস্তু ভাঙ্গার অধিকার আমার নেই।'

আসল কারণটি গোপিত রাখলেন অবধূত। কিই বা প্রয়োজন? তিনি তো অন্তর্যামী। স্বয়ং ভগবান। সেই ভগবানের কি কোন চিহ্নের প্রয়োজন আছে? দণ্ড তো চিহ্ন বহন করে মাত্র। এক দণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিবাদ-বিভেদ অনেককালের। দণ্ড নিশ্চিহ্ন— নিশ্চিহ্ন বিবাদ-বিভেদও। নিশ্চিন্ত নিত্যানন্দও। এ গোপ্য প্রকাশ করলেন না। প্রকাশ্যে বললেন, 'অপরাধ হয়েছে। নিজগুণে ক্ষমা কর। আর যদি ক্ষমা করতে না পার, তাহলে যে শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে নেব।''

প্রভু রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'তুমি তো শাস্ত্রের ধার ধার না। দণ্ড তাই তোমার কাছে বাঁশ মাত্র। যা হোক। তোমরা আর আমার সঙ্গী হতে পারবে না। এখন বল, তোমরা আগে যাবে, না আমি আগে যাব?'

সবাই নীরব। মুখ খুললেন মুকুন্দ, 'তুমিই আগে যাও। আমাদের কিছু কথা আছে। আমরা পরে যাব'।

"ভাল" বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত সিংহ প্রায় গতি লখিতে দুষ্কর॥"

হ্যাঁ, সিংহ গতিই বটে। সিংহ রাশি সিংহ লগ্নে জাত পুরুষ সিংহের

সিংহ গতি। মুহূর্তের মধ্যে প্রভু পৌঁছে গেলেন জলেশ্বরে। জলেশ্বর শিবস্থান। সেখানে গিয়ে কি দেখলেন প্রভু?

—"বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দিগে নৃত্যগীত পরম মঙ্গল॥"

নৃত্য-গীত-বাদ্য – এ তিনের সমন্বয়ে সংকীর্তন। সংকীর্তন পিতা পেলেন সংকীর্তন এখানে এসে। ব্যস! প্রভুর দণ্ড দুঃখ দূরে গেল। সব রোষের রসায়ন হল সন্তোষে। পরম সন্তোষে। সন্তোষের প্রকাশ নৃত্য বিলাসে। অমনি 'নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞা' এতক্ষণ "গন্ধ পুষ্প, ধূপ দীপ মাল্য বিভূষণে" পুজো হচ্ছিল। প্রথাগত পুজো। প্রভু এসে কি করলেন?—

"দেখি প্রভু ক্রোধে পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেমরসে॥"

মেশাবেন বৈকি। প্রভু যে প্রেমাবতার। প্রেম পুরুষোত্তম।

এর মধ্যে একটা কিন্তু রয়ে গেল যে। প্রভু না বৈষ্ণব। ইষ্টবস্তু গোবিন্দ। হঠাৎ শিব বন্দনায় রত হলেন যে! হঠাৎ নয়। প্রভুর কার্য বিধি শ্রুতি বাক্যের অনুরূপ: 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' গীতারও তো সেই একই উদার বাণী:

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।'

গীতা বাক্য মাণিক্য। চির উজ্জ্বল। চির সুন্দর। এ বাক্যে বাজে ঐক্যের বাণী। সাম্যের সামগান। পঞ্চবিধ উপাসক: সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত।

একে অপরের অমিত্র। যুগ যুগ ধরে চলেছে এঁদের মধ্যে

বিবাদ-বিভেদ, কচাল-কলহ। প্রভু চিত্ত সদা সাম্যময়। বিরোধ নিরাকরণ কল্পে 'শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।' শিবভক্তবৃন্দ যেমন বিস্মিত হলেন, তেমনি হলেন হৃষ্ট। এই ঐক্য গীত যুগে যুগে। সাম্যের এই ললিত বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখেও: 'যত মত তত পথ।" ঠাকুর একটু বিশদ করে বলেছেন, "যত লোক দেখি ধর্ম ধর্ম করে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও এর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়। তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম। বস্তু এক, নাম আলাদা। যাকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলেছে, আবার পুরাণে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ বলেছে।"

কথাটা কত সুন্দর! কথাটা তো সুন্দর। কিন্তু জ্ঞানের কথা যে! জ্ঞানের কথা জ্ঞানীজন বুঝবে— সাধারণ জন বুঝবে কেন? ঠাকুর সচেতন। সরল পুরুষ। সরল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একটি পুকুর। একাধিক ঘাট। এক ঘাটে জল নিচ্ছে হিন্দু। বলছে জল। অন্য ঘাটে মশক ভর্তি করছে মুসলমান। বলছে পানি। আবার আরেক ঘাটে হাজির হয়েছে খ্রীষ্টান। বলছে ওয়াটার। মুখে পান করছে একই বস্তু অর্থাৎ জল। আবার সেই মুখেই বলছে আলাদা আলাদা নাম।

বেশ, ভাল কথা। তত্ত্ব কথা ভাল। দৃষ্টান্ত আরও ভাল। কিন্তু এসব তো মুখের কথা। মুখের কথা লোকের এক কান দিয়ে ঢোকে, অপর কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আচরণ? হ্যাঁ, আচরণ

লোকের মনে দাগ কাটে— বড় মোটা দাগ। সহজে মুছে যায়না। গীতা ভাগবতও এই আচরণের কথাই বলেন। সে কথা উল্লেখ করে কবিরাজ বলছেন,

"আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়।"

ঠাকুরেরও শিক্ষা নিজ আচরণে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৫ই জুন। অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস। কৃষ্ণা ৬ষ্ঠী তিথি। রবিবার। কাঁকুরগাছিতে সুরেন্দ্র মিত্রের বাগান বাড়ী। মাথুর পালা হচ্ছিল। ঠাকুর এলেন। এলেন আকণ্ঠ আকুলতা নিয়ে। মাতৃ সাধক। এসেছেন মাধুর্য রস আস্বাদন করতে। শুধু কি শ্রোতারূপে আস্বাদন? — না। পরমাশ্চর্য ঘটনা। মাঝে মাঝে সেই পালা কীর্তনে আখরও দিচ্ছেন। আখর কি? পদকর্তার মূল পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কীর্তনীয়া স্থান বিশেষে পদ যোগ করেন। এতে কীর্তনের সৌন্দর্য বাড়ে। আখর তাই অলঙ্কার। অনবদ্যাঙ্গীও অলঙ্কার পরেন। সর্বাঙ্গে নয়। সাধারণত কানে, নাকে, গলায়, হাতে। এতে তার সৌন্দর্য বাড়ে। কীর্তন শ্রবণে ঠাকুর পুলকিত। রাধাভাবে আবিষ্ট হলেন। আখর দিলেন, "সখি, হয় প্রাণ বল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।" বলতে বলতে বাহ্যদশা হারালেন। কিছুক্ষণ কাটল। ঠাকুর বাহ্যদশা ফিরে পেলেন। আবার আখর দিলেন, 'সখি, তাঁর কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে। ……আমি তোদের দাসী হব। তুই তো কৃষ্ণ প্রেম শিখিয়েছিলি।

প্রাণবল্লভ ? আরেকটি ঘটনা। কীর্তনের আসর। এখানেও ঠাকুর আখর দিয়েছেন :

'সখি, রূপের দোষ না মনের দোষ ?
আন হেরিতে শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন।"

তবে কি এই মাতৃসাধক শাক্ত নন ? হ্যাঁ, অবশ্যই শাক্ত। আবার বৈষ্ণবও বটেন। শাক্ত বৈষ্ণব দুইই। দুয়ে মিলে এক। শ্যাম-শ্যামা এক। সাধ্য এক। অর্থাৎ সেই 'একং সৎ…. '

'যে যেইরূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥'

একই কথা শিব মহিম্ন স্তোত্রেও

'রুচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পযসামর্ণব ইব ॥'

--মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। তাই পথও ভিন্ন ভিন্ন। গন্তব্যস্থল কিন্তু সবার একই।

আসল কথা অচলায়তনে আবদ্ধ না থাকা। আত্মনিয়ন্ত্রণই বড় কথা। আত্মসংযমই বড় প্রয়োজন। দেবত্ব আন্তর সত্তায়। জাগ্রত করাই একমাত্র লক্ষ্য। পথটা বড় কথা নয়। পথ অসদৃশ হতেই পারে।

শিষ্য গুরুপন্থী। সেই শিষ্য বিবেকানন্দ বলছেন, **'Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this Divinity within, by controlling nature, external & internal. Do this either by work or**

worship or psychic control, or philosophy by one or more or all of these and be free.'

প্রভু নৃত্য করছেন। নিঃসঙ্গ নৃত্য। পার্ষদ নেই। অভিমানে সঙ্গ ত্যাগ। কিন্তু সঙ্গীরা তো প্রভুকে ছাড়তে পারেন না। ছাড়বেন কি করে? প্রভু যে অয়স্কান্ত মণি— নিশিদিশি আকর্ষণ করছেন। পার্ষদবৃন্দ লৌহকণা। তাই এত প্রবল আকর্ষণ। তাই তাঁরা সদাই ধাবিত হন। মুহূর্তের বিরহ তাঁদের কাছে যুগ মনে হয়। ফলে,

'কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥'

কোথায় গেল প্রভুর অভিমান? প্রেমাবতার কি প্রেমভাজন ছাড়া থাকতে পারেন? পারলেও কতক্ষণই বা পারেন? তাই পার্ষদবৃন্দ পেয়ে বড়ই আহ্লাদ হল প্রভুর। সেই আনন্দ প্রকাশ পেল কিভাবে?

'প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা, বেড়ি গায় ভক্তবৃন্দে॥'

আর দু চোখে নামল প্রেমাশ্রু। সে প্রেমাশ্রু যেন, 'নয়নে বহায় সুরধুনী শতধার।'

এক সময় কীর্তনানন্দ সমাপ্ত হল। প্রভু সবাইকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। প্রভুর এত তো আনন্দ, তবুও হৃদয়ের এক কোণে ব্যথা বাজছে কেন? বাজবেই তো। নিত্যানন্দকে যে প্রভু কিছুক্ষণ আগে কটু-কাটব্য করেছেন। তাই আর স্থির থাকতে পারলেন না। একেবারে কোলে তুলে নিলেন। গোরাচাঁদের কোলে নিতাইচাঁদ।

আহা! কি মধুর দৃশ্য। প্রভু আবেগরুদ্ধ গলায় বললেন, 'শ্রীপাদ, তুমি হঠাৎ হঠাৎ বালকের মত কাজ কর কেন? আর যদি এরকম করবে তো আমার মাথা খাও।' —বলে আবেগে-সবেগে নিবিড় আলিঙ্গন দিলেন। প্রভুর কিন্তু এটা মুখের কথা। অন্তরে তিনি উপলব্ধি করেছেন দণ্ড ভঙ্গের কারণ। প্রভু একে বললেন বালকবৎ আচরণ কিন্তু নিত্যানন্দের এই বালক সুলভ ব্যবহার তো এই প্রথম নয়।

অপরাহ্ন বেলা। নিমাইচাঁদ দাওয়ায় বসে প্রিয়াজীর সঙ্গে আলাপ করছেন। এমন সময় উঠোনে এসে দাঁড়ালেন নিতাইচাঁদ। হঠাৎ অবধূত নগ্ন হয়ে পরিধেয় কাপড়টি মাথায় চূড়ো করে বাঁধলেন। কি লজ্জা, কি লজ্জা! লজ্জারুণ প্রিয়াজী ঘরে চলে গেলেন। গৌরসুন্দর কিন্তু নিগূঢ় তত্ত্বটি উপলব্ধি করলেন। নিজের একটি কাপড়ে নিত্যানন্দের লজ্জা নিবারণ করলেন। ইতিমধ্যে গৌরগৃহে নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ ভক্ত মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই ছুটে এসেছেন। তখন গৌরসুন্দর ভক্তদের নির্দেশ দিলেন নিতাই-চাঁদের মাথার কাপড়টি টুকরো টুকরো করে তাদের শিরে ধারণ করতে।

নিত্যানন্দ যুবাপুরুষ। বত্রিশ বছর তার বয়স। আর মালিনী দেবী বয়োতীত রমণী। অবধূতের মাতৃসমা। তাই বলে কি তিনি শ্রীবাস প্রিয়ার স্তন্য পান করবেন সর্ব সমক্ষে। অদ্ভুত বালক সুলভ ব্যবহার।

দৃষ্টান্ত আরো আছে। অদ্বৈত অবধূতের পিতৃতুল্য। অদ্বৈত

উত্তর পঞ্চাশ আর অবধূত উত্তর ত্রিশ। এ হেন পিতৃসম ব্যক্তির সঙ্গে নিত্যানন্দের রঙ্গ-রসিকতা। প্রণয়-কলহ লেগে থাকত কি অশনে, কি অবগাহনে। এমনই বালকোচিৎ ব্যবহার।

এই বালকবৎ ব্যবহার কিসের লক্ষণ? — ঈশ্বর দর্শন লাভের লক্ষণ। ভাগবত বলছেন ঈশ্বর দর্শনে যে ব্যক্তির জীবন সার্থক হয়েছে, তাঁর মধ্যে পাঁচটি লক্ষণের যে কোন একটি দেখা যাবে।

প্রথমটি হচ্ছে বালকবৎ! ভাগবতের মধু ভাষায় 'বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ।' শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ করে বলেছেন, 'ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়।'

"......... বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গুণের বশ নয়। এই খেলাঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইলো। মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। খানিক-ক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল— নয় বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে।'

দ্বিতীয় পিশাচবৎ। এঁর কাছে শুচি-অশুচি দুই-ই সমান। যেমন, রামপ্রসাদ গেয়েছেন,

"শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে জীরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।"

ঠিক এমন ভাবটি বর্ত্তমান নিত্যানন্দে।

শান্তিপুর। অদ্বৈতাচার্যের গৃহ। দুজন আহারে বসেছেন। গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ। পরিবেশন করছেন আচার্য স্বয়ং। পর্বত

প্রমাণ আহার। গৌরসুন্দর স্বল্লাহারেই সন্তুষ্ট। নিত্যানন্দও পরম তুষ্টি লাভ করেছেন। কিন্তু করলে কি হবে? অদ্বৈতের সঙ্গে খুনসুড়ি না করলে যে তাঁর আহার্য হজম হবে না। চলল কথার কলহ। বাক্য বাণের আদান-প্রদান। এমন একটা পর্য্যায় এল যখন অবধূত অধোবদন হলেন। কিন্তু হলে কি হবে— মনে মনে অন্য এক মতলব আঁটছেন আচার্যকে হারিয়ে দেবার জন্য। আহার প্রায় শেষ। অদ্বৈত সামনেই বসে আছেন। এমন সময় পাতের এক মুঠো অন্ন নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন অদ্বৈতের মুখে। আচার্য কপট রোষে বললেন, 'কি, এঁটো ছিটিয়ে দিলে আমার গায়ে।' এই এতক্ষণে একটা জুতসই জবাব খুঁজে পেলেন নিত্যানন্দ, 'কি! গোবিন্দের প্রসাদকে এঁটো বলছ অপরাধ মহা অপরাধ হল তোমার। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

প্রায়শ্চিত্তের কথা তোলা থাক। এ থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হল। সেটি হচ্ছে অবধূতের মানসপট। প্রসাদ আর এঁটোতে ভেদ নেই।

তৃতীয়ত জড়বৎ। এ লক্ষণের জীবন্ত দৃষ্টান্ত আচার্য হস্তামলক। ব্রাহ্মণ দম্পতির এই একটিই সন্তান। তাঁরা বড়ই মন্দ ভাগ্য। সন্তানটি জড়। কথা বলতে পারে না। আচার্য শঙ্কর নাকি অলৌকিক কার্য সাধন করতে পারেন। তাই আচার্যের শরণ নিলেন এঁরা। মণি মানিক চেনেন। লক্ষণেই লক্ষ্যভেদ হয়ে গেল। সংশয় শূন্য শঙ্কর শুধোলেন, 'কে তুমি?' অমনি মূক বালক বাচাল হল। উত্তর দিল, 'আমি আত্মা।' পরবর্তী সংবাদ

প্রসঙ্গ নয়— অনুষঙ্গ মাত্র। এখানে নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থত উন্মাদবৎ। এই লক্ষণটাও ঠাকুরই পরিষ্কার করেছেন, 'পাগলের মত কভু হাসে কভু কাঁদে', এই বাবুর মত সাজগোজ, আবার খানিক পরে ন্যাংটা, বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে —তাই উন্মাদবৎ।"

ঠিক এমনটি করেছিলেন নিত্যানন্দ গৌর—গৌরপ্রিয়ার সামনে। করেছিলেন প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করে, যে দণ্ড ভঙ্গ দেখে প্রভু অবধূতকে বলেছিলেন,

'তুমি সদা উনমত বুদ্ধি স্থির নয়।
বাতুলের প্রায় রীত— বালক আশয়॥'

পঞ্চমত ও শেষত হচ্ছে 'গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ' নৈগমঃ' মানে বেদজ্ঞ, কিন্তু আচরণ গরু অর্থাৎ অবলা জীবের মত: প্রাকৃত জনের চোখে নির্বুদ্ধিতা। ঠিক এই আচরণটি নিত্যানন্দের মধ্যে। নিত্যানন্দ ব্যাস পুজো করবেন। ভাল কথা। ভাল মনে ভাল আয়োজন করলেন পণ্ডিত শ্রীবাস তাঁর গৃহাঙ্গনে। পুজোর আয়োজন পূর্ণ। কিন্তু কোথায় নিত্যানন্দ? কার পুজো কে করে? শেষকালে কোন রকমে নিত্যানন্দের হাতে মালা গুঁজে দিয়ে শ্রীবাস বললেন, 'বলুন, ওঁ ব্যাসদেবায় নমঃ।' আর মন্ত্রোচ্চারণ? অবধূত শুধু বললেন 'হুঁ'। পণ্ডিত বললেন, 'হুঁ' কি বলছেন, বলুন ওঁ ব্যাস দেবায় নমঃ।' নিত্যানন্দের মুখে 'হুঁ', আর 'হুঁ'। প্রাকৃত দৃষ্টিতে এঁরা অবলা জীবের মতই। যেমনটি শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর টাকা জলে ফেলে দিয়ে বলছেন টাকা মাটি, মাটি টাকা। মথুর বাবু জমি দিতে

চাইলেন দলিল মূলে। আর যাবে কোথায়? ঠাকুর একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। মথুরকে এই মারেন তো, সেই মারেন!

উপরিউক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে চারটিই নিত্যানন্দের মধ্যে প্রকট। ঈশ্বর দর্শনে সার্থক তাঁর জীবন। এহেন নিত্যানন্দেব পরিধেয়-পরিচ্ছদ পবিত্র, অতি পবিত্র। অমর্ত্য বস্তুর মত পবিত্র। তাই গৌরসুন্দর ভক্ত জীবন সুন্দর করলেন যখন তাঁরই নির্দেশে অবধূত বস্ত্র হল তাঁদের শিরোভূষণ।

এই সব ভাগবত তত্ত্ব ভাগবত পুরুষ জানেন। তবে তিনি ভৎ’সনা করলেন কেন অবধূতকে? তাও অন্যান্য ভক্তদের সামনে। নিত্যানন্দই প্রভুর নিকটতম জন, এমন কি অভিন্ন হৃদয়। তবুও যে কটু-কাটব্য করলেন। না করে উপায় কি? তিনি যে পতি— জগৎপতি। জগৎজন শিক্ষার্থেই তাঁর এই অনুশাসন। কিন্তু অন্যান্য ভক্তদের রয়েছে শ্রেয়োভাব নিত্যানন্দের প্রতি। এখন এই অনুশাসনে যদি হেয়ভাব জন্মায় তাঁদের মনে। তাই সুচতুর প্রশাসক সতর্ক করে দিচ্ছেন সঙ্গীদের, ‘দেখ, আমার গণের মধ্যে অবধূতই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রেষ্ঠ। আমার এই ভৎ’সনার তোমরা অন্য অর্থ করবে না। এবং নিত্যানন্দকেও অন্য দৃষ্টিতে দেখবে না। অবধূত আমার চেয়েও বড়। তোমরা ভক্ত— আমার প্রিয়তা লাভ করেছ। কিন্তু নিতানন্দের কাছে যদি তোমাদের অপরাধ হয়, তাহলে সেই প্রিয়তা থেকে বঞ্চিত হবে।’’ এ সংবাদ কম্বুকণ্ঠে জানাচ্ছেন বৃন্দাবন: ‘মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।

সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দড়॥

নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি বাধ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"

আত্ম প্রশস্তি শুনলেন নিত্যানন্দ। লজ্জারুণ হলেন। অধোবদন অবধূত। ঠিক যেন বালক বৎ। খাম-খেয়ালী ছেলে। কাজের ভালমন্দের প্রাকৃত বিচার নেই। প্রাকৃত দৃষ্টিতে একটা ত্রুটি ঘটে গেল। ভৎসিত হল। আবার সেই ছেলেকে যখন মা 'সোনা-ধন' বলে আদর করল, তখন সে মাথা লুকোলো ঐ মায়েরই কোলে।

প্রভুর মধ্যে যেমন এই শাসন ও সমর্থন, তেমনটি দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। ঠাকুরের বচন তো বটেই, তাঁর জ্ঞান মুদ্রাও (জ্ঞান মুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃত দুহে নমঃ) এই দুইয়ের প্রতীক। মুদ্রাটি হচ্ছে তাঁর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী। অঙ্গুষ্ঠে সমর্থন ও আদর, আর তর্জনীতে শাসন।

কোন ঠাঁইয়ে দাঁড়াবার সময় নেই প্রভুর। মন পড়ে আছে ঐ এক ঠাঁইয়ে। জগন্নাথস্বামীর ঠাঁইয়ে। কিন্তু রাতের আঁধারে যে পথ চলা দুষ্কর। তাই সগণ প্রভু রাত্রি বাস করলেন জলেশ্বরে।

পরবর্তী স্থান বাঁশদহ। ভোরের আলো ফুটতেই বাঁশদহ পথে যাত্রা শুরু হল। এইস্থানে প্রভুর আরেক লীলা। জলেশ্বরে সঙ্গ করলেন শৈবের সঙ্গে। কীর্তনানন্দ আস্বাদন করলেন আকণ্ঠ। এখন সাক্ষাৎকার ঘটল শাক্তের সঙ্গে। শাক্ত অনেক তত্ত্ব কথা বললেন। শুনে প্রভু মৃদু হাসলেন। যাহোক, এ পর্যন্ত ভালই

কাটল। কিন্তু এ শাক্ত যে পঞ্চ 'ম' কারের ভক্ত। তাই প্রভুকে আমন্ত্রণ জানালেন, ''চল, আমার মঠে চল। আজ সবাই আনন্দ পান করে আনন্দ লাভ করব।'

শাক্তের কাছে যা ঈপ্সিত, প্রভুর কাছে তা জুগুপ্সিত। আনন্দ মানে মদিরা। যাহোক, প্রভু মনের জুগুপ্সা বাইরে প্রকাশ করলেন না। সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমরা গিয়ে আয়োজন কর। এই আমরা আসছি।'

এড়িয়ে গেলেন, কিন্তু এহেন শাক্তের সঙ্গে কথা বললেন যে। এও প্রভুর এক লীলা। বৈষ্ণবের কেউ ত্যাজ্য নয়। সবাই গ্রাহ্য, এছাড়া, প্রভু যে পতিত পাবন। পাবন কে? — না, যিনি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্র করেন। দূরে ঠেলে রাখলে তো ঐ পঞ্চ 'ম' কার সেবীর উদ্ধার হবে না। নদীয়া লীলায় প্রভু ঐ উদ্ধার কার্য সমাপন করে এসেছেন। দুই দুরাত্মা প্রভুরই কৃপায় মুক্তিলাভ করেছে। নবদ্বীপ নগরে নবজীবন লাভ করেছে তারা। এই যে শাক্তকে তিনি সঙ্গ দিলেন, এই সঙ্গ সৌরভে ঐ শাক্ত নবজীবন লাভ করবে একদিন। শুধু কাল পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা। তাই প্রভু 'নানা মতে করিলেন সর্ব জীব ত্রাণ।'

এরপর রেমুনা। এটা একটা গ্রাম। বালেশ্বরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে। পুণ্যভূমি রেমুনা। ভক্তি সৌরভে আমোদিত। এই-খানেই রয়েছেন ক্ষীর চোরা গোপীনাথ। গৌড়ীয় নাথ এলেন গোপীনাথের কাছে। প্রভুর আনন্দ আর ধরে না। তাই 'বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তবর্গ সাথ।' আর চোখে নামল আষাঢ়ের আসার।

'রোদন করেন অতি করিয়া করুণা।' আর সে করুণা কি রকম ? 'সে করুণা শুনিতে কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে।'

সুরধুনীর ধারা প্রভুর আঁখি পাতে। গোপীনাথ দর্শন করলেন তো, তাই এই অবিরল প্রেমাশ্রু। তিন কৃষ্ণের তিন লীলা। ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নবকিশোর নটবর-গোপবেশ বেণুকর। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসের আস্বাদন করেন এই বৃন্দাবনে, তাই ব্রজে মাধুর্যই মুখ্য ঐশ্বর্য গৌণ এবং মাধুর্যের গুণীভূত। গোপীদের সঙ্গে মাধুর্যরস আস্বাদন করেন রাসস্থলীতে। তাই তিনি গোপীনাথ।

পট পরিবর্তন মথুরায়। মাধুর্য ও ঐশ্বর্য সমান-সমান। দৃশ্যের প্রতীপ রূপ দ্বারকায়। এখানে ঐশ্বর্যই মুখ্য, মাধুর্য গৌণ এবং ঐশ্বর্যের গুণীভূত। তাই তো এই "পুরুষোলোককল্পঃ' ব্রজে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। সেই পূর্ণতমকে দর্শন করলেন প্রভু রেমুনাতে। ব্রজের গোপীনাথ রেমুনাতে কেন, আর ক্ষীরচুরির দায়ে ক্ষীরচোরা অভিধাই কেন ?

"মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥"

নবঘনের মধ্যে নবঘন শ্যামকে দেখে অচেতন হন। এ হেন পুরীজী ঈশ্বরপুরীর দীক্ষা গুরু। আবার ঈশ্বরপুরীই গৌরসুন্দরের মন্ত্রগুরু। সেই মন্ত্রগুরুর গুরুর গুণকীর্তন আর গোপীনাথের মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন গৌরচন্দ্র। শুনলেন গোপীনাথ-সেবকেরা আর প্রভুর চার ভক্ত সঙ্গী।

প্রভু বলতে আরম্ভ করলেন : মাধবেন্দ্র পুরী তো বৃন্দাবনে

এলেন এবং পরিভ্রমণ কবতে করতে এলেন গিরি গোবর্ধনে। পুরীজীর তখন বাহ্যাবস্থা নেই বললেই হয়। ব্রজেন্দ্র নন্দনের প্রেমে উন্মাদ। দিন রাত্রির জ্ঞান নেই। এই দাঁড়াচ্ছেন। আবার চলতে চলতে পড়ে যাচ্ছেন। পড়বেন বৈকি। একে প্রেমোন্মত্ত, তার ওপর অনাহার ক্লিষ্ট। শেষে সূর্যদেব যখন পাটে বসলেন, পুরী বসলেন এক বৃক্ষতলে।

এমন সময় ঘটল এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। কোথা থেকে এক গোপ বালক পুরীজীব সামনে হাজির হল। হাতে এক পাত্র দুধ। বলল,

"পুরী এই দুগ্ধ লঞা কব তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥"

বালকের রূপ যেমন অনবদ্য, তেমনি নিরবদ্য। ভুবন ভোলানো রূপ। দেখলে শুধু দেখতেই ইচ্ছা করে। ইচ্ছা কবলেও উপায় নেই। বালক যে বলল,

"গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আরবার আসি এই ভাণ্ডটি লইব॥"

আর ভাণ্ড? কার ভাণ্ড কে নেয়? পুরীজীর নিদ্রা হলনা। রাত্রি শেষে তিনি তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখলেন সেই গোপবালক তাঁকে হাত ধরে এক কুঞ্জে নিয়ে এল। কে এই গোপ বালক? কে আবার? ইনিই না গিরি গোবর্ধনধারী গোপাল।

তা, পুরীজীকে দর্শন দিলেন কেন? পুরীজী যে নবঘনের মধ্যে নবঘন শ্যামকে দর্শন করে সংজ্ঞা হারান। কারণ অবশ্য

আরেকটি আছে। সেই গোপাল বললেন ম্লেচ্ছের ভয়ে তাঁর সেবকেরা এই মন্দিরে লুকিয়ে রেখে গেছে তাঁকে। ভক্তের হাতে তিনি প্রতিষ্ঠা চান। কতদিন ধরে তিনি পুরীজীর পথ চেয়ে আছেন। গোপাল বলছেন,

"বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥"

পুরীর প্রেম কিরকম? গোপাল বলছেন,

"তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥"

পুরীর স্বপ্ন ভঙ্গ হল। আঁথে ব্যাথে অস্থির হলেন। প্রেমাবেশে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়লেন। কিছু সময় কাটল। আবার বাহ্যাবস্থা ফিরে পেলেন। ছুটলেন গ্রামবাসীদের কাছে। কোথায় কুঞ্জ? সর্বত্রই তো বন-বাদাড়। কুঠার কোদালের প্রয়োজন হল। কুঞ্জ পাওয়া গেল কিন্তু 'মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে।' বহু আয়াসে এবং বহুজন প্রয়াসে সেই ঠাকুর পর্বতের ওপর তোলা হল। পাথরই হল ঠাকুরের সিংহাসন আর পাথরই হল উপাধান।

ব্রাহ্মণেরা নটি পাত্রে গোবিন্দ কুণ্ডের জল নিয়ে এলেন। পরিবেশ সুখকর এবং মুখর হল নানাবিধ বাদ্য ধ্বনিতে। কেউ নাচছে। কেউবা গাইছে। তাদের মনে আজ বড়ই আহ্লাদ। উপকরণ উপচে পড়তে লাগল। দুধ, ঘি, সন্দেশ আরো কত কি যে এল। এল তুলসী পুষ্প, পুরীজী নিজ হাতে করালেন গোপালের মহাস্নান। তারপর তেল মেখে শ্রীঅঙ্গ করলেন সুচিক্কণ।

এরপর নতুন বস্ত্রে করলেন গোপালকে সুসজ্জিত এখন পুজো. পুজোর উপকরণের মধ্যে আছে তুলসী, ফুল, আর আছে দুধ, দই সন্দেশ।

এরপর অন্নকূটের আয়োজন। সে এক বৃহৎ ব্যাপার। সারা গ্রামের চাল গম যেন চলে এল। রান্না করবে কে? কেন, ব্রাহ্মণই তো আছে। দশজন বামুন লেগে গেল অন্ন প্রস্তুতিতে। আর পাঁচজন ব্যঞ্জন রন্ধনে। রুটির পাহাড় জমে গেল।

নতুন কাপড় পাতা হল। এর ওপর পাতা হল পলাশ পাতা। পাতা হল আধার আর অন্ন এবং অন্যান্য দ্রব্য হল আধেয়। এই অন্ন ঘিরে সাজান হল দই, দুধ, মাখন, বিবিধ ব্যঞ্জন, পায়েস আরো কত কি। অন্নকূটের সাড়ম্বর আয়োজন। অনেক কাল অভুক্ত তো গোপাল। তাই এত আয়োজন। পুরীজী অনুভব করলেন সব খাদ্যই গোপাল গ্রহণ করলেন। এরপর গোপালের আচমন। তারপর নতুন শয্যায় শয়ন।

গোপাল-মাহাত্ম্য বায়ু বেগে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামে। আর প্রতিদিনই প্রতিটি গ্রাম করল অন্নকূটের আয়োজন। না, ভক্তজন এইখানেই ক্ষান্ত হলনা। মথুরার ধনাঢ্যরা এগিয়ে এলেন অর্ঘ্য নিয়ে। এল রজত, কাঞ্চন আর দামী পরিচ্ছদ। পরিশেষে এক ধনশালী ক্ষত্রিয় নির্মাণ করিয়ে দিলেন গোপালের মন্দির। সত্যিই তো, নিজেরা থাকবে ছাদের তলায়, আর গোপাল থাকবেন আকাশের তলায়। তা কি কখনো হয়?

আনন্দে—মহানন্দে কাটল দুটি বছর। ভূমিকার পরিবর্তন

পুরীজীর। সবই লীলাময়ের লীলা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাময়েরই স্বপ্নাদেশ হল পুরীকে। কি সেই ইচ্ছা? গোপালজী তাপ ক্লিষ্ট বোধ করছেন। চন্দন চর্চিত হয়ে তিনি তাপ নিবারণের ইচ্ছা করছেন। কোন স্থানের চন্দন প্রয়োজন? —না, নীলাচলের। ছুটলেন পুরীজী। গৌড়দেশ হয়ে যেতে হবে নীলাচলে। শান্তিপুরে এলেন। বড়ই সুভগ অদ্বৈত। এও লীলাময়েরই লীলা। শান্তিপুরের ভক্তটির কৃপা প্রাপ্তির কাল উপস্থিত। কি সে কৃপা? না, দীক্ষা দিলেন পুরীজী অদ্বৈতকে।

এরপর মাধব রেমুনাতে এলেন। গোপীনাথ দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হলেন। তুষ্ট হলেন গোপীনাথের সান্ধ্য ভোগ দেখে। সন্ধ্যাবেলায় বারটি মাটির পাত্রে ক্ষীর সাজিয়ে দেওয়া হল গোপীনাথের সেবায়। একে বলে অমৃতকেলি। নিখিল বিশ্বে আর কোন দ্বিতীয় স্থান নেই, যেখানে এই রকম ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ দেখে পুরীজীর মনে দুটি বাসনা জাগল। এই ক্ষীর প্রসাদ প্রাপ্তির বাসনা আর দ্বিতীয় বাসনা হচ্ছে তিনিও তাঁর গোপালের ভোগ এমনি করেই দেবেন। বাসনা জাগল যে। এ তো এক রকমের লোভ। অনুতপ্ত হলেন পুরী। তাই সন্ধ্যারতির পর চলে গেলেন ঐ গ্রামের নির্জন হাটে। বসে নাম জপ করতে লাগলেন অপরাধ ক্ষালনের জন্য।

জগৎস্বামী অন্তর্যামী। ভক্তের অন্তরের ইচ্ছা তাঁর অন্তরে জেগে ওঠে। ভক্ত যেমন ভগবানের ইচ্ছা পূরণের জন্য ব্যগ্র হন, আবার ভগবানও স্থির থাকতে পারেন না, যতক্ষণ না ভক্তের

ইচ্ছা পূরণ হয়। তাই তিনি স্বপ্নাদেশ দিলেন, 'মাধব আমার পরম ভক্ত। ক্ষীর ভোগ সেবন করার ওর বড়ই বাসনা। আমি সেটা জানতে পেরে একটি ভোগের পাত্র আমার ধরার অঞ্চলে অন্তরাল করে রেখেছি। ভক্ত হাটে বসে নিরাশায় আমার নাম কীর্তন করছে। ওকে তুমি ভোগ পাত্রটি দিয়ে এস।'

সেবকের স্বপ্ন টুটে গেল। ছুটলেন তিনি মাধবের কাছে ভোগ পাত্রটি হাতে নিয়ে। ক্ষীর পাত্রটি পুরীজীর হাতে দিয়ে বললেন তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা।

দুচোখে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল মাধবের। মহাপ্রসাদ মহানন্দে ভোজন করলেন। ভোজনান্তে মাটির পাত্রটি কি ফেলে দিলেন? — না, প্রসাদ স্পর্শে পাত্রটিও যে প্রসাদ হয়ে গেছে। টুকরো টুকরো করে বহির্বাসে বেঁধে রেখে প্রতিদিন খেতে লাগলেন।

অজ্ঞাতসারে তাঁর ভক্তের জন্য একপাত্র ক্ষীর সরিয়ে রেখে-ছিলেন গোপীনাথ। তাই তিনি হলেন ক্ষীর চোরা গোপীনাথ।

মানুষ চুরি করে নিজের জন্য— ভগবানের জন্য নয়। আর ভগবান চুরি করেন মানুষের জন্য— নিজের জন্য নয়। তাতে হোক তাঁর নাম ক্ষীর চোরা। তবে কি সব মানুষের জন্যই করেন? — না, করেন মানুষের মত মানুষের জন্য। ভক্তের মত ভক্তের জন্য। পুরীজীর মত ভক্তের জন্য।

পুরীজী কি রকম? নবঘনের মধ্যে নবঘন শ্যামকে দেখে সংজ্ঞাহারা হন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এই তিন বস্তু দেহধারী জীবের চাই-ই। চাইনা শুধু মাধবেন্দ্রের। দিনমান দানা-পানি

পেটে পড়েনি। পড়েনি তো কি হয়েছে? কই, পুরীর তো কোন দেহ কষ্ট হচ্ছেনা। লক্ষ্য শুধু ইষ্ট বস্তু— ঐ নবঘন শ্যাম। আর সবই তাঁর কাছে অবস্তু। তাঁর তো কত শত ভক্ত। তাদের কাছে চাওয়া মাত্রই না হাজারো বস্তু হাজির হবে তাঁর সামনে। কিন্তু হাজারো বস্তু যে সবই অবস্তু। তাহলে তিনি তাঁর নবঘন শ্যামের কাছে চান না কেন? চাইবেন কেন? না চাইতেই তো তিনি সবই দিয়ে রেখেছেন এই বিশ্ব চরাচরে। কবি যেন পুরীজীর মানস পট এঁকেছেন এইভাবে ঃ

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান।
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ।"

আর পুরীজী অটুট বিশ্বাসে মনে মনে বলছেন ঃ

"দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সেই মহাদানেরই যোগ্য করে।"

হ্যাঁ, চার-চারবার-দুগ্ধদান ছলে একবার এবং তিনবার স্বপ্নে তাঁর প্রভু তাঁকে দেখা দিয়েছেন, আবার মুহূর্তের মধ্যে সরেও গেছেন। কিন্তু পুরীজী তাঁর প্রভুর এই লীলা কিভাবে গ্রহণ করেছেন?

"এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য করে।"

তাই জীবনের অন্তিমকালেও তাঁর বাসস্থান হল কক্ষতল নয়, বৃক্ষতল।

ব্যাধিক্লিষ্ট মাধবেন্দ্র। আশ্রয় ঐ বৃক্ষতল। সেবা করছেন

তাঁরই শিষ্য ঈশ্বরপুরী। পুরীজী কি কাতরতা প্রকাশ করছেন? —হ্যাঁ, তবে ব্যাধির কাতরতা না। বিরহের কাতরতা। সেই কাতরতার ভাষা কি? — বিরহ ক্লিষ্টা শ্রীমতীর শ্রীমুখ নিঃসৃত শ্লোকটি :

"অয়ি দীন দয়াদ্র'নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম॥"

— হে নাথ, দীনের দুঃখে তোমার কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হয়, দয়ার উদয় হয়। হে মথুরানাথ, কবে তুমি আমাকে দর্শন দেবে? তুমি আমার দয়িত। তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় বড়ই কাতর। — তোমার দর্শন লাভের জন্য তোমাকে ইতি-উতি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখন আমি কি করি?

যাহোক, পুরীজীর রেমুনাতে আর থাকা চলে না। কি করে থাকবেন? পুরীজীর আদেশ পালন করতে হবে যে। চন্দন কাঠ সংগ্রহ করতে হবে। না, যে কোন জায়গার চন্দন কাঠ না। নীলাচলের হওয়া চাই।

চলতে চলতে নীলাচলে এলেন। বললেন গোপালজীর আদেশের কথা জগন্নাথের সেবক মহান্তদের। সেবকদের ভারি আহ্লাদ হল স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে। তারা জানাল রাজপাত্রকে। রাজপাত্র আনন্দে সংগ্রহ করলেন চন্দন কাঠ। রাজপাত্রের সুবুদ্ধি প্রশংসনীয়। চন্দন কাঠ তো সংগ্রহ করলেন, কিন্তু বয়ে নিয়ে যাবে কে? রাজ পাত্রই একজন লোক দিলেন। এই লোকই বয়ে নিয়ে যাবে। মাধবেন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মনে মনে ভাবছেন পুরীজী,

'আহা! প্রভুর কি অপূর্ব লীলা! তাঁর কাজ তিনিই সেরে নেন। ভক্ত উপলক্ষ্য মাত্র।'

পুরীজী সচন্দন কাষ্ঠ ফিরে এলেন রেমুনাতে। এসে সেই গোপীনাথ দর্শন করলেন। না এখন আর গোপীনাথ না— ক্ষীর চোরা গোপীনাথ। আহ্লাদে মনটা ভরে গেল। বাষ্পায়িত হল চোখ জোড়া। আনন্দ দ্বিগুণিত হল সাঁঝ বেলাতে। কেন? সান্ধ্য ভোগ দর্শন করতে পারবেন যে! এই অমৃতকেলি তো জগতে আর দ্বিতীয় স্থানে নেই।

ক্ষীর ভোগ হয়ে গেল। পুরীজী প্রসাদ পেলেন। পরম তৃপ্তি তাঁর মনে। মন্দিরেই শয়ন করলেন। স্বপ্নে দেখলেন এক পরমাশ্চর্য দৃশ্য: স্বয়ং গোপাল এসে বলছেন, 'মাধব, তোমার আনা চন্দন আমি গ্রহণ করেছি। তোমাকে আর চন্দন কাঠ বয়ে নিয়ে যেতে হবেনা বৃন্দাবনে। এই গোপীনাথের অঙ্গ চন্দন চর্চিত করলেই আমার অঙ্গের তাপ দূর হবে। আমি আর গোপীনাথ যে অভিন্ন কলেবর।'

পুরীজীর স্বপ্ন টুটে গেল। আনন্দাশ্রুর বন্যা তাঁর দু চোখে।

গোপালজীর স্বপ্নাদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন পুরীজী। প্রতিদিন তিনি গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করতে লাগলেন।

গোপীনাথ ও মাধবেন্দ্রের পুণ্যকথা শোনালেন প্রভু। শুনলেন পার্ষদেরা আর গোপীনাথের সেবকেরা। কিন্তু শোনাতে শোনাতে, বিশেষ করে উক্ত শ্লোকটি পাঠ করার সময় প্রভুর কি হল? প্রভু বাহ্য হারালেন। প্রেমাবিষ্ট প্রভু কখনো কাঁদেন, কখনো হাসেন।

কখনো কীর্তনানন্দে নাচেন। আবার কখনো ইতি উতি তাকান তাঁর ইষ্ট বস্তুর অন্বেষণে। আর দেহে দেখা দিল,

"কম্প, স্বেদ, পুলকাঙ্গ, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য॥"

প্রভুর এই দশা দেখে লোক সংঘট্ট দেখা দিল, আর

"লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।"

এরপর ঠাকুর শয়ন দিয়ে সেবক বারটি ক্ষীর পাত্রই প্রভুকে দিলেন। বার পাত্রই কি প্রভু রাখলেন? —না, তা রাখবেন কেন? তাঁরা যে পাঁচজন। পাঁচ পাত্র রেখে বাকী সাত পাত্র সেবককে ফিরিয়ে দিলেন।

আজ বড়ই আনন্দ প্রভুর। তাই নিদ্রা গেলেন না। সারা-রাতই কীর্তনে মেতে রইলেন। এই আখ্যান শুনিয়ে প্রভু কি সংবাদ দিলেন?

"শ্রীগোপাল গোপীনাথ পুরী গোসাঞিঃর গুণ।
ভক্ত সঙ্গে শ্রীমুখ প্রভু করে আস্বাদন॥
এই আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্ত বাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা॥"

না, আর বিলম্ব নয়। তাই সপার্ষদ প্রভু "প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া।" এবং 'চলিতে চলিতে-আইলা যাজপুর গ্রাম।' এলেন ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে। যাজপুর। নামটি ভারি মিষ্টি। এরকম নাম হল কেন? কেউ বলেন যজ্ঞ, যাজন ইত্যাদি থেকে, আবার কেউ বলেন উড়িষ্যার শৈবরাজ যযাতি কেশরী থেকে।

যাহোক' নামে কি আসে যায় ? আসল কথা এখানে কোন্ ঠাকুর দর্শন করলেন প্রভু? সে সংবাদ দিচ্ছেন কবিরাজ,

'বরাহ ঠাকুর দেখি করিলা প্রণাম।'

বরাহ হচ্ছেন দশ অবতারের অন্যতম অবতার। প্রভু তাই প্রণাম করলেন। প্রেমানন্দে আবিষ্ট হলেন। আর করলেন স্তব-স্তুতি। কিভাবে করলেন সেই স্তব স্তুতি ?

"নৃত্য গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন॥"

এত স্তব-স্তুতি করলেন কেন ? ইনি সেই "পুরুষোলোককল্প'র তৃতীয় অবতার। পৃথিবীতে তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। আগে ছিল শুধুই জল— চারভাগই জল। তাই তিনি এলেন মীন রূপে। দ্বিতীয় অবতারে উভচর রূপে অর্থাৎ কূর্মরূপে। ধীরে ধীরে স্থলভাগ ঐ জলভাগ থেকেই জেগে উঠল। কচ্ছপ জলে থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। ডাঙ্গা জেগে উঠেছে। উদ্ভিদ দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন দংষ্ট্রার। দাঁত দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে খেতে হবে তো। তাই এলেন বরাহ রূপে। স্রষ্টার কি মধুর লীলা।

যাজপুর লীলা সাঙ্গ হল। এর পরবর্তী স্থান কটক নগর। প্রভুর লীলার কি অন্ত আছে ? এদিকে তো বিলম্ব সয়না। মন পড়ে আছে জগন্নাথে। কিন্তু এই কটকে আছেন সাক্ষী গোপাল। নিত্যানন্দ এর আগে পরিভ্রমণকালে সাক্ষীগোপাল দর্শন করেছেন এবং মাহাত্ম্য শুনেছেন লোকমুখে।

এতদিন ছিলেন প্রভু বক্তা। অন্যেরা শ্রোতা। ভূমিকার

পরিবর্ত্তন হল। এখন নিত্যানন্দ বক্তা। অন্যেরা শ্রোতা। এই অন্যদের মধ্যে আছেন প্রভু স্বয়ং। বক্তার ভূমিকায় সাক্ষীগোপাল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে লাগলেন নিত্যানন্দ: স্থান বিদ্যানগর। সাক্ষীগোপাল এক নাটকীয় আখ্যান। এর প্রধান ভূমিকায় দুই ব্রাহ্মণ। বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্র। একজন বয়োতীত, অপর জন যুবক। তাই বড় ও ছোট। দুজনে তীর্থ ভ্রমণে বেরোলেন। গয়া, কাশী ও প্রয়াগ দর্শনান্তে তাঁরা এলেন মথুরায়। উভয়েই পুলকিত। 'মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা।' দ্বাদশ বন দর্শন করলেন। পরিক্রমা করলেন গিরি গোবর্ধন। এরপর এলেন গোপাল মন্দিরে। বৃন্দাবনের এই শ্রীগোপাল দর্শন করে মন তাঁদের কানায় কানায় ভরে গেল আনন্দে। শ্রীগোপাল তাঁদের মন কেড়ে নিয়েছেন। যতই দেখেন, ততই দেখতে ইচ্ছা করে। কিছুতেই আশ মেটে না। তাই দু-চার দিন থেকে গেলেন।

বয়সের ভার বড় বিপ্রের দেহে। সবকাজ নিজে করতে পারেন না। স্বেচ্ছায় সেবা-যত্নের ভার নিলেন ছোট বিপ্র। কৃতজ্ঞতায় গলে গেল বড় বিপ্রের মন। কিভাবে ঋণপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়— বড় বিপ্র সর্বদাই ভাবছেন। ঋণ তো বটেই। কত তাঁর ছেলে, কত তাঁর আত্মীয় স্বজন, লোকজন? কই, তাদের কেউ তো তাঁকে তীর্থে নিয়ে এল না। না, এ ঋণ তাঁকে শোধ করতেই হবে। কিভাবে শোধ করা যায়? ভাবতে ভাবতে পথ পেয়ে গেলেন। হ্যাঁ, তাঁর তো কন্যা আছে। সেই কন্যারত্নটিকে দান করেই তিনি ঋণমুক্ত হবেন। তাই ছোট বিপ্রকে বললেন,

'দেখ, তোমার জন্যই আমি তীর্থ দর্শন করলাম। ধন্য হলাম। আর তুমি যে সেবা যত্ন করলে, তা আমি নিজ জনের কাছেও পেতাম কি না সন্দেহ। তাই আমি তোমারি কাছে ঋণী। আমার কন্যটিকে তোমাকে সম্প্রদান করে ঋণমুক্ত হতে চাই। তুমি সম্মতি দাও।'

বয়সে কাঁচা হলে কি হয়, জ্ঞানে কিন্তু পাকা ছোট বিপ্র। আদৌ উল্লসিত হলেন না এ প্রস্তাবে। বললেন, 'দেখুন, আমি যা কিছু করেছি, কৃষ্ণ প্রীতিতেই করেছি। কোন কিছু পাওয়ার আশায় করি নি। আপনার এ প্রস্তাব একেবারেই অবাস্তব। আমি অকুলীন, আর আপনি হচ্ছেন মহাকুলীন। আপনি নিজে না হয় কুলের কথা ভাবছেন না, কিন্তু ভাবার লোক আছে অনেক। আপনার স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন সবই আছে। ওরা সবাই আপত্তি করবে। তাতে হরিষে বিষাদ হবে। ভাগবত আখ্যান আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে। রুক্মিণী পতিরূপে বরণ করেছেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই। সব সময়েই কৃষ্ণরূপ ধ্যান করেন। তাঁর বাবা ভীষ্মকও ইচ্ছুক। কিন্তু বাধ সাধল তাঁর দাদা। শেষকালে পত্র লিখে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করলেন তাঁকে উদ্ধার করতে। যোদ্ধার ভূমিকায় উদ্ধার করলেন বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণে যা সম্ভবপর, তা আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে কল্পনার বস্তু।' বড় বিপ্র নাছোরবান্দা। তাই

"বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজ ধন।
নিজধন দিতে নিষেধিবে কোন জন?"

নিরুপায় ছোট বিপ্র। তাই সম্মতি জানালেন। তবে হ্যাঁ, একটা শপথের প্রয়োজন। অবস্থা বৈগুণ্যে অপমানের বোঝা বইতে

যাবেন কেন ? তাই বললেন, 'বেশ, আপনার কথায় না হয় রাজী হলাম। তবে আপনি গোপালকে সাক্ষী রেখে শপথ করুন।' বড় বিপ্র তাই করলেন। ছোট বিপ্র বয়সে নবীন, ভক্তিতে প্রবীণ। তাঁর কৃষ্ণপ্রীতির তুলনা নেই যেন, নইলে মূর্তিকে কেউ সাক্ষী মানে —বলে কি না বড় বিপ্রের কথার তিনিই রইলেন সাক্ষী। প্রয়োজনে তাঁকে সেই সুদূর বিদ্যানগরে গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে।

এরপর উভয়েই দেশে ফিরলেন। ফিরে বড় বিপ্র তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিকটজনকে কন্যা সম্প্রদানের শপথের কথা বললেন। গোপাল সাক্ষী করে শপথের কথা। শুনে সবাই হাহাকার করে উঠলেন। নিচ কুলে কন্যা দিলে নিজকুলের বিনাশ হবে। তবুও বড় বিপ্রের কাছে বাক্যই মাণিক্য। তাই নিজ সংকল্পে অটল রইলেন। শেষে স্ত্রী-পুত্র বললেন তাঁরা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হবেন। না, বড় বিপ্রের সংকল্প আর অটুট রইল না। পরিবারবর্গ পরামর্শ দিলেন, 'তোমাকে সত্য ও বলতে হবে না, আবার মিথ্যাও বলতে হবে না। শুধু বলবে তোমার স্মরণ হচ্ছে না। আর তাছাড়া বিগ্রহ কখনো হাঁটতে পারে নাকি ? যত সব আজগুবি কথা। বড় বিপ্র ভক্ত মানুষ। তাই

"এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হইল মন
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল চরণ॥
মোর ধর্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন
তুই রক্ষা কর গোপাল লইনু স্মরণ॥"

দিন যায়। দিন আসে। আসেনা শুধু বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের কাছে। ছোট বিপ্রই তাই গেল বড় বিপ্রের কাছে।

শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। বড় বিপ্র শেখানো বুলিই বলল। শুনে ছোট বিপ্রের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই বড় বিপ্রের ছেলে তেড়ে এল ছোট বিপ্রকে মারতে। ছোট বিপ্র আর কি করে? পালিয়েই জীবন বাঁচাল। ছোট বিপ্র দেহে বাঁচল। মনে মরে রইল। তার ঐ এক ভাবনা। স্বয়ং গোপাল যে সাক্ষী। তা কি করে মিথ্যা হয়? তাই সে একদিন গ্রাম্য সালিশ ডাকল। বিচার চাইল। বড় বিপ্র গ্রাম প্রধানদের বললেন, 'আমি বৃদ্ধ কখন কাকে কি বলেছি, তা তো স্মরণ হয় না।' এই কথার সূত্র ধরে বড় বিপ্রের ছেলে বলল, 'বাবা অনেক টাকা পয়সা নিয়ে তীর্থে গিয়েছিলেন। সব টাকা লুট করে নিয়েছে ওই বামনা ব্যাটা। এখন বলে কি না চুরি হয়ে গেছে। বাবাকে ধুতরা খাইয়ে মাথায় গোলমাল করে দিয়ে এখন শপথ বাক্যের কথা তুলছে। আচ্ছা, আপনারাই বলুন ও কি আমার বোনের যোগ্য পাত্র?'

গ্রাম প্রধানদের মনে দ্বন্দ্ব-ধন্দ দেখা দিল। তখন ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের গোপাল সাক্ষী করে শপথের কথা বললেন। এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন বড় বিপ্র। প্রধানদের কোন কিছু করতে হল না। বড় বিপ্র বললেন, 'বেশ তাই হবে। যদি গোপাল এসে সাক্ষী দেন, তাহলে কন্যা সম্প্রদান আমি অবশ্যই করব। স্ত্রী-পুত্র কারুর কথাই মানব না।'

এ কথা কি কন্যাদান এড়িয়ে যাবার জন্য বললেন? —না। বড় বিপ্র ভক্ত মানুষ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নিজ বাক্য রক্ষার দায় থেকে গোপাল তাঁকে রক্ষা করবেন।

পরমাশ্চর্য প্রত্যয় ছোট বিপ্রের মনে। সেই অটল বিশ্বাসে ছুটলেন ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে। গোপালজীকে নতি-প্রণতি জানিয়ে সব কথা নিবেদন করলেন। গোপাল বললেন, 'বেশ, তুমি সভা ডাক, আমি সাক্ষী দেব।'

ছোট বিপ্র বললেন, 'তোমাকে কিন্তু এই মূর্তিতে গিয়েই সাক্ষী দিতে হবে।' গোপাল বললেন, 'তা কি করে হয়? প্রতিমা কি চলতে পারে?' শিশু সরলতায় শুধোলো ছোট বিপ্র, 'তা হলে কথা বলছ কি করে? কে বলে তুমি প্রতিমা? তুমি তো সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

কথায় যেন হেরে গেলেন গোপাল তাঁর ভক্তের কাছে। ভক্তের আবদারই মেনে নিলেন। বললেন, 'বেশ, আমি এই মূর্তিতেই যাব। তুমি আগে। আমি পেছনে। আমার নূপুর ধ্বনি শুনে বুঝবে আমি তোমার পেছনে আছি। তুমি কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাবে না আমার দিকে। যে স্থানে তাকাবে, আমি সেই স্থানেই থেমে যাব।'

যাত্রা শুরু হল। ভক্ত-ভগবানের যাত্রা: ভক্ত আগে, ভগবান পেছনে। মধুর। বড়ই মধুর যাত্রা।

দিন যায়। দিন আসে। আবার দিন যায়। অপর দিন শুরু হয়। এমনি করে চলল দিনের পর দিন। শতদিন। বিদ্যানগরের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন। তখন ছোট বিপ্রের মনে কেমন যেন ধন্দ লাগল। নূপুরধ্বনি কানে বাজছে না যেন। বাজবে কেন— ধন্দ এসেছে যে। কান তাই বাজে হয়ে গেছে। বাজে কানে বাজে না।

কেন এমন হল ? ছোট বিপ্র যে ঘরপোড়া গরু। একবার অপমানের বোঝা মাথায় নিয়েছে। আবার কি সেই অপমানের অপায় তাঁর ঘাড়ে এসে পড়বে ঐ গ্রামসভার সামনে। না, তা হতে পারে না। নিশ্চিত হওয়া দরকার। তাই ঘাড় ফেরাল বিপ্র। আর অমনি "হাসিয়া গোপাল দেব তাহাই রহিল।' এবং বললেন, 'এথায় রহিব আমি না যাব অতঃপর।' গোপালজীর যেমন কথা. তেমন কাজ। ছোট বিপ্রের খেদ নেই এতে। থাকুন গোপালজী। এইখানেই থাকুন। কাছেই তো এসে গেছেন। খবর দেওয়া যাক গ্রামবাসীদের। সংবাদ পেয়ে কি হল ? -- 'আইল লোক সাক্ষী দেখিবারে।' দেখে তাদের মনে যুগপৎ বিপরীত ক্রিয়া দেখা দিল :

'গোপালের সৌন্দর্য দেখি লোক আনন্দিত।
প্রতিমা চলি আইলা শুনি হইয়া বিস্মিত ॥'

ছুটে এলেন বড় বিপ্র। একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। পড়বেন বৈ কি। গোপাল যে তার বাক্য রক্ষা করেছেন। না, আর দেরী না। তিনি আর স্ত্রী-পুত্রের কথায় থাকবেন না। ওরা মরতে চায় মরুক। কন্যা তিনি দান করবেনই। আর করলেনও তাই।

দুই বিপ্রই তুষ্ট। বড়ই তুষ্ট। ছোট বিপ্রের মান রক্ষা হল। আর বাক্য রক্ষা হল বড় বিপ্রের। আর রক্ষা হল একটি সত্য : ভগবান ভক্তের বশ।

শুধু দুই বিপ্র কেন— তুষ্ট সর্বজন। তুষ্ট ভগবান স্বয়ং। তাই বরদানে ইচ্ছুক হলেন। বর চাইলেন উভয়েই। একই বর। কি সে বর ? মান, কাঞ্চন, যশ, প্রতিপত্তি ? —না, শুধু স্থিতি—গোপালজীর

স্থিতি। উভয়েই একই সুরে বললেন, 'যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে।' 'তথাস্তু' বলে সেই স্থানেই রয়ে গেলেন। এখন আর গোপাল না, সাক্ষী গোপাল।

সর্বজন এলেন গোপাল দর্শন করতে। সর্বজনের মধ্যে কি রাজাও আছেন? —হ্যাঁ, আছেন।

"এই মতে বিদ্যানগরে সাক্ষীগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥"

তবে স্থানের পরিবর্তন হল। উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম। দেশটি জয় করলেন যুদ্ধ করে। বিষয়ী, আবার পরম ভক্ত। তাঁর বড়ই সাধ গোপালের স্থিতি তাঁর রাজধানী কটকেই হোক। গোপালজী তাঁর সাধ পূরণ করলেন। ভগবান যে ভক্তাধীন। গোপালজী এলেন কটকে বিদ্যানগর ছেড়ে। বিদ্যানগরে গোপাল ছিলেন সিংহাসনে। এখন আসীন হলেন রত্নসিংহাসনে। রাজপাটের ব্যাপার তো পাটরাণীও এলেন গোপাল দর্শনে। দর্শন করে বড়ই পুলকিত হলেন। রাণীরও সাধ জাগল, কি না তিনি তাঁর নাকের দামী মুক্তো গোপালের নাকে পরাবেন। আকুল হয়ে উঠল রাণীর মন— আহারে! গোপালের নাকে যদি ছিদ্র থাকত। ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূরণ করলেন: স্বপ্ন দেখলেন রাণী— গোপাল বলছেন শিশুকালে তাঁর মা তাঁর নাকে ছিদ্র করে মহামূল্য মুক্তো পরিয়ে দিয়েছিলেন। স্বপ্নের কথা রাজার কানে দিলেন রাণী। রাজা মন্দিরে এলেন। দেখলেন রাণীর স্বপ্ন সম্পূর্ণ ঠিক। এই তো গোপালজীর নাকে ছিদ্র আছে। তাই রাজা

"পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহা মহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা॥"

গোপাল মাহাত্ম্য কথা সমাপ্ত করলেন অবধূত। মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে অনেক রাত হল। বাকী রাত সংকীর্তনানন্দে মেতে রইলেন সবাই। তারপর 'প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া।'

আবার যাত্রা শুরু হল। পথ যেন ফুরোয় না। বিশ দিনের পথ তো— সহজে ফুরোবে কেন? এর ওপর আবার আছে স্থানে স্থানে লীলাবিলাস। এরপর ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বর পুরীর উত্তরে। স্থানটি দেবালয়ময়। এরই মধ্যে আছে শিবালয়। শিবেরই নাম ভুবনেশ্বর। শিবের স্থান তো কাশী। হঠাৎ এখানে? তবে কি এটা দ্বিতীয় কাশী? —না, গুপ্ত কাশী।

এখানে অধিষ্ঠানের পশ্চাৎ কাহিনী একাধিক। কাহিনী যেমন একাধিক, আবার নামও তেমনি একাধিক। যেমন, ভুবনেশ্বর, একাম্রক ক্ষেত্র, হেমাচল, স্বর্ণাদ্রি ক্ষেত্র। স্থান মাহাত্ম্য অনবদ্য। কোটিলিঙ মূর্তি ও অষ্টতীর্থ বিরাজমান। বিরাজমান এখানে বিন্দু সরোবরও। শিব স্থানটি পেলেন কি ভাবে? —তাঁর স্বপ্রয়াসে আর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে। যেমন, বৃন্দাবন সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

'শুন শিব, তোমারে দিলাঙ দিব্য স্থান।
সর্ব গোষ্ঠী সহ তথা করহ পয়ান।'

শ্রীকৃষ্ণ আবার বললেন,

'একাম্রক বন নাম স্থান মনোহর।
তথায় হইবা তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর॥

সেই বারাণসী প্রায় সুরম্যনগরী।
সেই স্থানে আমার পরম গোপ্যপুরী॥'

আরও বললেন,

'হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে॥
ভক্তি-মুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথা তুমি খ্যাত হৈবা শ্রীভুবনেশ্বর॥'

এ তো গেল হরিহর সংবাদ। কিন্তু গৌরহরি সংবাদ কি? গৌরহরি কি করলেন?

'সেই শিবগ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে।
শিবলিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে।'

প্রভুর এই সন্তোষের কারণ কি? সাম্যের সামগীত গেয়েছেন প্রভু নদীয়া লীলায়। মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ নেই। সব সমান। সবারই সমান অধিকার। সেই সাম্যের সন্ধান পেলেন প্রভু এই ভুবনেশ্বরে। কি ভাবে?

স্বর্ণাদ্রি মহোদয় গ্রন্থে ব্যাসদেব সংবাদ জানাচ্ছেন ভুবনেশ্বরের প্রসাদ গ্রহণে পংক্তি ভেদ নেই। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যেমন গ্রহণ করতে পারে, তেমনি সমানাধিকারে গ্রহণ করতে পারে শূদ্রও।

ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব আরও জানাচ্ছেন ভুবনেশ্বরের প্রসাদ গ্রহণে শৌচাশৌচ বিচার নেই, নেই কাল নিয়মাদি আচারের আদাড় পাঁদাড়। এ প্রসাদ স্পর্শ দোষমুক্ত। অন্ত্যজ স্পর্শেও কোন দোষ হয় না। বরং সেই স্পর্শের প্রসাদ গ্রহণে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ঘটে।

বাহ্যাচারের কোন বালাই-ই নেই। বিচার নেই এই প্রসাদ গ্রহণে স্নাত-অস্নাতের। প্রাপ্তি মাত্রেই গ্রহণে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ পবিত্র হয়।

তাই সাম্য পুরোধাপুরুষের এত পুলক। এই পুলকের সংবাদ দিচ্ছেন বৃন্দাবন ঃ

'নৃত্যগীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সেই রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র ॥'

প্রভুর হৃদয় কমল পুলকে পূর্ণায়ত। প্রভু এলেন কমলপুরে। এখন প্রভুর দ্বিগুণ. চতুর্গুণ, শতগুণ পুলক। পুলকে দেহ কম্পিত। ঐ—ঐ তো জগন্নাথ দেবের মন্দির। চূড়ো দর্শন করেই প্রভু আথে ব্যথে অস্থির হলেন। হলেন আনন্দিতও। সব কিছুর সংমিশ্রনে এক অদ্ভুত, অচিন্ত্য ভাব। শুধু শুধু ঘন ঘন হুঙ্কার দিচ্ছেন। আর

'প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে ॥"

কি সে শ্লোক? বড়ই মধুর সে শ্লোক। যেমন,

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মের বক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিত সুবদনে বালগোপাল মূর্তিঃ ॥"

—ঐ দেখ, প্রাসাদের ওপর ফুল্লকমল বদন বালগোপালরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখে মধুর মধুর হাসছেন। এই হাস্যে শ্রীবদনের শোভা বর্দ্ধন করে তিনি অবস্থান করছেন।

শ্লোকার্থ বৃন্দাবন পয়ারে গেয়েছেন এই ভাবে ঃ

"প্রভু বলে, 'দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখে শ্রীবাল গোপালে ॥"

সে এক পরমাশ্চর্য দৃশ্য। আবেগে বেগবান, আবার বিবশ। বারবার শ্লোক পড়ছেন, আর ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ছেন। আর্তিতে চোখ জোড়ায় বইছে সুরধুনীর ধারা। এ দৃশ্য বর্ণনা করা মানুষের দুঃসাধ্য। যথার্থ বলেছেন বৃন্দাবন ঃ

'অনন্তের জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন।'

দৃশ্যপটের পরিবর্তন। এতক্ষণ তো মাটিতে পড়ছিলেন, উঠছিলেন আর শ্লোক পড়ছিলেন, কিন্তু এখন ভুঁয়ে লগ্ন হলেন প্রভু। অর্থাৎ গোটা পথটাই চলতে লাগলেন দণ্ডবৎ প্রণাম করে। প্রভুর এমনই প্রেমাবেশ। মাত্র তো চারদণ্ডের পথ ঃ কমলপুর থেকে মন্দির। সেই পথ অতিক্রম করতে লাগল তিন প্রহর। এমনি করেই ভক্তিমার্গে চলাব পথ দেখালেন প্রভু।

এখন আঠারনালা। পুরীর প্রবেশ পথে আছে একটা ছোট নদী। বিলের মত। এর বুকটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে সাঁকো দিয়ে। এই সাঁকোতে আছে আঠারটা খিলান। তাই আঠারনালা।

প্রভু ভাব সংবরণ করলেন। বললেন, 'এখন তো মন্দিরে প্রবেশের পালা। আমি একা যেতে যাই। তোমরা আগে যাবে, না আমি আগে যাব?' সবাই নীরব। শেষে মুকুন্দই মুখ খুললেন। 'বেশ তো, তুমিই আগে যাও।' স্মিত হেসে প্রভু বললেন, 'ভাল, আমিই আগে চললাম।'

প্রভু চললেন। কিভাবে চললেন?

"মত্ত সিংহ গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর॥"

মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দর্শন করলেন জগন্নাথ, সুভদ্রা, সঙ্কর্ষণ। প্রভু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তাই,

"দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হৈলা জগন্নাথ কোলে করিবারে॥"

না. শুধু ইচ্ছাই নয়। সত্যি সত্যি প্রভু জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে গেলেন। সর্বনাশ! জগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ। তাও এক ভিন দেশের সন্ন্যাসী। 'মার' 'মাব' রব তুলে ছুটে এল মন্দিরের সেবকেরা। অবশ্য প্রভু সঙ্গে সঙ্গেই সংজ্ঞা হারা হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

না, প্রহার করতে পারলনা পড়িছারা। উদ্যত পড়িছাদের নিরস্ত করলেন এক দিব্যকান্তি সৌম্য দর্শন বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ। কে এই ব্রাহ্মণ বয়সে যিনি উত্তর পঞ্চাশ?

সপ্তম অধ্যায়

সার্বভৌম উদ্ধার

ব্রাহ্মণের নাম লোকমুখে সার্বভৌম। আসল নাম শ্রীপাদ বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তখন ভারতবর্ষে বেদজ্ঞ বলতে ছিলেন দুজন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী, যিনি কাশীবাসী, আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন এই সার্বভৌম। পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়েই না দোর্দণ্ড প্রতাপ মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁকে সভাপণ্ডিত করে এনেছেন। স্বয়ং মহারাজই তো তাঁর কাছে আনত মস্তক। পড়িছারা তো কোন্ ছার!

আচ্ছা, সার্বভৌম পড়িছাদের কর্তব্যে বাধা দিলেন কেন? সেবকদের দোষ কি? জগন্নাথ দেবের পবিত্রতা, নিত্যকর্ম পালন বিধি রক্ষা করাই না এদের কাজ। এরা যে পড়িছা, পরিহারী। প্রতিহারীর প্রধান কর্তব্যই তো রক্ষণাবেক্ষণ। তাহলে সেই কর্তব্যে যে বাধা দিলেন রাজপণ্ডিত!

তবে কি ভট্টাচার্য চিনতে পেরেছেন জগন্নাথসুতকে। নবদ্বীপের দিনগুলো তো স্মরণে থাকার কথা নয়। সে কি আজকের কথা? তখন তো নিমাইয়ের পৌগণ্ডকাল। গঙ্গাদাসের টোলে

ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হল। এখন ন্যায় অধ্যয়ন প্রয়োজন। ন্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কে? — না, সার্বভৌম স্বয়ং। কাজেই সার্বভৌমের কাছেই গেলেন নিমাই ন্যায়ের পাঠ নিতে।

গুরু শিষ্যকে চেনার কথা। কিন্তু শিষ্য যে তখন ছিলেন বালকমাত্র। আর সেই শিষ্য এখন যুবাপুরুষ। নধরতনু-দীর্ঘদেহী। মাথায় ছ ফুটের ওপর। আর ওপর ইনি এখন নবীন সন্ন্যাসী। তবে যে সার্বভৌম পড়িছাদের বাধা দিলেন?

আসলে প্রথম দর্শনেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সার্বভৌম। কে এই জ্যোতির্ময় পুরুষ-যিনি অচেতন হয়ে শয়ান আছেন 'কোটি ইন্দু জিনি জ্যোতি/কোটি রবি তেজে।' আর যাঁর 'নবীন কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ/সুমেরু পর্বত জিনি দেহের গঠন।' কে এই অকলঙ্ক কলানিধি তাঁরই সামনে ভূ-লুন্ঠিত? সভাপণ্ডিত তিনি দীর্ঘকালের। কই, এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে এমন জ্যোতির্ময় পুরুষ, এমন প্রেমাবিষ্ট সন্ন্যাসী তো তাঁর চোখে পড়েনি।

চোখে পড়েনি তাঁর নবদ্বীপ বাসকালেও। তখন তাঁর যৌবনকাল। প্রথম অধ্যাপনা নবদ্বীপেরই বিদ্যানগরে— গঙ্গানন্দপুরে। এই জনপদেরই মহেশ্বর বিশারদের নাম কে না জানত? পিতার খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গেল বুঝিবা পুত্র সার্বভৌমের খ্যাতি। পরমাশ্চর্য যোগসূত্র। প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী ও মহেশ্বর ছিলেন সতীর্থ আবার সার্বভৌম ও জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন সহাধ্যায়ী।

ঘটনাটি যেমন পরমাশ্চর্য। তেমনি অসাধারণ। তাই কৌতূহলও

প্রবল। তাই তিনি পড়িছাদের নিরস্ত করলেন।

আচ্ছা, যদি রাজপণ্ডিতের আকস্মিক আবির্ভাব না ঘটত? তাহলে কি আঘাতজনিত কোন ঘটনা ঘটত প্রভুর দেহে? —না, ঘটতনা। পড়িছারা কোন ছার? — এমন কোন প্রাকৃত শক্তি নেই, যা প্রভুর অঙ্গে আঘাত করতে পারে। তিনি যে চিন্তামণির চিন্তায় অচেতন। আর সেই চিন্তামণি তাঁরই সম্মুখে দণ্ডায়মান।

যাহোক, সার্বভৌমের চিন্তায় ছেদ পড়ল। সত্যিই তো সন্ন্যাসীটির পরিচয় পরে নিলেও চলতে পারে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন এঁর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা। নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন।

কিন্তু এই দীর্ঘ দেহী পুরুষটিকে বহন করা তো সহজ ব্যাপার নয়। তবে হ্যাঁ, সেবকের আছে। আর তাঁর আদেশ সেবকেরা মান্যও করবে। সার্বভৌম সেবকদের নির্দেশ দিলেন সন্ন্যাসীকে তাঁর বাড়ী নিয়ে যেতে। সেবকেরা নির্দেশ পালন করল। সেবা-শুশ্রূষা শুরু হল। না, সন্ন্যাসীর মূর্চ্ছা তো ভাঙ্গেনা। ভাঙ্গবে কি করে? যে রোগের যে ওষুধ তাতো জানা নেই ভট্টাচার্যের। জানবার কথাও না। তিনি যে জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মবাদী। সোঽহং— নিজেই ভগবান। ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক তো তাঁর পরিধির বাইরে। শ্রীচৈতন্যের এই অচৈতন্য হচ্ছে অধিরূঢ় মহাভাব। আর মহাভাব সার্বভৌমের ভাবনার বাইরে।

তাহলে মহাভাব কাটাতে পারবেন কারা? কেন, সঙ্গে এসেছেন যাঁরা। সেই সঙ্গীরাই এসে পড়লেন। পার্ষদবৃন্দ প্রথমে

গিয়েছিলেন মন্দিরে। সেখানে জিজ্ঞাসায় প্রভুর অচৈতন্যের কথা জানতে পেরে ছুটে এসেছেন। আথে-ব্যথে এতই অস্থির যে জগন্নাথ দর্শন না করেই তুরঙ্গ বেগে ছুটে এসেছেন। তাঁদের প্রাণের ঠাকুর যে অচেতন। আর কি তাঁরা কোথাও দাঁড়াতে পারেন?

প্রভুর এই পার্ষদবৃন্দ সার্বভৌমের গৃহে আসছিলেন। পথে সাক্ষাৎ হল আচার্য গোপীনাথের সঙ্গে। গোপীনাথও আসছিলেন ভট্টাচার্যের বাড়ীতে। আত্মীয় আত্মীয়ের গৃহে যাতায়াত স্বাভাবিক। আচার্য ও ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি শ্যালক সম্পর্ক। আচার্য ভগ্নীপতি, ভট্টাচার্য শ্যালক। নিত্যানন্দ ও মুকুন্দ গোপীনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। গোপীনাথ যে নবদ্বীপেরই জামাই। নবদ্বীপেই পরিচয়। পরিচয় পরিপক্ক হয়েছে ঘনিষ্ঠতায়। শুধু এঁদের সঙ্গে কেন? প্রভুর সঙ্গেও— প্রভুর পরমভক্ত এই আচার্য।

যাহোক, মুকুন্দকে দেখে বিস্মিত হলেন আচার্য। নমস্কার বিনিময় হল। প্রভুর কথা জিজ্ঞেস করলেন গোপীনাথ। মুকুন্দ বললেন, 'প্রভু নীলাচলে এসেছেন, তাই আমরাও এসেছি সঙ্গে। এক সঙ্গেই ছিলাম। আঠারনালা পার হয়ে প্রভুর কি ইচ্ছা হল— আলাদা হয়ে আগে ছুটলেন। তারপর তো মন্দিরে এসে শুনলাম প্রভু ঈশ্বর দর্শনে অচেতন হয়ে পড়েছেন. এবং প্রভুকে সার্বভৌম নিজ গৃহে নিয়ে গেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। আমাদের প্রভু অচেতন, মনটা বড়ই-উতলা। চল, সর্বাগ্রে প্রভুর কাছে যাই। পরে জগন্নাথ দর্শন হবে।'

স্মিত হেসে গোপীনাথ বললেন, 'বেশতো তাই চল।' সগোপীনাথ সঙ্গীরা এলেন সার্বভৌম-গৃহে। গোপীনাথ নমস্কার করলেন নিত্যানন্দকে।

সার্বভৌম এখন আর নবদ্বীপের সার্বভৌম নন। জীবনস্রোত বাঁক নিয়েছে অন্যখাতে। তিনি এখন রাজপণ্ডিত। রাজপণ্ডিত তো — রাজ-রাজড়ার মতই চলেন। সোনার পালঙ্কে শয্যা, সোনার থালায় আহার। আর বাসগৃহও রাজপ্রাসাদেরই মত। অন্তঃপুরে সবার প্রবেশাধিকার নেই। অবশ্য গোপীনাথের আছে। গোপীনাথ তাই এঁদের বহির্বাটিতে রেখে অনুমতি আনতে গেলেন। অনুমতি অবশ্যই মিলল। তখন সবাইকে নিয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। প্রভু-তো অচেতন। দেখে সবার মনে দুঃখ যেমন হল, আবার আনন্দও হল।

দুঃখ হল শচীমাতার আদরের দুলালের আজ বিসদৃশ দশা দেখে। কোথায় তাঁর 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি'! শচীমাতা নিজ হাতে না খাওয়ালে যাঁর খাওয়া হয়না, আজ সেই নিমাইয়ের এ কী দশা! অনাহারে, অনিদ্রায়, অজস্র কষ্ট-ক্লিষ্ট হয়ে নিশি দিশি শুধু ছুটে চলেছেন 'হা-কৃষ্ণ হা-কৃষ্ণ' বলে। আর সেই আর্তিতেই আজ অচেতন। আর আনন্দ হল এই দৃশ্য দেখে যে সার্বভৌমের মত মায়াবাদীও আজ তাঁদের প্রভুর সেবা যত্ন করছেন।

গোপীনাথ পার্ষদদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সার্বভৌমের সঙ্গে। জানালেন এঁরা প্রভুর জন্য ব্যাকুল হয়ে সরাসরি চলে

এসেছেন। জগন্নাথ দর্শন হয়নি। সার্বভৌম বললেন, 'নবীন সন্ন্যাসী অচেতন। এমন অচৈতন্য আমি এর আগে দেখিনি। সর্বাঙ্গ নিথর-নিস্পন্দ। উদরে পর্যান্ত স্পন্দন নেই। আমি তো শঙ্কিত হয়েই পড়েছিলাম। শঙ্কা কাটলো যখন নাকে তুলো ধরলাম। তুলো যখন নড়ল, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। যাহোক, আপনারা জগন্নাথ দর্শন করে আসুন। আমি তো সন্ন্যাসীর সেবাযত্নে রইলাম। তবে হ্যাঁ, আপনারা ভিন দেশী। আবার আরেক অঘটন না ঘটে। আমি আমার পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিচ্ছি। আপনাদের কোন রকম অসুবিধা হবেনা।'

পার্ষদবৃন্দ হৃষ্ট হলেন জগন্নাথ দর্শনে। আর নিত্যানন্দ তো হৃষ্ট হলেনই। একেবারে প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তখন সবাই মিলে তাঁকে প্রকৃতিস্থ করলেন। সেবকেরা সবাইকে সমাদর করলেন। করবারই কথা— সঙ্গে চন্দনেশ্বর আছেন কি না। তাই 'ঈশ্বর সেবক মাল্য প্রসাদ আনি দিল।' আর 'প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে।'

এরপর ফেরার পালা। জগন্নাথ দর্শনে যেমন উৎফুল্ল, আবার তেমনি উদ্বিগ্ন প্রভুর মূর্চ্ছায়। তাই ঝটিতি ফিরে এলেন। অবশ্য পার্ষদেরা নিশ্চিন্ত। তাঁরা প্রভুর বাহ্যদশা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। তবে যে সার্বভৌম পারলেন না। পারবেনও না। তিনি ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কটি জানেন না। সম্পর্কের এই গূঢ় গোপ্যটি জানেন পার্ষদেরা। জানেন বলেই প্রভুকে অচেতন রেখে গেলেন জগন্নাথ দর্শন করতে।

গূঢ় গোপ্যটি কি? সে কি কোনো মন্ত্র? নাকি পরিচর্যা? —না, এসব কিছুই না। এঁদের গোপ্য প্রকাশ্য এক বস্তু। ঐ নাম সংকীর্তন। এই এক মহৌষধেই পরিত্রাণ সর্ব পরিস্থিতিতে। হবেই তো। এ যে তারকব্রহ্ম নাম। প্রভুই শিখিয়েছেন তাঁদের এই নাম। কি আধিতে, কি ব্যাধিতে এঁরা অন্যকোন ঔষধ-বটিকা সেবন করেন না বা কারুর দ্বারস্থ হন না। দ্বারস্থ হন শুধু নামের। সব অপায়ের উপায় হচ্ছে এই নাম। নামাবলীর বলেই তাঁরা বলী। মহাবলী—সার্বভৌম বলী। তাই,

"উচ্চ করি করে সবে নাম সংকীর্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥"

তখন কি হল—প্রভুর আর সার্বভৌমের?—

"হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি॥"

সার্বভৌমের মধ্যে দেখা দিল যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়। দিব্য-কান্তি সন্ন্যাসীটি সংজ্ঞাহীন হয়ে ছিলেন দীর্ঘক্ষণ। তিনি বাহ্যদশা ফিরে পেলেন। তাই ভট্টাচার্যের আনন্দ।

আবার ভাবছেন এই সন্ন্যাসীটি কোন্ বস্তু? আর পার্ষদবৃন্দই বা কোন বস্তু? এই নামই বা কোন্ বস্তু? মায়াবাদী সার্বভৌম নামযজ্ঞের জগৎ থেকে নির্বাসিত—নামামৃত পান থেকে বঞ্চিত। তাই তাঁর এই বিস্ময়। বাসুদেব রাজপণ্ডিত। হেম বর্ণ হর্মে তাঁর বাস, কাঞ্চন পাত্রে তাঁর ভোজন, আর কনক পালঙ্কে তাঁর শয়ন। জ্ঞানে কাশীর প্রকাশানন্দের তুল্য। মান, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তিতে

স্বর্ণোজ্জ্বল তাঁর জীবন। এহেন জীবনের অধিকারী হয়ে, এত সব থাকতেও তিনি সন্ন্যাসীটির সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে পারলেন না? আর সেই সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনলেন কারা? —না, যাঁরা তাঁর মান, যশ ও অর্থের দীপ্তির সামনে ক্ষীণপ্রভ। আর এই যে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর— এর এত মাহাত্ম্যই বা কেন? কি আছে এই নামে? — এই সব কথা ভাবছিলেন সার্বভৌম।

ভট্টাচার্যের এবংবিধ ভাবনাই স্বাভাবিক। ইনি এমন এক মানুষ যাঁর কাছে ঈশ্বর বলে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নেই। তাহলে তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু কি? —না, জ্ঞান চর্চা। জ্ঞানানুশীলনই তাঁর ঈশ্বর।

বেলা তৃতীয় প্রহর। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতীত। অক্রান্ত পথশ্রম। তার ওপর মূর্চ্ছা। প্রভু যে বস্তুই হোন— প্রাকৃত লোকে দেহধারী জীব। দেহধারী জীব মানেই অন্নগত তাঁর প্রাণ। সার্বভৌম বিচক্ষণ। তাই,

"সার্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুঞি দিব আজি ভিক্ষা প্রসাদান্ন॥"

সত্যিই তো অনেক বেলা হয়ে গেছে। আর বিলম্ব নয়। সপার্ষদ সমুদ্র স্নানে গেলেন প্রভু। ফিরেও এলেন শীঘ্রই।

আসন পাতাই ছিল। পার্ষদদের নিয়ে বসলেন। ভট্টাচার্য প্রস্তুত। প্রস্তুত পর্যাপ্ত প্রসাদ নিয়ে। আধেয় অঢেল। আধারও অতি উত্তম। সুবর্ণ পাত্র। পরিবেশনও উত্তম। পরিবেশন করছেন সার্বভৌম স্বয়ং।

পরমাশ্চর্য আতিথেয়তা বোধ সার্বভৌমের। যাঁর এক হাঁকে হাজারো লোক হাজির হয়, সেই সার্বভৌম নিজে পরিবেশন করছেন। অতিথি সৎকার অপরের দ্বারা করালে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। আর নিজ হাতে করলে আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। সার্বভৌম বহিরঙ্গে বড়, আবার বড় অন্তরঙ্গেও।

ভোজন পর্ব আরম্ভ হল। রাজপণ্ডিত তো—একেবারে রাজসিক আয়োজন। প্রভু অতি ভোজন এবং রাজকীয় আহার্য আদৌ পছন্দ করেন না। শুধুমাত্র অনুরোধ ও মান রক্ষার্থে যেটুকু গ্রহণ না করলে নয়, সেইটুকুই করেন। তাই আয়োজনের ঘটা দেখে,

'প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে॥'

আরও বললেন, 'পিঠা পানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে।'
যুক্ত করে ভট্টাচার্য বললেন, 'সব পদই গ্রহণ কর। জগন্নাথদেব প্রতিটি পদ কেমন আস্বাদন করেছেন, অন্তত সেটুকু বোঝার জন্যও তো তোমার সব পদই আস্বাদন করা দরকার।'

কতই না আন্তরিকতা ভট্টাচার্যের! প্রভু যেন তাঁর কত নিকট জন। অথচ এখনও তো পরিচয়ই হয়নি। শুধু দেখেছেন প্রভু এক অনিন্দ্যকান্তি নবীন সন্ন্যাসী। আর জেনেছেন বরং বুঝেছেন বয়সে নবীন হলেও ভাবে গহীন।

আচমনের ব্যবস্থা করলেন ভট্টাচার্য। তারপর প্রভুর অনুমতি নিয়ে আহার করতে গেলেন। সঙ্গে গোপীনাথ। আহারান্তে ফিরে এসে প্রভুকে নমস্কার করলেন। প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণে মতিরস্তু।'

ভট্টাচার্য স্পষ্টই বুঝলেন এই নবীন সন্ন্যাসীটি পরম বৈষ্ণব। মায়াবাদী সন্ন্যাসী তো, কৃষ্ণনাম নেন না। নেবেন আর কি করে? এঁরা না নিজেরাই ভগবান। এই সন্ন্যাসীটির পরিচয় জানা প্রয়োজন। সরাসরি জিজ্ঞেস করলে সম্ভ্রম থাকে না। তাই ভগ্নীপতিকে একান্তে শুধোলেন, "গোসাঁইর পূর্বাশ্রম কোথায় ছিল? এঁর পরিচয় কি? পিতৃদেবের নামই বা কি?" গোপীনাথ বললেন, 'তোমার পূর্ব নিকেতন আর এঁর পূর্বাশ্রম এক ঠাঁইয়ে। অর্থাৎ নবদ্বীপে। ভালই হল। — এক ঠাঁইয়ের লোক আবার এক ঠাঁই হল। প্রভুর পিতৃদেবের নাম তুমি বিলক্ষণ জান। জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরকে নদীয়া নগরের কে না জানত? আচ্ছা, তোমার নীলাম্বর চক্রবর্তীকে মনে পড়ে? নীলাম্বরই হচ্ছেন এঁর মাতামহ। এই নীলাম্বর আর তোমার পিতৃদেব ছিলেন সতীর্থ।'

প্রীত হলেন সার্বভৌম, প্রভুকে বললেন, 'একে তো তুমি সন্ন্যাসী, তার ওপর তোমার পূর্বাশ্রমের যে পরিচয় পেলাম— তাতে তুমি আমার পূজ্য। আমি তোমার দাস।'

লজ্জায় রাঙা হলেন প্রভু। কানে আঙ্গুল দিয়ে বিষ্ণুনাম স্মরণ করলেন। বললেন. 'হ্যাঁ, একথা ঠিক আমি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের আমি কতটুকুই বা জানি আর বুঝি। বয়সে আমি বালক মাত্র। আর তুমি হচ্ছ পণ্ডিতের পণ্ডিত। গুরুর গুরু— জগদ্‌-গুরু। সন্ন্যাসীদের শিক্ষাদাতা। আমি তোমার সন্তানতুল্য। আমাকে তুমি তোমার পুত্র জ্ঞানেই শেখাবে-পড়াবে।'

তুষ্ট হলেন ভট্টাচার্য প্রভুর বিনয়-নম্রতায়। এই নম্রতাই

প্রভুর আধ্যাত্মিক আয়ুধ। এই আয়ুধেই ঐ জগৎগুরু কেন, সমগ্র জগৎই জয় করা যায়। যথার্থ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশী। এই জন্যই ঝড় চিরদিন টিকতে পারেনা, এই জন্যই ঝড় কেবল সংকীর্ণস্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর শান্ত বায়ু প্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্য-ভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করেনা, বিচ্ছিন্ন করেনা। আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এইজন্যই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বী বিজয়ী। শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকার একমাত্র তারই।'

কবি চিরন্তন সত্যই ব্যক্ত করেছেন। প্রতি যুগেই সত্য। কয়েক শতক পরের পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও সেই বিনয়। ঠাকুর গেছেন গিরিশ ঘোষের কাছে স্টার থিয়েটারে চৈতন্য লীলা দেখতে। নমস্কার জানাতে গেলেন গিরিশ। কিন্তু তাঁর নমস্কারের আগেই ঠাকুরই নমস্কার জানালেন। গিরিশ প্রতি নমস্কার জানালেন। ঠাকুর আবার নমস্কার করলেন। গিরিশও আবার করলেন। ঠাকুরও আবার। শেষকালে গিরিশ নিরস্ত হলেন। পরাস্ত হলেন প্রণামায়ুধে ঠাকুরের কাছে।

এ তো গেল পরবর্তী যুগের কথা। আবার পূর্ববর্ত্তী যুগেও বিনয়ের

স্বর্ণোজ্জ্বল আদর্শ হয়ে আছেন স্বয়ং বাসুদেব। রাজা যুধিষ্ঠিরের বড়ই সাধ রাজসূয় যজ্ঞের। হঠাৎ এ সাধ কেন? ঠিক হঠাৎ নয়। লোক সম্মান চায় দুই লোকেই— ইহলোকে ও পরলোকে। যুধিষ্ঠিরও চান। তাই এই সাধ। সাধের কথা জানালেন বাসুদেবকে। যুক্তিও দিলেন। আর বললেন দেবর্ষি নারদই এই যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলেছেন। রাজসূয় যজ্ঞ বলে কথা! সব ব্যাপারেই রাজকীয় আয়োজন। পুরোহিত কে? আর কে? স্বয়ং ব্যাসদেব। কাজ তো একটা না। একাধিক। তাই বণ্টন করা হল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে। প্রতিটি কাজের ভালমন্দ বিচারের ভার দেওয়া হল পিতামহ ভীষ্ম আর দ্রোণাচার্যকে। খাদ্য ভাণ্ডারের ভার নিলেন দুঃশাসন। ব্রাহ্মণদের আতিথেয়তার ভার পড়ল অশ্বত্থামার ওপর। সঞ্জয় তো সচিব। তাই তাঁর ওপর পড়ল সেবার ভার— রাজন্যবর্গের সেবার ভার। কোষাগার ও রত্নভাণ্ডারের ভার নিলেন কৃপাচার্য। হিসাব রাখার জন্য স্থিতধী ব্যক্তি প্রয়োজন। তাই আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার ভার পড়ল বিদুরের ওপর। উপঢৌকন তো আসবে অজস্র। গ্রহণ করবেন কে? কেন, দুর্যোধন। উনি এক সঙ্গে দুই কাজ করবেন— উপঢৌকন গ্রহণ আর অভ্যর্থনা। সর্বাধ্যক্ষ হলেন চারজন: ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ। সব বিভাগই বণ্টিত হয়ে গেল। তাহলে বাসুদেব? বাসুদেব কি বাদ পড়লেন? হ্যাঁ ঠিক তাই। অভিমানাহত হয়ে বাসুদেব সেকথা জানালেন যুধিষ্ঠিরকে। জানিয়েই বললেন, 'না, না, পেয়েছি। একটা পদ

এখনও খালি আছে। পাদপ্রক্ষালনের কাজটি এখনও কারুকে দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, ও কাজটার ভার আমিই নিলাম।' ত্রিভুবনের সার্বভৌম নিয়ামক নিলেন পাদপ্রক্ষালনের ভার। বিনয় আর কাকে বলে ?

যাহোক, ভট্টাচার্য প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। বললেন, 'দেখ, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার মধ্যে যে ভাব দেখলাম, তাতে তোমার পক্ষে একলা জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া ঠিক হবেনা। সম্ভবপর হলে আমার সঙ্গে যাবে অথবা অন্য লোকের সঙ্গে যাবে। সে লোক আমিই দেব।'

প্রভুই সমস্যার নিরাকরণ করলেন। 'না, না, অতশত করার দরকার নেই। আমি মন্দিরের ভেতরে যাবনা। গরুড়ের পেছনে দাঁড়িয়েই দর্শন করব।'

সার্বভৌমের অন্তরটি বড়ই ভাল। বিশেষ করে প্রভু তাঁর কাছে এখন এক বড় আকর্ষণ। প্রভুর সব ভাবনা যেন তাঁরই ভাবনা। তাই বললেন, 'গোপীনাথ, তুমি নিজে সঙ্গে নিয়ে প্রভুকে জগন্নাথ দর্শন করাবে।'

এ সমস্যার না হয় সমাধান হল। কিন্তু প্রভুর থাকার ব্যবস্থা কোথায় হবে ? এ ভাবনাটাও সার্বভৌমের। তাই সার্বভৌম বললেন 'প্রভু তো ভাবজগতের মানুষ। লোক সংঘট্ট পছন্দ হবেনা। এখানে আমার মাসীর বাড়ী আছে। খুবই নিরিবিলি। সন্ন্যাসীর পক্ষে এটি উপযুক্ত স্থান। বুঝলে হে গোপীনাথ, তুমি তাহলে প্রভুকে আমার মাসীর বাড়ীই নিয়ে যাও।'

গোপীনাথ প্রভুর পরমভক্ত। শোনামাত্রই বাসার ব্যবস্থা করলেন। প্রয়োজনীয় জলপাত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবস্থাও করলেন।

ভক্তির জগৎটাই আলাদা। প্রাকৃত জগতের সঙ্গে মেলেনা। প্রাকৃত জগতের লোক কোন কাজ একবার করার আগে পাঁচবার ভাবে। দশ রকম আয়োজন করে। বিশ রকম তার সতর্কতা। তবুও বিপদ ঘটে ঘাটে ঘাটে। আর ভক্তি জগতের পুরুষ হচ্ছেন প্রভু। কোন আয়োজন নেই। নেই কোন চিন্তা ভাবনা। নেই কোন সতর্কতা। 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।'— সেই মাঘের শীতে সাঁতরে পার হয়ে এলেন কাটোয়ায়। একা— সম্পূর্ণ একা। আবার শান্তিপুর থেকে নীলাদ্রী দীর্ঘ বিশ দিনের পথ। যবন রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে হিন্দু রাজ্যের। একে অপরের দ্রোহী। রাজ্য প্রান্তে অতন্দ্র প্রহরী। যাত্রার পূর্বে ছিল কত নিষেধ সতর্কতা। গ্রাহ্য করেননি প্রভু। কেনই বা করবেন ?— তাঁর যে আছে নামের বল— মহাবল। এ বলের কাছে রাজা বাদশাহের বল ক্ষীণ বল। হলও তাই। অথচ সঙ্গে তো সুপুরি দানাটুকুও সম্বল নেই। এক কৌপিন ভরসা। হ্যাঁ, আর ছিল দণ্ড। সে দণ্ডও তো অবধূত ভেঙ্গে করলেন তিনখণ্ড। এহ বাহ্য। পরমাশ্চর্য নাম মাহাত্ম্য। বলা নেই, কওয়া নেই, কোথা থেকে চলে এলেন রামচন্দ্র খান। সমাদরে, ভক্তি ভরে পার করে দিলেন শঙ্কাসঙ্কুল প্রান্তিক পথ। তারপর এই নীলাচল। ঐ মুহূর্তে সার্বভৌম মন্দিরে আসবেন এমন তো কোন কথা ছিলনা, অথচ সঙ্কটময় সময়ে এলেন সার্বভৌম। প্রতিকূল পরিস্থিতি

পরিহার করলেন প্রভু কত সহজে, এমন কি নিজের অজ্ঞাতসারেই।

নীলশৈলতে তো এলেন! কোথায় অশন, কোথায় শয়ন, আর কোথায়ই বা অবস্থান অয়ন? এ সবের কোন কিছুই তো ঠিক ছিল না। অথচ কত আদরে, কত আন্তরিকতায় আহার বাসস্থানের সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল।

ভক্তভাবন ভার নেন যেখানে, সেখানে ভক্ত হন নির্ভার নিরাপদ।

ভক্তির জগৎটাই আলাদা।

ভক্ত বটেন গোপীনাথ। প্রভুকে পেয়েছেন একেবারে নিজের কাছটিতে। বাস! সবকাজ ভুলে গেছেন। প্রভুকে নিয়েই মেতে আছেন। এখন আর নিজের কোন কাজ নেই। একমাত্র কাজ প্রভুর সুখ বিধান। জগন্নাথদেবের নিত্য সেবাপুজোর অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে শয্যোত্থান। ভারি দৃষ্টি রসায়ণ দৃশ্য। বড়ই মধুর। প্রভুকে দেখাতে হবে। আচার্যের সাধ জাগল। তাই,

"আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা।"

মুকুন্দ এলেন সার্বভৌমের গৃহে। প্রভুর প্রতি ভট্টাচার্যের প্রীতি বাড়ছে দিনে দিনে, আর কৌতূহলও বাড়ছে। সেদিন তো জানা গেল সন্ন্যাসীর নিবাস আর পিতৃ পরিচয়। তাঁর সন্ন্যাসাশ্রমের নামটাই তো জানা হয়নি এখনও। উনি যে সন্ন্যাসী, তা তো আকার দেখেই বোঝা গেছে। প্রকার তো বোঝা যায়নি। মুকুন্দকে শুধোলেন সার্বভৌম,

'কোন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার শুনিতে হয় মন॥"

মুকুন্দ নীরব। উত্তর দিলেন গোপীনাথ, 'কাটোয়ার কেশব ভারতী এঁর দীক্ষা গুরু। তিনি নামকরণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।' মৃদু হেসে ভট্টাচার্য বললেন. 'বেশ, বেশ, ভারি মিষ্টি নাম। তবে কি জান, সম্প্রদায়টা নিম্ন পংক্তির।'

আচার্য প্রভুর পরম ভক্ত। এ ধরণের কটূক্তি তাঁর কাছে কর্ণপেয় নয়। তাই তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'দেখ, উচ্চ-নীচের বাছ-বিচার তোমার আর তোমার শিষ্যদের কাছে। প্রভুর কাছে এসব বাহ্য বস্তু। আসল বস্তু অন্তরে। সেই অন্তরটি প্রস্তুত করতে পারে কজন? যেমন পারনি তোমরা। প্রভুর কাছে উচ্চ নীচের ভেদ নেই। সব সমান। তিনি যে সাম্য সাম্রাজ্যের সার্বভৌম নায়ক। সাম্যের সামগান সদাই তাঁর কম্বু কণ্ঠে।'

সম্প্রদায়গত ভেদ-বিভেদের মধ্যেই এঁদের জীবন। সাম্যের জয়গাথা মাথায় ঢুকল না ভট্টাচার্যের। তাই এত কথার পরেও ভট্টাচার্য বললেন, 'সন্ন্যাসী সম্মতি দিলে সম্প্রদায় বদলের ব্যবস্থা করতে পারি। শাস্ত্রে যোগপট্টের বিধান আছে।'

এ কথায় রুষ্ট হলেন দুজনেই। চেহারা দেখেই বুঝলেন ভট্টাচার্য। এঁরই ভগ্নী আচার্যের ঘরণী। সার্বভৌম সুচতুর। ভগ্নীপতির মন নষ্ট করলে ভগ্নীর ঘর নষ্ট হবে। তাই প্রসঙ্গান্তরে এলেন। বললেন, 'দেখ আচার্য, সন্ন্যাসীটি তো খুবই সুদর্শন। তবে বয়সটা খুবই কাঁচা। এ বয়সে ইন্দ্রিয় সংযত রাখা বড়ই কঠিন।

অল্প বয়সের এই হচ্ছে এক অপায়, তবে এর উপায়ও আছে। উপায়টি হচ্ছে বেদান্ত শ্রবণ। যদি ওঁর সম্মতি থাকে, তাহলে আমিই শোনাব।'

ভট্টাচার্যের কথা শুনে উভয়েই ব্যথাহত হলেন। যাঁকে জানলে সব জানা যায়, সেই তাঁকেই তো জেনেছেন প্রভু, আর জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাকে অভিন্ন মনে করেন প্রভুর ভক্তরা। সে হেন প্রভুকে কিনা বেদান্ত শোনাবে সার্বভৌম। এতে নাকি প্রভুর ইন্দ্রিয় সংযত হবে। যিনি অনবদ্যাঙ্গী স্ত্রীর আকর্ষণ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, তাঁকেই কিনা বেদান্ত শ্রবণে ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে। আর ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলছেন কে? — না, সেই সার্বভৌম যিনি নিজে ভোগী, রাজসিক বিলাসে যাঁর জীবন যাপন, স্বর্ণ পালঙ্কে যাঁর শয়ন, স্বর্ণ পাত্রে অশন, মহার্হ হর্ম্যে বাস আর বহুমূল্য যাঁর বসন। তাই বিরক্তির স্বরেই ভগ্নীপতি বললেন শ্যালককে, 'দেখ ভট্টাচার্য, ভক্তই ভগবানের লক্ষণ চিনতে পারে, তুমি তো মায়াবাদী জ্ঞান মার্গী। ভক্তিমার্গ থেকে যোজন দূরে তোমার বাস। কাজেই প্রভুর মধ্যে যে ভগবত্তার লক্ষণ পূর্ণায়তরূপে আছে, তা তোমার দৃষ্টিতে পড়বে কিভাবে? আর প্রভুর মহিমাই তুমি বুঝবে কি? অজ্ঞের কাছে সবই অন্ধকার। ভক্তিহীনের তো ভ্রমা থেকে প্রমায় উত্তরণ নেই। ভক্তির লেশমাত্র থাকলেও তোমার সংশয় থাকত না যে প্রভুই স্বয়ং ভগবান।

'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।'

— ঠিক তাই। এবার সোচ্চার হয়ে উঠলেন ভট্টাচার্যের শিষ্যেরা।

শুধোলো, 'বেশ, ভাবাবেগে তুমি তোমার প্রভুকে ভগবান বলতে পার, কিন্তু কোন প্রমাণ দিতে পার কি ?"

গোপীনাথের পরিষ্কার উত্তর, "ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া ঈশ্বর তত্ত্ব কেউ জানতে পারেনা। ঈশ্বরের কৃপালাভ প্রয়াস সাধ্য নয়, প্রসাদ লব্ধ।'

ভাগবতের কথাই বললেন গোপীনাথ। যেমন,

'তথাপি তে দেব ! পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশীনুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।'

হে ভগবন, হে দেব ! যিনি তোমার চরণ কমলের অনুগ্রহ কণিকা লাভে কৃতার্থ, তিনিই তোমার মহিমা তত্ত্ব অবগত হতে পারেন। অন্যে দীর্ঘকাল বিচার বিতর্ক করেও জানতে পারেনা।'

আচার্য আরও বললেন ভট্টাচার্যকে, 'হ্যাঁ, তুমি গুরুর গুরু, জগদগুরু। পাণ্ডিত্যে তোমার দ্বিতীয় নেই এ জগতে। কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা। তোমার ওপর ঈশ্বর কৃপা লেশমাত্রও বর্ষিত হয়নি। তাই তুমি দেখেও দেখতে পাওনা। চক্ষুষ্মান হয়েও তোমার দর্শনেন্দ্রিয় বিকল।'

পাণ্ডিত্য প্রয়াস সাধ্য। এ প্রয়াসের পরিণতি ঘটে বিনয়ে নয়, অভিমানে, অহংকারে। অহং বোধে— স্ফীত সার্বভৌম রোষারুণ নয়নে বললেন, 'ঈশ্বর কৃপার প্রমাণ কি ?' ঝটতি জবাব দিলেন দিলেন আচার্য, 'প্রমাণ তুমি নিজেই পেয়েছ। স্বচক্ষে দেখেছ প্রভুর প্রেমাবেশ। বহু আয়াসেও তুমি সেই আবেশ ভঙ্গ করতে পারনি। কারণ তোমার প্রয়াস তো বাহ্য প্রয়াস মাত্র। অথচ

আমরা যখন নাম কীর্তন আরম্ভ করলাম, তখনই প্রভু হুঙ্কার দিয়ে বাহ্য ফিরে পেলেন। 'প্রভুর ওপর কৃষ্ণকৃপা না থাকলে কি অচেতন অবস্থায় কৃষ্ণনাম তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে নাড়া দেয়? তবে কি জান এসব কথা তোমাকে বলা সর্বৈব নিরর্থক। তোমার মন যে কৃষ্ণ বহির্মুখ।'

শাস্ত্রজ্ঞ সার্বভৌম উত্তর দিলেন, 'কিন্তু শাস্ত্র বলেন কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার নেই। তাহলে এই নবীন সন্ন্যাসী কলির অবতার হন কিভাবে?'

আচার্য বেদনাহত হয়ে বললেন, 'গোলটা কোথায় জান ভট্টাচার্য? শাস্ত্র বলতে তুমি একমাত্র বেদকেই বোঝ? কিন্তু ভাগবত আর মহাভারতও যে শাস্ত্র, সে বোধ তোমার নেই। যদি থাকত, তাহলে বুঝতে পারতে যুগে যুগেই কৃষ্ণ অবতাররূপে আসেন।' আচার্য বাক্যের সমর্থনে আছে ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকাবলী :

'আসন বর্ণাস্ত্রয়ো যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥'

—গর্গ ঋষি নন্দকে বলেছিলেন, 'তোমার এই পুত্রটি প্রতি যুগেই দেহ পরিগ্রহ করে থাকেন। অন্য তিন যুগে এঁর শুক্ল, লোহিত, ও পীত, এই ত্রিবিধ বর্ণ ছিল। সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।' এবং

"ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম।
নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥"

—হে রাজন! এই প্রকারে দ্বাপর যুগে জগদীশ্বরের স্তব করে থাকেন, সম্প্রতি নানাতন্ত্র বিধান দ্বারা কলিকালের পুজো বিধি অবধান কর। এবং

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

—যাঁর মুখে কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ, যাঁর কান্তি গৌর এবং যিনি অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্র পার্ষদ সমন্বিত, সুমেধাগণ নাম সংকীর্তন রূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁর উপাসনা করে থাকেন।

এবং মহাভারত বলেন,

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ॥"

—সুবর্ণ বর্ণ। হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গাদী, সন্ন্যাসকৃত সম, শান্ত, নিষ্ঠা, শান্তি পরায়ণ, এই আটটি নামের মধ্যে আদি লীলায় চারটি এবং অন্ত লীলায় সন্ন্যাসকৃৎ থেকে চারটি নাম হয়ে থাকে।

আচার্য থামতে পারছেন না। ভক্তপ্রাণে আঘাত লেগেছে তো। তাই বলেই চললেন, 'মুশকিল হল কি জান, তুমি নৈয়ায়িক, কূটতর্কে জয়ী হয়ে শিষ্যদের বাহবা পাওয়াই তোমার নেশা এবং দেশে দেশে যশ ক্রয় করাই তোমার পেশা। কাজেই ভাগবত আর ভারতের বাণী তো তোমার অন্তর দ্বারের বাইরে থাকবেই। তাছাড়া, তোমাকে এসব কথা, এত কথা বৃথাই বললাম, কারণ তোমার হৃদয়টা হচ্ছে উষর মরু। তপ্ত মরুতে বীজ উপ্ত হয় না, যুগল পত্র তো দূরের কথা।

আচার্যের এত কথা, প্রকারান্তরে ভৎর্সনা আপাতত সহ্য করলেন ভট্টাচার্য। অবশ্য তাঁর সঙ্কল্পে তিনি অনড়ই রইলেন। তবে মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। প্রকাশ্যে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, "শোন গোপীনাথ, এ প্রসঙ্গ এখন থাক। তুমি আমার নাম করে তোমাদের প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা কর। সময় বিস্তর আছে। পরে না হয় আমাকে জ্ঞান দান করো।" 'জ্ঞানদান' কথাটার মধ্যে বিনয় নেই, বিদ্রূপ আছে। ভট্টাচার্য বেদজ্ঞদের শিরোভূষণ। তাঁর আর দ্বিতীয় নেই। থাকলেও সেই প্রকাশানন্দ আছেন সুদূর কাশীতে। ন্যায় সুরধুনীর ভগীরথ হচ্ছেন সার্বভৌম। নবদ্বীপ ন্যায় শাস্ত্র লাভ করল তাঁরই পরমাশ্চর্য প্রয়াসে। এর আগে নবদ্বীপে এই শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছিল শশশৃঙ্গের মত কপোল কল্পনা। শাস্ত্রে আগ্রহী অনেকেই। কিন্তু শাস্ত্র যে নেই। শাস্ত্র তো মিথিলায়। ওদিকে মিথিলার পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের নকল করতে দেবেনা— শাস্ত্র দেওয়া তো দূরের কথা। অসাধ্য সাধন করলেন ভট্টাচার্য। মিথিলায় গিয়ে গোটা শাস্ত্রটাই কণ্ঠে ধারণ করে নিয়ে এলেন। তাঁরই মুখ নিঃসৃত বাণী থেকে লেখা হল ন্যায়শাস্ত্র।

সেহেন বাসুদেব সার্বভৌমকে শাস্ত্র কথা শেখাবেন কিনা গোপীনাথ। আচার্য যদি সেই স্তরের শাস্ত্র পণ্ডিতই হতেন, তাহলে না তিনিই হতেন রাজপণ্ডিত ভট্টাচার্যের পরিবর্তে।

শ্রীক্ষেত্রের শ্রী তো তিনিই বাড়িয়েছেন। মস্ত বড় টোল। কত তাঁর শিষ্য! সেই শিষ্যরা তাঁকেই ঈশ্বর গণ্য করে। কত দূর

দূরান্তর থেকে তারা আসে। এসে তাঁরই পদতলে লুটিয়ে পড়ে। সদা-সর্বদাই তিনি বেষ্টিত থাকেন তাদের দ্বারা। এদের স্তোকবাক্য সর্বদাই স্ফীত করে তাঁর বক্ষোদেশ।

শুধু কি এই? বস্তুত গজপতি প্রতাপরুদ্রের এক মন্ত্রী তিনি। ধর্ম ও শাস্ত্র বিষয়ক মন্ত্রী। না, তিনি মন্ত্রীরও অধিক। তিনি যেন গুরু— যে গুরুর কাছে আনত মস্তক দোর্দণ্ড প্রতাপ উৎকলাধিপতি। এই ধন, মান, যশ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তিনি কিসের বলে লাভ করেছেন? —না, পাণ্ডিত্য বলে। এ হেন জগৎজয়ী পণ্ডিতকে শিক্ষা দেবেন কে? —না, গোপীনাথ। সার্বভৌম বিদ্রূপবাণ এই অর্থেই নিক্ষেপ করলেন।

যাহোক দুজনেই এলেন প্রভুর কাছে। ভট্টাচার্যের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ জানালেন গোপীনাথ। প্রভু সানন্দে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ভট্টাচার্যের বিদ্রূপে এতক্ষণ রোষ ধূমায়িত হচ্ছিল গোপীনাথের মনে। এখন বিস্ফোরণ ঘটল প্রভুর সামনে। কটু-কাটব্য করলেন সার্বভৌমের বিরুদ্ধে। প্রভু রুষ্ট গলায় বললেন, 'এ তুমি কি বলছ গোপীনাথ। না, না, তোমার কটূক্তি হটোক্তি মাত্র। এ সব কথা আমাকে আর কখনও শোনাবে না। সার্ব-ভৌম হৃদয়বান। তাই না আমাকে বাসস্থান দিয়েছেন অসীম শ্রদ্ধায়। আমি তাঁর স্নেহধন্য আর আমার সন্ন্যাস রক্ষা করতে তিনি সদা প্রয়াসী।'

কি ভেবে বললেন, আর কি ফল পেলেন! – নীরবে গোপী-নাথ ও মুকুন্দ ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে এই বোধে

এলেন যে প্রভু তাঁদের প্রাকৃত ভাবনার অতীত।

এরপর একদিন সার্বভৌম নিজে জগন্নাথ দর্শন করালেন প্রভুকে। প্রভুর ভারি আহ্লাদ হল। হবেই। কৃষ্ণগত যাঁর প্রাণ, তাঁর তো সদাই আহ্লাদ হবে কৃষ্ণ দর্শনে।

গুরু গিরি একবার যাঁর মধ্যে ঢুকেছে, মন তাঁর সেই ব্যবসাতেই মশগুল থাকবে। লোকের ওপর আধিপত্য প্রতাপ, তাঁদের স্তোক-বাক্য গুরুকে নেশাসক্ত করে। এক আকাশে দুই সূর্য থাকতে পারেনা। গোপীনাথ ও মুকুন্দ নবীন সন্ন্যাসীকে সাক্ষাৎ ভগবান গণ্য করে। এমনি করে আরো অনেকে গণ্য করবে বুঝিবা। তখন তাঁর একাধিপত্য কোথায় যাবে? শঙ্কা দেখা দিল মনে। হিংসার আগাছা গজিয়ে উঠল।

সার্বভৌম বৈদান্তিক। বেদান্ত শিক্ষার মাধ্যমে যদি এই নবীন সন্ন্যাসীটিকে স্বমতে ও স্ববলে আনা যায়, তাহলে তাঁর প্রতিপত্তি অপ্রতিহত থাকবে আগের মতই। বেদান্ত পাঠের কথা গোপীনাথকে বলেও ছিলেন, ভোলেননি সেকথা।

কথা কাজে রূপ নিল। আরম্ভ হল বেদান্ত পাঠ। বক্তা ভট্টাচার্য আর শ্রোতা গৌরসুন্দর! সার্বভৌম বললেন, 'এ জগৎ মায়াময়। প্রপঞ্চ। ঈশ্বর বলে পৃথক কোন বস্তু নেই। জীবই শিব। তুমিই ভগবান।' এসব শুনে অন্তর পুড়ে যাচ্ছে প্রভুর। যাবেনা কেন? ভট্টাচার্যের এসব কথায় লীলাভূমি ব্রজধাম কোথায় গেল? আর 'তাঁর মধ্যে গোপীগণ/ সাক্ষাৎ মোর জীবন' যে গোপীরা, সেই গোপীরাই বা কোথায় গেলেন? আর 'তুমি মোর

জীবনের জীবন' যে রাইকিশোরী. সেই রাইধনী কি আর রইলেন ? সর্বোপরি, প্রভুর সেই 'নবকিশোর নটবর/গোপবেশ বেণুকর'-কে তো সার্বভৌম নাস্তি করে দিলেন। তাহলে অস্তিত্বে রইলেন কে ? — না, একা একেশ্বর সার্বভৌম স্বয়ং। তিনিই যে 'সোঽহং'।

যাহোক, পাঠ চলতে থাকল। একদিন যায়, দুদিন যায়। কই, সন্ন্যাসীটি তো কথা কয়না। এমনি করে সাত সাতটা দিন কেটে গেল। নাঃ, তবুও তো স্বামী নীরব, সম্পূর্ণ নীরব। ধন্দ লাগল ভট্টাচার্যের মনে। সাতটা দিনেও একটা কথা বলেনা— এ আবার কেমন শ্রোতা, কেমন পাঠার্থী। ধন্দ-দ্বন্দ্ব-দ্বিবিধ চিন্তার খাতে বইল। ভট্টাচার্য একবার ভাবছেন সন্ন্যাসীটি আকাট মূর্খ — মূর্খের কোন জিজ্ঞাসা থাকেনা। আবার ভাবছেন হয়তো বা বাতুল। হয়তো বা কেন, নিশ্চিতভাবেই বাতুল। সন্ন্যাসী হয়ে নাচে গায়। নাচ-গান তো সন্ন্যাসীর অকৃত্য।

অষ্টম দিনে ভট্টাচার্যের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। কিছুটা বিরক্তির সুরেই বললেন, 'এই যে এত পরিশ্রম করে সাত-সাতটা দিন বেদান্ত পাঠ করলাম, কই তুমি তো কিছু বললেনা ? দেখ, আমার এই বিরাট টোল। সারা ভারতবর্ষের শত শত ছাত্র পড়ে এখানে, কিন্তু তোমার মত শিক্ষার্থী তো দেখিনি, যার মধ্যে কোন জিজ্ঞাসা নেই, নেই কোন কৌতূহল। এখন তো কৌতূহল আমারই হচ্ছে ঃ তবে কি তুমি কিছুই বোঝনি ?

প্রভু বিনয়ে নম্র হয়ে বললেন, 'দেখ, আমি মূর্খ, শাস্ত্রাদি পাঠ করিনি। তোমার নির্দেশে তোমার মুখে শ্রবণ করলাম মাত্র।

তুমি বলেছ বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম, সেই ধর্ম রক্ষার্থেই শ্রবণ করলাম। তুমি বেদান্তের যে অর্থ করলে, তা আমি বুঝতে পারিনি।'

বিরক্ত সার্বভৌম বললেন, 'বেশ তো, না বুঝতে পারাটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু কই, কোন জিজ্ঞাসা তো করলে না। আর বুঝতে যে পার নি, তাও তো এ সাতটা দিন বলনি।'

প্রভু এবার সন্তর্পনে অগ্রসর হলেন। বললেন, 'বেদান্তসূত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সেই সূত্রের তুমি যে ব্যাখ্যা করেছ। তা বুঝতে পারিনি। বরং ব্যথাহত হয়েছি।'

বিস্মিত ভট্টাচার্য শুধোলেন, 'সে কি! ব্যথাহত হয়েছ— কেন?'

সার্বভৌম নৈয়ায়িক তো, তাই ধীর পদে অগ্রসর হলেন প্রভু। বললেন,

'সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মূখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখান।
কল্পনার্থ তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥

ব্যস্. সার্বভৌমের মস্তক ঘূর্ণন শুরু হল। অ্যাঁ, বলে কি এই বালক। মনের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ। প্রকাশানন্দের কথা ছেড়ে দিলে, তিনিই না সারা দেশটায় একমাত্র বেদজ্ঞ। এই লোকোত্তর পাণ্ডিত্যের জন্যই না দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রতাপরুদ্রও তাঁর কাছে আনত মস্তক। আর আজ তাঁর পুত্রের বয়সী এক বালক বলে কিনা তিনি প্রকৃত ব্যাখ্যা করছেন না অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হল তিনি ভুল

ব্যাখ্যা করছেন।

দিগ্বিজয়ী দিকবিদিক শূন্য হয়ে পড়লেন। রাজপণ্ডিতের স্বর্ণ সিংহাসন কম্পমান। কম্পমান পণ্ডিত স্বয়ং। তিনি আর লোক সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে? ভাবতে লাগলেন গজপতি প্রতাপ রুদ্রের কথা, শত শত শিষ্যের কথা। সারা দেশের পণ্ডিত বর্গের কথা। সারা দেশে তাঁর আধিপত্য প্রশ্নাতীত। সে হেন তর্কাতীত আধিপত্য যাঁর, আজ তাঁর ব্যাখ্যা কিনা ভুল। এ কথা প্রমাণিত হলে প্রকাশ হয়ে যাবে বায়ুবেগে। তখন তাঁর এতকালের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, অর্জিত মান, যশ, প্রতিপত্তি এক লহমায় ভূমিলীন হয়ে যাবে।

না, সার্বভৌম তা হতে দেবেন না। তাই এখন আর খণ্ড যুদ্ধ নয়— একেবারে টোটাল ওয়র। ভট্টাচার্য রোষে-দ্বেষে বললেন, 'তাহলে তুমি বলছ সূত্রের মুখ্য অর্থ প্রকাশ না করে আমি কল্পনার্থ ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছি। এর প্রমাণ? ধীর কণ্ঠে প্রভু বললেন, 'প্রমাণ স্বয়ং শ্রুতি। যে শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম নিরাকার, আবার সেই শ্রুতিই বলেছেন তিনি সাকার এবং শ্রুতিসূত্র সমূহের সামগ্রিক বিচারে এই দাঁড়ায় যে তিনি সাকার।'

বলে চললেন প্রভু, 'ব্রহ্ম সাকার এবং সবিশেষ—সর্ববিধ ঐশ্বর্যের আকর। তবে হ্যাঁ, তাঁর প্রাকৃত শরীরাদি নেই, কিন্তু অপ্রাকৃত শরীরাদি আছে। চিন্ময় সত্তা। এ কথা বেদান্তেই আছে। ব্রহ্মের চিহ্ন ত্রিবিধ কারকে। যথা, অপাদান, করণ ও অধিকরণে অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকেই জীবের জন্ম, ব্রহ্ম দ্বারাই জীব পালিত এবং ব্রহ্মেই জীব লীন হয়।'

প্রভু আরও বললেন, 'দেখ ভট্টাচার্য, বেদই বলেছেন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তবে বেদবাক্য যেমন প্রমাণ প্রধান, তেমনি এঁর অর্থোদ্ধার কাঠিণ্যে পাষাণ। তাই ব্যাসদেব এঁর সূত্রভাষ্য করে সুগম ও সরল করেছেন মহাপুরাণে অর্থাৎ ভাগবতে। কিন্তু তুমি তো ভক্তি বিরোধী, তাই ভাগবতের রসাস্বাদন কর নি।'

ভৎ´সনার সুরে বললেন, 'মায়াবাদী ভাষ্যে তুমি অভ্যস্ত। তাই এই বিকৃত অর্থ নিজে গ্রহণ করেছ এবং শিষ্যদের করিয়েছ। আর তাই যে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়, তাঁর সঙ্গে নিজেকে অভেদ ভেবে আত্ম-তুষ্টি লাভ করেছ। আর অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি করে এই মায়াবাদী ভাষ্যে বিবর্তবাদ স্থাপন করেছ। ফলে ব্যাস অনুমোদিত পরিণামবাদ বর্জন করেছ। এ জগৎ মিথ্যা নয়, তবে নশ্বর। কিন্তু তোমার দোষ নেই, কারণ তুমি শঙ্করপন্থী। আবার আচার্যেরও দোষ নেই, কারণ তিনি এই মায়াবাদ স্থাপন করেছিলেন ঈশ্বরেরই আদেশে— এক বিশেষ পরিস্থিতিতে।'

ব্রহ্ম সাকার নিরাকার— দুইই। বেদান্তের এই কথাটি প্রভু এই মাত্র বললেন। যথার্থ বললেন প্রভু। যেমন কঠোপনিষৎ বলছেন, "অশরীরং শরীরেষ্বন বস্থেস্ব বস্থিতন।………"

ঠিক পরের শ্লোকেই বলছেন,

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মাবৃণুতে তনুংস্বাম॥"

—এই আত্মা বহু বেদাধ্যয়ন দ্বারা লভ্য নহেন, মেধা দ্বারা লভ্য নহেন, বহু বেদশ্রবণ দ্বারা লভ্য নহেন। এই আত্মা যাঁকে কৃপা

করেন, তিনিই তাঁকে পান, তাঁর নিকটই এই আত্মা স্বীয় তনু প্রকাশ করেন।

পরস্পর প্রতীপ বাক্য : ব্রহ্ম অশরীর এবং ব্রহ্ম সশরীর। এ বাক্য কি মাণিক্য হতে পারে? — পারে, যদি সিদ্ধান্ত হয় যে ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নেই, আছে চিন্ময় সত্তা।

প্রভু একটু আগেই আরেকটি কথা বলেছেন অর্থাৎ মায়াবাদ স্থাপনে আচার্য শঙ্করের যেমন দোষ নেই, তেমনি দোষী নন সশিষ্য সার্বভৌম যাঁরা অনুসরণ করেছেন শঙ্করকে। আচার্য এ কার্যটি সম্পাদন করেছিলেন ঈশ্বরেরই নির্দেশে। এ কথাটি যথার্থ। প্রভু বাক্য অনৃত হতে পারে না।

নির্দেশটি— কিরকম? যেমন, পদ্ম পুরাণ বলেন,

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান মদ্বিমুখান কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টি রেষোত্তরোত্তরা॥"

— শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে শিব, তুমি স্বকল্পিত আগমশাস্ত্র দ্বারা লোক সকলকে আমার প্রতি বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর, যেন এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে।'

এই কথাটাই শিব পার্বতীকে বললেন। যথা, পদ্মপুরাণ বলেন,

"মায়াবাদম সচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছনং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিনা॥"

— মহাদেব ভগবতীকে বললেন, 'হে দেবি! যাকে লোকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র বলে, সেই মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র কলিকালে ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি ধারণ করে আমিই প্রচার করেছি।'

এখানে যে শিবের কথা বলা হল সেই শিবেরই অবতার শঙ্কর। ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি কথাটাও যথার্থ। আচার্য শঙ্কর ছিলেন ব্রাহ্মণ। ভগবানের আদেশেই তাঁর এই অসৎ শাস্ত্র রচনা। আসলে আচার্য ছিলেন এক পরমাশ্চর্য ভক্ত— কি আচরণে, কি তাঁর রচনায় যেমন তাঁর স্তোত্র 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।' এবং 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে'। তাঁর ষটপদী স্তোত্রেও সেই ভক্ত প্রবরেরই কথা। যেমন.

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম।
সামুদ্রো হি তরঙ্গ ক্বচন সমুদ্রোন তারঙ্গ।'

এর অর্থ কি ? অর্থ উদ্ধার করেছেন বৃন্দাবন তাঁর ললিত ভাষায়'

"যদ্যপিও জগতে ঈশ্বর ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঁই॥
তব্ তোমা হইতে যে হইয়াছি আমি।
আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ'— লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র'— না হয় কোন কালে॥
অতএব জগৎ তোমার তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥
যাঁহা হৈতে হয় জন্ম। যে করে পালন।
তাঁরে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥"

সার্বভৌম এমন এক তার্কিক ব্যক্তিত্ব যাঁর কথা লোকে শুনে

এসেছে. মান্য করেছে এতকাল। তিনি কিন্তু শোনেননি কোন লোকের কথা কোনদিনই। শুনতে হবে ধারণাটা তাঁর কাছে শশশৃঙ্গ। তাই ন্যায়ের ন্যায়-অন্যায়, কুটিল-জটিল পথ ধরলেন প্রভু— বাক্য খণ্ডন করতে। একটি কাষ্ঠ খণ্ড যেমন নিমজ্জমান ব্যক্তির শেষ আশ্রয়, ভট্টাচার্যেরও এখন সেই অবস্থা।

না, পারলেন না। পারলেন না ভট্টাচার্য। ভট্টাচার্যের অভিধানে পরাজয় শব্দটি এই প্রথম অন্তর্ভুক্ত হল। তাই সার্বভৌম নির্বাক। স্মিত হেসে প্রভু বললেন, 'তুমি দেখছি স্তম্ভিত হয়ে গেলে। বিস্ময়ের বিষয় নয়। আত্মারামও কিন্তু ঈশ্বর ভজন করেন। হ্যাঁ এই এতক্ষণে সার্বভৌম 'আত্মারাম' শব্দটির মধ্যে যেন শেষ আয়ুধের সন্ধান পেলেন রণতৃষ্ণা মেটাবার। তাই,

"শুনি ভট্টাচার্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥"

প্রভু চতুর শিরোমণি। তাই বললেন, বেশ তো, তুমি যখন কথাটা পাড়লে, তাহলে তুমিই ব্যাখ্যা কর। তোমার ব্যাখ্যার পর আমি সাধ্যমত ব্যাখ্যা করব।

আরম্ভ করলেন সার্বভৌম। নয় রকম ব্যাখ্যা করলেন। পুলকিত প্রভু হেসে বললেন, 'চমৎকার! সাধু, সাধু!! বিদ্যায় তুমি সত্যি বৃহস্পতি। শাস্ত্র ব্যাখ্যায় নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। তবে এর ভিন্নতর ব্যাখ্যাও আছে।'

সার্বভৌম উৎসুক হয়ে শুধোলেন, 'কি সে ব্যাখ্যা? শোনাও তাহলে।'

প্রভু ভিন্নতর ব্যাখ্যাই করলেন। ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যার ধারে-কাছেও গেলেন না। আঠারটি ব্যাখ্যা করলেন প্রভু।

না, সার্বভৌম আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। প্রভুকে পরাভূত করার সর্ব প্রয়াসই তাঁর ব্যর্থ। যাঁকে মনে করেছিলেন সাধারণ, তিনি তো অলোক সাধারণ। যাঁকে ভেবেছিলেন সামান্য, তিনি যে অসামান্য। এই সন্ন্যাসীর মধ্যে যে ঐশ্বর্য তিনি দেখলেন, এতো অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য। অল্প ভেবেছিলেন যাঁকে, তিনি যে ভূমা। তবে কি সেই ভূমাই এলেন ভূমিতে। সেই গোলোক থেকে ভূলোকে। মন তাঁর আথে-ব্যথে বিকল। উথাল-পাথাল! সার্বভৌম প্রায় অচেতন। এ কি! তাঁর সম্মুখে কে দণ্ডায়মান। কোথায় সেই নবীন সন্ন্যাসী? এ যে চতুর্ভুজ নারায়ণ। না, নারায়ণও তো এখন নেই। এ যে দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ। নবকিশোর নটবর—গোপবেশ বেণুকর।

অর্ধ চেতনায় ভাবছেন সার্বভৌম: 'তাহলে তো গোপীনাথ ঠিকই বলেছিল। অথচ আমিই বলেছিলাম কলিযুগে অবতার নেই। গোপীনাথ বাক্যই যথার্থ: যশোদা নন্দনই শচীনন্দন হয়ে এসেছেন। কালিন্দী তট ছেড়ে এসেছেন সুরধুনী তটে। ছিলেন কালা, হলেন গোরা। কালাচাঁদই হয়েছেন গোরাচাঁদ। কৃষ্ণচন্দ্র হয়েছেন গৌরচন্দ্র। বৃন্দাবন চন্দ্র এসেছেন নবদ্বীপচন্দ্র হয়ে। লীলাপুরুষোত্তম লীলারস আস্বাদন করার জন্য হলেন দুই— রাধা-কৃষ্ণ। আবার এই দুইয়ে মিলে এক হলেন প্রেম পুরুষোত্তম রূপে— রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত তনু হয়ে। হ্যাঁ, গোপীনাথ ঠিকই

বলেছে, বারবারই বলেছে। তার কথা অবিতথ। আমি সার্বভৌম অকারণে অবুঝ হয়ে অজচ্ছল কুতর্ক করেছি। এখন দেখছি তিনিই ইনি। ইনিই তিনি। আমি অভক্ত চিনি বা না চিনি। চিনবই বা কি করে? আমি তো জ্ঞান গর্বে এতকাল ভেবে এসেছি জীবই শিব। ঈশ্বর বলে কোন বস্তু নেই। আমিই ভগবান। তাই না জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিনা। এখন বুঝতে পারছি ভগবান আছেন। না, শুধু আছেন না— তিনি আসেন। যুগে যুগে আসেন। যুগের প্রয়োজনে আসেন। আসেন তিনি গীতার প্রতিজ্ঞা বাক্য রক্ষা করতে।'

বাহ্য ফিরে পেয়েই সার্বভৌম সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন প্রভুপদে। জ্ঞানে বৃহস্পতি। ঝটিতি শতশ্লোকে স্তুতি করলেন প্রভুর। প্রভু প্রেমালিঙ্গন দিলেন। আলিঙ্গনে বাহ্য হারালেন ভট্টাচার্য। হারাবেন বৈকি। তখন যে তাঁর দেহে দেখা দিয়েছে অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক. কম্প, স্বেদ ইত্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।

সে কি, সার্বভৌম নৃত্য করছেন! নর্তন তো অকৃত্য—শাস্ত্র বিরুদ্ধ। তিনিই না বলেছেন নবীন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর কর্তব্য পালন করে না। পাগলের মত নাচে, গায়। আর আজ? প্রেমাবেশে তিনি নিজেই নর্তন করছেন। হৃষ্ট হলেন গোপীনাথ। তাহলে এতদিনে ঊষর মরুতে প্রেমবারি বর্ষিত হল। যুগল পত্র দেখা দেবে কিনা— পরের কথা। এখন তো অন্তত বীজ উপ্ত হবার জন্য ভূমি প্রস্তুত হল। তাই নৃত্য 'দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন।' প্রভুর গণ কিন্তু হাসলেন। হাসলেন কেন? এঁরা

ভগবৎ প্রেমে আবিষ্ট থাকেন সদাই। তপ্ত মরুদেশের ধুসর বালুকার মত শুষ্ক জ্ঞানের, তর্ক শাস্ত্রের ধার ধারে না এঁরা। আজ দেখলেন সেই জ্ঞান মার্গী তার্কিক পরাভূত। শুধু পরাভূত নন, বশীভূত— প্রেমে বশীভূত। প্রেম পুরুষোত্তমের বশীভূত। তাঁরই চরণে পতিত। কী সে দৃশ্য! গজপতি দোর্দণ্ড প্রতাপ উড়িষ্যাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গুরু, গুরুর গুরু এবং জগৎ গুরু যে সার্বভৌম, যিনি স্বর্ণ পালঙ্কে শয়ন করেন, অশন করেন স্বর্ণ পাত্রে, সেই সার্বভৌম এক গেরুয়া কৌপীন পরা সন্ন্যাসীর পদে পতিত— শরণাগত।

প্রেমাবেশ কেটে গেলে সার্বভৌম বললেন, 'অবস্তুতে অভিভূত ছিলাম এতদিন। ছিলাম একখণ্ড প্রস্তর। তোমার তেজে সে পাষাণও আজ দ্রবীভূত হল।' বলে পুনর্বার স্তুতি করলেন প্রভুর। আত্মস্তুতিতে কোন ক্ষেত্রেই আহ্লাদ হত না প্রভুর। তাই ঝটিতি নিজ বাসায় চলে এলেন। আর ভট্টাচার্য আচার্যকে দিয়ে মহাপ্রসাদ আনিয়ে প্রভুর সেবার ব্যবস্থা করলেন।

ভট্টাচার্য এতকাল অপরকে দেখেছেন। দেখেননি শুধু নিজেকে। এই যে অপরকে দেখেছেন, সে দেখাও দেখেছেন জ্ঞানালোকে। প্রেমের প্রমা থেকে ছিলেন যোজন দূরে।

আর নিজেকে দেখা? দেখবেন কি করে? এতকাল তাঁর চিত্ত দর্পণটি ছিল ধুলি মলিন। মুকুর মলিন থাকলে কি মুখ দেখা যায়? জ্ঞানগর্ব সার্বভৌমের মনমুকুরে এনেছিল মলিনতা। তাই তিনি নিজেকে চিনতে পারেননি। চিনবেন কি করে? দেখতেই তো

পারেননি।

মলিনতা দূর হয় আত্ম সমর্পণে, জ্ঞানগর্জনে নয়। ভট্টাচার্য সেই সোঽহং ত্যাগ করে যখন প্রভুপদে নিবেদিত প্রাণ হলেন, তখনই তাঁর চিত্ত দর্পণ মার্জিত হল। মলিনতা ঘুচে গেল আর সেই মার্জিত চিত্তে প্রভু করলেন প্রেম সঞ্চার। আর তাই প্রেমাবিষ্ট হলেন সার্বভৌম। যে নৃত্য ছিল তাঁর কাছে জুগুপ্সিত, সেই নৃত্যই হল পরম ঈপ্সিত। তিনি হলেন নৃত্যে মাতোয়ারা। এমনই মাতোয়ারা যে জগতের সব কিছু বিস্মৃত হলেন। বিস্মৃত হলেন গজপতির কথা, কাশীর তার্কিক পণ্ডিতদের, বিশেষতঃ প্রকাশানন্দের কথা, এবং তাঁর পরিকরদের কথা। আর কি লোকাপেক্ষা থাকতে পারে? তিনি এখন বিমুক্ত বিহঙ্গ— বিমুক্ত জ্ঞান মার্গের ভ্রান্তির অমা থেকে। তাঁর উত্তরণ হয়েছে প্রেম প্রমায়··· প্রভুর প্রেম সঞ্চারে। সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়েছে তাঁর। জ্ঞান মার্গীর আচারের বালুরাশির আগ্রাসী হাঁ তাঁকে আর গ্রাস করতে পারবেনা। পারবেই বা কি করে? তাঁর মধ্যে যে দেখা দিয়েছে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার।

আচার নিষ্ঠা যেন ধমনীর রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এর রাহুগ্রাস থেকে মানুষকে মুক্ত করা হিমাদ্রি লঙ্ঘন করার মত সুকঠিন। লোক শিক্ষার্থেই প্রভুর আবির্ভাব। লোক চরিত্র তাঁর নখ মুকুরে। প্রভু জানেন চিরাচরিত ধর্ম লোক সহজে ছাড়তে চায়না। সার্বভৌম প্রেম ধর্মে দীক্ষিত হলেন এই সেদিন। কিন্তু বেদ ধর্ম্মের একটা মোটা দাগ রয়েছে তাঁর চিত্ত দর্পণে।

এই দাগটি মুছে ফেলা দরকার। তবেই না সার্বভৌম সার্বিকভাবে হবেন বন্ধন মুক্ত।

কিছুদিন কেটে গেল। জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান দর্শন প্রভুর বড়ই প্রিয়। একদিন গেলেন দর্শন করতে। দর্শন করলেন। পুজোরী প্রসাদী মালা আর অন্ন দিলেন প্রভুর হাতে। তখন সদ্য অরুণোদয়। প্রভু সেই মালা প্রসাদ কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ছুটলেন সার্বভৌমের বাড়ীর দিকে। তখন ভট্টাচার্য সবে ঘুম থেকে জেগেছেন। ঘুম থেকে ওঠার সময় মানুষ ইষ্ট দেবতার নাম করে। প্রভু দেখলেন ভট্টাচার্যও নাম করছেন। কি সে নাম? — না, কৃষ্ণনাম। হৃষ্ট হলেন প্রভু। তাহলে সোঽহংবাদীরও মনে কৃষ্ণপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়। সাধু! সাধু!!

বাইরে এলেন ভট্টাচার্য। এসেই প্রভুর দর্শন। ভারি আহ্লাদ হল দর্শন লাভে। প্রণত হলেন প্রভু পদাম্বুজে।

দুজনেই আসন গ্রহণ করলেন। প্রভু খুঁট খুলে ভট্টাচার্যের হাতে প্রসাদ দিলেন। পুলকিত হলেন প্রসাদ পেয়ে। প্রভু নিজে বয়ে এনে তাঁর হাতে দিয়েছেন। তবুও একটু দ্বিধার দোলা তাঁর মনে। এই তো সবে তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। প্রাতঃকৃত্যের কোনটাই যে করা হয়নি— প্রাতঃ স্নান, প্রাতঃ সন্ধ্যা তো দূরের কথা। বেদ ধর্মের বেড়াজাল থেকে পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেন নি এখনও। তাই এই দ্বন্দ্ব-ধন্দ। শেষকালে প্রভু-কৃপারই জয় হল। সার্বভৌম মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন, তবে তার আগে পদ্ম পুরাণের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন :

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং নাত্র বিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥"

—মহাপ্রসাদ পর্যুষিতই হোক, আর দূর দেশ থেকে আনীতই হোক, যখনই পাওয়া যাবে, ঠিক তখনই ভোজন করতে হবে। এ বিষয়ে কোনরূপ বিচার করবেনা। এতে দেশের নিয়ম নেই, কালেরও নিয়ম নেই। শিষ্ট ব্যক্তিরা অনতিবিলম্বে ভক্ষণ করবেন। স্বয়ং শ্রীহরি এ কথা বলেছেন।

প্রভুর সে কি আনন্দ! প্রেমাবিষ্ট হয়ে সার্বভৌমকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। না, শুধু আলিঙ্গনই না। দুজনে হাত ধরাধরি করে নৃত্যে মেতে উঠলেন।

প্রভু আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বললেন, 'ভট্টাচার্য, আজ আমি ত্রিভুবন জয় করলাম। আমার বৈকুণ্ঠ লাভ হল। আর সর্ব অভিলাষও পূর্ণ হল। কেন জান? এতকাল যে মহাপ্রসাদ তুমি গ্রহণ করনি, সেই মহাপ্রসাদ ঐকান্তিক বিশ্বাসে গ্রহণ করলে। আর আমি এও বুঝলাম মায়ার বন্ধন তুমি ছিন্ন করতে পেরেছ। আজ তুমি কৃষ্ণ প্রেমে আবিষ্ট। তাই বেদ ধর্ম লঙ্ঘন করে প্রসাদ গ্রহণ করেছ প্রাতঃকৃত্য না করেই। আমি সুনিশ্চিত তোমার কৃষ্ণ প্রাপ্তি অবশ্যই ঘটবে এবং ভগবৎ তত্ত্ব অবগত হবে।'

সার্বভৌম প্রাতঃকৃত্য না করে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। এতে মহানন্দে প্রভু বললেন তিনি ত্রিভুবন জয় করলেন।

প্রভু এ কথা বললেন কেন?

সার্বভৌম ছিলেন জ্ঞান মার্গী কুতার্কিক। ভক্তির পথ থেকে যোজন দূরে ছিল তাঁর বাস। তিনি সমগ্র সন্ন্যাসী কুলের শিরোমণি। অখিল ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, একমাত্র কাশীর প্রকাশানন্দ ছাড়া। তিনি যে পথ অনুসরণ করবেন, সেই পথই হবে অন্য সকলের একমাত্র পথ। সে হেন সার্বভৌম জ্ঞানমার্গ বর্জন করলেন। গ্রহণ করলেন প্রেমভক্তির পথ। মহাপ্রসাদ গ্রহণ শ্রদ্ধা ভক্তির অন্যতম লক্ষণ। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও সন্ন্যাসী তাঁর প্রেমভক্তির পথই অনুসরণ করবেন। ত্রিভুবন তো জয় করা হলই। প্রেমভক্তি বিতরণের জন্যই না প্রভুর আবির্ভাব। সার্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করলেন প্রাতঃকৃত্য না করেই। করলেন মানে প্রভুই করালেন প্রেমভক্তি তাঁর মনে সঞ্চার করে।

আচারের অচলায়তন ভেঙ্গে দিলেন প্রভু। সমগ্র জনসমাজকে মুক্তি দিলেন। সমাজ ইতিহাসে এই প্রথম বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিপ্লবে বহুবিধ আয়ুধ ব্যবহৃত হয়। আর এই বিপ্লবেও আয়ুধ ব্যবহৃত হল। তবে বহুবিধ নয়, একটি মাত্র। নাম তার প্রেমায়ুধ। বহুবিধ আয়ুধের অপায় শোনিত বন্যা। আর প্রেমায়ুধে প্রবাহিত হল প্রেমবন্যা। প্রেমপুরুষোত্তমের এই মুক্তিদাতার ভূমিকাটি বড়ই মধুর। এ মুক্তিতে জীব পাবে দিশারী দীপ শিখার সন্ধান।

ত্রিভুবন জয়— কথাটা অন্য অর্থেও অবিতথ। ত্রিভুবন জয় নিঃসন্দেহে সুকঠিন কাজ। ঠিক এমনি সুকঠিন কাজ ছিল সার্বভৌম উদ্ধার। কেন? তিন রকমের লোক: ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরে

অবিশ্বাস এবং তৃতীয় রকম হচ্ছে যারা বিশ্বাসীও নয়, আবার অবিশ্বাসীও নয়। যারা বিশ্বাসী, তাদের বিশ্বাসের পুষ্টি সাধন সহজ সাধ্য। যারা বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী কোনটাই নয়, তাদের বিশ্বাসে আনা আয়াস ও সময় সাপেক্ষ হলেও একেবারে দুঃসাধ্য নয়। যেমন যে ব্যক্তি মৃৎশিল্প জানেনা, তাকে যে মূর্তি গড়ানো শেখান হবে, সে সেই মূর্তিরই রূপদান করবে। একটু সময় বেশী লাগবে এই যা। কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তাকে বিশ্বাসী করা ঐ ত্রিভুবন জয়ের মতই প্রায় অসাধ্য। এক্ষেত্রে দ্বিবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপসারণ, এবং অপসারান্তে তার মধ্যে তার বিসদৃশ বিশ্বাসের উৎপাদন। ঈশ্বর তত্ত্ব ছিল সার্বভৌমের কাছে সম্পূর্ণ বিসদৃশ। শঙ্করপন্থী মায়াবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করাতো ত্রিভুবন জয় বটেই।

প্রভু সার্বভৌমকে আশ্বাস দিলেন তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব অবগত হবেন। এ আশ্বাসের ভিত্তি কি? ভিত্তি স্বয়ং ভাগবত। যেমন,

"যেষাং সর্ব এব ভগবান দয়য়েদনন্ত সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো
যদি নির্ব্ব্যলীকম।
তে দুস্তরামতিতবন্তি চ দেব মায়াং নৈষাং মমাহমিতি
ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

—ব্রহ্মা নারদকে বলেছিলেন, 'সেই অনন্ত ভগবান যাঁদের কৃপা করেন, তাঁরা যদি অকপট হৃদয়ে সর্বতোভাবে তাঁর চরণে শরণাগত হন, তবেই তাঁরা অতি দুস্তর দৈবী মায়ার পারে গমন করতে ও ভগবৎ তত্ত্ব অবগত হতেও পারেন; তখন আর কুকুর শৃগালের

ভক্ষ্য এই দেহে তাঁদের 'আমি ও আমার' ইত্যাকার বুদ্ধি জন্মে না।

প্রভু বললেন, তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হল। হল বৈ কি। সার্বভৌমকে যে উদ্ধার করলেন। আর সার্বভৌমের উদ্ধার মানে সর্বজীবের উদ্ধার।

সার্বভৌমের যে উদ্ধার হল তার কি প্রমাণ? প্রমাণ তাঁর আচরণ। কোথায় আর সেই সোঅহংবাদী সার্বভৌম? এখন তো তিনি

"চৈতন্য চরণ বিনে নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আব না করে ব্যাখ্যান॥"

শুধু কি এই?

'আর দিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু স্থানে॥
দণ্ডবৎ কবি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব দুর্ম্মতি॥'

তাঁব ভক্তি দেখে আচার্য কি করলেন?

'গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
হবি হরি বলে নাচে করতালি দিয়া॥'

নাচবেন বৈ কি। তাঁরই তো সব চেয়ে বেশী আনন্দ। কত চেষ্টাই না করেছেন তিনি তাঁর এই শ্যালকটিকে ভক্তিপথে আনতে। অবশ্য সে কথার উল্লেখ করতেও ছাড়লেন না:

'গোপীনাথাচার্য্য বোলে আমি পুর্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য! তোমার সেই ত হইল॥'

অবশ্য ভট্টাচার্যও অকৃতজ্ঞ নন। আচার্যের ঋণ স্বীকার করে বললেন,

'যথার্থ বলেছ তুমি। তোমারই সংপ্রয়াসে আজ আমি প্রভু কৃপা লাভ করেছি। তোমাকে নমস্কার। শতকোটি নমস্কার। তুমি পরম ভাগবত, আর আমি সারা জীবন কুতর্ক করেছি হীরে ফেলে কাঁচ নিয়ে।'

কলিহত জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন ভক্তি কি? প্রশ্ন জাগল সার্বভৌমের মনে। জিজ্ঞাসার পাত্র তো এখন একজনই-- নব জীবন দাতা প্রভু। প্রভু বললেন, 'যাগ-যজ্ঞ, পূজা অর্চনা কলিহত জীবের পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। তাই শুধ নাম সংকীর্তন।' —বলে বৃহৎ নারদীয় পুরাণ থেকে এই শ্লোকটি স্বমুখে উচ্চারণ করলেন:

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'

না, শুধু উচ্চারণই নয়। বিশদ ব্যাখ্যা করলেন। চমৎকৃত হলেন সার্বভৌম। এ তো ব্যাখ্যা নয়— অমৃতের আস্বাদন প্রতি পলে। এরপর জগন্নাথ দর্শনে গেলেন সার্বভৌম। প্রভুর নির্দেশেই গেলেন। প্রভুর আলিঙ্গন ধন্য হয়ে গেলেন। সঙ্গে রইলেন জগদানন্দ ও দামোদর। প্রচুর প্রসাদ এনে দিলেন জগদানন্দের হাতে। সঙ্গে দিলেন এক পত্রী। তাল পাতায় লেখা— সার্বভৌম স্তুতি করেছেন প্রভুর। মধুর, বড়ই মধুর সে স্তুতি। মহাজ্ঞানী তো। তার ওপর প্রভুর কৃপায় সেই জ্ঞান পুষ্ট হয়েছে ভক্তিরসে। স্তুতিটি হচ্ছে:

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজভক্তি শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

(বৈরাগ্য বিদ্যা ও স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে করুণাসিন্ধু এক পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করি। কালপ্রবাহে বিনষ্টপ্রায় স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ পুনরায় প্রচার করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর চরণ কমলে আমার মনোমধুকর গাঢ়রূপে আসক্ত হোক।)

প্রভুর কাছে এলেন দুজনেই। জগদানন্দের হাতে প্রসাদ ও পত্রী। পত্রীটি মুকুন্দ নিলেন। তিনি মন জানেন প্রভুর। স্তুতি আদৌ পছন্দ করেন না প্রভু। আরও জানেন প্রভু স্তুতিটি হাতে পেয়েই ছিঁড়ে ফেলবেন। কিন্তু স্তুতিটি যে বড়ই মধুর— রক্ষা করা প্রয়োজন। তাই তিনি বাড়ীর বাইরের দেয়ালে লিখে রাখলেন। মুকুন্দের আশঙ্কা কাজে ফলল, প্রভু পত্রীটি পড়ে ছিঁড়ে ফেললেন। মুকুন্দের বুদ্ধির তুলনা নেই বুঝিবা। আজ তাঁরই বুদ্ধির কল্যাণে "এই দুই শ্লোক ভক্ত কণ্ঠে হার।" রক্ষা পেল। ভক্তের আনন্দধ্বনি হয়ে রইল চিরদিনের জন্য।

'ভক্ত কণ্ঠে হার'— যথার্থই বলেছেন কবিরাজ গোস্বামী। তিনিই আদি পুরুষ। যেমন ব্রহ্মসংহিতা বলেন,

'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম্॥'

আবার ভক্তের প্রাণের কথাটিই বলেছেন সার্বভৌম। ভক্তির

সুরধুনী যে বইছে তাঁর মনোভূমিতে। ভক্তির এমনই মহিমা। যে বেদজ্ঞ তাঁর জ্ঞানগর্বে বলেছিলেন কলিতে অবতার নেই, ভক্তিঋদ্ধি বলে বলীয়ান হয়ে আজ সেই বেদজ্ঞ বলছেন— প্রভুকে স্তুতি করে বলছেন প্রভুই পুরাণ পুরুষ। অর্থাৎ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিই সর্বকারণে কারণ।

চিন্ময়কে চিনতে পারেন কজন? পার্থ ই কি চিনতে পেরেছিলেন পার্থ সারথিকে? কিন্তু যখন চিনতে পারলেন, তখন পদাম্বুজে পতিত হয়ে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বললেন,

'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥'

শুধু ফাল্গুনি কেন? মহেশ্বরই কি চিনতে পেরেছিলেন? যখন চিনলেন, তখন যুক্তকরে স্তব করলেন,

'ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয় স্তুর্য্যঃ স্বদৃগ হেতু রহেতুরীশঃ।
প্রতীয় সেহথাপি যথাবিকারং স্বমায়যা সর্ব্বগুণ প্রসিদ্ধৈ।'

—হে ভগবান! আপনি এক অর্থাৎ স্বজাতীয় ভেদরহিত, অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদ রহিত। জগতের আদি কারণ, স্বপ্রকাশ, বিশ্বের উৎপাদক, স্বয়ং কারণ রহিত, অনেক পুরুষ স্বরুপ, বাসুদেবাদি চতুর্ব্বুহ স্বরূপ ও সর্বেশ্বর। স্বজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থন্তর নেই বলে যদিও আপনি আবরণ শূন্য, তবুও কৃপালুত্ব, স্বভক্তরক্ষকত্ব, সর্বার্থপ্রদত্ত প্রভৃতি গুণ সমূহ প্রত্যাখান করার জন্য নিজকৃপায় মায়াকার্য অনুসারে ভক্তগণের হৃদয়ে অনুভূত হয়ে থাকেন। এই জন্যই পরিচ্ছিন্ন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহের অগোচর হয়েও আপনি

ভক্তদের কাছে পালকাদি রূপে প্রতীত হয়ে থাকেন।

সার্বভৌম আবার বললেন, 'বৈরাগ্য বিদ্যা নিজভক্তি শিক্ষার্থমেকঃ।' হ্যাঁ, বৈরাগ্যের ও ভক্তিযোগের কথা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র কথা শাস্ত্রেই গ্রথিত আছে। তাতে লোক শিক্ষা হয়নি। হবেই বা কি করে? লোকশিক্ষা তখনই হয়, যখন প্রবক্তা নিজ আচরণে দেখান। 'আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সবারে' — এই প্রতিজ্ঞা বাক্য রক্ষা করলেন প্রভু। বাক্য তখন বলনেই রইলনা, মাণিক্য হয়ে প্রকাশ পেল চলনেও।

ঘরণী ছাড়লেন, জননী ছাড়লেন, ছাড়লেন নিজবাস। ত্যাগ করলেন বাসভূমি— পূর্ব পুরুষের মাটি। শ্লোক রচয়িতার অশন হয় হেম পাত্রে, বসন মহার্হ, শয়ন হেম পালঙ্কে, সর্বোপরি হেমোজ্জ্বল তাঁর যশ, প্রতিপত্তি— তাঁর সমস্ত জীবন। আর যাঁকে নিবেদন করছেন সেই পুরুষটির স্বর্ণ পালঙ্ক নেই, নেই কোন স্বর্ণ পাত্র। সর্বোপরি তিনি তো এখন অনিকেত— ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ থেকে থাকেন যোজন দূরে।

তাহলে তাঁর আছে কি? আছে শুধু তিন 'ক'। কটিতটে কৌপীন, করে করঙ্গ, আর কণ্ঠে কৃষ্ণ।

সার্বভৌমের সর্ব বস্তুই হেমময়, আর প্রভুর শুধুমাত্র একটি বস্তু হেমময়— তাঁর হেমদণ্ড বাহু। এই হেমদণ্ড বাহু দিয়ে তিনি আলিঙ্গন করবেন সর্বজীবকে, আর সর্বজীবে বিতরণ করলেন অকাতরে কৃষ্ণনাম। ফলে কলিহত জীব হল ভক্তির সুরধুনীতে সুস্নাত।

ভক্তি তো অব্যয়, অক্ষয়। এর আবার ক্ষয় ক্ষতি হয় নাকি ? — হয়। সর্ব বস্তুই যে মহাকালের অধীন। তাইতো তাঁকে আসতে হয়। আসতে হয় যুগে যুগে। আসেনও তিনি যুগে যুগে। আহা! কি মধুর সেই আশ্বাস বাণী ঃ '......সম্ভবামি যুগে যুগে।'

ভক্তি বস্তুটি বিস্মৃতিতে বিলীন হয়েছিল শঙ্করপন্থী সার্বভৌমের কাছে। জ্ঞান গর্বের নাগপাশ থেকে যখন তিনি মুক্ত হলেন, তখনই উপলব্ধি করলেন ভক্তি বস্তুটি কাল প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যুগে যুগেই বিনষ্ট হয়, আবার যুগে যুগেই এর পুনরুত্থান ঘটে। আর পুনরুত্থানার্থেই আসেন তিনি যুগে যুগে যুগাবতার রূপে। তাই না এই নবীন সন্ন্যাসী এসেছেন কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে।

যথার্থ বলেছেন সার্বভৌম। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই পরাৎপর পরতত্ত্বের প্রাকট্য স্বীয় আচরণে জীব শিক্ষার্থে। স্বচক্ষে সেই শিক্ষা দেখে এবং বহু প্রয়াসে সেই শিক্ষা লাভ করে শ্লোকদ্বয় রচনা করলেন। এই শ্লোক যথার্থই ভক্ত কণ্ঠে হার।

না, শুধু স্তুতি পত্রীতেই না। — আচরণে, মনে মননেও সার্বভৌম হলেন গৌরগত প্রাণ। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন ঃ

"সার্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন॥"

এমনকি ভট্টাচার্য নিরন্তর জপ করেছেন শুধু একটি নাম 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'

ভক্তিতে আপ্লুত থাকে সদাই ভট্টাচার্যের মন। মানুষের

সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত বস্তু কি ? --- চার পুরুষার্থ ঃ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— এই চতুর্বর্গ। ভট্টাচার্য এখন কি অবস্থায় আছেন ? -- আছেন সদাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে। আর সেই কৃষ্ণকে তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ করছেন প্রভুর মাঝে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তো দূরের কথা, তিনি তো এখন মোক্ষও চাননা। তবে তিনি কি চান ? — চান ভক্তি। একমাত্র ভক্তি— শুদ্ধা ভক্তি-- অহৈতুকী ভক্তি। ভক্তের কাজ কি ? — সেব্যের সুখবিধান। কাজেই মুক্তি তিনি চান না। মুক্তিতে যে সেব্য সেবক সম্পর্ক থাকেনা। এই সুখবিধান কিভাবে করতে হয় ? -- না,

'অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥'

আর ঠিক এইভাবেই সার্বভৌম ভজন করতে চান। কর্ম ছাড়তে হবে কেন ? কর্ম বলতে তো হোম যজ্ঞাদি— যা করলে স্বর্গলাভ হয়। স্বর্গলাভেই তো সমূহ সর্বনাশ। কেন ? তখন তো আর সেব্য সেবকের সম্পর্ক থাকেনা। সুরলোকে শুনবেন সেবক তখন গন্ধর্বের সঙ্গীত, শুনবেন অনবদ্যাঙ্গী অপ্সরার নূপুর নিক্কণ, সেই নৃত্যপটীয়সীর হাতে থাকবে পারিজাত, কুন্তলে মন্দার মঞ্জরী, সুরা আসবে কাঞ্চন পাত্রে। তখন কার সেবা কে করে ? সেব্যের কথা কি তখন স্মরণ থাকতে পারে ?

আর জ্ঞান ? এ জ্ঞানে তো ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি। সোঅহং হলে সেবার প্রশ্ন, ভক্তি নিবেদনের প্রশ্ন আর থাকেনা। তাই সার্বভৌম মুক্তি চাননা। ভক্তের তো তৃপ্তি নেই, আছে আকুলতা। এ যেন

তপ্ত ইক্ষু সেবন— জিভ জ্বলে যায়, তবু ছাড়া যায় না। যেমন ভক্তোত্তম মহাজন বলছেন,

'জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।'

আরও বলছেন,

'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।'

ভক্তিতে সার্বভৌম এত ব্যাকুল যে মুক্তিপদ যুগ্ম শব্দটিতেও তাঁর অনীহা। অনীহা এত তীব্র যে ভাগবত শ্লোকের পাঠান্তর করলেন। যেমন,

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

— ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন. (যেহেতু ভক্তি ভিন্ন তোমাকে বা তোমার মহিমা অবগত হওয়া যায় না) অতএব যে ব্যক্তি কবে ভগবানের কৃপা হবে এইরূপ প্রতীক্ষা করে স্বকৃত কর্মফল ভোগ করতে করতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার (তোমার ভজনাদি) করে জীবন ধারণ করেন, তিনিই ভক্তিপদে দায়ভাগী হবেন।

আসলে ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে 'ভক্তিপদে' কথাটি নেই, আছে 'মুক্তিপদে'। ভক্তির রসামৃত আস্বাদনে আবিষ্ট সার্বভৌমের বদনে ঐ মুক্তি শব্দটি আর আসে না। আসবেনা তো— তিনি যে আর চিনি হতে চান না, চিনি খেতে চান। হ্যাঁ, চিন্ময়কে চিনেছেন এতদিনে।

দায়ভাক্। গভীর ব্যঞ্জনা শব্দটিতে। দায় মানে পৈত্রিক বিষয় আশয়। ভাক বা ভাগী মানে অধিকারী। উত্তরাধিকারীর কি কি গুণে অধিকারী হওয়া প্রয়োজন? প্রথম কথা, তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, পিতৃ শাসনে নতি-প্রণতি জানাতে হবে, নইলে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, সম্পত্তি লাভের জন্য সন্তুষ্ট করতে হবে পিতৃদেবকে। এই তিনটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করতে পারলেই তার পৈতৃক সম্পত্তি লাভ হবে।

অনুরূপভাবে, ভগবান ভক্তির ভাণ্ডারী। অফুরান তাঁর ভাণ্ডার— ভক্তের অনাময় কল্পেই। যে ভক্ত এই ভক্তি লাভের বাসনা করেন, তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে পূর্বজন্মের এবং এ জন্মের দুষ্কৃতির ফল ভোগ করতে হবে। তাই শ্লোক বলছেন 'ভুঞ্জান এব আত্মকৃতং বিপাকম্।' বিপাক মানে বিসদৃশ ফল। তাইনা ত্রিতাপ জ্বালা সইতে হয় দেহধারী জীবকে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ের জন্য মানুষ নানা জনকে দোষ দেয়ঃ 'ছেলেটা মানুষ হলনা, তাই আজ আমার এত অর্থকষ্ট। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে. কিন্তু আমার রমণী গুণহীনা, তাই আমার সংসারে এত অশান্তি। শেষ বয়সে একটু সেবা যত্নের আশা করেছিলাম। সে আশা ফানুসের মত ফেটে গেল দজ্জাল পুত্রবধূর জন্য। ছেলের চাকরীটা হতে হতেও হল না শুধুমাত্র ভাইবেরাদরের বাগড়ার জন্য।' — ইত্যাকার হাজারো রকমের দোষারোপ করে থাকে মানুষ। এর সবটাই ভ্রান্তি বিলাস। আসলে এরা কেউ দায়ী নয়। তবে দায়ী কে? — সম্পূর্ণ ভাবে

ঐ ক্ষুব্ধ মানুষটি। মানুষটি মানে মানুষটির কর্মফল। — এ জন্মের ও আগের জন্মের। তাহলে এরা? এরা উপলক্ষ মাত্র। এরা অমিত্র না, বরং মিত্র। এরা ক্ষুব্ধ মানুষটির অশান্তি আসান করছে। কর্মফল তো ভোগ করতেই হবে। এর থেকে রেহাই নেই। কাজেই যত শীঘ্র এবং যতখানি ভোগ করা যায়, ততখানিই এরা মানুষটির দুঃখ ভোগের সহায়ক হয়। ভোগের ফলে শিক্ষা হয়। মনের ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরীক্ষা হয়। ভবিষ্যতে নতুন কর্মফাঁদেও পড়তে হয়না। অর্থাৎ ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে কবে তাঁর কৃপা হবে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এও এক ধরণের তাঁর সেবা। যথার্থ বলেছেন মিলটন: 'They also serve who stand and wait' ধৈর্যের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করলেই ভক্তিপদে উত্তরাধিকারী হওয়া যায়।

নামকরণ কালে যিনি ভাগবত স্পর্শ করেছিলেন, তাঁর কাছে ভাগবত শ্লোকের পাঠান্তর? ধরে ফেললেন প্রভু। তাই

"প্রভু কহে 'মুক্তিপদে' ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদে' কেনে পড় কি তোমার আশয়॥"

উত্তরে ভট্টাচার্য বললেন, 'মুক্তি শব্দ কানে এলেই সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কথা মনে আসে। আর আমার ত্রাস হয় সাধ্য-সাধক সম্পর্ক যে আর রইলনা। তাই মুক্তি শব্দে আমার এত অনীহা ও ভীতি।'

প্রভু বললেন, 'এই শব্দটিতে তোমার জুগুপ্সা ও ভীতির কোন কারণ নেই। মুক্তি বলতে তুমি বলতে চাইছ ভক্ত মুক্তি চাইছে।

'কিন্তু 'মুক্তিপদের' অর্থ অন্যবিধও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তোমার ঈপ্সিত অর্থই হয় অর্থাৎ ঈশ্বরকেই বোঝায়। তুমি মুক্তিপদের অর্থ ধরেছ— মুক্তি রূপ পদ এবং পদ অর্থে বস্তু ধরেছ অর্থাৎ মুক্তিরূপ বস্তু অর্থাৎ মুক্তি। তাই তোমার এত ত্রাস; কিন্তু পদ শব্দের অন্য অর্থ হতে বাধা কোথায়? যেমন পদের প্রথম এবং স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে চরণ। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায় মুক্তি যাঁহার পদে বা চরণে অর্থাৎ কিনা যাঁর চরণে শরণ নিলে মুক্তি পাওয়া যায়। আর এই মুক্তি তোসার জুগুপ্সিত পঞ্চবিধা মুক্তি নয়। এই মুক্তি হচ্ছে তোমার পূর্বের সেই মায়াবাদেব গ্রাস থেকে মুক্তি। আচ্ছা, এতে যদি তোমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে আরেক অর্থও করতে পার। যেমন মুক্তি যাঁর পদে আশ্রয় নিয়েছে তিনিই মুক্তিপদ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান— ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

সবটাই প্রভুর লীলা। যুক্তি তর্কের অবতারণায় পরীক্ষা। ঘট বুঝে ফুল। তিনি জানেন সার্বভৌম তার্কিক পণ্ডিত। সলীল গৌরহরির লীলার শেষ নেই। তাই আবার বললেন, 'আচ্ছা ভট্টাচার্য, আরেক রকম অর্থও তো হতে পারে। মুক্তি কথাটা ভাগবতের অন্যত্রও আছে। সেই অর্থে মুক্তির আশ্রয় যিনি অর্থাৎ ভগবান। ভাগবত বাক্য কি অনৃত হতে পারে? ভাগবতের যে পাঠান্তর হয় না।'

ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে দশটি পদার্থের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে নবমটি মুক্তি আর দশমটি আশ্রয়। আশ্রয় কে? — না, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র নন্দন। কার

আশ্রয় ? — না, ঐ নটি পদার্থের আশ্রয়।

প্রভুর লীলার অন্ত নেই। আসলে মন পরীক্ষা করছেন প্রভু। অপেক্ষা করছেন কি উত্তর দেন ভট্টাচার্য।

ওদিকে সার্বভৌমের মন অটল, অনড়। সার্বভৌম বললেন, 'তোমার সব অর্থই যথার্থ। তবে ঐ শব্দটি আমার মুখে আর আসছেনা। তাছাড়া কিছুটা আশ্লিষ্ট দোষও তো থেকে যায়। যোগরূঢ়ার্থক হয়। অর্থের এই কূট-কচালের মধ্যে যেতে আমার বড়ই অনীহা। অথচ ভক্তি শব্দ উচ্চারণ করতে আমার বড়ই উল্লাস।'

অপরা বিদ্যাতে অনীহা আর অন্তরঙ্গ বস্তু ভক্তিতে তাঁর পরম উল্লাস। এর কারণ কি? কারণ জানাচ্ছেন ভক্তোত্তম নরোত্তম ঃ

'গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভক্তি-রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

হ্যাঁ, শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন সার্বভৌম, আর তাই—

"শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥"

প্রেম আয়াস সাধ্য নয়, প্রসাদ লব্ধ। প্রভু প্রসাদ লাভে ধন্য ভট্টাচার্য। প্রভু শুধু অয়স্কান্ত মণিই না, পরশমণিও। পরশমণি সহজে চেনা যায়না। চেনা যায় কখন? — না, যখন এর পরশে লোহা সোনা হয়।

নীলাদ্রির সর্বজন চিনলেন প্রভুকে যখন ভট্টাচার্য্যের লৌহময়

হৃদয় হল হেমময়। হল প্রেমময়। কি চিনলেন তাঁরা? —তাঁরা চিনলেন, জানলেন তিনিই ইনি, ইনিই তিনি। কবিরাজের কথায়.

"ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
কাশী মিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সভে প্রভুপদে আসি॥'

'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বশ্রেষ্ঠ নরলীলা
নরবপু তাহারই স্বরূপ।'

সাধু! সাধু!! যথার্থ গেয়েছেন মহাজন। সময়ের চাকা অনাদি কাল থেকে চলছে, আর প্রতিপলে পঙ্কিলতা জমছে জনসমাজে। তাই তিনি আসেন। স্তুপীকৃত কালের কলুষ থেকে জীবকে উদ্ধার করতে। এটাই তাঁর লীলা। নরলীলা। নরলীলা, তাই নরবপুতেই আসেন। এলেন তেমনি কলিযুগেও। কলিহত জীবকে কলুষমুক্ত করতে। না, স্বরূপে এলেন না। স্বরূপে এলে তো সর্বজীব সরে যাবে। সরে গেলে প্রেমালিঙ্গন দেবেন কাকে? এ অবতারে যে তিনি প্রেমের ঠাকুর।

লোকের জন্য এলে লোকচরিত্র সর্বাগ্রে জানা দরকার। লাখ লাখ লোক লোকসমাজে। সেই লোক চরিত্রের বীক্ষণশীল বিনেতা বিশ্বম্ভর। প্রতিটি জনপদে জনপ্রতিনিধি থাকেন। সেই প্রতিনিধিকে যদি কলুষমুক্ত করা যায়, তাহলে জনপদের প্রতি জনেরই পুণ্য সরণীতে উত্তরণ হয়।

লোক চরিত্রের মহাজ্ঞানী মহাপ্রভু জানতেন কোন জন প্রতিনিধিকে কোন পথে উদ্ধার করতে হবে। কোথাও উদ্ধার, কোথাও বা দলন। অপায় বুঝে উপায়।

চাঁদ কাজীর বেলায় একপথ, আবার সার্বভৌমের ক্ষেত্রে অন্যপথ। একপথ অন্য পথের প্রতীপ। সম্পূর্ণ প্রতীপ। লোক চরিত্রের বিরল বোদ্ধা প্রভু। কাজীকে করলেন দলন, আর সার্বভৌমকে করলেন উদ্ধার। লাখ লাখ লোকের লোকযাত্রা কাজী দলনে, আর সার্বভৌম উদ্ধারে লাখ নয়, হাজার নয়, শতও নয়। মাত্র এক। সেই এক একা প্রভু স্বয়ং। একা একশ নন, এক অক্ষৌহিণী।

কাজীকে দলন করলেন। আয়ুধ কি? — লোকবল। সম্পূর্ণ নিরায়ুধ লোকারণ্য। না, ঠিক নিরায়ুধ নয়। আয়ুধ ছিল। সে এক জগৎজয়ী আয়ুধ। আয়ুধটির নাম হচ্ছে— ষোল নাম। কাজী দলনে এত লোক নিয়ে গেলেন কেন? ব্যাধি বুঝে বটিকা। সআয়ুধ সৈন্যদলই ছিল কাজীর দম্ভ। তারা বেতনভুক। তারা বেতন নেয় তাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কাজীর জীবন বাঁচাবার জন্য নয়। এবং কাজীর জন্য জীবন দান করার জন্য নয়। আর প্রভুর? সশস্ত্র সৈন্য ছিলনা। প্রেমডোরে বাঁধা ছিল সমগ্র নদীয়াবাসী যাঁরা প্রভুর জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। নগরবাসীর কাজীর প্রতি আনুগত্য নেই। থাকলেও সামান্যতম। তাও প্রীতিতে নয়, ভীতিতে। অকারণ অত্যাচারের ভীতিতে। এই অবস্থাটি শেক্সপীয়রের কালজয়ী কথায়ঃ

'His sceptre show the force of temporal power,
The attitude to awe and majesty,
Wherein doth sit the dread and fear of kings."

তাই আনুগত্য সবটুকুই প্রভুর প্রতি। তারা যে প্রভুগত প্রাণ। ভীতিতে নয়, আন্তরিক প্রীতিতে।

প্রতীপ পন্থা সার্বভৌমের বেলায়। সৈন্য নেই, নেই কোন আয়ুধ। লোকবল নেই। লাখ লোক তো দূরের কথা। একটি লোকও নেই। শুধু একা-একা। একদিকে সার্বভৌম, অপরদিকে প্রভু। সার্বভৌম সারাজীবনে এক বস্তু পুজো করে এসেছেন। সে বস্তুটি হচ্ছে জ্ঞান। বেদ—বেদান্ত। বেশ, বেদান্ত নিয়েই বিগ্রহ শুরু হল। তাঁর স্বীয় শাস্ত্র বিগ্রহেই বিধ্বস্ত হলেন বিদ্যার্ণব সার্বভৌম।

যুদ্ধে সব সৈন্য নিধনের প্রয়োজন হয় না। জয়তিলক ভালে ভাস্বর হয় দ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষ বশে এলে। অগণন লোকের প্রতিভূ হচ্ছেন সার্বভৌম। সেই সার্বভৌমের উদ্ধার মানেই লাখ লাখ লোকের উদ্ধার। আর সর্বজীবের এই উদ্ধারকল্পেই না প্রভুর আবির্ভাব।

জীবের চিহ্ন দুটি— নাম ও রূপ। দুইই নশ্বর। এই আছে, এই নেই। ভট্টাচার্যের সার্বভৌম নামটি আর রইল কোথায়? তিনি তো এখন প্রভুর দাস— দাসানুদাস। এই নামেই তাঁর এখন পরিচয়— একমাত্র পরিচয়। আর রূপ? রূপও সীমিতায়ু— কি অন্তরঙ্গে, কি বহিরঙ্গে। ভট্টাচার্য ছিলেন কট্টর মায়াবাদী তার্কিক।

পরমাশ্চর্য রূপান্তর। ভক্তির রসাস্বাদন করছেন নিশিদিশি।

অপরপক্ষে, ভগবানের চিহ্ন তিনটি ঃ অস্তি, ভাতি ও প্রীতি। অর্থাৎ তিনি প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন এবং প্রেমঘন। জীবের অস্তিত্ব সান্তায়ু, আর ভগবানের অস্তিত্ব অনন্তায়ু। সর্বপ্রতাপ নিয়ে তিনি ছিলেন, তিনি আছেন এবং তিনি থাকবেন। তাঁর কোন পরিবর্তন নেই। তাই না তিনি অচ্যুত।

পরাবিদ্যার্ণব প্রভুর কাছে পরাভূত হলেন সার্বভৌম। আর তাঁর প্রেমডোর এমনই অবিনশ্বর যে সেই প্রেমডোরে বাঁধা পড়ল লাখ লাখ লোক, যে লোকারণ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কাজীর সীমায়িত বেতনভুক লোক।

পরমাশ্চর্য প্রভুর লীলা ঃ লোকবল, অস্ত্রবল, অর্থবল দলন করলেন মুখে শুধু হরিবোল দিয়ে। আবার জ্ঞানগর্ব, যশ, প্রতিপত্তির কল্মষ থেকে উদ্ধার করলেন মুখে শুধু হরিবোল বলে ভক্তির সুরধুনীতে সুস্নাত করে।

অষ্টম অধ্যায়

ঃঃ বিজয় বৈজয়ন্তী দক্ষিণাপথে ঃঃ

'কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।' —গাইলেন নরোত্তম। কত আকুতিই না ভক্তোত্তমের কণ্ঠে। প্রভুর আর্তিরই বাণীরূপ মহাজন-পদে। গো, গোবর্ধন, গোপ, গোপী ও গোকুলের অধীশ্বর গোবিন্দ। সেই গোবিন্দের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন। এই শ্রীবৃন্দাবনেই তিনি পূর্ণতম। এই লীলাভূমি দর্শনের বাসনা কি গোরাচাঁদের আজকের? সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের দিন থেকেই না তাঁর মানসপটে অঙ্কিত হয়েছে একটি ছবি, একমাত্র ছবি— শ্রীবৃন্দাবন। মথুরা নয়, দ্বারকা নয়, নয় হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগ বা দক্ষিণ দেশের কোন তীর্থ। শুধু একটি ধাম— ব্রজধাম। ব্রজেন্দ্র নন্দনের ধাম। নবকিশোর নটবর —গোপবেশ বেণুকরের লীলাধাম। আহা! কত লীলাই না করেছেন সেই রসিক নাগর ব্রজজনের সঙ্গে। বিশেষ করে ব্রজবনি-তাদের সঙ্গে। প্রধানত ব্রজদেবীর সঙ্গে। তাই না তিনি লীলা-পুরুষোত্তম। আর তাই প্রভুর একমাত্র কাঙ্ক্ষিত ধাম এই ব্রজধাম।

হ্যাঁ, প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রথম মুহূর্ত থেকেই তাঁর এই বাসনা। মত্ত সিংহের মত এই পুরুষ সিংহ ছুটেছিলেন ব্রজপানে। দিক-বিদিকের জ্ঞান নেই। নেই মানচিত্রের বালাই। চিত্তপটে চিত্র একটিই : ঐ ব্রজধাম। নিত্যানন্দ নিয়ন্ত্রণ করলেন জীব নিয়ন্তাকে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এলেন শান্তিপুরে। কোথায় শান্তিপুর, আর কোথায় ব্রজপুর।

তারপর তো মাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থে এই শ্রীক্ষেত্রে। সার্বভৌমকে দিলেন এক নতুন জীবন। অমা থেকে প্রমায় উত্তরণ। কেমন সে জীবন? ভক্তির সুরধুনীতে স্নাত সে জীবন। কথায় বলে একাই একশ। না, সার্বভৌম একাই লক্ষ। তাই অগণন জন স্নাত হলেন তাঁর সঙ্গে। প্রভু বললেন তিনি ত্রিভুবন জয় করলেন। প্রভু বাক্য মাণিক্য। কিন্তু তাঁর মনের মাণিক্য কোথায়? —না, ঐ মধু বৃন্দাবনে। নাগরের সেই লীলাভূমির তো এখনও দর্শন লাভ হল না। সদাই যে তাঁর মন উথাল-পাথাল। শুধু ঐ বৃন্দাবন দর্শন বাসনায়।

বেণুকরের বেণু নিস্বন যে শুনছেন তিনি নিশিদিশি। যতই শুনছেন, ততই মন তাঁর আকুল হচ্ছে। তাঁর ভাব যে ঐ রাই কিশোরীর ভাব। কানের ভিতর দিয়া / মরমে পশিল গো / আকুল করিল মোর প্রাণ।' এই আকুলতাই প্রভুর। তবুও কেন দর্শন লাভে তাঁর দর্শন ইন্দ্রিয়ের সুখলাভ হচ্ছে না? শুধু বিলম্ব আর বিলম্ব। বিলম্বের যেন আর শেষ নেই। তবে হ্যাঁ, বিলম্বে তাঁর আরেক ইচ্ছার পূরণ হল।

প্রভু তাঁর গৃহাশ্রমকালে প্রেমবারি সিঞ্চন করেছেন নর্তন-কীর্তনে।

আর তাতে

'মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেইসব মহাদক্ষ, ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা— সবারে ছুঁইতে নারিল॥'

কিন্তু 'সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ।
যতেক পালাঞা ছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্মী, নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু পায় হয় অবনত॥'

হ্যাঁ, অবনত হলেন ঘোর মায়াবাদী সার্বভৌমও। কিন্তু প্রভু যদি কাটোয়া থেকেই ব্রজধামে গমন করতেন, তাহলে এই মায়াবাদী মানুষের উদ্ধার কে করতেন? বৃন্দাবনে তখন জন কোথায়? সবটাই বন। তিনি না এসেছেন নরবপুতে নরলীলা করতে— নরেরই উদ্ধারকল্পে। তাই বিলম্ব হলেও তাঁর এক ইচ্ছার পূরণ হল।

এক ইচ্ছার পূরণ হল। উত্তম। কিন্তু এ তো তাঁর বহিরঙ্গ লীলা। অন্তরঙ্গ লীলা করবেন যে প্রভু অন্তরতমের ধামে। সেই লীলাই না শ্রেষ্ঠতম। সে ধাম তো ব্রজধাম।

আবার শ্রেষ্ঠতম যে তাঁর নরলীলা। দক্ষিণ দেশ উদ্ধার এখনও বাকী। তাই 'দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল।'

সদা ব্যস্ত প্রভু। তাঁর যে অনেক কাজ। সময় সংকীর্ণ। তাই তাঁর বিরাম বিহীন কর্মযাত্রা। হ্যাঁ, অবিরামই বটে।

১৫১০ সাল। ২৫শে জানুয়ারী। গৃহত্যাগ করলেন নিমাই।

বৃথা দিন যাপন নেই শ্রীচৈতন্যের জীবন পঞ্জীতে। থাকবে কি করে? তাঁর যে আছে বিরাট কর্মভার। কলিহত জীবের উদ্ধার। ভারতবর্ষের কোন জনসমাজই বঞ্চিত হবেনা এই পতিত পাবনের কৃপা পরশ থেকে। তিনি যে পরশমণি। পরশ মাত্রই সোনা। যেমনটি হল বঙ্গে আর উৎকল দেশে। এখনও অনেক বাকী। বাকী রয়েছে দক্ষিণ দেশ, বাকী উত্তর ভাগ।

তাই ঠিক পরের দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ। ২৬শে জানুয়ারী। নিমাই হলেন শ্রীচৈতন্য। শান্তিপুরে অদ্বৈত আলয়ে অবস্থান মাত্র আটদিন। তাও অনুরোধ রক্ষার্থে।

আবার যাত্রা। নীলাদ্রি যাত্রা। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। ২৩শে ফেব্রুয়ারী দোলযাত্রা দর্শন করলেন নীলাচলে। মাত্র দুটি মাস, এরই মধ্যে ত্রিভুবন জয় অর্থাৎ সার্বভৌম বিমোচন।

আবার শুরু হল যাত্রা। দক্ষিণ দেশে যাত্রা। সাল ১৫১০। এপ্রিল মাস। কবিরাজ সংবাদ দিচ্ছেন কর্মসূচীর:

"মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাগুনে আসিয়া, কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাগুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্যগীত কৈল॥
চৈত্র রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥'

কিন্তু 'যাইতে হৈল মন' হলেও তো যাওয়া হয়না। প্রভুর গণ রয়েছেন যে সঙ্গে। একজন নয়— চারজন। নিত্যানন্দ,

জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ। প্রভুর মনে তাই দ্বিধা। দ্বিধা আবার দ্বিধা-বিভক্ত। একদিকে তাঁদের ছেড়ে যেতে মন চাইছেনা, অন্যদিকে কারুকে সঙ্গে নিতে মন নিমরাজি।

ছেড়ে যেতে মন চাইবেই বা কি করে? পার্ষদেরা কি তাঁর সঙ্গে আজ থেকে আছেন? সেই কবেকার কথা। তাঁরাও ছাড়তে চাইবেন না। তাঁদের মনও তো দেখতে হবে। তাঁরা যে কিছুতেই বিচ্ছেদ যাতনা সইতে পারবেন না। প্রভু প্রশাসনের খাতিরে কখনও কখনও তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারে কঠিন হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আসলে তো তাঁদের মন ননীর মত নরম। তাই প্রভু সবাইকে আহ্বান করলেন। আহ্বান করে আলিঙ্গন করলেন। তারপর একে একে সবাইর হাত ধরে বললেন, 'তোমরা আমার প্রাণাধিক প্রিয। আমি প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু তোমাদের ত্যাগ করা তো দূরের কথা, ক্ষণিকের জন্যও ত্যাগের কথা ভাবতে পারিনা। তবুও ত্যাগ করতে হচ্ছে জনসমাজের হিতকল্পে।' পার্ষদেরা শুধোলেন, 'শ্রীবৃন্দাবন শুভ বিজয় করতে চাইছ?'

প্রভু বললেন, 'শ্রীবৃন্দাবন হবে আমার পরবর্ত্তী কর্মসূচী। তার আগে দক্ষিণ দেশ উদ্ধার আমার অবশ্যকৃত্য।' সমস্বরে সবাই বললেন, 'বেশ তো, এতে ত্যাগের কি আছে? আমরাও সঙ্গে যাব। আমরা না তোমার সর্বক্ষণেরই সঙ্গী। তাছাড়া, আমরা থাকলে তোমার কৃত্য সম্পাদনে আনুকূল্যই হবে।' প্রভু বললেন, 'না, এবারের যাত্রায় আমি একাই যাব। একেবারে নিঃসঙ্গ।'

সবার আগে হাহাকার করে উঠলেন নিত্যানন্দ। 'না, না, তা কি করে হয়? তুমি একা যাবে— একথা যে আমরা ভাবতেই পারিনা। কলিহত জীবকে উদ্ধার করার শক্তি তোমার আছে। এ যুগে সেই কারণেই তোমার অবতরণ, কিন্তু আমরা সঙ্গী হলে তোমার কী অসুবিধা হবে?' একটু থেমে অবধূত আবার বললেন, 'বেশ তো, সবাই না গেল। অন্তত দু/একজন সঙ্গে যাক। বলতো আমিই যাই। দক্ষিণ দেশের সব তীর্থই আমার জানা। সঙ্গী হলে তোমার সহায়তা করতে পারব।' প্রভু দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখানেই তো গোল। এইখানেই আমার দুর্বলতা। তোমার কথাই বলি— যেমনি নাচাচ্ছ, তেমনি নাচছি। কাটোয়া থেকে যেতে চেয়েছিলাম ব্রজপুরে, আর তুমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এলে শান্তিপুরে। আবার নীলাদ্রি আসার পথে ভেঙ্গে ফেললে আমার দণ্ড। শুধু কি তুমি? এই যে জগদানন্দ, ইনিও কি কম যান। অশনে, বসনে, শয়নে সংযত যিনি, তিনিই না সন্ন্যাসী অথচ জগদানন্দ চান— আমি বিষয়ী লোকের মত ভাল খাই, ভাল পরি এবং আরামে থাকি। ভয়ে-ডরে তাই করতে হচ্ছে। উপায় কি? যদি না করি, ব্যস্, চলল অভিমানের পালা— বাক্যালাপ বন্ধ। তাও কি একদিন নাকি— একেবারে টানা তিন দিন।'

একটু থেমে প্রভু আবার বললেন, 'সন্ন্যাসীর ধর্ম রক্ষা করা আমার পক্ষে এক বিষম দায় হয়ে পড়েছে। শীতে তিনবার স্নান করি— তাতে মুকুন্দর হয় কষ্ট। ভূমি শয্যা করলেও তাঁর হয় আন্তর্বেদনা। আবার তার অন্তরের জ্বালায় আমিও হই বেদনাহত।'

সামান্য বিরতির পর প্রভু আবার বললেন, 'না, না, আমার কষ্টের কাহিনী এইখানেই শেষ না। এই যে দামোদর পণ্ডিত— ইনি ব্রহ্মচারী মাত্র, আর আমি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের শাসনে থাকেন ব্রহ্মচারী, আর আমার বেলায় বিপরীত। পণ্ডিতের শাসনেই দিন যাপন করতে হয় আমাকে। ইনি কৃষ্ণ কৃপাধন্য, তাই লোকভয় নেই। আব আমাকে সর্বদাই লোকাচার মেনে চলতে হয়। আমি যে অতখানি কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ করিনি এখনও।'

পরমাশ্চর্য বাকচাতুর্য প্রভুর। কি মধুর ব্যাজস্তুতি! কত বাৎসল্যই যে প্রভু গোপিত রাখেন ভক্তের জন্য তাঁর মনমণি কোঠায়! এই ভক্ত বাৎসল্যের সংবাদ জানাচ্ছেন কবিরাজ ঃ

"চৈতন্যের ভক্ত বাৎসল্য অকথ্য কথন।
আপনে বৈরাগ্য দুঃখ করেন সহন॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥"

প্রভু আবার বললেন, 'তাই বলছিলাম অন্তত দিনকতক আমি নিজের ইচ্ছায় সন্ন্যাসীর ধর্ম পালন করি।'

আসলে প্রভু ইচ্ছাময়। সেই ইচ্ছাময়ের কখন কি ইচ্ছা হয়, তা অন্যের চিন্তাতীত। কবিরাজ তাই বলছেন,

"গুণে দোষোদগার ছলে সভা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া॥"

চতুর শিরোমণির সঙ্গে খেলা চলছে ভক্তদের। বিনোদ খেলা। তাই প্রয়াসের শেষ আয়ুধটি প্রয়োগ করলেন নিত্যানন্দ,

বেশ, আমরা না হয় নাই গেলাম তোমার সঙ্গে। কিন্তু তোমার জলপাত্র আর বহির্বাস বহন করবে কে? তুমি ডান হাতের আঙ্গুলে নাম জপ করবে। আর বাঁ হাতের আঙ্গুলে থাকবে সংখ্যা। দু হাতই তো জোড়া থাকছে। তাই বলছিলাম এই কালা কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নাও। এই ব্রাহ্মণ সন্তানটি পরমভক্ত। তোমার কোন ইচ্ছারই সে প্রতিবন্ধক হবেনা। আমার এই শেষ মিনতি তুমি রাখ।' মিনতি রাখলেন প্রভু। গৌর নিতাই যে অভেদ কলেবর। সে হেন নিত্যানন্দ বাক্য তো প্রভু রক্ষা করবেনই। করলেনও।

সমস্যার নিরাকরণ হল। এখন যাত্রা শুরু হবে। হবে বললেই কি হয়? আরেক ভক্ত রয়েছেন না। তাঁর কাছে বিদায় না নিলে চলে? প্রভু যে ভক্তাধীন। আরেক ভক্ত হচ্ছেন সার্বভৌম যিনি নিরন্তর জপ করে চলেছেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'

তাই উক্ত চার পার্ষদ নিয়ে প্রভু এলেন সার্বভৌমের গৃহে। সার্বভৌম নমস্কার করে আসন পেতে দিলেন নিজ হাতে।

প্রভু মুখ খুললেন, 'দেখ ভট্টাচার্য, তোমার কাছে এলাম তোমার অনুমতির জন্য।'— বলেই একটু চিন্তা করলেন। কি সে চিন্তা? — না, দক্ষিণ দেশ গমনের আসল গোপ্যটি প্রকাশ করবেন না। তাই আবার বললেন, 'তুমি তো জানই আমার দাদা বিশ্বরূপ দাক্ষিণাত্যে গেছেন সেই কবে। আমি তাঁর অন্বেষণে যেতে চাই। জানি তুমি ব্যথাহত হবে, তবে স্বল্প

সময়ের ব্যাপার তো— তোমার শুভেচ্ছায় আমি নিরাপদেই ফিরে আসব।'

শুধু কি ব্যথাহত? একেবারে চরণে পতিত। প্রভু পদাম্বুজে পতিত ভট্টাচার্য বললেন, 'বহুভাগ্যে তোমার সঙ্গ লাভ করেছিলাম। আবার ভাগ্য বৈগুণ্যে বঞ্চিত হতে যাচ্ছি সে সুখ সঙ্গ থেকে। তুমি ইচ্ছাময়। তোমার ইচ্ছায় বাধা দিই, সে শক্তি আমার কোথায়? শুধু একটিই নিবেদন, আর কয়েকটাদিন তোমার সান্নিধ্য সুখ লাভ করি।'

ভক্তের কাছে প্রভু দুর্বল, বড়ই দুর্বল। তাই যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। অবশ্য মাত্র চারদিনের জন্য। সার্বভৌমের আনন্দ আর ধরেনা। হোক চারদিনের জন্য। তবুও তো নিজ হাতে প্রভুর সেবা করতে পারবেন। তাতে তাঁর জীবন ধন্য হবে। শুধু হাত কেন? ধন্য হবে তাঁর সমস্ত দেহ। না, শুধু দেহ না। ধন্য হবে তাঁর প্রাণ। শুধুমাত্র প্রাণ কেন? ধন্য হবে, পূণ্য হবে তাঁর সমস্ত জীবন।

আহার্যের মধ্যে কোন পদটি প্রভুর প্রিয়— এ সংবাদ পেয়ে গেছেন ভট্টাচার্য। রান্নায় ষাঠীর মার হাত একেবারে পাকা পোক্ত। ষাঠী সার্বভৌমের আত্মজা। তাই ভট্টাচার্য পত্নীকে সবাই ডাকে ষাঠীর মা। প্রতিদিন প্রভু ভিক্ষা করছেন সার্বভৌম গৃহে। বড়ই পরিতোষ সহকারে ভিক্ষা করান সার্বভৌম। প্রভুর মন-কাড়া পদগুলির ব্যবস্থা করেন। গৃহিনী নিজ হাতে রান্না করেন, আর ভট্টাচার্য নিজ হাতে পরিবেশন করেন। প্রভুর একটি পদ শেষ

হয়, আবার আরেকটি পাতে দেন। এত দিয়েও সার্বভৌমের সাধ মেটে না। না হয় চোখের, না মনের।

যাত্রার দিন এসে গেল। প্রভু ভট্টাচার্যকে নিয়ে মন্দিরে গেলেন। মালা প্রসাদ পেলেন। প্রভু সার্বভৌম ও অন্যান্যকে নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর যাত্রা শুরু হল। সমুদ্রের তীর ধরে আলালনাথ পথে চললেন। সঙ্গে সার্বভৌম তো আছেনই, আছেন অন্যান্য সবাই। স্মরণে আসতেই সার্বভৌম বললেন, 'গোপীনাথ, ঘরে প্রভুর জন্য চারটে কৌপীন বহির্বাস রেখে এসেছি। নিয়ে এস। আর ঐ সঙ্গে প্রসাদান্নও নিয়ে আসবে।'

এরপর প্রভুকে বললেন, 'দেখ, দক্ষিণ দেশে যাচ্ছ। সেখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে তুমি অবশ্য দেখা করবে। জ্ঞান ও ভক্তির যুক্ত বেণীর মিলন এমন মহদাশয় সারা দেশে তুমি আর পাবেনা। গোদাবরীর তীরে এঁর বাস। নাম রায় রামানন্দ। গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি। আরেকটি কথা— বিদ্যানগরের শাসনকর্তা বলে এঁকে বিষয়ী মনে করোনা। আমি বরং ভুল বুঝে 'বৈষ্ণব' বলে কত ঠাট্টাই করেছি। এখন মনস্তাপ হচ্ছে।'

ঠাট্টার কারণ আছে। বৈষ্ণবের ভগবান হচ্ছেন সাকার, সগুণ। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক সেব্য সেবকের। আর জ্ঞানীর হচ্ছে ব্রহ্ম। নিরাকার, নির্গুণ। জ্ঞানীর অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর কাছে সেবা পুজো। ব্যাপারটা নিতান্তই বালখিল্যের কাজ। এঁরা বলেন বৈষ্ণবের তো সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তু। প্রাকৃত বস্তুর আবার অপ্রাকৃত সত্তা কিসের? কাজেই তাঁর

আব কিসেব পুজো, কিসের সেবা ?

আবার, নিগু´ণ ব্রহ্মের অপ্রাকৃত সত্তা আছে। সেক্ষেত্রে তো জীবই শিব। সোঅহং। কাজেই কার পুজো কে করে? তাই এই ঠাট্টা। কিন্তু আজকের সার্বভৌম তো প্রভু স্পর্শে হয়েছেন লোহা থেকে সোনা। বৈষ্ণব পরিমণ্ডলের সোনা। তাই এই মনস্তাপ।

প্রভুর আর বিলম্ব সয়না। তিনি ঝটিতি বিদায় নিতে চাইছেন। বিদায় বেলায়ও তাঁর বিনয়-বিনম্রতায় বিস্ময় জাগে। প্রেমালিঙ্গন দিয়ে সার্বভৌমকে প্রভু বললেন,

"ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥"

আহা কি মধুর! প্রভুর কথার প্রতি বর্ণ থেকে যেন বিনয়ের মধু ঝরছে। যে সার্বভৌম নিত্য জপ করছেন প্রভুর, সেই সার্বভৌমের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছেন প্রভু। প্রসাদ প্রার্থী হচ্ছেন প্রত্যাবর্তনের। ভক্ত ভগবানের এমন মধুর লীলা ভূলোকে হল দুবার। দ্বাপরে করেছিলেন লীলাপুরুষোত্তম যশোদা নন্দন। আর কলিতে করলেন প্রেম পুরুষোত্তম শচী নন্দন। লীলায় এত সাদৃশ্য কেন? তিনিই যে ইনি, আর ইনিই যে তিনি। মধুঝরা বাক্য বলে প্রভু অগ্রসর হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়লেন সার্বভৌম। না, আর বিলম্ব না। ফিরেও তাকালেন না প্রভু। এগিয়ে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। বিনয়ে সদা বিনত যিনি, শিউলি পাপড়ির মত নরম যাঁর মন, সেই প্রভু হলেন কুলিশ কঠোর। কেন? এর উত্তর

দিচ্ছেন উত্তর চরিত ঃ

"বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরানাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥"

— অলৌকিক ব্যক্তিগণের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, এবং কুসুম অপেক্ষাও কোমল, এটা কে বুঝতে পারে? অর্থাৎ কেউ বুঝতে পারেনা। কেউ বলতে প্রাকৃত জন। সত্যিই তো প্রাকৃত বুদ্ধি বলে কি আর সেই মনের সন্ধান পাওয়া যায়, যা সদা সলীল মায়িক জগতের উর্ধ্বে। শ্লোকাংশ যথার্থ ঃ "কোহি বিজ্ঞানুমীশ্বরঃ॥"

এদিকে ভট্টাচার্য তো ভূ-শয্যায় শায়িত। এখন এঁকে দেখেন কে? স্বনিকেতনে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থাই বা কে করেন? মহাপ্রভু তো বৃহৎ জগতের সন্ধানে। মহাপ্রভু গেলেন— প্রভু তো আছেন। সেই প্রভু নিত্যানন্দই সার্বভৌমকে পরিচর্যা করলেন। তারপর স্বগৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রভুর তো সিংহ গতি। গতিতে নিত্যানন্দও কম যান না। ঝটিতি চলে এলেন প্রভুর কাছে। ইতিমধ্যে গোপীনাথও এসে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কৌপীন বহির্বাস, আর মহা-প্রসাদ।

চলতে চলতে প্রভু পৌছুলেন আলালনাথে। সঙ্গীরাও এলেন। ব্যস! আরম্ভ হল নৃত্য-গীত। পুণ্য স্থান এল—কি শুরু হল প্রভুর পুণ্য কর্মটি অর্থাৎ নৃত্য-গীত। প্রেমাবিষ্ট প্রভু নৃত্য করছেন। দৃষ্টিরসায়ন সে নৃত্য। নৃত্য চরণে, আর হরিনাম

বদনে। বড়ই মধুর সে দৃশ্য। আর কি ভক্তেরা ঘরে থাকতে পারে? এ যেন বংশীবটে বংশীধারীর বংশীধ্বনি, যা শুনে ব্রজ বনিতারা বলেছিলেন:

"আর তো ঘরে রইতে নারি, কেমন করে প্রাণ।
কোন বিজনে ডাকছে আমায় শ্যামের বাঁশির গান॥"

নৃত্য গীত জমে উঠল। কি সুন্দর হরিবাসর। চারদিকে ভক্তেরা, আর মধ্যে গৌরহরি। কলেবর সোনার বরণ। তার ওপর অরুণ বসন। প্রেমাবেশে হেম দেহে দেখা দিয়েছে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব।

অগণন গণের আগমন। প্রভু যেন প্রেমের ফাঁদ পেতেছেন। সবাই আটকে গেলেন সেই ফাঁদে। না, তাঁদের কেউ আর ঘরে যান না। বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রীলোক কেউ আর ঘরে যান না।

নিত্যানন্দের আনন্দ আর ধরেনা। পুলকভরা মনে ভক্তদের বললেন, 'দেখবে এরপর প্রভু যে স্থানেই যাবেন, সেই স্থানেই তিনি প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য-গীত করবেন। তাঁর দেহে অষ্ট বিকার দেখা দেবে। আর শত শত লোক ছুটে এসে নৃত্যগীত করবে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে। কেউ বাদ যাবে না। বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রীলোক সবাই কীর্তনানন্দে মেতে উঠবে।

হরিনামে তো সবাই মাতোয়ারা। এদিকে মধ্যাহ্ন আহারের সময় যে পার হয়ে যায়। যাক্। তবুও কেউ ঘরে ফেরে না। এঁরা কি পাগল নাকি? —হ্যাঁ, পাগল বৈকি। কৃষ্ণ প্রেমে পাগল। ভক্তমন যেন বলছে;

"আমি যাবনা যাবনা যাবনা ঘরে।
বাহির করেছে পাগল মোরে॥"

মন না হয় পাগল হয়েছে। প্রাণ তা শুনবে কেন? দেহধারী জীব, অন্নগত প্রাণ। প্রভুর সামান্য কষ্টও নিত্যানন্দ সইতে পারেন না। গৌরহরির মধ্যাহ্ন সেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উপায় উদ্ভাবন করলেন অবধূত। ভক্তদের জানালেন প্রভু এখন মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি করতে যাবেন। গণ সহ প্রভু স্নানে গেলেন। কিন্তু লোক সব ধেয়ে চলল। শেষে স্নান সমাপনান্তে নিত্যানন্দ, প্রভু ও তাঁর গণ আলালনাথের মন্দিরে এলেন। মন্দির দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হল।

এই অবসরে গোপীনাথ প্রভু ও নিতাইচাঁদের প্রসাদ ভোজনের ব্যবস্থা করলেন এবং নিজেরাও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করলেন।

না, প্রভু আর থাকতে পারলেন না। মন্দিরের বাইরে শুধু হরিবোল আর হরিবোল। উভরায় হরিবোল। হরিবোলের কলরোল। হাজারো কণ্ঠের হরিবোল। প্রভু দ্বার খুলে দিলেন।

প্রভুর দর্শন হল, আর ঐ লোক সংঘট্ট আনন্দ সাগরে ভাসল। ভেসে গেল গ্রামকে গ্রাম ভক্তির বন্যায়। কবিরাজ দৃশ্যটি এঁকেছেন এইভাবে ঃ

"এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হৈল লোক — সভে নাচে গায়॥
এইরূপে সেই ঠাঁই ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥"

রাত্রি প্রভাত হল। প্রভু স্নানাহ্নিকাদি সেরে নিলেন। প্রভু স্নান করেন তিনবার। প্রাতঃকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য ও সান্ধ্যকৃত্য— কৃত্য তিনবার, স্নানও তিনবার।

না, আব বিলম্ব না। রাত্রিতে পথ চলা দুষ্কর। তাই রাত্রি-বাস আলালনাথে। কৃষ্ণ কথায় যামিনী যাপন। রাত পোহাল। ফর্সা হল। পথ সুগম হল রবির লোহিত বরণে। আর তো দেরী করা চলে না। লোক সংঘট্ট? — না, প্রভুর কর্মসূচী কারুর জন্যই বিঘ্নিত হতে পারে না। তাঁর প্রাত্যহিক কর্মজীবনে বৃথা কাল যাপন ভাবনাতীত।

তাই ঝটিতি ভক্তদের বিদায় আলিঙ্গন দিলেন, যেমনটি দিয়েছিলেন ভট্টাচার্যকে। ফলে কি হল? সে সংবাদ দিচ্ছেন কবিরাজ ঃ

"মূর্চ্ছিত হইয়া সভে ভূমেতে পড়িলা।
তাহা সভাপানে প্রভু ফিরি না চাহিলা॥"

- যেমনটি ফিরে তাকান নি ভূ-লুণ্ঠিত ভট্টাচার্যের দিকে বিদায় বেলায়। তাকালে যে কর্তব্য বিঘ্নিত হয়। কোন একটি মুহূর্তেরও অপব্যয় নেই প্রভুর নিত্যকার জীবনে।

বেশ তো, কর্তব্যের খাতিরে ফিরে না হয় নাই তাকালেন, তাই বলে কি তিনি ভক্তদের ব্যথার ব্যথী নন। নিশ্চয়ই। ব্যথার উৎস মূল তো হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। অন্তরের বস্তু অন্তরায় হয়নি বাইরের কৃত্য সম্পাদনে।

আবাব যাত্রা শুরু হল। এখন আর লোক সংঘট্ট নেই।

শুধু দুজন। প্রভু আগে। পেছনে কৃষ্ণদাস— গাত্রবস্ত্র ও জলপাত্র হাতে।

মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক। মন বিকল তো, দেহও অচল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞান আর থাকে না। প্রভু বিরহে ভক্তদের দশাও তাই হল। বিরহ ব্যথায় প্রভুর কথা ভাবতে ভাবতে আহারের কথা ভুলে গেলেন। আহারে বড়ই অনীহা। অনাহারে দিন গেল। রাত্রিও গেল। অনাহারে দেহ কষ্ট হল না? হল বৈকি। তবে বোধ হল না। তাঁদের মনোকষ্টই যে অধিক। দেহ কষ্টের আর বোধ থাকবে কি? পরের দিন প্রভাত বেলায় ফিরে এলেন তাঁরা নীলাচলে।

ওদিকে প্রভু তো ধেয়ে চলেছেন। আগে তিনি, পেছনে কৃষ্ণদাস। হাতে তাঁর অরুণ বসন আর করোয়া। আর কোন সম্বল? হ্যাঁ, আছে— আছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল। আন কথা নেই— কণ্ঠে কেবল কান কথা। প্রভু পথ চলছেন আর অবিরাম গেয়ে চলেছেন:

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম॥"

প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী বড়ই মধুর। মধুর কিন্তু প্রভু রাম

রাঘব বলে চলেছেন যে! ইষ্ট দেবতা যাঁর কৃষ্ণ, তিনি দশরথসুতকে স্মরণ করবেন কেন? বিশেষ করে প্রভু এখন ভক্তের আকুতিতে আপ্লুত— রাধাভাবে আবিষ্ট। তাহলে ভানুসুতা কেন স্মরণ করবেন দশরথসুতকে? সীতা স্মরণ করবেন রামকে। তাছাড়া তত্ত্বও তো প্রতীপ। রাম সীতা স্বকীয়া তত্ত্ব, আর রাধাকৃষ্ণ পরকীয়া তত্ত্ব। জানকী হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী, আর ভানুবালা হচ্ছেন নন্দলালার প্রেয়সী, আয়ানের ঘরণী। রসের আস্বাদনেও ভিন্ন। পরকীয়া রসে প্রেমের নিত্য নবীনতা, আর তীব্রতা। স্বকীয়া রস ঋদ্ধা জানকী কি কোনদিন বলতে পেরেছেন ব্রজ দেবীর মত—

"সখিরে, কি কহব অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥"

তবুও যে প্রভু রাম উচ্চারণ করলেন। প্রভু বাক্য অবিতথ। এখানে রাম মানে রমণ করেন যিনি। রমণ করেন গোপীদের সঙ্গে, গোপী ঠাকুরাণী রাধারাণীর সঙ্গে, তাই শ্রীকৃষ্ণ রাধারমণ, গোপিকা রমণ। কতই না, রমণ করেছেন তিনি ভানুবালার সঙ্গে। করেছেন নিভৃত-নিকুঞ্জে— রাসস্থলীতে। রামচন্দ্র — এ নামটি পিতৃদত্ত। দয়িতা পিতৃদত্ত নামে ডাকবেন কেন তাঁর দয়িতকে? ডাকবেন লীলায় যে অভিধা পেয়েছেন পুরুষোত্তম— সেই নামে। তাই রাম। কিন্তু কৃষ্ণ তো দয়িতার দেওয়া সলীল নাগরের নাম নয়। এ নাম তো "কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।" এখানেও আকর্ষণ করেন— ব্রজ বনিতাদের আকর্ষণ করেন বলেই কৃষ্ণ।

কিন্তু রাঘব? রঘুবংশে জন্ম বলে শ্রীরামচন্দ্র রাঘব অভিধা পেয়েছেন। এটা যেমন ঠিক, তেমনি ঠিক রঘ্‌ থেকে রাঘব। এখানে রঘ্‌ মানে দীপ্তি অর্থাৎ রাঘব মানে দীপ্তিমান। দীপ্তিমান কেন? কিসের দ্যুতি-- দীপ্তি? কেন, মাধুর্যের। ঐ যে কবিরাজ বলছেন না ঃ

'......... কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।'

বিরহ বিধুরা বিধুবদনী রাইধনি স্মরণ করবেন বাঁশিমোহনকে। তিনি কেন কেশব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণকে স্মরণ করতে যাবেন?

প্রভু এখানে কেশব শব্দটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এখানে কেশব মানে ঐ নব কিশোর নটবর— গোপবেশ বেণুকর, যিনি রসিক নাগর, যিনি রহঃকেলি করেন ভানুদুলালীর সঙ্গে রহঃকেলি কালে বসন শ্লথ হয়। আর বিস্রস্ত হয় কেশকলাপ। কত সোহাগে, কত আদরে, কত পরিপাটি করে সেই কুন্তলদাম বেঁধে দেন সেই রসিক নটবর। আর তাই তিনি হয়েছেন কেশব।

আবার ঐ যে প্রভু বলছেন 'রক্ষ মাম' 'পাহি মাম'— রক্ষা কর, পালন কর। প্রভু না রাধাভাবে আবিষ্ট। 'রক্ষা কর', 'পালন কর' বলে কি কোন আকুতি থাকতে পারে রাইকিশোরীর? ও প্রার্থনা তো মথুরাবাসীর, যারা শুধু বলে 'দেহি', 'দেহি'। গোপীরা, বিশেষ করে মহাভাব ঠাকুরাণী তো 'দেহি', 'দেহি', বলেন না। দেহটাই তো দিয়ে দিয়েছেন তাঁরা ঐ গোবিন্দ চরণে। শুধু কি দেহ? দেহ, গেহ, লজ্জা, মান, কুল, দারক, দারিকা—

সবই না সমর্পিত সচ্চিদানন্দ চরণে। এমন কি কামও? কাম? হ্যাঁ, কাম। Suppression নয়, Sublimation নিবেদিত হয়ে সেই কাম হয়েছে নিকষিত হেম। এটা কোন অতথ্য তত্ত্ব নয়, বাস্তব সত্য যেমন, চণ্ডীদাস গেয়েছেন;

'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কাম গন্ধ নাহি তায়।'

তবে কি শ্বাপদ সঙ্কুল পথে প্রভু পথ চলছেন বলে এই প্রার্থনা? না, তা হবে কি করে? তিনি যে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে পথ চলছেন। রাধার বিরহভাবে ভাবিত প্রভু। তাই স্মরণে আসছে হৃদয় রসায়ন বিনোদ কেলির কথা: 'হে বঁধু, কত খেলাই না খেলেছ আমার সঙ্গে। খেলেছ নিধুবনে, রাসস্থলীতে, বংশীবটে। রহঃকেলির সময় তোমার অবয়ব কতই না দীপ্তিমান হত। সেই তুমি 'অচিরেই আসব' বলে চিরতরেই চলে গেছ। সেই সব পুলক ঝলমল দিনের কথা মনে হলেই বিরহ ব্যথায় ক্লিষ্ট হই। তাই মিনতি, তোমার সেই দ্যুতিময় মূরতি ধরে দেখা দাও, প্রভু। দেখা দিয়ে বিরহ তাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর। রক্ষা করে আমার এই তাপিত দেহটি পালন কর। কেনই বা করবেনা— এ দেহ না তোমারই।'

যাত্রার প্রাক্কালে নিত্যানন্দ বলেছিলেন, প্রভু যেখানে, কৃষ্ণ প্রেম বন্যাও সেখানে। অবধূত বাক্য মাণিক্য। হলও তাই। চলতে চলতে প্রভু যাকে পাচ্ছেন তাকেই বলছেন 'কৃষ্ণ বল।' বলবেনই তো। তিনি যে প্রেম দিতে এসেছেন নরে নরে, ঘরে ঘরে.

যারে তারে। প্রভু-স্পর্শ স্পর্শ মণির মত কাজ করছে। স্পর্শ মাত্রই তার মনের মলিনতা ঘুচে যাচ্ছে। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। নামে সে মাতোয়ারা হয়ে যাচ্ছে। প্রভুর পেছনে ছুটছে। প্রভু তো অন্য সঙ্গী নেবেন না। তাই আলিঙ্গনে বিদায় দিচ্ছেন। আলিঙ্গনের পরমাশ্চর্য ইন্দ্রজাল। তার অন্তরটি হয়ে যাচ্ছে প্রেমের সাগর। উত্তাল তরঙ্গ সেই সাগরে। সেই তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে সমগ্র জনপদ। এমনি করে গ্রামের পর গ্রাম হল কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা। এই হাজারো জন 'ক' বলতে শুধু কৃষ্ণই বুঝল। বদনে লেগে রইল দুই বর্ণের এই নামটি। লেগে রইল অষ্টক্ষণ। অবিরাম। এই মন-কাড়া দৃশ্যটি কবিরাজ তাঁর সোনার কলমে পয়ারে এঁকেছেন এইভাবে ঃ

"সেই যাই নিজ গ্রাম বৈষ্ণব করা।
অন্য গ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥"

নাম সাগরের ধারা বয়ে চলল সারা দক্ষিণ দেশে। ধন্য পুণ্য হল জন সমুদ্র নাম সমুদ্রের বারি পান করে। কিন্তু সাগরের জল যে নোনা। না, না, নোনা হবে কেন? ক্ষীর সাগরও তো আছে। নাম সেই ক্ষীর সাগর। আস্বাদনে আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। মন কাড়ে। তৃষ্ণা বাড়ে। বাড়ে আর বাড়ে। তৃপ্ত হয়না।

নদীয়া লীলা এক রকম। আর দাক্ষিণাত্য লীলা আরেক রকম। সংবাদ দিচ্ছেন কবিরাজ ঃ

"নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে॥"

বিচারে, বীক্ষণশীলতায় প্রভুর দ্বিতীয় নেই। ঘট বুঝে ফুল দেন প্রভু। উদ্দেশ্য অবশ্য এক। নাম বিতরণ। কিন্তু পদ্ধতি এক না। ভিন্ন। একেক জায়গায় একেক পদ্ধতি।

পথ চলছেন প্রভু। বদনে নাম অবিরাম। আর

"এই মত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈলা স্তবন প্রণামে॥"

কূর্ম্ম ক্ষেত্রে কূর্ম্মাবতারের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করলেন প্রভু। ভারি আহ্লাদ হল। প্রণাম জানালেন। স্তব-স্তুতি করলেন। করবেন বৈকি। ইনি যে বিষ্ণুর দশাবতারের দ্বিতীয় অবতার। পরম ভাগবত জয়দেবও স্তুতি করেছেন। যেমন,

"ক্ষিতি রতি বিপুল তরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণী ধারণ কিণ চক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কূর্ম্ম শরীর জয় জগদীশ হরে॥"

ভক্ত কবি ভক্তি যেমন নিবেদন করেছেন, তেমনি পরিবেশন করেছেন পরম আস্বাদ্য এক বস্তু। এর নাম অদ্ভুত রস। তাই না ইনি নব রসিকের এক রসিক। বিষ্ণু এই অবতারে সমুদ্র মন্থনে মন্দর ও কল্পারম্ভে পৃথিবী পৃষ্ঠে ধারণ করেন।

প্রথম অবতারে মৎস। উপায় কি? জল আর জল। চারদিকে অথৈ জল। স্থল নেই। তাই এলেন তিনি মৎসরূপেই। ধীরে ধীরে ডাঙ্গা জেগে উঠল। তাই তিনি এলেন উভচররূপে—

কূর্মরূপে।

না, প্রভু শুধু-স্তব স্তুতিই করলেন না। প্রভুর অন্তর প্রেমানন্দে ভরপুর। ভিতরের কৃষ্ণ প্রেম বাইরে প্রকাশ পায় নর্তন-কীর্তনে। তখন প্রভু বাহ্য হারান। তাই প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভু নর্তন-কীর্তন আরম্ভ করলেন। সেই নর্তন কীর্তনের এক ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ। সকলকেই আকর্ষণ করে। প্রভুর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব পড়ে তো— তাই এই আকর্ষণ। এই শক্তিটির প্রকাশ এই প্রথম এই দক্ষিণ দেশেই প্রথম প্রকাশ। তাই প্রভুকে নর্তন-কীর্তনে দেখেই প্রেমাবিষ্ট হল অগণন জন। সবাই হল বৈষ্ণব। কিভাবে হল? সংবাদ দিচ্ছেন কবিরাজ :

"কৃষ্ণ নাম লোক মুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সবগ্রাম॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণ নামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল॥"

নর্তন কীর্তনে এতক্ষণ প্রভু প্রভুর মধ্যে ছিলেন না? এখন বাহ্যে ফিরে এলেন। তখন বিগ্রহ মন্দিরের সেবক সপ্রেম সম্মান করলেন। এই কূর্মক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটি প্রভুর সর্বাধিক কৃপাধন্য হলেন, তিনি এই কূর্ম। প্রভু কৃপায় এই বৈদিক ব্রাহ্মণটি এমন প্রেমাবিষ্ট হলেন যে গদগদ কণ্ঠে প্রভুকে নিবেদন করলেন :

"যেই পাদপদ্মে তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।

আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুলধন ॥
কৃপা কর মোরে প্রভু! যাঙ তোমার সঙ্গে।
সহিতে নাপারি দুঃখ বিষয় তরঙ্গে ॥”

হ্যাঁ, কৃষ্ণ প্রেমের এমনই শক্তি। মহামায়া সরে যান, বিষয় আশয়ের আসক্তিও ঘুচে যায়। আসেন যোগমায়া। যোগ করে দেন মন কৃষ্ণের সঙ্গে। তাই কূর্মেরও এল বিষয়ে বিরক্তি। আসবেই তো। তিনি যে এখন যোগমায়ার কৃপায় কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। তাই ঘর সংসার ছেড়ে তৎক্ষণাৎ সঙ্গ নিতে চাইলেন প্রভুর। কিন্তু প্রভুর তো এক কথা। সঙ্গী আর নেবেন না। দক্ষিণ দেশে একক ভূমিকায় নাম বিতরণ। অথচ এর আগে নদীয়া লীলায়— নাম বিতরণ করেছেন সপার্ষদ। উদ্দেশ্য অভিন্ন। লীলাপ্রকৃতি ভিন্ন। কারণ কি? কে জানে, আর কেই বা বলবে? প্রভুর লীলা যে অলৌকিক, লৌকিক জ্ঞানের অতীত।

প্রভু নিশি যাপন করলেন কূর্মের ঘরেই। পরেরদিন প্রাতঃকৃত্য সেরেই ঝটিতি আবার যাত্রা শুরু করলেন। কূর্ম আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। ধাবিত হলেন প্রভুর পশ্চাতে। ঘর সংসারে আর মন নেই। বিবাগী হয়েছে। কিন্তু সংসার ত্যাগ তো প্রভুর বাঞ্ছিত নয়। হ্যাঁ, একটা বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এটা তো এখন তাঁর অভিপ্রেত নয়, তাই কূর্মকে বললেন, ‘সংসার ত্যাগের বাসনা ত্যাগ কর। ঘরে ফিরে গিয়ে ঘরে বসে কৃষ্ণনাম কর অনাসক্ত মনে। তাহলেই তুমি তোমার ইষ্ট বস্তু লাভ করবে’

এক ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ। নাম বাসুদেব। তার বড় সাধ প্রভুর দর্শন লাভ করার। মনটি একেবারে 'তরোরিব সহিষ্ণুনা'। কি রকম? গলিত কুষ্ঠ থেকে পোকা ঝরছে। সেই পোকা তুলে নিয়ে ক্ষতস্থানে বসিয়ে দিচ্ছে। ভাবটা এই, 'হঠাৎ পরে গেছিস। বেশ তো, আমি তুলে দিচ্ছি। খা, পেট ভরে খা।' এই যে তার মহাব্যাধি, এর জন্য সে 'নাহি র্ভৎসে অদৃষ্টরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি।' ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। এখন শুধু একটাই বাসনা— প্রভুর দর্শন লাভ। শুক্র শোণিতে গঠিত— শিবা-শকুনি ভক্ষ্য এই দেহের পতন হয় হোক, তবুও একবার, শুধু একটিবার, মাত্র এক লহমার জন্য যেন প্রভুর দর্শন লাভ হয়— এমনই তীব্র আকুতি বাসুদেবের।

গলিত অঙ্গ। তাই মৃদু গতি। তবুও অদম্য ব্যাকুলতায় যথাসাধ্য দ্রুততায় এল কূর্মের গৃহে।

না, নেই। প্রভু নেই। ভাগ্য বৈগুণ্যে বাসুদেব প্রভুর দর্শন লাভ করতে পারলনা। কূর্ম্ম জানাল প্রভু চলে গেছেন। হাহাকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কুষ্ঠ ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ। নিয়তির একি নিষ্ঠুর নিগ্রহ। পরক্ষণেই চমকে উঠল বাসুদেব। না, নিগ্রহ কোথায়? এ তো অনুগ্রহ। এই তো তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন বরাভয়ের ভঙ্গিতে। আহা! কি সুন্দর। বদন মণ্ডল যেন পূর্ণায়ত পদ্ম। আর নয়ন কমল করুণা স্নিগ্ধ। ভাবছে বাসুদেব, 'কোথা থেকে এলেন? কোন পথে গেলেন, আবার ঝটিতি কোন পথেই বা ফিরে এলেন? এ প্রশ্নের সুন্দর উত্তর

দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণঃ 'কখনও ভগবান চুম্বুক, ভক্ত ছুঁচ......। আবার কখনও ভক্ত চুম্বুক পাথর হন, ভগবান ছুঁচ হন। ভক্তের এত আকর্ষণ যে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভগবান তার কাছে গিয়ে পড়েন।' আনন্দে বাসুদেবের সর্বাঙ্গ নেচে উঠল। প্রভু বাসুদেবকে দিলেন গাঢ় আলিঙ্গন। স্পর্শ মাত্রই বাসুদেবের অঙ্গ সোনা হয়ে গেল। কোথায় কুষ্ঠ? সর্বাঙ্গ সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক। প্রভু পদাম্বুজে পতিত হল বাসুদেব। বলল, 'প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, পতিত পাবন। একাজ প্রাকৃত জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এতকাল ছিলাম আমি সমাজের নিকৃষ্টতম জীব। এমনকি পাষণ্ডও আমাকে দেখে দূরে চলে যেত দুর্গন্ধে আর ঘৃণায়। আর আজ সেই ঘৃণ্য জীবকে তুমি বুকে তুলে নিলে। সমাজে সবার মধ্যে, সবার সঙ্গে ঠাঁই করে দিলে। তোমার এক আলিঙ্গনে সমগ্র জন সমাজের আলিঙ্গনেব ব্যবস্থা হয়ে গেল। তুমি একাই একশ— না. ভুল বললাম। একাই লাখ. না, কোটী, না, অর্বুদ,— তুমিই ত্রিভুবন নাথ।'

ভাবোল্লাস কিছুটা স্তিমিত হলে বাসুদেব আবার বলল, 'কিন্তু প্রভু, ব্যাধিগ্রস্ত দেহেই ভাল ছিলাম। অন্তত অহংকারটা ছিল না। এখন যে আমার মধ্যে দেহাভিমান দেখা দেবে আর তা হবে আমার ভজন পথে এক মস্ত বড় কাঁটা।'

স্মিত হেসে প্রভু আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'না, সে শঙ্কা তোমার নেই। অবিরাম তুমি কৃষ্ণনাম গেয়ে যাও। আর কৃষ্ণ-কথা সবাইকে শোনাও। দেখবে তোমার মধ্যে দেহাভিমান দেখা

দেবেনা। আর অচিরেই তুমি তাঁর চরণারবিন্দে ঠাঁই পাবে।'
দক্ষিণ দেশে প্রথম পদক্ষেপে প্রথম পর্ব সমাপ্ত। আর কি প্রভু থাকেন কূর্ম্মের গৃহে ? ঝটিতি বিদায় নিলেন।

প্রয়াসে লৌকিক কার্য সম্পন্ন হয়। আর ভগবৎ প্রসাদে সাধিত হয় অলৌকিক কার্য। আর এই ভগবৎপ্রসাদ কে লাভ করে ? গীতা সংবাদ দিচ্ছেন :

"মৎ কর্ম্মকৃন্মৎ মৎপরমোভক্ত সঙ্গ বর্জিতঃ।
নির্বৈর সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ॥"

বাসুদেব পরম ভক্ত। ভক্তির টানেই সে তার বিকল দেহটি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল কূর্ম্মের ঘরে। কেন সে এতখানি ক্লেশ স্বীকার করেছিল ? তার রোগমুক্তির জন্য ? — না, সে সব কিছুই না। সে চেয়েছিল শুধুমাত্র প্রভুকে দর্শন করতে। বাসুদেব প্রকৃতই 'সঙ্গ বর্জ্জিতঃ।' তার মনে নেই কামনা-বাসনার আদাড়-পাঁদাড়। দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপের কোন বালাই নেই। দেহের প্রতি কোন আকর্ষণই নেই— রোগ মুক্তি তো দূরের কথা। তা যদি থাকত, তাহলে কি ক্ষত থেকে পড়ে যাওয়া পোকা সে আবার ক্ষতস্থানে তুলে দিত ? তার এই ব্যাধির জন্য। ভাগ্য বৈগুণ্যের জন্য সে কারুকে দোষারোপ করেনি। এ হেন ব্যক্তিই তো ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করবে। ভগবৎ প্রসাদ চাইতে হয় না। আপনি ঝরে পড়ে। ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, তেমনি ভগবানও ভক্তের জন্য আকুল হন। উভয়েরই তপস্যা। ভক্তের তপস্যা হল সাধনা, আর ভগবানের তপস্যাকে বলে করুণা।

সাধনায় ভক্ত অগ্রসর হয়, আর করুণায় ভগবান অবতরণ করেন। এইভাবে ভক্ত ভগবানের ব্যবধান ঘুচে যায়— উভয়ের হয় মিলন— মহামিলন। উভয়েই উভয়ের প্রীতিতে প্রীত। যথার্থ বলেছেন শেক্সপীয়ার ঃ

"The quality of mercy is not strained,
It droppeth as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath. It is twice bless'd,
It blesseth him, that gives and him that takes.'

নবম অধ্যায়

রামানন্দ সনে প্রেমানন্দ ঃ সূচনা।

উত্তম, অতি উত্তম এক উপমা দিয়েছেন কবিরাজ গোস্বামী। যেমন ঃ "সঞ্চার্য রামাভিধ ভক্ত মেঘে স্বভক্তি সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈস্তজ্‌জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥"
— শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সমুদ্র ভক্ত রামানন্দ স্বরূপ মেঘে স্ববিষয়ক ভক্তি সিদ্ধান্তরূপ অমৃত সঞ্চার করে তাঁর দ্বারা অর্থাৎ সেই রামানন্দরূপ মেঘ দ্বারা বর্ষিত সেই সিদ্ধান্তরূপ অমৃত ধারা সিদ্ধান্তের অনুভব রূপ রত্ন সমূহের আলয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

একটা কথা আছে বৃষ্টির জল না পড়লে সাগরের শুক্তিতে রত্ন জন্মে না, অথচ জলধির জল না জলদেরই রূপ ধরে। আবার পড়ে ঐ জলধিতেই। মাঝখানে একটা ছোট্ট প্রক্রিয়া। রবিতাপে বাষ্পায়ন। জল পড়লেই রত্নের জন্ম। তাই জলধির নাম রত্নাকর।

কবিরাজ ভক্তরাজও। তাই তাঁর উপমাঋদ্ধ এই স্তুতি। কিসের উপমা? রায়ের সঙ্গে গোরারায়ের আলাপনের তুলনা। উপমেয় ও উপমান কিন্তু একাধিক। ভারি মধুর এই উপমা। অনুপম এই উপমা। কি রকম? যেমন, মহাপ্রভুকে মহোদধির সঙ্গে, রায়ের সঙ্গে মেঘের, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসাশ্রিত

সিদ্ধান্তকে জল বা অমৃতের সঙ্গে। না, এখানেই শেষ নয়। গৌর কথা যে অফুরাণ। তাই চরিতামৃতকার ঐ সব রসের সিদ্ধান্ত রায় মুখে জ্ঞাত হয়ে তাঁদের উপলব্ধিকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সাগর যেমন নিজের জলকে মেঘে রূপায়ণ করে আবার নিজেই গ্রহণ করে. তেমনি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক (অর্থাৎ স্ববিষয়ক) ভক্তিরস সিদ্ধান্ত রামানন্দে সঞ্চার করে তাঁর মুখ দিয়েই সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করান এবং সাগরের মত নিজেও গ্রহণ করে উপলব্ধি লাভ করেন।

বিভিন্ন রসের সিদ্ধান্ত অর্থে এক কথায় সাধ্য-সাধন তত্ত্ব প্রকাশ করান রায় মুখে গোরারায়। কিন্তু এত শতর কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? প্রভু না স্বয়ং জ্ঞান বারিধি, আর রায় তাতে তরঙ্গ মাত্র। তরঙ্গই সমুদ্রে থাকে। সমুদ্র তরঙ্গে থাকে না। সুতরাং তিনি তো এই সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নিজেই প্রকাশ করতে পারতেন।

পারতেন, তবে তাতে লীলা হত না, অথচ লীলার জন্যই না তিনি এসেছেন ধরাধামে এবং আসেন যুগে যুগে। যেমন ভাগবত সংবাদ দিচ্ছেন :

'নানা ভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্নৈর্দেবান লোকসেতূন বিভর্ষি।'

— হে ভগবান! আপনি লীলা হেতুই যথাযোগ্য বিবিধ-অবতার রূপ ধারণ করে দেবগণকে, সাধুগণকে এবং লোকের ধর্ম মর্যাদা সমূহকে পালন করে থাকেন।

লীলা বা খেলা কখন একা একা হয় না। লীলার নর্ম সহচর প্রয়োজন। আর লীলা না হলে শুধুমাত্র বস্তু লাভ হয়। বস্তু

রসের আস্বাদন হয়না। যথার্থ বলেছেন চরিতামৃতকার ঃ

"রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

হ্যাঁ, এই লীলারস আস্বাদনের জন্যই এই লীলা সঙ্গী প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গীর অন্তরে লীলাময়ই শক্তি সঞ্চার করে যোগ্য করে নেন। তবেই না তিনি হন লীলা পরিকর। এ কথা রায় নিজ মুখে স্বীকার করেছেন ঃ

"এত তত্ত্ব মোর মুখে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশ হৃদয়ে॥"

আর এই পরিকরের আশা-আকুতি কি রকম? কবি সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
তাইতো আমি এসেছি এ ভবে॥'

কিন্তু গৌরসুন্দরকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করলেন কেন কবিরাজ? এ লীলায় কলিহত জীব উদ্ধারের জন্য তিনি প্রেম পুরুষোত্তমের ভূমিকা নিয়েছেন। প্রেম তো অমৃত। আর তিনি বিতরণও করছেন প্রেমামৃত। অথচ তুলনা দেওয়া হয়েছে সাগরের সঙ্গে। সাগরের জল না নোনা। হ্যাঁ, সাগরের জল নোনা। আবার ক্ষীর সাগরও তো আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ গেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। গিয়েই রসিক ঠাকুর বললেন, 'খাল বিল নদী পেরিয়ে সাগরে পড়লুম।'

বিদ্যাসাগরের সাফ জবাব, 'বেশ তাহলে খানিকটা নোনা জল নিয়ে যান।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'নোনা জল কেন নেব গো, ক্ষীর সাগরও তো আছে।'

আবার সমুদ্রে রয়েছে উত্তাল তরঙ্গ। দেখলেই ভীতি জন্মে। কিন্তু প্রভু তো জনসমাজের হৃদয় কেড়ে নিয়েছেন প্রীতিতে। ভীতিতে নয়। তাহলে এ তুলনা কেন? সমুদ্রে তরঙ্গ আছে ঠিকই, কিন্তু মধ্য সমুদ্র শান্ত। মহাপ্রভু হচ্ছেন মধ্য মহোদধি—শান্ত, গভীর, স্থিতধী ও স্থিতপ্রজ্ঞ।

সাগরে আছে হাঙ্গর, কুমীর। কিন্তু প্রভুর তো এ লীলায় কোন আয়ুধ নেই। কে বলে নেই? আয়ুধ আছে তো। সে আয়ুধ হচ্ছে প্রেমায়ুধ। তাহলে সাগরের সঙ্গে তুলনা কেন? ব্যাপ্তি, বিশালতা ও গভীরতা অর্থে। সাধারণ মানুষেরও প্রেম আছে। সে প্রেম তার পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সীমায়িত। কিন্তু প্রভুর প্রেম নিজ পরিবারের মধ্যে তো দূরের কথা, নিজ ইষ্ট গোষ্ঠির মধ্যেও সীমায়িত নয়। এ প্রেম অখিল, অনন্ত ও অখণ্ড।

শ্লোকে পাওয়া যাচ্ছে রামানন্দের মুখে সিদ্ধান্তগুলো শুনে প্রভু তজ্জ্ঞ অর্থাৎ সিদ্ধান্তজ্ঞ হলেন। সিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ করে রত্নাকর হলেন। তাহলে কি প্রভুর এই সিদ্ধান্ত জ্ঞান ছিল না? যদি নাই থাকে, তাহলে তিনি এই জ্ঞান রামানন্দের অন্তরে সঞ্চার করলেন কিভাবে? নারায়ণ নিজে যদি বেদজ্ঞ না হতেন, তাহলে কি তিনি শ্রুতি জ্ঞান ব্রহ্মার চিত্তে সঞ্চার করতে পারতেন?

সিদ্ধান্তজ্ঞান নিশ্চিতভাবেই ছিল প্রভুর। সেই জ্ঞান রূপান্তরিত

হল বিজ্ঞানে, যখন প্রভু রায় মুখে প্রকাশ করলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান এক কথা নয়। পড়াশোনা করে অর্থাৎ বই পড়ে ও লোকমুখে শুনে যা জানা যায় তা হচ্ছে জ্ঞান। আর অনুভূত সত্য হচ্ছে বিজ্ঞান। জ্ঞানের আধার মস্তিষ্ক. আর বিজ্ঞানের আধার হৃদয়। অধ্যাপনাকালে নিমাই পণ্ডিতের ছিল জ্ঞান,—স্মৃতি, শ্রুতি. ন্যায় ইত্যাদি শাস্ত্রে কতই না তাঁর জ্ঞান। তিনি পণ্ডিতের পণ্ডিত। কিন্তু সেই পাণ্ডিত্য এক লহমায় বিসর্জন দিয়ে যখন তিনি কৃষ্ণানুশীলনে ব্রতী হলেন, তখনই তিনি লাভ করলেন বিজ্ঞান। কিন্তু রায় মুখে শোনার পর বিজ্ঞান লাভ করলেন কেন? এটাই হচ্ছে লীলারস আস্বাদন। অন্তরে আস্বাদ্য বস্তুর আস্বাদন হয়. যখন লীলা সহচরের মাধ্যমে সেই রস পরিবেশিত হয়। লীলার আনন্দঘন রূপবৈশিষ্ট্য এইখানেই।

ব্রজে ব্রজেশ তনয়েরও নর্ম সহচর ছিলেন শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রমুখ। কত খেলাই না খেলেছেন তাঁদের সঙ্গে। লীলা করেছেন ব্রজ গোপীদের সঙ্গে, বিশেষ করে গোপী ঠাকুরাণীর সঙ্গে। শুধু বৃন্দাবন কেন? লীলা করেছেন কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনেও, বিশেষ করে সখা অর্জ্জুনের সঙ্গে।

এইতো গত শতকের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন। এলেন পার্ষদবৃন্দ সঙ্গে নিয়েই। প্রত্যেকের অন্তরে ঠাকুর শক্তি সঞ্চার করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের ভারি মিষ্টি নাম দিয়েছেন— বলেছেন কলমীর দল। একটানেই সব চলে আসে।

প্রথম দেখা সুরেন মিত্রের বাড়ীতে। নরেন দত্ত সেদিন

ঠাকুরকে কয়েকটা গান শুনিয়েছিলেন। এইদিন এই পর্যন্তই।

গোল বাঁধল দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে। দক্ষিণেশ্বরে। দেখা হতেই ঠাকুর বললেন. 'এত দেরী করে এলে কেন গো। কতকাল তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তুমি তো নররূপী নারায়ণ গো।'

হাসলেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর দেবতা আবার দেখা যায় নাকি? অথচ তাঁকেই বলছেন নররূপী নারায়ণ। লোকটা পাগল নাকি? কিন্তু অন্যসব কথাবার্তায় তো স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। দ্বন্দ্ব-ধন্দ কাটাবার জন্য সরাসরি শুধোলেন. 'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?' ঠাকুর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি। তোমাকে যেমন সামনা সামনি দেখছি, তার চেয়েও বেশী স্পষ্ট দেখেছি।'

বিশ্বনাথ পুত্র এর আগেও এ কথাটা একাধিক জ্ঞানী-মানী মানুষকে জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু কই, এমন সতেজ কণ্ঠে তো কেউ উত্তর দেননি। তাহলে তো এঁকে পুরোপুরি পাগল বলা যায়না। তাহলে অর্ধ পাগল— **Mono—maniac.** তবে হ্যাঁ. মানুষটি সরল — একেবারে শিশুর মত।

এ হেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দই হলেন ঠাকুরের সর্বপ্রধান লীলা সহচর।

সর্ব পার্ষদই তো বিবেকানন্দ হন না। তবে কেউ কম যান না। ঠাকুরের একেকটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একেক জনের আবির্ভাব। যেমন, যোগীন পরে যিনি স্বামী যোগানন্দ। বিবেকানন্দের বদনোক্তি: 'আমাদের মধ্যে একমাত্র যোগীনই কামজিৎ।

পার্ষদ একাধিক। হলে কি হবে? সবার স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন না ঠাকুর তাঁর ভাব সমাধি অবস্থায়। পারতেন শুধু একজনের। তিনি বাবুরাম মহারাজ। অর্থাৎ প্রেমানন্দ। কেন পারতেন? উত্তর ঠাকুরই দিয়েছেন: বাবুরামের হাড় পর্য্যন্ত শুদ্ধ— শ্রীমতীর অংশ যে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থটির নাম মুখে মুখে ফেরে। রচয়িতা সেই সারদানন্দ ছিলেন মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে সমশক্তিমান।

মন্দিরের পরিকল্পনা বিবেকানন্দের। আর রূপ দেন এক সন্ন্যাসী যিনি পেশাগত বিদ্যায় ছিলেন এঞ্জিনীয়ার। ইনিই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

রাম দত্তের চাকর। রুজির তাগিদে সুদূর বিহার থেকে এসেছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার। পরে ইনি কিনা হলেন সন্ন্যাসী। ব্যাপার অদ্ভুত, নামও তাই অদ্ভুত অর্থাৎ অদ্ভুতানন্দ। লোকমুখে লাটু মহারাজ।

আরো কত পার্ষদ ছিলেন ঠাকুরের। এঁদের মধ্যে যাঁর নাম বিশ্বসভায় স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে; তিনি হচ্ছেন কালী মহারাজ অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দ।

ঈশ্বরকোটি পুরুষ অর্থাৎ নিত্য সিদ্ধ সাত পার্ষদের অন্যতম হচ্ছেন ঠাকুরের মানস পুত্র ব্রহ্মানন্দ। ঠাকুর বলেছেন, 'নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয় রসের দিকে যায় না .... সাধন ভজন পরে। সাধনের আগে ঈশ্বর লাভ। যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল, তারপরে ফুল।' সাধারণ লোক যদি মাছি, নিত্যসিদ্ধ

মৌমাছি। মাছি ফুলেও বসে, মলেও বসে। আর মৌমাছি শুধু ফুলে বসে। মধু আহরণ করে, আবার বিতরণও করে।

হাঁা, রায় রামানন্দ। এঁর জাতি কি? — নিম্নতম পংক্তি। আর পেশা কি? পেশায় ইনি সাধন মার্গের বিপরীত কোটির লোক। পরের কথা একটু আগে বলতে হয়। এ হেন ব্যক্তির সঙ্গেই কিনা প্রভু অন্ত্যলীলায় ব্রজরস আস্বাদন করবেন গম্ভীরা-লীলায়। লীলার ধর্মই এই রকম। যেমন মধুর, তেমনি অচিন্ত্য।

যাহোক, মাধুর্যভাবস্থ প্রভু এগিয়ে চললেন। এলেন জীয়ড় নৃসিংহ মন্দিরে। নৃসিংহ দেব দর্শনে মহাপ্রভুর মহানন্দ। প্রভুর আনন্দের প্রকাশ নৃত্য-কীর্তনে। প্রভু আছেন রাধাভাবে আবিষ্ট। করছেন মাধুর্য রসের আস্বাদন। আর নৃসিংহ দেব হচ্ছেন ঐশ্বর্যের প্রতীক। ভগবানের শবলা লীলা। যেমন, স্তুতি করেছেন জয়দেব ঃ

"তব করে কমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙম।
দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙম॥
কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥"

পিতা-পুত্র— দুইজন দুই মেরুবাসী। প্রহ্লাদ পরম ভক্ত। সদাই কৃষ্ণনাম বদনে। আর নয়নে? — 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

আর পিতা হিরণ্যকশিপু? কৃষ্ণদ্রোহী। প্রবল দ্রোহী। এত প্রবল যে কৃষ্ণনাম পর্যন্ত শুনতে পারে না। এদিকে তো পুত্রের মুখে অষ্টক্ষণ কৃষ্ণনাম। কত চেষ্টাই না পিতা করল পুত্রকে

ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ. মারে কে? আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে? কই, কেউ তো রাখতে পারল না, অথচ এত বড় বরে বরিষ্ঠ দানবটি। বরটি কি? কোন নর তাকে নিধন করতে পারবেনা। তাই-না শ্রীহরির এই অবতারে এইরূপ। কি সে রূপ? — অর্ধেক নর আব অর্ধেক সিংহ অর্থাৎ নৃসিংহ। ভক্ত-রাজ প্রহ্লাদ। ভক্তাধীন ভগবান। সেই ভক্তের মান রাখতেই এলেন তিনি এই বিচিত্র মূর্তি ধরে। বাৎসল্য রসেই এলেন। মাধুর্যরসে আছে এই বাৎসল্য আংশিকভাবে। আর প্রভুও মাধুর্য-রসেই আবিষ্ট। তাই প্রভুর এত আনন্দ, এত নৃত্য, এত কীর্তন।

আর এই জীয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র— এখানেও ভক্ত ভগবানের লীলাবিলাস। ভক্ত বাঞ্ছা পূরণ করতেই তাঁর এই বিচিত্র নাম— জীয়ড় নৃসিংহ। জীয়ড় কে? — না, এক সওদাগর। প্রকৃতি কি রকম তার? সে একজন ভক্ত। কি রকম ভক্ত?

"নিজ ভাগ্য মানি' পায়ে পড়ি সওদাগর।
পরসাদ করি' প্রভু বোলে— মাগো বর॥

কি বর চাইল ভক্ত? "চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম।
বর মাগোঁ মোর নামে হউ তোর নাম॥"

ভক্ত-ভগবানে কি অপূর্ব মিলন। মহা মিলন। নামে নামে মিলন। তাই প্রভু করছেন এই মহামিলন রসের আস্বাদন। এই মধুর আস্বাদনে আর কি প্রভু স্থির থাকতে পারেন? — না। তাই চরণ হল চঞ্চল আর বদন হল মুখর সেই রসেশ্বরের গুণকীর্তনে।

দশম অধ্যায়

রামানন্দ সনে প্রেমানন্দঃ আস্বাদন।

রাতের আঁধারটুকুই প্রভুর যা বিশ্রাম। আঁধারে পথ দুর্গম। তাই বিশ্রাম। জীয়ড়-নৃসিংহ ক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণের ঘরে নিশি যাপন করলেন প্রভু। বৈষ্ণব ভক্ত। ভক্তের আমন্ত্রণ তো উপেক্ষা করা যায়না।

রাত পোহাল। শাখী পুষ্পিত হল। পাখী গান গাইল। আর প্রভুরও যাত্রা শুরু হল। সেই প্রেমাবেশ। রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভু। পথ চলছেন। জনপদ পেরিয়ে যাচ্ছেন। একটার পর একটা। আর জনপদবাসী ধেয়ে আসছে প্রভুর কাছে। প্রভুর রূপে মুগ্ধ হয়ে। কেমন সে রূপ? যেমন লোচনের ললিত স্তুতি ঃ

"সুমেরু সুন্দর তনু বাহু জানু সম।
সিংহগ্রীব কম্বু কণ্ঠ, সুদীর্ঘ লোচন॥"

এ রূপ দেখলে কে না মুগ্ধ হবে? এ রূপ যে অদৃষ্টপূর্ব রূপ। শুধু এরা কেন, কেউ দেখেনি এর আগে ভূমণ্ডলে। কিন্তু শুধু কি রূপ দেখেই আসছে? —না। প্রভুর প্রেমাবেশে আকৃষ্ট

হয়েও আসছে। আসার পর কি হচ্ছে? কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যাচ্ছে। মাতোয়ারা হয়ে প্রভুর সঙ্গে নর্তন-কীর্তন করছে।

প্রভু যেখানে, লোক সংঘট্টও সেখানে। আবার নর্তন-কীর্তনও সেখানে। শুধু নাম আর নাম। কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর। এতদিন নাম ছিল গ্রন্থে। গৃহে। গৃহাঙ্গনে। অঙ্গন পেরিয়ে নাম এলেন রাজপথে। আসবেন বৈকি। ভক্ত প্রহ্লাদের খেদ দূর করতে হবে তো। প্রহ্লাদের আক্ষেপ :

"প্রায়েন দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তি কামা মৌনং চরতি বিজনে ন
পরার্থনিষ্ঠা।"

— মুনিরা শুধু নিজেদের মুক্তির জন্য নির্জনে মৌনাবলম্বন করে তপস্যা করেন। তাঁরা পরার্থ নিষ্ঠ নন, তাই অন্য কোন জীবের দিকে তাকান না।

প্রহ্লাদের প্রাণের ইচ্ছা পূরণ হতে লাগল এক যুগ। দ্বাপর পেরিয়ে এল কলি। সেই কলিহত জীবের জন্য কেঁদে আকুল হলেন গৌরসুন্দর। কাঁদবেন বৈকি। প্রভু যে পরার্থ-নিষ্ঠ। তাইতো তিনি নাম নিয়ে এলেন পথে। পল্লীপথে। নিয়ে এলেন চেনা-অচেনা জনসমাজে। এ সমাজে জাতপাত নেই, উচ্চ-নীচ নেই—নেই কোন ধনী-নির্ধন। সবাই সমান। ভক্তির পথ যে শরণাগতির পথ। বিবাদ-বিভেদ নেই এ পথে। সবারই লক্ষ্য বস্তু এক। গোবিন্দ পাদপদ্ম। এক যেখানে, সেখানে তো বিবাদ হয় না। একাধিক হলে হয়। নাম এক, নামী এক, নর্তন এক, কীর্তনও এক। ঠাঁই এক। ভজন-ভোজনও এক।

আচার এক, আচরণও এক। কোন পথ ভেদ করে আসবে বিভেদ? সবাইতো একের মেলবন্ধনে আলিঙ্গনাবদ্ধ। এই একের কেন্দ্রপীরে আছেন কোন পুরুষ? — না, লীলা পুরুষোত্তম। সেই লীলা পুরুষোত্তমের পানে নিয়ে যাচ্ছেন কোন্ পুরুষ? — না প্রেম পুরুষোত্তম গৌরসুন্দর। কি ধন আছে তাঁর? কি ধন দিয়ে আকর্ষণ করছেন তিনি অগণন জনকে। মাত্র একটি ধন দিয়ে। সে ধন অন্ন নয়, বস্ত্র নয়, বাসস্থান নয়। আর এসব তিনি পাবেনই বা কোথায়? তাঁর নিজেরই তো অশন-বসন- শয়নের ঠিক-ঠিকানা নেই। তবে কি সে ধন? — না, একমাত্র ধন, একটিমাত্র ধন— প্রেমধন।

রাষ্ট্রনায়কের রাজ্য জয়ের আয়োজন কি রকম? লাখ লাখ তাঁর সৈন্য। লাখ লাখ তাঁর অস্ত্র। কত লোকক্ষয় হয়, কত সীমন্তিনীর সিঁথির সিঁদুর মুছে যায়। অভাগিনী মা হারায় তার একমাত্র পুত্র ধন। সেই শোণিত ধারায় উন্মত্ত নৃত্যে মত্ত হয়ে রাষ্ট্রনায়ক করে বিজয়োল্লাস।

আর সাম্যের মহানায়ক মহাপ্রভুর কত অস্ত্র আছে? কত সৈন্য আছে? সৈন্য? সৈন্য তো দূরের কথা— সঙ্গীই তো নেই — ঐ একমাত্র কালা কৃষ্ণদাস ছাড়া। আর অস্ত্র? হ্যাঁ, অস্ত্র একটা আছে। সে বড় বিচিত্র অস্ত্র। এ অস্ত্র প্রাণ নেয় না— প্রাণের কাছে টানে। তাইনা এর নাম প্রেমাস্ত্র। এ অস্ত্র একসঙ্গে সবাইকে টানে। টানে পতি, দারা, দারক দারিকা সবাইকে।

রাজার রাজত্বকাল সীমায়িত। যতদিন রাজত্ব, ততদিনই

জনসমাজে তার আধিপত্য। লোকের এ অধীনতা ভীতিতে, প্রীতিতে নয়। তাই অল্পায়ু। আর প্রীতির বন্ধনে যে অগণন জন প্রভুর অধীনতা স্বীকার করছে, সে বন্ধন চিরায়ু। প্রাকৃত মৃত্যুর পরেও থাকে অটুট। রাষ্ট্রনায়ক জয় করে দেহ, দেহের জোরে। আর মহানায়ক করেছেন ও করছেন হৃদয় জয়। হৃদয়ের একমাত্র ধন প্রেমের জোরে।

মহানায়কের জয়ের তো কোন ভৌগোলিক সীমা নেই। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যাচ্ছেন আর রাষ্ট্র করছেন মধুমাখা হরিনাম। নামের বাঁধনে বাঁধছেন অগণন জন। তাঁর তো নিজের কোন ঘর নেই। ছিল। ত্যাগ করেছেন। ত্যাগ করেছেন কোটি কোটি লোকের ঘরে যাবেন বলে। এক ঘরের বদলে হল কোটি কোটি ঘর। বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী ছিলেন। প্রিয়াজীকেও ত্যাগ করেছেন। তিনি এখন প্রিয়াস্বামী নন। হয়েছেন জগৎ স্বামী। প্রিয়া ত্যাগ করেছেন জগতে প্রিয়তা আনার জন্য। 'জগদ্ধিতায়'।

পথ চলছেন প্রভু। চলতে চলতে এলেন গোদাবরীর তীরে। প্রভু তো রাধাভাবে আবিষ্ট। গোদাবরী কি আর গোদাবরী থাকতে পারে? হয়ে গেল যমুনা। তীরে বন আছে। বন আর বন রইল না। হয়ে গেল বৃন্দাবন। আর কি প্রভু স্থির থাকতে পারেন? আরম্ভ হল নর্তন-কীর্তন। গোদাবরী পার হলেন। পার হয়ে স্নান কৃত্য সারলেন। তীরের কাছে বসে প্রভু নাম জপ করছেন।

"হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥"

বাজনা তো বাজবেই। রায় যে রাজা। দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রতাপ-রুদ্রের দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি। সেই রামানন্দ আসছেন স্নানকৃত্য সারতে। বাজনা বাজবে না তো কি বাজবে? শুধু কি বাজনা?

"তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তেঁহো স্নান তর্পণ॥"

বিধিমত? কোন বিধি মানতেন রামানন্দ? রামানন্দের ছিল শুদ্ধাভক্তির পথ। বর্ণাশ্রম ধর্ম তিনি পালন করতেন না। কেন করতেন না? এ ধর্ম যে অনন্য ভক্তির প্রতিকূল। ভাগবত বলছেন,

"ধর্ম্মান সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।"

যে সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে আমাকে ভজনা করেন, সেই উত্তম ভক্ত। 'ধর্ম্মান' হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। অনন্য ভক্তি কেন? অনন্য ভক্তি ছাড়া যে ইষ্টবস্তু লাভ করা যায় না। কে বলেছেন এ কথা? কেন, ইষ্ট বস্তুই বলেছেন। গীতায় বলেছেন শ্রীমুখে°

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

ভগবান চান ভক্ত শুধুমাত্র তাঁকেই ভালবাসুক। অন্য কারুকে নয় বা অন্য বস্তু নয়। বরং অন্যকে ভালবাসলে তাঁর মনে অসূয়া জাগে। সে আবার কি? ভগবানের মনে হিংসা অসূয়া। তিনি না অনসূয় অনসূয়. কিন্তু একটি ক্ষেত্র

বাদে। ভক্তের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, 'I the Lord your God, am a jealous God.' কেন এমন কথা বলছেন। সে কথা বাইবেল স্পষ্ট করেছেন: 'No one can serve two masters .... you cannot serve God and mammon' রায় দোলায় চেপে এলেন। সঙ্গে বাদ্যকর আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। এক রাজকীয় আয়োজনে স্নান তর্পণ সারলেন।

প্রভু স্নান কৃত্য সেরে তটে বসে জপ করছেন। আর রায় সেই তটেই এলেন তটিনীতে স্নান কৃত্য সারতে। এখন শুধু উভয়ের মিলনের অপেক্ষা। মিলন দৃশ্যটি বড়ই মধুর। ভক্ত ভগবানের লীলা তো। লীলায় লুকোচুরি খেলাও হয়। উভয়ের মধ্যে হলও তাই।

খেলাটা কি রকম? প্রভু তো জানেন পশ্চিম গোদাবরী প্রদেশে বিদ্যানগরে রায় আছেন। আর রায়ই এই প্রদেশের রাজ্যপাল। সার্বভৌমই না তাঁকে একথা জানিয়েছেন। স্নান কৃত্যের এত আয়োজন যাঁর, তিনি প্রশাসক ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। প্রভু এখন নিশ্চিন্ত যে ইনিই রায় রামানন্দ। মিলনের ইচ্ছাও প্রবল। কই, তবুও তো প্রভু উঠছেন না। এও এক পরীক্ষা। পরীক্ষাটা লীলাচ্ছলে। কিসের পরীক্ষা? কার পরীক্ষা? রায়ের মানসপটের পরীক্ষা। ভক্ত ভগবানের খেলাই না এই রকম। ভক্তকে তপস্যা করতে হয়। তার এই তপস্যা হল সাধনা। সাধনায় ভক্তকে অগ্রসর হতে হয়। অগ্রসর হলে

মেলে করুণা— ভগবানের করুণা।

রায় মহা আড়ম্বরে স্নানকৃত্য সারলেন। সেরে চতুর্দোলা অর্থাৎ পাল্কীর দিকে এগোলেন। এগোতেই দেখলেন,

"সূর্য শতসম কান্তি— অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ— কমললোচন॥"

হ্যাঁ, প্রকাণ্ডই বটে। নিজের হাতের চার হাত। রায় কত সন্ন্যাসীই না দেখেছেন। কিন্তু এমন হিরণ-কিরণময় সন্ন্যাসীতো দেখেন নি। না, আর কোন সংশয় নেই। ইনিই সেই নবীন সন্ন্যাসী— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁর উদয় সংবাদ তিনি আগেই পেয়েছেন। ছুটে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানালেন। প্রভুর মুখে তো সদাই ঐ দুই বর্ণ। তাই বললেন, 'ওঠ, বল কৃষ্ণ।' প্রেমালিঙ্গন দিতে প্রেমসুন্দর গৌরসুন্দরের মন আঁতে-ব্যথে অস্থির হল। তবুও শুধোলেন, 'তুমিই কি রায় রামানন্দ?' সরাসরি উত্তর দিলেন না রায়। উত্তরে বললেন না, 'হ্যাঁ, আমিই রায় রামানন্দ।' তবে কি বললেন? সেবক সেব্যের মন জানেন। বৈষ্ণবের অন্যতম প্রধান গুণ দৈন্য। সেই দৈন্যঋদ্ধই রায়। তাই

'তেঁহ কহে— সেই হও দাস শূদ্র মন্দ।' —অর্থাৎ 'তুমি ঠিকই ধরেছ— আমিই সেই রামানন্দ, তবে তোমার দাস। জাতিতে শূদ্র, তবে মন্দ শূদ্র, অর্থাৎ শূদ্রাধম। শূদ্র হয়েও শূদ্রের কাজ করছি না, করছি ক্ষত্রিয়ের কাজ। আমি যে বিদ্যানগরের প্রশাসক।

দীনতার সজীব বিগ্রহ প্রভু। তাই অভিভূত হলেন রায়ের

দৈন্যে। না. পরীক্ষা নয়। আবেগে, সবেগে প্রভু প্রেমালিঙ্গন দিলেন। উভয়ের প্রেম স্বভাবসিদ্ধ. প্রয়াসলব্ধ নয়। তাই সুদৃঢ় আলিঙ্গনে সেব্য-সেবক ভূঁইয়ে লুটিয়ে পড়লেন। উভয়েই সংজ্ঞাহারা।

সংজ্ঞা হারালেন কেন? সনাতন গোস্বামী এক মনোজ্ঞ আখ্যান শুনিয়েছেন: গোপকুমার ও জনশর্ম মাথুর বিপ্র শ্যাম সুন্দরের দর্শন লাভ করলেন। নতি-প্রণতি জানাতে ধেয়ে গেলেন। না, সান্নিধ্যলাভ হলনা। অর্ধ পথেই সংজ্ঞা হারালেন আবেগ বিহ্বলতায়। ওদিকে যশোদানন্দনও প্রিয় ভক্তের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছায় ছুটলেন। কিন্তু আনন্দাতিশয্যে তাঁদের সবেগে আলিঙ্গন দিয়ে তাঁদেরই ওপর পতিত হলেন।

ভক্ত-ভগবানের লীলাই এই রকম। রায় ও গোরারায়ের মধ্যে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক লক্ষণও দেখা দিল। আবার সংজ্ঞা ফিরে আসতেই উভয়েরই কণ্ঠে গদগদ কৃষ্ণনাম।

এদিকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছে এই দৃশ্য বিসদৃশ— এক বিপন্ন বিস্ময়: তাইতো, সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্র স্পর্শ তো অকর্তব্য। আবার রায় তো রাজা— বিদ্যানগরের রাজা। শুধু রাজাই নন, জ্ঞানী মহাজ্ঞানী রাজা। তিনিই বা কেন এক সন্ন্যাসীর আলিঙ্গনে এমন ব্যাকুল বিহ্বল হয়ে পড়লেন?

প্রভু লোক চরিত্রের বিচক্ষণ বোদ্ধা। বিজাতীয় লোকের কাছে বিসদৃশ ঠেকবে এই লীলাবিলাস। এসব তো গূঢ় তত্ত্ব। 'বুঝিবে রসিক জন, না বুঝিবে মূঢ়।' এরা তো রসিক জন না.

প্রাকৃত জন। তাই আত্মসংবরণ করলেন রায় ও গোরা রায়!

এখন প্রকৃতিস্থ উভয়েই। হাসিতে স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভুর বদন। বললেন, 'রায়, তুমি যে অনেক গুণের আকর— এ কথা আমি সার্বভৌমের কাছে শুনে এসেছি। আর সার্বভৌমই আমাকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বারবার বলে দিয়েছে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই এই বিদ্যানগরে এসেছি। তা, ভালই হল। অল্প আয়াসেই তোমার দর্শন পেলাম।'

নম্রকণ্ঠে রায় বললেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য সার্বভৌম আমাকে তাঁর সেবকবৃন্দের মধ্যে রেখেছেন। এমনকি অসাক্ষাতেও। আজ তাঁর কৃপাতেই না তোমার চরণ স্পর্শ পেলাম। আমার মানব জন্ম সার্থক হল।'

হ্যাঁ, মানব জনম সার্থক-সফলই বটে। রায় সফল-সার্থক মনে করছেন কেন? মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য কি? — না, ঈশ্বর লাভ। যুগে যুগে একই কথা। গত শতকেও একই কথা। বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'তুমি এ সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্য মানব জন্ম পেয়েছ।' আবার এ শতকেও একই কথা। বলেছেন রবীন্দ্রনাথ,

'চাইগো আমি তোমায় আমি চাই—
এই কথাটি সদাই মনে বলতে যেন পাই।
আর যা কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে—
মিথ্যা সে সব মিথ্যা ওগো,
তোমায় আমি চাই।'

কিভাবে লাভ করা যায় ঈশ্বর ? ---ভজনে। আর 'নরতনু ভজনের মূল।' মহাজন বাক্য অতথ্য নয়। তাই না এই মনুষ্য জন্ম কামনা করে সুরলোকবাসীও। নরকবাসী তো বটেই। ভাগবত সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

"স্বর্গিনোহপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।
সাধকং জ্ঞানভক্তি-ভ্যামুভয়ং তদসাধকম্॥"

রামানন্দের আজ পরমানন্দ। গৌরসুন্দরের মাঝে তিনি ঈশ্বর দর্শন করলেন। তাই তাঁর এত বাকস্ফূর্তি। বলছেন রামানন্দ, 'সার্বভৌম সত্যি তোমার কৃপাধন্য। তাঁর অনুরোধেই তুমি আজ আমাকে স্পর্শ সুখ দিতে এসেছ, নইলে সন্ন্যাসী কখনও শূদ্রকে স্পর্শ করে ? এ কাজ যে তোমার পক্ষে সর্বৈব অকৃত্য। তুমি তো সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবান ছাড়া আর কে পতিতকে উদ্ধার করে ? তুমি পতিত পাবন বলেই না অযাচিতভাবে আমাকে— আমার মত পতিতকে উদ্ধার করতে এসেছ। মহান্তের স্বভাবই যে এই রকম।' বলেই রায় ভাগবতের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন,

"মহদ্বি চলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥"

— হে ভগবন! দীন চিত্ত গৃহিগণের কল্যাণ সাধনার্থই মহদাশয় তাঁদের গৃহে যান। অন্য কারণে না।

এই দীনভাবটি জ্ঞাপন করেছিলেন নন্দ মহারাজ আচার্য গর্গকে। 'কৃষ্ণনাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।' নন্দ লালার নাম করণ অনুষ্ঠান। বসুদেব পাঠালেন গর্গকে। গর্গাচার্য নন্দ

মহারাজের গৃহে উপস্থিত হলে নন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এই শ্লোকটি উচ্চারণ করে।

কি মধুর দৈন্য! সেই মধুর দৈন্যই রামানন্দে। নন্দ বাক্য হল রামানন্দ বাক্য। না, বায় আজ নামতে পারছেন না। মুখর তাঁর বদন। বলে চললেন রামানন্দ, 'আমি তো বটেই। এই যে হাজার লোক আমার সঙ্গে আছে, তাদের মন গলে গেছে তোমার দর্শনে। আর তোমার মুখে কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর। তাই না সবার নয়নে আষাঢ়ের আসার। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কে একাজ করতে পারে?'

মৃদু হেসে প্রভু বললেন, 'না, না. আমার দর্শনে না. তোমার দর্শনেই এদের মন দ্রবীভূত। তুমি পরম ভাগবত। এদের তো কথাই নেই। এদের মন তো গলবেই। আমি যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমার মনই গলে গেছে তোমার সান্নিধ্য লাভ করে। আমি ভক্তিহীন. অথচ তোমার স্পর্শমাত্রই কৃষ্ণ প্রেম সাগরে ভাসছি। এখন বুঝতে পারছি কেন সার্বভৌম তোমার সঙ্গে—সাক্ষাতের কথা বলেছে। সার্বভৌম বিচক্ষণ, তাই না তোমার যাদুস্পর্শে আমার কুলিশ কঠোর হৃদয় কমল কোমল হল।'

না, স্তুতিতে কেউ কম যান না। স্তুতি পাল্টাস্তুতি চলল। তবে হ্যাঁ, উভয়েরই চিত্তকুম্ভ কানায় কানায় পূর্ণ আনন্দে—প্রেমানন্দে।

একে অপরকে চাইছিলেন যেন কতকাল ধরে। কিন্তু পেলেন এই আজ। আগে পাননি কেন? আগে যে কাল পূর্ণ হয়নি।

সব বস্তুই কাল নির্ভর। ব্রজেন্দ্রনন্দন কি সব লীলা এক সময়ে করেছেন? পর্যায়ক্রমে— কাল পর্যায় ক্রমে করেছেন। সেই লীলাপুরুষোত্তম এসেছেন প্রেম পুরুষোত্তমের ভূমিকায়। প্রভুরও তাই পরিকর আসছেন পর্যায়ক্রমে। ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে আসছেন কেন? ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন পার্ষদদের। কলিহত জীবের উদ্ধার যে কঠিন কাজ। সেই সুকঠিন কৃত্য সহজ হবে সুশৃঙ্খলায়। সেই সুশৃঙ্খলা কিভাবে আসবে? আসবে প্রভু যখন তাঁদের প্রতিজনকে সুসজ্জিত করবেন সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য।

প্রভু লোক চরিত্রের বিচক্ষণ জ্ঞাতা। পরিচয়ের স্বল্পালোকেই সেই লোকের মনের গহন প্রদেশে প্রবেশ করতে পারেন। আর তখনই নিরূপণ করেন সেই পার্ষদের ভূমিকা। দিশারী দীপ-শিখাটি তাঁর হাতে তুলে দেন। আর সেই আলোতে পার্ষদের দুর্গম সরণী হয় সুগম। প্রভুরও কার্যসূচীর হয় সুষ্ঠু রূপায়ণ। জীবের উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবিত হয় পর্যায়ক্রমে। প্রভু পরিচালিত পার্ষদদের অবদানে। পুরণো সব কিছুতেই জনসমাজ আঁকড়ে থাকতে চায়। কিছুতেই ছাড়তে চায়না। নতুনকে বরণ করতে চায়না। এই পুরনো থেকে নতুনে উত্তরণ। এ এক বৈপ্লবিক বিবর্তন। এই বিবর্তন ঘটাতে পারে কে? পারে একজনই। তিনি হচ্ছেন 'পুরুষোলোককল্প।' প্রভু আজ সেই ভূমিকায়।

এদিকে এক বৈষ্ণব প্রভুকে আহারে নিমন্ত্রণ করলেন। প্রভু গ্রহণ করলেন। গ্রহণ না করলে বৈষ্ণবের মান থাকে না।

প্রভু যে নিজে বৈষ্ণব। কিন্তু একটু আগেই যে রায়কে বলেছেন তিনি ভক্তিহীন মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ওটা তো একটা খেলা। লুকোচুরি খেলা। এ খেলা কবির ভাবরাজ্যে ধরা পড়েছে এমনি-ভাবে :

'বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি
এবার বলো আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছলবেনা।'

সহজে ধরা দিতে চাননা। কেন? — বাঃ, খেলার একটা আনন্দ আছে না। আর পার্ষদদের অন্তর লোকও না প্রকাশ পাবে এই খেলায়, এই বিনোদ খেলায়। খেলতে খেলতে সেই নর্ম সহচরই হন মর্ম সহচর। যেমনটি হবেন এই রায় গোরারায়ের অন্ত্যলীলায়, পরের কথা পরেই হবে।

প্রভু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ইচ্ছুক হলেন। রায়ের কাছে বিদায় নিতে হয়। মৃদু হেসে প্রভু বললেন, 'তোমার মুখে কৃষ্ণ-কথা বড়ই মধুর। একবার শুনলে বারবার শুনতে বাসনা জাগে। আমার এ বাসনা তুমি পূর্ণ কর।'

বিনয়-ঝরা কণ্ঠে রায় বললেন, 'এই না একটু আগেই বললে আমার জন্যেই তোমার এখানে আসা। তা এসে যখন পড়েছ, পাঁচ-সাত দিন থাক। মনের মুকুরে মলিনতা জমেছে অনেককাল ধরে। তোমার দর্শনে আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু মালিন্য তো এখনও কাটেনি। আজ সন্ধ্যায় আমিই আসছি এই বৈষ্ণবের গৃহে। কৃষ্ণকথায় প্রাণ জুড়োবে।' — বলে রায় বিদায় নিলেন।

দিনমণি দিনের কাজ শেষ করলেন। পাটে বসলেন। কিন্তু দিনটা কাটল কিভাবে এই দুজনের? শুধু উৎকণ্ঠায়ঃ কখন সন্ধ্যা হয়। দিন ফুরোতে দেরী হচ্ছে কেন আজ? কিসের উৎকণ্ঠা? মিলনের উৎকণ্ঠা। মিলনেই যে কৃষ্ণ কথা। আর সে কৃষ্ণকথা বড়ই মধুর। কৃষ্ণকথা কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে। মরমে গেলেই হৃদয় জুড়োয়। বড়ই শান্তি। ত্রিতাপ জ্বালার স্বস্তি। তাই না এই উৎকণ্ঠা।

দিনের অবসান তো উৎকণ্ঠারও অবসান। রায়েরও হল আগমন। কি হল তখন?

'নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুইজনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে॥'

কি সে কথা? — না, কৃষ্ণ কথা। সাধ্য তত্ত্ব। প্রশ্নোত্তরে আলোচনা। গুরু শিষ্য সংবাদের মত। না, বলায় ভুল হল। মত নয় বরং বিসদৃশ। বিসদৃশ কেন? এখানে গুরুই শ্রোতা, শিষ্য বক্তা। শিষ্য বক্তা? এ শক্তি পেলেন কি করে রায়? কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ না বলালে কে বলতে পারে? গোরা রায়ই না যদুরায়। গোরা রায় বলাচ্ছেন, তাই রাম রায় বলছেন। এটা রায়েরই স্বীকারোক্তি। যেমন,

'মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।'

প্রভু তো নিজেই সরাসরি বলতে পারতেন। পারতেন। তবে তাতে পারতেন না লীলারস আস্বাদন করতে। তাই

'প্রভু কহে পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥'

'পঢ় শ্লোক' বললেন কেন প্রভু? সাধ্য তত্ত্বের আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে মুখে। এটাতো কোন পাঠের আসর নয় যে শ্লোকের পাঠ হয়। মৌখিক আলোচনা। তবে 'পঢ় শ্লোক' বলে প্রভু যেন রায়কে একটু সতর্ক করে দিলেন। কি সে সতর্কতা? শ্লোক আছে শাস্ত্রে। সেই শাস্ত্র সম্মত আলোচনাই যেন রায় করেন। প্রভু অশাস্ত্রীয় কোন কথা শুনতে ইচ্ছুক নন। তাই এই সতর্কতা। আরম্ভেই।

সাধ্য বস্তু নির্ণয় করবেন রামানন্দ। ভাল কথা। কিন্তু সাধ্য মানে কি? প্রতি জীবেরই সাধনা আছে। তার মত, পথ ও লক্ষ্য যা-ই হোক। তার সমগ্র জীবনের সাধনায় যে কেন্দ্রীভূত লক্ষ্যবস্তু, তা-ই হচ্ছে সাধ্য। প্রাকৃত জীবের সেই লক্ষ্যবস্তু স্বভাবতই সুখ। সুখই তার কাম্য ও অভীষ্ট। কি রকম সুখ? — না, শুধুই সুখ, দুঃখ না। কিভাবে সুখ পেতে চায় জীব? — না, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চার পুরুষার্থ লাভ করে। কিন্তু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কি সত্যিই জীবকে নিত্য সুখ দিতে পারে? লালসা হয়, কিন্তু প্রাপ্তির পর সেই লালসার জন্য অনুতাপও হয়। এই তিনের বাস্তব চিত্র বিপরীত অর্থাৎ এরা দুঃখকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

তাহলে দুঃখ দূর করার উপায়? মোক্ষ। হ্যাঁ, মোক্ষ প্রাপ্তিতে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়। কি আনন্দ! সাযুজ্য

লাভ করেছে তো। সদাই আনন্দ। আর দুঃখ নেই। কিন্তু লোভ? লোভ যে পীড়ণ করে। কিসের লোভ? — ভগবৎ সেবার লোভ। তাহলে তো নিষ্কণ্টক সুখ হল না। অর্থাৎ মোক্ষও পরম পুরুষার্থ— হল না।

জীবের পরিচয় কি? — না, সে কৃষ্ণের নিত্যদাস। সেব্য শ্রীকৃষ্ণ, সেবক জীব। জীবের কৃত্য কি? — না, সদাই সেব্যের সুখ বিধান। সেই সুখ বিধান কল্পে সাধ্যভূমির তরতমের দিগদর্শন করেছেন রামানন্দ প্রভুর প্রশ্নের উত্তর মালা গেঁথে।

শুরু করলেন রায়। সর্বপ্রথম বললেন স্বধর্মাচরণ ও বিষ্ণুভক্তির কথা। অর্থাৎ কিনা জীবের সাধ্য বস্তু হচ্ছে বিষ্ণুপ্রীতি, আর তার উপায় বা সাধন হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। প্রভু আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি অশাস্ত্রীয় কথা শুনবেন না। তাই রায় বিষ্ণুপুরাণ থেকে এই শ্লোকটি দিয়ে নিজমত সমর্থন করলেন :

"বর্ণাশ্রমাচারতা পুরুষেণ পরঃ পুমান
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম।"

— পরম পুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার সম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হয়ে থাকেন। বস্তুত বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি সাধনের অন্য উপায় নেই।

যথার্থ সমর্থন। স্বয়ং বিষ্ণু পুরাণ বলছেন একথা। চার বর্ণ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং চার আশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু বা সন্ন্যাস। জনসমাজে যাঁর যে কাজ, সে সেই কাজ করবে। ফলে সমাজ সুশৃঙ্খল ভাবে চলবে।

জনসমাজ সুখে থাকবে। আর বিষ্ণু প্রীতিও লাভ করবে। বর্ণানুযায়ী কর্ম বিভাগের কথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলেছেন :

'চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ।'

কর্ম বিভাগ— ডিভিশন অব লেবার এর জন্যই এই চারবর্ণের সৃষ্টি। বাসুদেব এইখানেই থামেননি প্রাণিত করেছেন অর্জ্জুনকে যুদ্ধে ব্রতী হতে। বললেন স্বকর্মই স্বধর্ম। অর্থাৎ 'হে অর্জ্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। অতএব তুমি যুদ্ধ কর।'

সাধ্য নির্ণয়ে রায়ের উক্তি যুক্তিতে অকাট্য। তবুও কাটলেন প্রভু। বললেন, '·········এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'

কেন বললেন? যুক্তি কি? ভাগবত বলেন ভগবান ভক্তাধীন — 'অহং ভক্ত পরাধীনঃ।' কোন্ ভক্তের বশ তিনি? — না, সাধন ভক্তির ভক্তের, এত বশ যে 'বিক্রীনীতে স্বমাত্মানাং ভক্তেভ্যো ভক্ত বৎসলঃ।' ভক্ত বৎসল ভগবান ভক্তের কাছে নিজেকে বিক্রী করে ফেলেন।

কিন্তু এই ভক্ত বাৎসল্য বর্ণাশ্রম ধর্মে কোথায়? সেখানে তো সেব্যের সুখ বিধানের সাধ নেই। আছে আত্ম সুখ বিধানের আশা-আকাঙ্ক্ষা। বিষ্ণু পুরাণই এই আশার বাণী শুনিয়েছেন, বলেছেন বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করলে জীবের স্বর্গলোক, সত্যলোক ইত্যাদি লোক প্রাপ্তি ঘটে। স্বর্গলোকে বাস মানেই তো সমূহ সর্বনাশ। তখন কি আর সে সেব্যের কথা মনে রাখতে পারবে? কি করে পারবে? গন্ধর্ব ললিত কণ্ঠে সুমধুর গান গাইবে, হাতে পারিজাত নিয়ে অপ্সরা নাচবে, স্বর্ণপাত্রে সুরা আসবে— তখন

কার সেবা কে করবে? সেব্যের কথা তো মনেই থাকবে না। তাহলে কি দাঁড়াল? — দাঁড়াল এই, এই সাধ্যভূমি নিম্নতম ভূমি। ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন। তাই না প্রভু বললেন, 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।' তাহলে কি আগে আরও আছে? আছে বৈকি। শতদল তার পাপড়ি মেলে রাতের পর রাতের সাধনায়। মেলতে মেলতে সে হয় পূর্ণায়ত শতদল।

রায় প্রভুর মন বুঝলেন। প্রভুর কৃপাতেই বুঝলেন। ঈশ্বর কৃপা প্রযাস সাধ্য নয়, প্রসাদ লব্ধ ধন। কবি কণ্ঠেও একই বাণী :

"না হয় আমার নাই সাধনা,
ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল
চকিতে ফল ফলবে না।"

সেই প্রসাদ লব্ধ ধন বলেই রায় সাধ্যভূমিতে এলেন। এসে কি করলেন?

"রায় কহে কৃষ্ণে কর্মাপণ সাধ্য সার।'

শুধু বললেই তো হবেনা। প্রমাণ দিতে হবে। রায় তাই গীতার এই শ্লোকটির উল্লেখ করলেন :

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম॥'

— শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন, 'হে কৌন্তেয়! তুমি যা কিছু কর্ম কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু হোম কর, যা কিছু দান কর,

এবং যা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর।

অর্থাৎ কর্মই যেন অর্ঘ্য হয়, স্বামীজী যাকে বলেছেন—
'Work is Workship'

কিন্তু না, এবারও হলনা। তাই

'প্রভু কহে এহ বাহ্য, আগে কহ আর।'

জীব যে কোন কাজ করে, যা কিছু ভোজন, হোম, দান এবং তপস্যা করে, সবই যদি সেই তাঁরই চরণে অর্পিত হয়, তাহলে আর বাকী থাকে কি?

প্রথম সাধ্যভূমিতে রায় বলেছেন স্বধর্মাচরণের কথা। সেটা প্রভু নাকচ করেছেন। কারণ ধর্মাচরণের সঙ্গে কর্মবন্ধনের মায়া ডোর রয়ে গেছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় সাধ্যভূমিতে তিনি যে কর্মার্পণের কথা বললেন, এর সঙ্গে কর্মবন্ধনের তো কোন যোগ নেই, বরং অর্পণ করলে মায়াবন্ধন থেকে মুক্তই হওয়া যায়। কিন্তু তবুও যে প্রভু একে বহির্দ্বারে রাখলেন প্রথমটির মত।

প্রভু যথার্থই রাখলেন। এখানে দ্বিবিধ কর্তৃত্ব দেখা যায়। এক, কর্ম করার কর্তৃত্ব, দুই অর্পণ করার কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বের এই দুই দানব দাপিয়ে বেড়ায় অর্পণকারীর মনের আনাচে-কানাচে। অহং এর বিষবাষ্প এমনই ভয়াবহ।

যেমন, গীতায় বলছেন,

'অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।' আরও সরল-তরল করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না। মেঘ সরে গেলেই

সূর্যকে দেখা যায়।' বারান্তরে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, 'জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে দুটো ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ এক জল, লাঠিটার দরুণ দুটো দেখাচ্ছে। অহংই লাঠি। লাঠি তুমি লও, সেই এক জলই থাকবে।'

এই অহংবাদীরা বলতে জানে না,

"মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।"

রবীন্দ্রনাথ রস তারল্যে বলেছেন,

"রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম।
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম॥
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি।
মূর্তিভাবে আমি, হাসে অন্তর্যামী॥"

আবার এক গুজরাটি কবি একটা নীচ প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন,

"হুঁ করু, হুঁ করু, এ জ অজ্ঞানতা।
শকটানো ভার জেম শ্বান তানে॥"

— আমি করি, আমি করি,— এটা অজ্ঞানতা। গরুর গাড়ীর ছায়ায় ছায়ায় একটা কুকুর চলেছে। কুকুর ভাবছে সেই-ই গাড়ীটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কই, এই দ্বিতীয় সাধ্যভূমিতে তো অহংকার নির্বাসনের স্থান হল না। তাহলে অহংকার যাবে কোথায়? কোথাও যেতে পারেনা। নিজের মনের কোণেই থেকে যায়। এই অহং এর

দাপাদাপিতে— ভগবানের ওপর ভরসাও সে হারিয়ে ফেলে। এ বিষয়ে রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ একটি রসের গল্প বলেছেন :

একদিন নারায়ণ ও লক্ষ্মী বসে গল্প করছেন। গল্প জমে উঠেছে। এমন সময় আচম্বিতে নারায়ণ ব্যস্তভাব সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। বিস্মিত হলেন লক্ষ্মী। কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। পাবার প্রয়োজনও হল না। যেমনি ঝটিতি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি দ্রুতপদে ফিরে এলেন। আসতেই লক্ষ্মীদেবী শুধোলেন, 'কি ব্যাপার বলতো, কেনই বা উর্ধ্বশ্বাসে চলে গেলে, আবার কেনই বা মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলে? নারায়ণ মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি তো জান, আমি ভক্তাধীন। আমার এক ভক্ত বিপদে পড়েছিল। আমার নাম জপতে জপতে এমন তন্ময় হয়েছিল যে ধোপার কাপড়ের ওপর দিয়ে সে পথ চলছিল। ধোপারা রাগে ফেটে পড়ল। তারা তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হল। তাই তাকে আমি রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।'

— 'তা, ওকে রক্ষা করে চলে এলে?' শুধোলেন নারায়ণ প্রিয়া।

'না, তার আর প্রয়োজন হলনা। আমার ওপর আর তার ভরসা নেই। ও নিজের ভার নিজেই নিয়েছে। একটা পাথর হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। এটা দেখেই ফিরে এলাম।'

তাইতো প্রভু এই দ্বিতীয় সাধ্য ভূমিকেও প্রথমটির মত নাকচ করলেন। তখন রায় কি করলেন? তখন

'রায় কহে স্বধর্ম ত্যাগ এই সাধ্যসার।'

এবার রায় দ্বিগুণ সমর্থন উল্লেখ করলেন তাঁর এই নির্ণয় প্রয়াসে।

প্রথম করলেন ভাগবত থেকে :

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকাশ।
ধর্ম্মান সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।"

—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন, 'হে উদ্ধব! বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে আমি যে আদেশ-নির্দেশ দিয়েছি, তার দোষগুণ সম্পূর্ণরূপে জেনে সেই সব নিত্য নৈমিত্তিক রূপ স্বকীয় বর্ণাশ্রম ধর্মাদি পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি আমার ভজনা করে, সেই ব্যক্তিও পূর্বোক্ত 'কৃপালুর কৃত দ্রোহাদি' ব্যক্তির ন্যায় সত্তম। আর গীতা থেকে উল্লেখ করলেন,

"সর্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

— শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন, 'হে অর্জ্জুন, সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে উদ্ধার করব। কোনবকম শোক করো না।' সাধ্যের প্রথম নিরাকরণে রায় স্বধর্মাচরণের কথা উল্লেখ করলেন। প্রভু নাকচ করলেন। এখন বললেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা অর্থাৎ স্বধর্ম আচরণ নয়, স্বধর্ম ত্যাগ।

এই তৃতীয় সাধ্যভূমিতে রায় প্রথমটির প্রতীপ বস্তুর কথা বললেন এবং দ্বিগুণ সমর্থন উল্লেখ করলেন। রায়ের আশা, বড় আশা প্রভু এবার আগের দুবারের মত বহির্দ্বারে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না— অন্তর্দ্বারে প্রবেশাধিকার দিবেন। কিন্তু, হরি, হরি, এবারও যে আশা ভঙ্গ হল। প্রভু তো বাঁধা গতের মত ঐ

একই কথা বললেন।

স্বধর্ম ত্যাগ কেন? — না, তাঁর চরণে শরণাগতির জন্য। নিজ ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করে যে তাঁর শরণ নেব, শুধু কি ভাবাবেগে বা উপদেশে? সেক্ষেত্রে সেই শরণাগতির স্থায়িত্ব কতটুকু? তাহলে কিভাবে তাঁর চরণে আশ্রয় নিতে হবে? — না, সর্বভূতে এই ভূতভাবনই যে একমাত্র শরণ্য এ জ্ঞান আগে থাকা প্রয়োজন। সেই জ্ঞানে জ্ঞানোজ্জ্বল হয়ে যে শরণাগতি, সেই শরণাগতিই অনড়-অটল। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি যদি সর্বধর্ম ত্যাগ করে শুধুমাত্র আমার শরণ নাও, তাহলে আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব।'

ভূতভাবন তো পতিত পাবন। একটার বদলে আরেকটা। এ আবার কেমন কথা। এ তো পাটোয়ারী কথা— শর্ত চুক্তির কথা। সাধ্য বস্তু লাভে বিসদৃশ কথা। কই, এ গন্ধ তো ব্রজজনের নাসিকায় নেই। থাকবে কেন? ওতে যে রয়েছে মহাজন-ব্যাপারীর বিষয়ের বিষ। কৃষ্ণানুশীলনের পথ তো ভিন্ন। কি রকম ভিন্ন? যেমন,

"অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে— কৃষ্ণানুশীলন॥'

পাপমুক্তির অভিলাষে যদি কেউ শরণ নেয়, তাহলে তার অন্য বাঞ্ছা থেকেই যাচ্ছে।

ব্রজজন তো এসব কথা ভাবেন না। তাঁকে ভজন করব—

বললেন, 'ভজন করতে হয়, তাই করি। ভজন না করে থাকতে পারি না, তাই করি। আন বাঞ্ছা, আন জ্ঞান, আন কর্মের ধার আমরা ধারি না। আমাদের আছে শুধু কান বাঞ্ছা, কান জ্ঞান আর কান কর্ম।'

উপদেশ, আদেশ, নির্দেশ যেমন 'সব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য ......।' ইত্যাদি থাকবে কেন ভজন পথে! ভজন তো অন্তরের অন্তরতম ধন অন্তরতমের জন্য। নির্ঝরের মত এব অনপেক্ষ স্বতঃ সৃজন। আদেশ উপদেশের অপেক্ষা আবার কিসের?

তাইনা প্রভু বললেন, 'রায়, হচ্ছেনা। তোমাকে আরো এগোতে হবে। অন্তর্দ্বারে অত সহজে কি পৌঁছুনো যায়?'

রায় আর কি করেন? চতুর্থ চেষ্টায় তাই বললেন, 'জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্যসার।' পুরো পযারটি হচ্ছে:

"প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে — জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥"

বিচারালয়ে মহামান্য বিচারপতি সকাশে কৌসিলী আইনের বিধান নিবেদন করে যেভাবে পূর্ব সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন, ঠিক সেইভাবে রামানন্দ সাধ্য নির্ণয়ে একটি করে পয়ার বলছেন, আর সমর্থনার্থে উল্লেখ করছেন শাস্ত্রীয় সূক্ত। না করে উপায় কি? গুরু যে শুরুতেই গুরু নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। তিনি অশাস্ত্রীয় কথা শুনাবেন না। তাই রায় গীতা থেকে নিচের শ্লোকটি উল্লেখ করলেন:

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সম সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম॥"

— ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না। কোন বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে তিনি আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) পরাভক্তি লাভ করেন।

তিন জ্ঞান ° ভগবৎ তত্ত্বের জ্ঞান, জীব স্বরূপের জ্ঞান, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান। এ হেন জ্ঞান মার্গের সাধন পথে যিনি ব্রতী তাঁর জড় জগতের কোন উপাধি থাকে না। না থাকা মানেই মায়িক মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ফলে তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়। তাই প্রসন্নাত্মা। প্রাকৃত বস্তুর কোনটি নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্য তিনি শোক করেন না। করবেন কেন? চিত্ত তো প্রসন্ন। আর মনও নিরাকাঙ্ক্ষ। তাই প্রাকৃত বস্তুর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। নেই কোন লোভ। স্বভাবতই মায়িক জগতের ভাল-মন্দ, সাধু-অসাধু, ভক্ত-পাষণ্ড, ছোট-বড়— সব জীবকেই সমান মনে করেন। তিনি যেন বালক। এ হেন স্তরে উন্নীত ব্যক্তি উত্তমা ভক্তি লাভ করতে পারেন। তাহলে সাধ্যের নিরাকরণ হয়ে গেল। চিন্তা করলেন রাম রায়। চিন্তা করলে কি হবে! তাঁর চিন্তামণি গোরা রায় যে ভিন্ন চিন্তা করছেন। কি সে চিন্তা? না, রায়ের এই নিরাকরণে রায় দিলেন না গোরা রায়।

কিন্তু প্রভু জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিকে বাতিল করলেন কেন? ভক্ত ভজনে ব্রতী হয়েছেন। তিনি যদি সর্বক্ষণ জ্ঞানের তিন অঙ্গ অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যতত্ত্ব নিয়েই

মগ্ন থাকেন, তাহলে তো ভজন সময়ের হয় অপচয়। শুধু কি সময়েরই অপচয়? তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তাঁর মধ্যে আসবে একটা মোহাবেশ। এই মোহাবেশ ক্রমশ তত্ত্বালোচনার প্রতি লোভ বাড়াবে। তখন ঐ তত্ত্বালোচনাই হবে সার, আর মুখ্য বস্তু ভজন হবে অসার। শুধু কি এই? তৃতীয় অঙ্গটি অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের ঐক্যতত্ত্ব সেবা-সেবক সম্বন্ধের সম্পূর্ণ বিরোধী।

গোপীর ভজনে কোন্ তত্ত্বটি আছে? তাঁরা তো আলা-ভোলা গোয়ালিনী। তাদের কাছে ঐ এক তত্ত্ব। শাস্ত্রের হাজারো শ্লোকের বাইরে সে তত্ত্ব।

সেটা কি? — না, ভালবাসতে হয় তাই ভালবাসি। ভাল না বেসে থাকতে পারি না, তাই ভালবাসি। ব্রজ রাখালেরা তাদের রাখালরাজের ভজনা করে কিভাবে? কই, তাঁরা তো কোন গ্রন্থ পাঠ করেন না, শাস্ত্র আলোচনা করেন না, করেন না কোন তত্ত্বের বিচার। না আছে কোন উপচার, না কোন আয়োজন, না আড়ম্বর। তাঁদের ভজন তো শুধু খেলা, আর খেলা, ছেলেখেলা, ভারি মজার খেলা। যেমন,

'কেহ শিঙ্গা করে চুরি কেহ ফেলে দূর করি
পুন দেই হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণ যদি থাকে দূরে ধাঞা ধাঞা শিশু চলে
পুন আইসে কৃষ্ণ পরশিয়া॥'

শাস্ত্র-জ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর রসময় ভঙ্গিতে বলছেন, '......... পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক

ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়্— কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না।'

জ্ঞান মিশ্রা ভক্তির এইতো পরিণাম। তাইতো প্রভু জ্ঞান মিশ্রাকে বাইরের তোরণে রেখে দিলেন।

এবার রায়ের পঞ্চম প্রয়াস। চিন্তার বলিরেখা দেখা দিল ভালে: ভাবছেন রায়: 'তাই তো, চার চারটে দিগ দর্শন দিলাম, তবুও তো সাধ্যের নিরাকরণ হলনা। আচ্ছা, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি যখন বাতিল হয়ে গেল, তাহলে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা বললে কেমন হয়? দেখা যাক, এবার প্রভু কি বলেন?' তাই যখন জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিকে 'প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর'— তখন 'রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার।'
বলেই সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত দিলেন ভাগবত থেকে:
'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু বাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত
জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম।'

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'হে অজিত, তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্য্যাদির মহিমা বিচার করার জন্য কিঞ্চিৎ মাত্রও চেষ্টা না করে যাঁরা (তীর্থ ভ্রমণাদি না করেও) কেবলমাত্র সাধুদের আবাসস্থানে থেকে সাধুদের মুখে উচ্চারিত এবং আপনা থেকেই কর্ণে প্রবিষ্ট তোমার রূপ গুণ লীলাদি কথার বা তোমার ভক্তদের চরিত কথার কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন। (ভগবৎ কথার বা ভগবদ ভক্ত চরিত কথার শ্রবণকেই নিজেদের

একমাত্র উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন, অন্য কিছুই করেন না।
ত্রিলোক মধ্যে তাঁদের দ্বারাই তুমি বশীকৃত হও।'

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি কি? রায় জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বলতে ঐ তিন জ্ঞান তত্ত্বের বাইরে যে ভক্তি, সেই ভক্তির কথাই বলছেন। জ্ঞান-তত্ত্ব রসশূন্য, আর ভক্তিতত্ত্ব রসপূর্ণ। ভক্তি রসের রসিকই সাধ্যবস্তু লাভ করতে পারেন। রসিক রসেই মাতোয়ারা। তাঁর কাছে তত্ত্বতো অতথ্য মাত্র।

ভাবছেন রায়। তাহলে তো সর্বদিক দিয়েই এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই ভজন পথের অনুকূল। অনুকূল পবন বইছে। এখন পতাকা উড়িয়ে দিয়ে তাতে লিখে দিলেই তো হয় জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধ্য সার। কিন্তু রায়ের রায়ে কি এসে যায়? রায় দেবেন তো গোরা রায়। কেতনে লিখবেন তো তিনি। তাই উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রই-লেন প্রভু পানে। মৃদু হাসলেন প্রভু। প্রভুর হাসি দেখে রায়ের উৎকণ্ঠা গেল। মুখ উজ্জ্বল হল। উজ্জ্বলতর হল যখন

'প্রভু কহে— এহো হয়, আগে কহ আর।'

প্রভু আরো বললেন, 'রায় এতক্ষণে তুমি বহির্দ্বার অতিক্রম করেছ। কিন্তু তোমাকে যে আরো এগোতে হবে। সাধ্যের পথ সুগম নয়। হয় হলেই তো সব হলনা। উত্তম আছে, আছে অপেক্ষাকৃত উত্তম, আছে সর্বোত্তম। তুমি সেই পথে এগোও।

'তাই তো'— আবার ভাবনায় পড়লেন রায়। এই পঞ্চম প্রয়াসের প্রসাদ পেয়েছেন, তবে আংশিক। তাঁকে আরো অগ্রসর হতে হবে।

অগ্রসর হলেন রাম রায়। গোরা রায়েরই কৃপায়। উদ্ভাবনও করলেন এই ষষ্ঠ প্রয়াসে। কি সে উদ্ভাবন?

'রায় কহে— প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার।'

সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন দিলেন। যেমন,

'নানোপচার কৃত পূজন মার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখ বিদ্রুতং স্যাৎ।

যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো নন্বু ভক্ষ্যপেয়ে॥''

— হে ভক্ত! বিবিধ উপচার সহযোগে পুজো ছাড়াও কেবল প্রেম দ্বারাই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হয়ে যায়— যেমন, যে পর্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই পর্যন্ত অন্ন-জল সুখপ্রদ হয়ে থাকে।

গীতার যেখানে শেষ, ভাগবতের সেখানে শুরু। শেষ থেকে শুরু। কি রকম? রকমটি ভাবী মনোজ্ঞ। গীতায় ডোর বাঁধা হয়েছে জ্ঞানমিশ্রাতে। আর ভাগবতের ডোর খোলা হয়েছে জ্ঞান-শূন্যাতে। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির সংবাদ জানালেন ভাগবত। সংবাদের সূত্রপাত হল কিভাবে?

'অন্তরে শান্তি নেই মহর্ষি বেদব্যাসের। এত বড় জ্ঞানী। মহাজ্ঞানী। রচনা করেছেন মহাভারত যার মধ্যে রয়েছে তত্ত্ব ও জ্ঞান ঋদ্ধা গীতা। রচনা করলেন একাধিক পুরাণ। তবুও অন্তর রসশূন্য কেন? রসকুম্ভের সন্ধান পাবেন কোথায়? গেলেন রস-সাগর ভক্তিসাগর দেবর্ষি নারদের কাছে। দেবর্ষি রসের সন্ধান

দিলেন মহর্ষিকে। বললেন, 'মহর্ষি! তুমি এতকাল শুধু জ্ঞান রাজ্যেই বিচরণ করছ। এ রাজ্যে রস কোথায়? রস তো ভক্তি রাজ্যে— প্রেমরাজ্যে। তুমি আত্মসমর্পণ কর অচ্যুতের পদাম্বুজে। তাঁর গুণগান গাও। রসের সন্ধান পাবে।'

নারদ বাক্য বেদ বাক্য জ্ঞানে মান্য করলেন বেদব্যাস। রস বাঙ্ময় মূর্তি ধারণ করল ভাগবতরূপে, মধুর, ভারি মধুর। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি থেকে শুরু হল ভাগবত। তাহলে তো গোল মিটে গেল। ভাল কথা। উত্তম কথা। কিন্তু উত্তম যে প্রভু বলছেন না। প্রভু শুধুমাত্র বললেন, 'এহো হয়' এবং উত্তমের সন্ধানে বললেন, 'আগে কহ আর।'

তাহলে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি উত্তম নয় কেন? জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে জ্ঞান নেই। যথার্থ। কিন্তু জ্ঞান যে নেই— এ জ্ঞানটা তো আছে। এ জ্ঞানটা থাকা মানেই অন্তরদ্বার অর্গল বদ্ধ, অথচ অন্তরতমকে পেতে হবে অন্তরেরই অন্তরতম প্রদেশে।

জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে দর্শন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কালারূপ দেখে মুগ্ধ হলেন, আর শ্রীমতীর মত গাইলেন:

'সবে দুটি আঁখি দিয়াছে বিধাতা রূপ নিরখিব কি?'

নয়ন যখন সক্রিয়, অন্তর তখন নিষ্ক্রিয়। কিন্তু আস্বাদন তো করতে হবে অন্তরে। হৃদয়ে। চোখের ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো আসল নয়— আতসবাজি মাত্র। মুহূর্তেই বিলীন হয়। আসল তৃষ্ণা, কৃষ্ণ তৃষ্ণা তো হৃদয়ের। আর হৃদয়েই জাগে প্রেম।

তাই 'রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব সাধ্য সার।' বলে নিশ্চিন্ত

হলেন। শুধু সাধ্য সার বললেন না, বললেন সর্বসাধ্য সার।

সত্যিই তো প্রেমের ওপর আর কি থাকতে পারে? প্রেমের ঠাকুরকে না প্রেম দিয়েই ভজন করতে হয়। আকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। সে এমনই ধ্যান. এমনই নিবিড়তম সম্বন্ধ যা অনুভব করে বিদ্যাপতি গাইলেন:

"পাখীক পাখ, মীনক পানি
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।"

অনেকটা একই সুরে গেয়েছেন নরোত্তম:

"জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুঃ হীন প্রেম বিনু
এই মত ভক্ত।
চাতক জলদ গতি, এমত একান্ত রীতি, যেই জানে সেই অনুরক্ত॥
লুব্ধ ভ্রমর যেন, চকোর-চন্দ্রিকা তেন, পতিব্রতা জন যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এইমত প্রেমভক্তি রীতি॥"

লালন ফকিরও গাইলেন,

'তার সাক্ষী আছে চাতক রে,
ও সে কোটি সাধনে যায় মরে,
চাতক অন্য বারি খায়না রে
থাকে মেঘের জলের আশায়।'

এমনই আকুলতা। নামান্তরে প্রেম। 'বিনা প্রেম সে নহি মিলে নন্দলালা' গেয়ে শোনালেন জীবনভোর যে মীরা, তাঁর আর্তি এই রকম তাঁর আর্তবন্ধুর জন্য:

'প্যারো দরসন দীজ্যো আয়, তুম বিনা রহো না জায়
জল বিন কঁবল, চংদ বিন রজনী, ঐ যে তুম দেখ্যা বিন সজনী।

দিবস ন ভূখ নীদ নহি রৈন, মুখ সুঁ কথন ন আরৈ বৈনা।
কহা কহুঁ কুছ কহত না আরে মিলকর তপত বুঝায় ॥
কুঁ্য তরসাবো অংতরজামী. আয় মিলো কিরপা কর স্বামী,
মীরা দাসী জনম জনমকী পরী তুমহারে পায় ॥'

একই কথা বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'রাধাকৃষ্ণ— মানো আর নাই মানো এই টানটুকু নাও. ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয় চেষ্টা করো। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়। কথাটা এই তাঁকে ভালোবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে।'

কি রকম ব্যাকুলতা? কি রকম টান? রসিক ঠাকুর ঘর সংসার থেকেই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : 'তিন টান একত্র হলে, তবে তিনি দেখা দেন— বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোর ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।'

হাজারো গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

'বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়।
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি ব্যাকুল হৃদয় ॥
....
আকুল প্রাণ মন ফিরিবেনা সংসারে,
ভুলেছে তোমারি রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগন তলে তব সুধাবাণী সতত উথলে—
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে।

ছুটে যেতে চায় অনন্তেরই পানে,

আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময় ও প্রেম আলয়॥'

এই হচ্ছে প্রেম। এ হেন প্রেমকেই রায় বললেন সর্বসাধ্য সার। কিন্তু গোরারায় যে রামরায়কে উত্তরণের পথে নিয়ে চলেছেন। রায়ের পৌঁছুতে অনেক পথ বাকী। প্রভু বললেন, 'হ্যাঁ, পথ ঠিকই ধরেছ। তবে পথ ধরলেই তো হয় না। অতিক্রম করতে হবে। তোমাকে আরো এগিয়ে যেতে হবে।'

প্রেমের আর্তি নিয়ে কত ভক্ত কবিই না প্রেমারতি করেছেন সেই প্রেমময়ের। যুগে যুগে করেছেন। যেমন করেছেন বিদ্যাপতি, লালন ফকির, মীরা, শ্রীরামকৃষ্ণ আর রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তবুও প্রভু বললেন,

'এহো হয়, আগে কহ আর।'

সাধন পথে এ হেন প্রেমভক্তিও উত্তম হল না কেন? রায় যে এখানে প্রেমকে বিশেষিত করেননি। বিশেষণের অবতংসেই না অপরূপ রূপ নেবে প্রেম। বৈশিষ্ট্য আসবে। আসবে বৈচিত্র্য। তাই প্রভু বললেন, '.................. আগে কহ আর।'

দীর্ঘপথ। তবে দীপ শিখাটি রয়েছে প্রভুর হাতে। দেখাচ্ছেন দিশারী আলো। সেই আলোকে আলোকিত হচ্ছে রায়ের মন। ধীরে ধীরে। স্তরে স্তরে। তাই তাঁর সপ্তম প্রয়াসে

'রায় কহে—দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার।' বলেই দুটো শ্লোকের উল্লেখ করলেন। প্রথমটি ভাগবত থেকে এবং দ্বিতীয়টি যামুন মুনি বিরচিত স্তোত্ররত্ন থেকে। যেমন,

'যন্নামশ্রুতি মাত্রেন পুমান ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্যতীর্থ পদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥'

—দুর্বাশা ঋষি অম্বরীশ মহারাজকে বলেছিলেন যাঁর নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্ব উপাধি মুক্ত হয়ে নির্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসদেব কি আর কোন প্রাপ্য বস্তু অপ্রাপ্ত থাকে অর্থাৎ তাঁদের কোনরকম অভাবই থাকে না।

এবার দ্বিতীয়টি :

'ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তর প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক বা নিত্য কিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথ জীবিতঃ॥'

—সমস্ত বিষয় বাসনা ত্যাগ করে কবে আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্য কিংকরত্ব লাভ করে তোমাব সেবা দ্বারা নিজের জীবনকে ধন্য করতে পারব।

দাস্যপ্রেম কোথা থেকে আসে? —না, আসে দেহবুদ্ধি থেকে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদ। যেমন হনুমান বলেছেন শ্রীরামচন্দ্রকে :

'দেহবুদ্ধ্যা তু দাসোঽস্মি ………………।'

অর্থাৎ তুমি প্রভু, আমি দাস। তোমার সেবাই আমার একমাত্র বাসনা।

কবীরেরও একই ভাব :

'প্রভু ম্যয় গোলাম। ম্যয় গোলাম। ম্যয় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান। তু দেওয়ান। তু দেওয়ান মেরা।'

রামরায় এখানেও দাস্যভক্তির কোন প্রকার ভেদ করেন নি। সাধারণ ভাবেই বলেছেন। প্রকার ভেদের প্রয়োজন আছে নাকি?

আছে বৈকি। মথুরা দ্বারকার দাস্য একরকম। আবার ব্রজের দাস্য অন্য রকম। মথুরা দ্বারকায় ঐশ্বর্য। আর ব্রজবাসী ব্রজেন্দ্র নন্দনের মধ্যে ঐশ্বর্য দেখতে পান না— পেলেও তা অপ্রধান। তবে উভয় ভক্তের মধ্যে একই ভাব অর্থাৎ 'তুমি প্রভু, আমি দাস।'

প্রভু দাস্য ভক্তিকে উত্তম স্তরে উন্নীত করলেন না কেন? কি করে করবেন? দাস্যভক্তি যে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

কেমন সে দূরত্ব? যেমন বলেছেন রবীন্দ্রনাথ:

'আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে 'তোমায় ভালবাসি॥'

ভৃত্যতো ভর্তার আজ্ঞাবহ। ইচ্ছাধীন। ভর্তার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। তার নিজের বলে কিছু নেই। নেই কোন সাধ-আহ্লাদ। এষণা— বাসনা। অথচ কত সাধই না ভক্তের প্রাণে জাগে সেব্যের সুখ বিধানের জন্য। তার সাধ জাগে সে তার ইষ্ট দেবতাকে এই এই বেশে সাজাবে— এই এই ভাবে খাওয়াবে। এই এই বস্তুতে সে বিনোদবিহারীর চিত্ত বিনোদন করবে। কিন্তু না, দাস্য ভক্তিতে তা হবার জো নেই। সেব্যের আদেশ পালন করাই যে তার একমাত্র কৃত্য। সেব্যের ইচ্ছার বাইরে কাজ করা তো তার অকৃত্য। ইচ্ছার পূরণ হয় না। ইচ্ছা শুধু হাহাকার করে ঘুরে মরে অন্তরের কোণে। তাই

'প্রভু কহে এহো হয়। আগে কহ আর।'

আবার ভাবনায় পড়লেন রায়। ভাবনায় পড়লেন উত্তমের

সন্ধানে। শুধু উত্তমেই চলবেনা। সর্বোত্তমের সন্ধান করতে হবে। সর্বোত্তম না হয় পরে হবে। আগে তো উত্তমের নিরাকরণ প্রয়োজন।

প্রভু তো ভূতভাবন। সব ভাবনাই না তিনিই ভাবেন। তাঁর কৃপাতেই উত্তমের সমাধান হবে। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ। মিললও বটে। রাম রায়ের চোখের সামনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি ফুটে উঠল। আর তখুনি

'রায় কহে— সখ্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার।' এবং ভাগবতের এই শ্লোকটি অধর মুক্ত হল ঃ

'ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন সার্দ্ধং বিজহ্রু কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥'

— শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন, যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্ম সুখানুভব স্বরূপ, দাস্যভাবে ভজনকারীদের পরমারাধ্য দেবতা স্বরূপ, মায়াবদ্ধ অজ্ঞজনের কাছে নরবালক রূপে প্রতীয়মান, সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অতি সৌভাগ্যবান গোপবালকেরা এইরূপে বিহার করেছিলেন।

রায় তাঁর বক্তব্য নিবেদন করলেন এবং ভাগবত কথামৃত দিয়ে সমর্থন করলেন। জীবের জীবনের পরমতম লক্ষ্যবস্তুই হচ্ছে সাধ্য। সেই সাধ্য নির্ণয়ে সাধ্যাতীত প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন রায়। কত ভাবনা যে তাঁকে ভাবতে হচ্ছে! কিন্তু তবুও তো প্রভুর মনের মত হচ্ছেনা। বীণার তার ঠিকই বাজছে, কিন্তু যে তারটি হৃদয়ের তারে সাড়া জাগায়। সেটি কি বাজছেনা!

সেই স্বধর্মাচরণ থেকে শুরু করেছেন রায়। স্বধর্মাচরণ, কর্মার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, এবং জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিকে তো প্রভু ফুৎকারে 'এহ বাহ্য' বলে উড়িয়ে দিলেন। চার চারটে স্তর পেরিয়ে এলেন রায়। বড়ই নিরাশ বোধ করলেন। প্রভুর কৃপায় আবার চিন্তা করলেন। এরপর পরপর তিনভূমিতে এলেন রায়। অর্থাৎ জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি, প্রেমভক্তি ও দাস্যপ্রেম। এই তিনের প্রথমটিতে—অর্থাৎ জ্ঞানশূন্যাতেই রামানন্দের মুখটি আনন্দে ঝলমল করেছে। চার—চারটে স্তর পার হবার পর এই প্রথম প্রভু 'এহো বাহ্য' না বলে, বললেন 'এহো হয়।'

এরপর চলল 'উত্তম' এর সন্ধান। না, সন্ধান কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। জ্ঞানশূন্যার পর রায় প্রেমভক্তির কথা বললেন। কিন্তু প্রভু বললেন, 'রায়, অন্তর দ্বারের নিকটে এসেও দ্বার স্পর্শ করতে পারছ না। আরো এগোতে হবে। 'উত্তম' কি অত সহজে ধরা দেয়?

রায় এগোলেন। প্রেমভক্তির পর রায় রায় দিলেন দাস্য প্রেমে; কিন্তু গোরা রায় তো রায় দিলেন না। প্রেমভক্তির মত 'এহো হয়-ই বললেন। তারপর রায় তাঁর অষ্টম প্রয়াসে সখ্যপ্রেমের কথা বললেন। শুধু বললেন না, ভাগবত থেকে একটি শ্লোকেরও উল্লেখ করলেন। তাকিয়ে রইলেন প্রভু পানে। সতৃষ্ণ নয়নে। তাঁর বড় আশা এই সখ্যপ্রেমই দেবে তাঁকে উত্তম এর সন্ধান। কিন্তু আশা করলে কি হবে? তাঁর আশার বীজটি যে যুগলপত্র রূপে দেখা দেবে প্রভুর সিদ্ধান্তে।

আচ্ছা, সখ্যপ্রেম উত্তম ভূমি স্পর্শ করবে— এমন আশা রায়ের মনে ঠাঁই নিল কেন ?

দাস্যপ্রেমে সেব্য সেবকে দুস্তর দূরত্ব। আর সখ্যপ্রেমে ? দূরত্ব তো প্রশ্নাতীত। আছে একত্ব। অভেদ ভাব। দাস্যপ্রেমে দেখা যায় সেবকের পা হয়ত লেগে গেছে সেব্যের পায়ে। অপরাধ, মহাঅপরাধ হল। শতকোটি প্রণাম জানিয়ে অপরাধের ক্ষালন হয়ত হবে। কৃষ্ণসখা তা ভাবেন না। কানুর গায়ে পা লেগেছে তো কি হয়েছে। প্রাণসখা কানুর পা আর তাঁর পা কি আলাদা ? দাসতো তাঁর প্রভুকে মনের মত করে সাজাতে পারেন না, খাওয়াতে পারেন না। আর এক সখা ফলের আধখানা খেয়ে বলছেন, খারে কানু খা, ফলটা ভারী মিষ্টি।' বলবে তো। তাঁর যা ভাল লাগবে, তাঁর ভালবাসার ধন কানুর তাই ভাল লাগবে। লাগতেই হবে। নইলে তাঁর প্রাণ চাইল কেন ? প্রাণ যে চাইল প্রাণ সখার জন্য।

শুধু কি এই ? ব্রজরাখালেরা তাঁদের রাখালরাজের সঙ্গে কত খেলাই খেলেন, খেলেন সারাটা দিন ধরে। কখনও লুকোচুরি, আবার কখনও বা ঘোড়া ঘোড়া। খেলায় হেরে গেছেন কানু। অতএব তাঁকে কাঁধে নিতে এক সখাকে। সেই সখা কানাইর কাঁধে চেপে বলছেন, 'হেট, হেট।' চল ঘোড়া চল। চল, চল।' মায়িক জগৎটা যিনি বানিয়েছেন খেলার ঘর, তাঁরই কাঁধে চেপে এই ঘোড়া ঘোড়া খেলা। আহা ! কি মধুর, কি মধুর।

ভাগবত সংবাদ দিচ্ছেন :

'যদি দূরং গত কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥
কেচিদ্ধ বেনূন বাদয়ন্তোধ্যান্ত শৃঙাণি কেচন।
কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ত কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে॥'

—বনশোভা দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ একটু দূরে গেলে 'আমি আগে ছোঁব, আমি আগে ছোঁব' বলে সেই গোপবালকেরা ছুটে গিয়ে কৃষ্ণকে ছুঁয়ে আনন্দ পেতেন।

আহা কত সুভগ এই সখারা। এঁদের সৌভাগ্যের কথা লেখনীতে চিত্রিত করতে ব্যাসদেবই তাঁর অসমর্থতা জ্ঞাপন করেছেন। যেমন,

'যৎপাদ পাংশুর্ব্ববহু জন্ম কৃচ্ছ্রতা ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
সবএব যদ্দগবিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম॥'

—বহুজন্মের কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে স্থিরচিত্ত যোগিরাও যাঁর পদধূলি লাভে সমর্থ হন না, তিনি স্বয়ং যাঁদের চোখের সামনে বিরাজমান ছিলেন, সেই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব?

এই হচ্ছে সখ্যপ্রেম। এহেন সখ্যপ্রেম তো উত্তম হবেই। যথার্থ। রাম রায়ের অনুমান যথার্থ। অনুমানই প্রমাণ হল যখন

'প্রভু কহে— এহোত্তম, আগে কহ আর।'

রায়ের অন্তর সাগরে আনন্দের বান ডাকল। হ্যাঁ। এতক্ষণে তাহলে উত্তম ভূমিতে উত্তরণ হল। তবে যে প্রভু আগের মতই বললেন, '.........আগে কহ আর।' বলবেন বৈকি। উত্তমই তো শেষ কথা নয়। শেষ কথাটা বলতে হবে যে। সেটি কি?

কেন, উত্তমের পর সর্বোত্তমও তো আছে। আছে সাধ্যাবধি।

আবার ভাবনায় পড়লেন রামানন্দ। এখন উত্তমের ওপরের ভূমিতে উত্তরণের প্রয়াস। সেই প্রয়াসে

'রায় কহে— বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার।' এর সঙ্গে যোগ করলেন ভাগবতের দুটো শ্লোক ঃ

"নন্দ ঃ কিম করোদ ব্রহ্মণ! শ্রেয় এবং মহোদয়ম।

যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥"

—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন। 'হে ব্রহ্মণ! গোপরাজ নন্দ মহাফলজনক এমন কি পুণ্য করেছিলেন? আর সেই সৌভাগ্যবতী যশোদাই বা কি পুণ্য কার্য করেছিলেন যাঁর স্তন সাক্ষাৎ শ্রীহরি পান করেছিলেন?'

আর অপর শ্লোকটি ঃ

'নেমং বিরিঞ্চোঃ ন ভবো ন শ্রীরপাঙ্গ সংশ্রয়া।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তি দাৎ॥'

—মুক্তি প্রদ ভগবানের কাছে যশোদা যে অনুগ্রহ লাভ করলেন, তা ব্রহ্মা, শিব, এমন কি তাঁর বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত লাভ করতে পারেন নি।

'রায় কহে— বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্য সার।'

রায়ের এই নিবেদনে গোরা রায়— রায় দিলেন, '.........এহোত্তম আগে কহ আর।'

না, পরের স্তরে উত্তরণ হল না। ঐ সখ্যপ্রেমের ভূমিতেই থেকে গেলেন রায়। সখ্য ও বাৎসল্য—এই দুইয়ের স্তর সমান্তরাল

এবং গুণ বৈশিষ্ট্যে সমান। সখ্যপ্রেমে ব্রজসখাদের ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই শ্রীকৃষ্ণে। তেমনি ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই মা যশোদারও। তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন, তাঁর গোপাল।

দাদা-ভাইয়ে খুনসুটি। একে অপরের দোষ পেলেই ছুট দেন মায়ের কাছে নালিশ জানাতে। বলরাম ছুটে গিয়ে নালিশ পেশ করলেন। 'মা, মা, কানাই মাটি খেয়েছে।' মা যশোমতী ছুটে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ মুখ কাঁচু মাচু করে বললেন, 'না মা, মিছে কথা। দাদা মার খাওয়াবার জন্য শুধু শুধু বানিয়ে বলছে। আমি মাটি খাইনি। এই দেখনা, আমার মুখ দেখ।'

মা বললেন, 'দেখি দেখি, হাঁ করতো।' হ্যাঁ, মাটিই বটে। গোটা মাটির পৃথিবী তো বটেই, অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই মা দেখলেন পুত্রের মুখের মধ্যে। মা ভয় পেলেন। না, না, ঐশ্বর্যজ্ঞানে নয়। কোন অশুভ শক্তি ভর করেছে বুঝি বা তাঁর বাছার ওপর। চিন্তামণির জন্য চিন্তা হল মায়ের। মায়ের কাছে শ্রীকৃষ্ণ যে গোপাল— নাড়ু গোপাল— ননীচোরা গোপাল।

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে এ ভাবটি এই রকম ঃ "কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না। উদ্ধব বললেন, 'মা, তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, যিনি জগৎ চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন।'

যশোদা বললেন, 'ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি। চিন্তামণি না, আমার গোপাল।'

ছেলের মুখের ভিতর মা দেখলেন বিশ্বরূপ। অর্জুনও দেখেছিলেন। তবে যোগ্যতা সম্বন্ধে অর্জুনের সংশয় ছিল। তাই

বলেছিলেন 'মন্তসে যদি তচ্ছকং...............।' বলেছিলেন মানে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। মা যশোদার ক্ষেত্রে যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোন কথা নেই। প্রার্থনা তো প্রশ্নাতীত। তিনি দেখতেও চাননি। শ্রীকৃষ্ণই না স্বেচ্ছায় দেখালেন। দেখালেন ঠিকই, তবুও মায়ের মধ্যে ঐশ্বর্য বোধ এলনা—এলনা বিশ্বরূপ বোধ। তাহলে এল কি? —না, দুর্ভাবনা। বাছার কি কোন অমঙ্গল ঘটল ?

মা তাঁর নিজের চোখেই দেখলেন। দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন হয় নি। আর প্রাকৃত চোখে অর্জ্জুনের কাজ হয় নি। তাই 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ' বলে দিব্য চক্ষু দিয়েছিলেন ভগবান।

বিশ্বরূপ দেখে ভীত উভয়েই। অর্জ্জুন ভীত নিজের জন্য— এই কায়ব্যূহরূপ সহ্য করতে পারলেন না।

আর মা ভীত নিজের জন্য নয়— তাঁর গোপালের জন্য। অকারণ কৌতূহলের তাড়নায় বিশ্বরূপ দেখে অর্জ্জুন হারালেন তাঁর সখা কৃষ্ণকে। সখ্য তখন রূপ দিল ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার। সে এমনই শ্রদ্ধা যে সখ্যভাবে যে রঙ্গরসিকতা করেছেন তার জন্য অর্জ্জুন বলছেন 'তৎ ক্ষাময়ে তামহমপ্রমেয়ম।'

আর মা? বাৎসল্য শিথিল তো দূরের কথা— সুদৃঢ় হল। ছেলের অমঙ্গল চিন্তায় ছেলের হাত তিনি মুঠিতে শক্ত করে ধরলেন।

বাপরে বাপ! কি দস্যি ছেলে। মা যশোমতী আর পেরে ওঠেন না। গোপাল ঘুমোচ্ছিল। ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠল স্তন্যপানের নেশা। মা তখন দুগ্ধ মন্থনে ব্যস্ত। ওদিকে উনি উনুনে দুধ চাপিয়ে এসেছেন। কার ব্যস্ততা

কে দেখে ? গোপালের যে এখন মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার নেশা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ মন্থন দণ্ডটি চেপে ধরল। যশোদা হেসে ফেললেন। পাগল ছেলে! কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। হঠাৎ ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে তিনি ছুটলেন কড়ার দুধ সামলাতে। দুধ যে উথলে পড়ে যায়। এদিকে ছেলের দুধের নেশা কাটেনি। রাগ হল। রাগে গোপাল একটা দধিভাণ্ড ভেঙ্গে ফেলল। আবার কাঁদলও। কাঁদতে কাঁদতে আরেক ঘরে গিয়ে ননী খেতে লাগল।

মা দুধ সামলে এসে দেখেন দধিভাণ্ড ভাঙ্গা। এটা যে তাঁর সুপুত্রেরই কাণ্ড— বুঝতে বাকী রইল না। দেখলেন অদূরে দাঁড়িয়ে নিজেও ননী খাচ্ছে, আর খাওয়াচ্ছে বাঁদরদেরও। দণ্ড হাতে ছুটলেন মা। আহা! কি মধুর দৃশ্য : বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দণ্ড যাঁর হাতে দণ্ড হাতে যশোদা ছুটলেন তাঁকে দণ্ড দিতে। বলিহারি! মাকে দেখে ছেলেও ছুটল। পেছনে পেছনে ছুটলেন মাও। পেরে উঠছেন না। নিতম্বভারে মন্থরগতি মা যশোমতী। তাই পেরে উঠছেন না। আর ঐ দস্যি ছেলের সঙ্গে কে-ই বা পারবে? সত্যিই তো কে তাঁকে ধরতে পারে? কত যুগ ধরে কত যোগী জপ করছেন তাঁকে পাবার জন্য! কে-ই বা পাচ্ছেন?

কিন্তু মা যশোদা ধরে ফেললেন। ধরা দিলেন, তাই ধরতে পারলেন। মা বললেন, 'এত তোর দস্যিপনা। দাঁড়া। মজা দেখাচ্ছি। তোকে আজ বাঁধব।' —বলে শ্রীকৃষ্ণের পেট বাঁধতে গেলেন উদুখলের সঙ্গে চুলের ফিতে দিয়ে। ও মা, দু আঙ্গুল কম

পড়ে গেল যে। ঘরের ভিতরে গেলেন। দড়ি নিয়ে এলেন। ও হরি! এবারও যে দু আঙ্গুল কম পড়ে গেল। ঘরে যত দড়ি ছিল, সবই নিয়ে এলেন। না, তাও দু আঙ্গুল কম। ঘেমে গেলেন মা যশোদা। বেণীর বাঁধন খুলে গেল। কুন্তল কুসুমও খসে পড়ল। আহা! কি অপূর্ব দৃশ্য। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি বেঁধে রেখেছেন, তাঁকে বাঁধতে চেষ্টা করছেন কে? —না, আলাভোলা গোয়ালিনী। পুরে যিনি শয়ন করেন অর্থাৎ সমস্ত শরীর বিস্তার করে যিনি ব্রহ্মাণ্ডপুরকে বেঁধে রেখেছেন, তিনিই না পুরুষ। আর তাঁকেই কিনা বাঁধতে চেষ্টা করছেন এক ব্রজাঙ্গনা।

যা হোক, শেষকালে বেঁধে ফেললেন মা তাঁর দুরন্ত গোপালকে। বেঁধে ফেললেন? না, স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়লেন। বাৎসল্য প্রেমে বাঁধা পড়লেন।

কি উত্তম লীলা, লীলা পুরুষোত্তমের। তাই না শ্রীহরির এই বাৎসল্য প্রেমকে গৌরহরি বললেন 'এহোত্তম।'

উত্তম তো প্রভু বললেন, কিন্তু এই নবম স্তরে এসেও যে বললেন, 'রায়, সর্বোত্তমে এখনও পৌঁছতে পারনি। তবে ছুঁই ছুঁই করছ। আর একটু এগোও। সাধ্যাবধির ভূমিতে পৌঁছুতে পারবে।'

রায় উৎসাহিত হলেন। ভাবনার জাল বুনতে লাগলেন মনে। হ্যাঁ, পেয়েছেন, পেয়ে গেছেন। সাধ্যের অবধি তাঁর আয়ত্তে। তাই

'রায় কহে— 'কান্তা প্রেম সর্বসাধ্য সার।' বলে ভাগবত থেকে উচ্চারণ করলেন দুটো শ্লোক ঃ

"নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ-উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং
নলিন গন্ধরচাং কুতোহন্যাঃ ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্
ব্রজসুন্দরীণাম ॥"

— রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাহু পাশে আবদ্ধা ও কণ্ঠলগ্না হয়ে ব্রজাঙ্গনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় তাঁরা যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন, সেই প্রসাদ নারায়ণ বক্ষোবিলাসিনী পরম প্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেননি এবং পদ্মগন্ধা ও পদ্মকান্তি অপ্সরাগণও লাভ করেননি। অন্য রমণীদের তো কথাই নেই।

দ্বিতীয় শ্লোকটি হচ্ছে :

"তাসামাবিরভুচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ॥"

— শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছিলেন শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজাঙ্গনাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন— তাঁর বদন কমল প্রফুল্ল, পরিধানে পীতবাস, গলে বনমালা, রূপে সাক্ষাৎ মদনমোহন।

এই দশম স্তরে এসে রাম রায় কান্তা প্রেমকেই সর্বসাধ্য সার বললেন। বলে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন রামানন্দ প্রভুর দিকে। শ্রীমুখ থেকে কি সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। মনটা আঁথে-ব্যথে অস্থির। কি জানি কি হয়!

আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসিতে প্রভুর মুখাবয়ব ঝলমল করে উঠল। আর এই হাসি দেখে রামানন্দের কি হল? এই দক্ষিণ দেশের মহারাজ হয়ে যে আনন্দ পেয়েছেন এতকাল, সে আনন্দ আজ

সাধ্য নির্ণয়ে ম্লান হয়ে গেল যখন

"প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥"

হ্যাঁ, এই দশম স্তরে এসে শচীমাতার দশম সন্তান বললেন এই কান্তা প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু। আবার বললেন 'সুনিশ্চয়।' শুনে সুনিশ্চিন্ত হলেন আর সুখ সাগরে ভাসলেন রায়।

সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু কান্তা প্রেম। প্রভুর স্থির সিদ্ধান্ত। কেন? এর উত্তরের পূর্বক প্রশ্নটি হচ্ছে – কান্তা কে? কান্তা হচ্ছেন ব্রজ বনিতা। কান্তা বলা হল কেন? পরকীয়া রস ভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারিনী যে গোপীরাই। তাই তাঁরা কান্তা। এঁদের প্রেমই কান্তা প্রেম— জীবের জীবনের পরম ও চরম আরাধ্য বস্তু। একমাত্র এঁরাই যে ত্যাগ করেছেন তাঁদের কান্তের জন্য। কি ত্যাগ করেছেন? কি ত্যাগ করেননি? দেহ, গেহ, মান, কুল, জাতি, লোক লজ্জা, লোকভয়, পতি, পুত্র— সবই ত্যাগ করেছেন এঁরা। কিসের বিনিময়ে? কোন কিছুরই নয়। বিনিময় এঁরা চাননা— জানেনও না। তাহলে কি এঁরা কৃষ্ণের কৃপা চান? কৃপা? সে তো চান মথুরাঙ্গনারা। এঁরা তো ব্রজাঙ্গনা। তবে কি দর্শন চান? — না, তাও চান না। চান শুধু তাঁর কুশল। তাই বলেন, 'বল বল তব কুশল শুনি/তোমার কুশলে কুশল মানি।' কৃষ্ণ বিহনে 'দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।' যাক্, তাতে দুঃখ নেই। দুঃখ আছে, নেই দুঃখ বোধ। তাই গোপী ঠাকুরাণী শুধোচ্ছেন, 'মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল?'

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখেও একই কথা : 'যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণ সুখে সুখী, তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক। .... গোপীদের এইভাব বড় উচ্চ ভাব।'

তাই ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপীদের কাছে কৃপাময় নয়, প্রেমময়— তাঁদের প্রাণবল্লভ। তাঁরা কিছু চান না, নেন না। শুধুই দেন। এমন কি কাম পর্যন্ত। কাম? হ্যাঁ, কাম। অচ্যুত চরণে অর্পিত হওয়ার পর সেই কাম হয় হেম— নিকষিত হেম। এই হচ্ছে গোপীর ভজন।

ভজন সরণী বড়ই দীর্ঘ। সাধন ভক্তি থেকে শুরু। তারপর রতি। রতির পর প্রেম। প্রেম থেকে স্নেহ। স্নেহ ঘনীভূত হয় মানে। মান সান্দ্র হয় প্রণয়ে। প্রণয়ের পরিণতি রাগে। রাগ থেকে অনুরাগ। অনুরাগের পুষ্টি ভাবে। আবার ভাব পরিপক্ক হয় মহাভাবে। মহাভাবের শেষ সীমা মাদনাখ্য মহাভাব। এই মাদনাখ্য মহাভাবই হচ্ছে শ্রীমতীর হৃদয়ের গোপিত ধন। এ ধনে ধনী শুধুমাত্র রাইধনি— একা একেশ্বরী। কান্তা ও কান্তা-ভাবের কিঞ্চিৎ আলো পাওয়া গেল কান্তাভাব আবার দ্বিবিধ : স্বকীয়া কান্তা ও পরকীয়া কান্তা।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এবং দ্বারকার রুক্মিণী, সত্যভামাদি স্বকীয়া কান্তা। আর ব্রজগোপীরা হচ্ছেন পরকীয়া কান্তা। এঁদের মধ্যে প্রভেদ আছে নাকি? নিশ্চয়ই। এঁরা বিপরীত মেরুর অঙ্গনা। স্বকীয়াতে তদীয়তা। স্বকীয়া কান্তা বলেন, 'আমি শ্রীকৃষ্ণের।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের একাধিক সেবিকা আছেন— আমি তাঁদের অন্যতম।

আর পরকীয়াতে মদীয়তা। পরকীয়া ভাবের ব্রজরামা বলেন 'আমারই শ্রীকৃষ্ণ।'

স্বকীয়া কান্তা ছুটে যান দ্বারকা পতির পদ প্রান্তে। আবার একটা অহং এর উপাধিও আছে। দ্বারকানাথ আমার নাথ, আর আমি তাঁর রাজমহিষী। তাই এঁদের সঙ্গে লীলা পুরুষোত্তমের লীলা হয় না।

আব সেই নবকিশোর নটবর গোপবেশ বেণুকর ব্রজরামাদের সঙ্গে সদা সলীল হয়ে পবকীয়া ভাবের বস আস্বাদন করেন। তাই

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ এই রসের উল্লাস। পরকীয়া কান্তায় আছে পূর্বরাগ, মান, আর আছে অষ্টবিধ নায়িকার ভূমিকা। সে বড মধুর ভূমিকা। নিত্যই নূতন। তাই এত তীব্র আকর্ষণ। আট রকম ভাব. আট রকম আস্বাদন।

দয়িতের আকর্ষণ বড়ই তীব্র। সংকেত কুঞ্জে যেতেই হবে। ঘরে গুরুজনের বারণ, বাইরে গুরু গুরু গর্জন। পথে শত সর্পের বিচরণ। তবুও যেতে হবে। ঐ নীরন্ধ্র অন্ধকার পথেই যেতে হবে। যেতে হবে একা। অভিসারে যে একাই যেতে হয়। ইনি অভিসারিকা। জ্ঞানদাস এঁকে চিত্রিত করেছেন এইভাবে :

'কানু অনুরাগে হৃদয়ে ভেল কাতর
রহই ন পারই গেহ।
গুরু দুরুজন ভয় কিছু নাহি মানয়
... ... ।

ঘন আন্ধিয়ার ভুজগ ভয় শত শত
তব নহি মানয়ে ভীত
সখীগণ তেজি চললি একেশ্বরী
... ... ।'

স্বকীয়া কান্তায় এই অভিসার তো শশশৃঙ্গ মাত্র। রাজ মহিষী রুক্মিণী দেবী থাকেন রাজ প্রাসাদের কনক পালঙ্কে। দ্বারকাধীশ তাঁর পতি, তাঁর আর ভাবনা কি? নিত্যদিনের জীবন একই রকম। প্রীতি রস আস্বাদনে কোন অভিনবত্ব নেই। নেই কোন তীব্রতা। প্রিয়তাবোধ গতানুগতিক, আজও যা, কালও তাই। একেবারেই একঘেয়ে। পানীয় আছে, তৃষ্ণা নেই। পানীয়ের আস্বাদন আর হবে কি? পানীয় গ্রহণ করতে হয়, তাই করা হয়।

দয়িতের সঙ্গে মিলন হবে। হবে গভীর রাতে। সংকেত কুঞ্জে। সেই বিহান বেলা থেকেই বাসরের সাজসজ্জা। শুধু কি সেজেরই, শুধু কি গেহেরই? না, দেহেরও। কত রকম সাজসজ্জা। কত পরিপাটী করে নায়িকা বিন্যাস করেছেন তাঁর কুঞ্চিত কেশ-কলাপ। শুধু কি বিন্যাস? — তাতে করেছেন ফুলসজ্জা। কত রকম কুসুম: মালতী, মল্লিকা, যূথি। শুধু কি কবরীই ফুলে ছাওয়া? ফুলময় হয়েছে বাহু বল্লরী, হয়েছে গলদেশ। তাম্বুলে রাঙা হয়েছে ওষ্ঠাধর। নয়নকোণে কাজলের রেখা। শ্রীমতীকে দেখে রূপ মঞ্জরী বলছেন,

'মদন কুঞ্জপর বৈঠল সুন্দরী নাগর মিলব আশে।
নব নব কিশলয়ে সেজ বিছাওল কুসুম নিকর চারুপাশে॥

সুন্দরী সাজল বাসক সাজ।
প্রেম জলধিজল নিগমন ভাবই আওব নাগরবাজ॥
কত কত আভরণ নেওল অঙ্গহি বদনে সুধাসম হাস।
দেখ দূতী নাগর কতদূর আয়ত ঘন কহে ঐছন ভাষ॥"

রবীন্দ্র বাণীতে বাসকসজ্জিকা ধরা পড়েছেন এইভাবে:

"আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে কুসুম চয়ন রে॥
... ...
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায় নীলবাসে তনু ঢাকিয়া।
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে একেলা রয়েছি জাগিয়া॥"

এ নায়িকা বাসক সজ্জিকা।

স্বকীয়াতে স্ব সজ্জা কোথায়? সাজসজ্জা তো করে দেয় শত শত পরিচারিকা। কনক চাঁপার ভূষণ নেই। কনকাভরণেই ভারাবনতা।

সেজ সাজিয়েছেন কত ফুলে। কত ফুলে সেজেছেন নিজেও। ফুলের মালা গেঁথেছেন কত ফুল চুনে চুনে। পড়ে পাতের ওপর পাত— 'ঐ বুঝে এল প্রাণনাথ' বলে নায়িকা ছুটলেন। কোথায় তাঁর প্রাণনাথ? আশাহত নায়িকা ঘরে ফিরে এলেন। আবার প্রতীক্ষা। ইনি উৎকণ্ঠিতা। এঁকে জ্ঞানদাস এঁকেছেন এইভাবে:

সেজ বিছাইয়া রহিলু বসিয়া
পথপানে নিরখিয়া॥
সই, কি করব কহ মোরে।

এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগ ভরে ॥
এ হেন রজনী কেমনে গোঙাব
বঁধুর দরশন বিনে।
বিফল হইল সব মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে ॥”

আর রবীন্দ্রনাথ গাইলেন,

‘দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি ॥
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই
‘কে আসিছে’ বলে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখি ॥’

স্বকীয়াতে কোন উৎকণ্ঠা নেই। সত্যভামা দেবী না দ্বারকাধিপতিকে সদা-সর্বদাই তাঁর চোখের সামনে পাচ্ছেন, এমন কি যুদ্ধ যাত্রায়ও তিনি সঙ্গিনী।

সংকেত স্থান, সংকেত সময়— সবই ঠিক। একটি শুধু ঠিক নাঃ প্রাণনাথ এলেন না। বেদনাহত হলেন নায়িকা। ওঁর মধ্যে দেখা দিল নির্বেদ, চিন্তা, অশ্রু, মূর্ছা ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস। যেমন, শ্রীমতী বলছেন বিশাখাকে :

‘চান্দ উদয় ভেল অম্বর মাঝ।
অবহু না আওল নাগর রাজ ॥

সো বর নাগর বাঞ্চল মোহে।
কোন্ যুবতী রসে বান্ধল তাহে॥
বিরহ দহনে অব মঝু প্রাণ যায়।
কি করব সখি, কহ না উপায়॥'

— বলেই বঞ্চনার বেদনায় মূর্ছা গেলেন। ইনিই বিপ্রলব্ধা। স্বকীয়াতে— না আছে সংকেত স্থান, না, সংকেত সময়। বঞ্চনাও নেই, নেই মূর্ছাও। রসাস্বাদন হবে কি করে?

যামিনীর শেষ যাম। নাগর এলেন শ্রীমতীর কাছে। এসেই ধরা পড়ে গেলেন। সারা নিশি অপর নারী সম্ভোগ করে এসেছেন। সম্ভোগের চিহ্ন সারা অঙ্গে। বসন বদল হয়ে গেছে। পীতাম্বর হয়েছে নীলাম্বর। কপালে সিঁদুরের দাগ।

এ হেন নায়ককে দেখে কোন্ নায়িকার না রাগ হয়? হল শ্রীমতীরও। তাই রুষ্ট কণ্ঠে বললেন,

'চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান॥
হাম বনচারী বঞ্চি একেশ্বরিয়া।
চাতুরী না কর চলহ শত ঘরিয়া॥
মিছাহি শপথি না কর মোর আগে।
কেমনে মিটায়াব ইহ রতি দাগে॥
যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত আর॥'

ইনিই খণ্ডিতা। পরকীয়ার পরমাশ্চর্য রস। বঞ্চনাতে রস তৃষ্ণা

বাড়ে। শুধুমাত্র পরকীয়াতেই এ রসের আস্বাদন।

না, শ্রীমতীর মান ভাঙ্গল না। কোন কিছুতেই না। কত যে অনুনয় বিনয় করলেন মাধব— আহারে! একেবারে রাইধনীর পদ পল্লবে পতিত হয়ে। কণ্ঠে কতই না মিনতি। যেমন,

'চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে॥'

না, তবুও মানিনীর মান ভাঙ্গলনা। প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেলেন মাধব।

এখন পরিতাপ। প্রচণ্ড পরিতাপ। ভানু বালার পরিতাপ নন্দলালার জন্য। রাইকিশোরী সখীদের বলছেন,

'করিয়া আদর সে বর নাগর আনি দিল মোরে মালা।
মানের ভরমে দূরেতে ফেলিনু করিয়া পরম হেলা॥'

এও এক রস। কলহান্তরিতার রস— একমাত্র পরকীয়াতেই।

নায়িকা বিধুরা। প্রাণকান্ত গেছেন প্রবাসে। দূর দেশে। কবে ফিরে আসবেন? নায়িকার অজানা। তাই শুধু পথ চেয়ে বসে আছেন।

না, শুধু বসে বসে কি দিন ফুরোয়? তাই নায়িকা প্রবাসী নায়কের গুণগান গাইছেন। কখনও বা মূক হয়ে চিন্তা মগ্না। আবার কখনও রাতের পর রাত জাগছেন। দেহ লতায় আসছে শুষ্কতা. শীর্ণতা।

এই অবস্থার নায়িকা হচ্ছেন প্রোষিতভর্তৃকা।

নায়িকার স্বাধীন ভূমিকা। নায়ক সদাই তাঁর অধীন। নায়িকাই দেন আদেশ-নির্দেশ। আর নায়ক করেন পালন। তাই এঁর নাম স্বাধীন ভর্তৃকা। প্রোষিতভর্তৃকার বিপরীত মেরুতে এঁর বাস। তাই রাই কিশোরী নবকিশোরকে আদেশ করলেন :

'রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং

… … … …পদে কুরু নূপুরাবিতি।'

যেমন আদেশ, তেমন কাজ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুচদ্বয়ে কস্তুরীপত্র, জঘনে কাঞ্চি, কবরীতে পুষ্পমালা, বাহুতে বলয় এবং চরণে নূপুর পরিয়ে দিলেন।

আহা, কি মধুব লীলা! স্বকীয়া কান্তার এ স্বাধীনতা কোথায় ?

পরকীয়া প্রেম আরও একটি গুণে বড়। এ গুণটি হচ্ছে পূর্বরাগ। ভারি মিষ্টি এই লীলাটি। ফার্স্ট ফ্লেম অব লাভ। কিভাবে হল ? একদিন রাইধনী যমুনায় জলকে গেলেন, আর অমনি 'পহিলহি নয়ন ভঙ্গ ভেল।' তাই শ্রীমতী বলছেন,

'যমুনার জলে যাইতে সজনি কালারূপ দেখিয়াছি।
সবে দুটি আঁখি দিয়াছে বিধাতা রূপ নিরখিব কি ?'

এর ফলে কি হল ?

'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥'

আর কি করেন ?

'সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা ॥'

পূর্বরাগের নায়িকা রবীন্দ্রনাথের সামনে এইভাবে দেখা দিয়েছেন ঃ

'এখনো তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশি শুনেছি—
মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥
শুনেছি মূরতি কালো,
তারে না দেখাই ভালো।
সখী, বলো আমি জল আনিতে যাব কি ॥'

এই লীলারস স্বকীয়া প্রেমে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু স্বকীয়া রুক্মিণী দেবী যে পত্রে তাঁর ভাব নিবেদন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। সে তো তাঁকে উদ্ধারের জন্য— তাঁর ভাই রুক্মির হাত থেকে। এতে তো পূর্বরাগের সামান্যতম স্পর্শও নেই। থাকবেই বা কি করে ? রুক্মিণী দেবী তো লীলাবিলাসিনী নন। সামান্যতম রঙ্গ রসিকতাও তাঁর রসবোধের বাইরে। সে এক কাহিনী বটে। অল্পেতেই বিস্তর হল। বিন্দুতেই সিন্ধু দেখা দিল, আর সেই সিন্ধুতে তখন হাবুডুবু খেলেন শ্রীকৃষ্ণ। পরিহাসের কি নির্মম পরিণাম। শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

'বৈদর্ভ্যেতদ বিজ্ঞায় ত্বয়া দীর্ঘ সমাক্ষয়া।
বৃতা বয়ং গুণহীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লঘিতা মুধা ॥'

— হে বিদর্ভ রাজ নন্দিনী !' তুমি দূরদর্শিনী নও। এইজন্যই

আমি যা বললাম, তা না জেনে আমার মত গুণহীন ব্যক্তিকে বিবাহ করেছ। ভিক্ষুকরাই আমার গুণগান করে।

একটু সতর্ক করে উপদেশ দিলেন :

'তস্মাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম।
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে॥'

-- অতএব এখনও সময় আছে। তুমি সেই ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর যাঁকে পেলে তুমি পরম সুখ লাভ করবে— কি ইহলোকে, কি পরলোকে।

ব্যস! যেই না বলা, অমনি 'আমার তাহলে কি হবে' বলে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়লেন রুক্মিণী দেবী। — যুগপৎ ভয়ে ও দুঃখে।

দৃশ্যটি ভাগবত এঁকেছেন এইভাবে :

'তস্যা সুদুঃখভয় শোক বিনষ্ট-বুদ্ধেহস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।

দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন রম্ভেব বায়ুবিহতা প্রবিকীর্য কেশান॥'

--- অপ্রিয় কথা শুনে অত্যধিক বেদনাহত হলেন রুক্মিণী দেবী। এই বুঝি কৃষ্ণকে হারালেন— এই ভয় দেখা দিল তাঁর মনে। তাহলে 'আমার কি হবে?'— এই দুর্ভাবনায় বুদ্ধি হারালেন। হাতের বালা শিথিল হল। ব্যজন মাটিতে পড়ে গেল। আর তিনি নিজে অচেতন হলেন। কুন্তল দাম ঝলমল করতে লাগল। আর তিনি কদলী তরুর মত ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

ঐ যাকে বলে হরিষে বিষাদ। বিদর্ভ রাজনন্দিনীর সঙ্গে নয়,

রঙ্গলীলা— অষ্টবিধ নায়িকার লীলা চলে বৃষভানু নন্দিনীর সঙ্গে। স্বকীয়া প্রেমে নয়, পরকীয়া প্রেমে। এহেন পরকীয়া প্রেমের অধিষ্ঠান কোথায়? - না, ব্রজধামে, শুধুমাত্র ব্রজধামে। অন্য কোথাও না। কেন? —একমাত্র ব্রজধামই যে কারণাতীত। বহিরঙ্গ ভাবের অতীত। মায়িক লীলার উর্ধ্বে।

'ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।' তিনরূপ: সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ এ তিনি প্রতাপঘন, চিৎ এ প্রজ্ঞাঘন আর আনন্দে প্রেমঘন। অধিষ্ঠানও ত্রিবিধ: দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন। দ্বারকা ধর্মভূমি— এ ভূমিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন, মথুরা কর্মভূমি এবং বৃন্দাবন লীলাভূমি। ত্রিবিধ সত্তা, ত্রিবিধ শক্তি, ত্রিবিধ লীলা-স্থল। অন্তরঙ্গ লীলা শুধুমাত্র ব্রজধামে, তাই তিনি এস্থলে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর আর দ্বারকায় পূর্ণ। ব্রজরস আস্বাদন মায়িক জগতের লীলা নয়, প্রকাশ কিন্তু মায়িক জগতেরই নর-নারীর মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে।

তাই পরকীয়া প্রেমই শ্রেষ্ঠতর প্রেষ্ঠতরও। কিন্তু পরকীয়া প্রেমে যে এক বিসদৃশ অশালীনতার গন্ধ!

কথা কি লোকে শুধু সাদামাঠাভাবেই বলে? কত কলা কৌশলেই না কত কথা বলে। বলে রূপকেও। এই সেই রূপক— allegory আধ্যাত্মিক রূপক— **Spiritual allegory.** বয়সটা দেখতে হবে তো। বয়সে যে তিনি কিশোর। সেই কিশোর পরকীয়ার সঙ্গে কিসের লীলাবিলাস করবেন?

রাধা কে? কই, এই বৃষভানু নন্দিনীর তো কোন উল্লেখ

নেই রাস পঞ্চাধ্যায়ে। এ নামটি হচ্ছে সাধক-সাধিকার প্রতীক বা প্রতিভূ— **prototype.** ব্রজে একমাত্র ব্রজেন্দ্র নন্দন ছাড়া সবাই তো নারী। পুরুষ হয়েও সাধন ক্ষেত্রে নারী।

একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল মীরার জীবনে। মীরাবাঈ গেলেন ব্রজে। রূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। গোঁসাইজী সংবাদ পাঠালেন তিনি রমণী মুখ দর্শন করেন না। মীরা বললেন, 'কি এত অহংকার গোঁসাইজীর। ব্রজধামে তো একমাত্র ব্রজেন্দ্র নন্দনই পুরুষ।' রূপের ভুল ভাঙ্গল। এসে সাদরে ভগিনী সম্বোধনে অভ্যর্থনা জানালেন।

তাহলে এই নারীরূপের কল্পনা কেন? সদৃশ সত্তায় প্রেমের আর্তি-আকুলতা আসেনা। জাগে না সেই তীব্রতা, নিত্য নবীনতা যা জাগে বিসদৃশ সত্তায়। মায়িক জগতে এটাই স্বাভাবিক। যার মধ্যে যে গুণের অভাব, সেই অভাব পূরণের জন্য তার আকর্ষণ সর্বাধিক সেই গুণের প্রতি। পুরুষের মধ্যে নারী গুণের অভাব, তাই নারীর প্রতি তার এত আকর্ষণ, আবার নারীর মধ্যে পুরুষ গুণের অভাব, তাই পুরুষের প্রতি নারীর এত আকর্ষণ। ঠিক এই চিত্রটিই চিত্রিত হয়েছে অপ্রাকৃত জগতে। সাধন মার্গে এই পদ্ধতিটি সাধন ভজনের বড়ই সহায়ক। যেমন, ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার আমাদের সংবাদ দিচ্ছেন:

'For long years Ramakrishna dressed himself as a Cowherd or a milk maid to be able to realise the experience of that form of piety in

which the human soul was like a faithful wife, a loyal friend to the loving spirit which is our Lord and Friend.'

আকুতি জানাচ্ছেন ভক্তোত্তম নরোত্তমও :

"হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ প্রকৃতি হইব॥"

এই তো সেদিনের কথা। নবদ্বীপের ললিতা সখীর কথা কে না জানেন? ললনা বেশে ভজন করতেন। এমন ললনা বেশ যে নাকে নথও পরতেন।

অয়স্কান্ত মণির আছে দুটো দিক। উত্তর ও দক্ষিণ। একটি মণির উত্তর দিক আরেকটি মণির উত্তর দিকে রাখলে হয় বিকর্ষণ। আর দক্ষিণ দিকে রাখলে হয় আকর্ষণ। নারী পুরুষেরও সেই আকর্ষণ। এ আকর্ষণ যেমন তীব্র, তেমনি নিত্যনতুন, যা নেই পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে।

সে দিন পিতৃশ্রাদ্ধ। বিল্বমঙ্গল পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করলেন। করলেন ঠিকই, মনে কিন্তু ঐ এক চিন্তা : কখন চিন্তার সঙ্গ সুখ উপভোগ করবেন। এই চিন্তা বা চিন্তামণি কে? — না, এক বারবধূ। অনবদ্যাঙ্গী। বিল্বমঙ্গল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব। কুল, মান, মর্যাদা— এ সব এই পণ্ডিত প্রবর কোনদিনই চিন্তা করেননি। প্রতিদিনই তাঁর চাই চিন্তার দেহ সম্ভোগ। কিন্তু আজ যে তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ! হোক। আজ যে বড় দুর্যোগ। হোক। কোন কিছুই তাঁর পথ আটকালনা। আসঙ্গ লিপ্সার

কি তীব্র তাড়না। জল-ঝড় মাথায় নিয়ে চললেন ঠাকুর। চিন্তার গৃহপথে নদী পড়ে যে! তারজন্য কোন চিন্তা নেই ঠাকুরের। তাঁর চিন্তায় শুধু চিন্তার গৃহ। নদীর তীরে এলেন। না, নৌকো নেই। নেই কোন মাঝি-মাল্লা। তাহলে উপায়? চিন্তার জন্য ঠাকুরের চিন্তা প্রাখর্য তখন তুঙ্গে। ঐ যে নদীতে কি যেন একটা ভেসে যাচ্ছে। সেই বস্তুটি ভর করেই ঠাকুর নদী পার হলেন।

পার তো হলেন। এদিকে চিন্তামণির গৃহের প্রবেশ দ্বার যে বন্ধ। আচ্ছা, পাঁচিল টপকে যাওয়া যায় না। যায়। একটা দড়ি দরকার। দড়ি কোথায়? নীরন্ধ্র অন্ধকার। কিছুই যে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঐ যে দড়ির মত কি যেন একটা আছে। ভর করলেন ঠাকুর ওর ওপরই। পাঁচিল টপকালেন। ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। চিন্তা দোর খুলেই হতভম্ব। বিপন্ন বিস্ময়ে বললেন, 'সে কি! এই জল-ঝড়ের রাতে তুমি! পাঁচিল টপকালে কি করে?'

বিল্বমঙ্গল বললেন, 'পাঁচিলে দড়ির মত কি একটা দেখলাম। অন্ধকারে ভাল দেখতে পাইনি। সেটি ধরেই এলাম।'

— 'দড়ি? চলতো দেখি কিসের দড়ি।'

দুজনেই এলেন। দুজনেই চমকে উঠলেন। এক বিশালকায় সাপ মরে পড়ে আছে। আঁধারে লোকের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। ঠাকুরের হল সর্পে রজ্জু ভ্রম। চিন্তার আকর্ষণ এতই দুর্বার।

চিন্তার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। আবার শুধোলেন, 'নদী পার হলে কি করে?'

— কাঠের মত কি একটা ভেসে যাচ্ছিল। সেটিকে ভর করেই এপারে এলাম।'

ততক্ষণে চিন্তার নাক বিষিয়ে উঠেছে একটা উৎকট দুর্গন্ধে। চিৎকার করে উঠলেন বীভৎস গলায়, 'কাঠ নয়, তুমি তো এক মরা ভর করে এসেছ। আমার দেহভোগের নেশায় তোমার নাকও বন্ধ হয়ে গেছে।'

চিন্তামণি স্থির হয়ে গেল। ভাবছেন আর ভাবছেন। ভাবছেন কিভাবে এই কামার্ত মানুষটিকে উদ্ধারের পথ দেখানো যায়। পথ যেন পেয়েও গেলেন। কার হাতে কখন যে কার মুক্তি। বেশ্যার হাতে ব্রাহ্মণের মুক্তি!

চিন্তামণি ধীর গলায় বললেন, 'ঠাকুর! আমার দেহটায় কি আছে বলতো। তোমার এত লোভ এতে। এ দেহটা আর কটা দিনই বা এমনটি থাকবে? তখন তো তুমি আর আসবেনা। হয়ত আরেকজনের কাছে যাবে। আর তোমার আমার দেহের দামই বা কি? একদিন পচে গলে যাবে। শেয়াল-শকুনে খাবে। তুমি এপথ ছেড়ে দাও ঠাকুর। আর যাই হোক তুমি ভালবাসতে জান। আর সে ভালবাসার শক্তি এত বেশী যে তা জল-ঝড়, সাপকেও গ্রাহ্য করেনা। এই ভালবাসা সবার ওপরে যিনি আছেন, তাঁর পায়ে দাও। তাঁকে পেলে. আর কারুকে পেতে ইচ্ছা করবেনা তোমার। আমি আর কি সুন্দর। আজ সুন্দর, কাল হব কুৎসিৎ, পরশু পচে গলে যাব। আর তিনি? সব সুন্দরের রাজা তিনি। চিরকালই সুন্দর! তুমি তোমার এই ভালবাসা সেই সুন্দরের

পায়েই দাও, ঠাকুর। তুমিও সুন্দর হবে।

চিন্তামণির কথা চিন্তামণির মতই কাজ করল। ব্রজের পথে ছুটলেন বিল্বমঙ্গল ব্রজেন্দ্রনন্দনের সন্ধানে। আবার বিঘ্ন, পথের কাঁটা এই চোখ জোড়া। চুলের কাঁটা দিয়েই চোখ জোড়া বিকল করলেন ঠাকুর। ভালই হল। বাইরের চোখ গেছে। এখন ভিতরের চোখে— অন্তরের চোখে তাঁকে দেখবেন। দেখলেনও। শুধু দেখলেন না। গাইলেন তাঁর গুণ গান। রচিত হল 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতম।'

চিহ্নিত হলেন নবরসিকের এক রসিকরূপে। অবশ্য যুগলেই হলেন। চিন্তামণি-বিল্বমঙ্গল। এক অবিদ্যা নবরসিকের আসনে ঠাঁই পেলেন কি রকম? রকম ভারি মধুর চিন্তাই না চিন্তামণির পথ দেখালেন। ভালবাসার এই দুর্বার গতি কোথায় পেলেন বিল্বমঙ্গল? — না, এক নারীর কাছে— ভালবাসা দুর্বার হয় নারী পুরুষের আকর্ষণে। আর সেই দুর্বার প্রেম হয় নিকষিত হেম যখন নিবেদিত হয় প্রেমময়ের রাতুল চরণে।

এ হেন কান্তা প্রেমই সাধ্যের শেষ সীমা। সাধ্যসীমা না হয় জানা গেল: কিন্তু এটা তো পঞ্চরতির অন্যতম। তাহলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যে কি কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে না? রাম রায় বলছেন, 'কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়, সাধন প্রণালী একাধিক। যেমনি একাধিক, তেমনি তারতম্যও আছে। বস্তু একাধিক— তাই তারতম্যও। তবে হ্যাঁ যে যেভাবে ভজনা করেন, তাঁর কাছে সেই প্রণালীই সর্বোত্তম।'

যথার্থ বললেন রায়। হ্যাঁ, কান্তা প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু কান্তা প্রেমের তো সবাই অধিকারী হতে পারেন না। কেন? জীবের মানসিকতা ও রুচি তো এক নয়। জীব ভিন্ন, তার রুচিও ভিন্ন। তাই রতিও ভিন্ন। আহা, কি মধুর লীলা ব্রজেশ তনয়ের। কোন ভক্তের তিনি প্রভু, কোন ভক্তের সখা, আবার কোন ভক্তের সন্তান।

আচ্ছা, কান্তা প্রেম অন্য চার রতি অপেক্ষা কি কি ভাবে শ্রেষ্ঠ? ব্যাখ্যা করছেন রাম রায়ঃ

"পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥"

পাঁচ রতির পাঁচ রস। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর। 'পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।' যথার্থ। শান্তের গুণ বর্তায় দাস্যে, দাস্যের সখ্যে, সখ্যের বাৎসল্যে, বাৎসল্যের মধুরে। শান্তের গুণ একটি, দাস্যের দুটি, সখ্যের তিনটি, বাৎসল্যের চারটি এবং মধুরের পাঁচটি।

এতে কি হল? রায় জানাচ্ছেন প্রভুকেঃ

'গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥'

কান্তা প্রেমের পাঁচটি গুণ। কাজেই গুণাধিক্যে অন্য চার রসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বাদাধিক্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কেন? রস যেখানে, স্বাদও সেখানে। প্রত্যেক রসেরই রয়েছে স্বকীয় স্বাদ। যে রসের যত বেশী গুণ, সেই রসের তত বেশী স্বাদ। মধুরের গুণ সংখ্যায়

বেশী, তার স্বাদও তাই বেশী।

উপমাও দিলেন রামানন্দ। উত্তম উপমা। কি রকম?

'আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।

দুই তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥'

পঞ্চভূতের পঞ্চ গুণ। আকাশ (ব্যোম), বায়ু (মরুত), তেজ, জল, (অপ) ও পৃথিবী (ক্ষিতি) — এই পঞ্চভূতের নিজ নিজ গুণ আছে। যেমন, আকাশের গুণ হচ্ছে শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রস। এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

পঞ্চ রতিরই অনুকৃতি। আকাশের গুণ একটি, বায়ুর দুটো, তেজের তিনটে, জলের চারটি এবং পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ নিয়ে পাঁচটি। তাহলে দাঁড়াল এই যে কান্তা প্রেমে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ তো আছেই, আর আছে নিজস্ব এক গুণ। কি সে গুণ? — না, কৃষ্ণের সুখ বিধানের জন্য আপনাঙ্গ দিয়ে সেবা।

বলে চললেন রাম রায়, 'এই কান্তা প্রেমই পূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। আর কৃষ্ণ এই প্রেমেই বশে থাকেন, যেন এক বশীকরণ মন্ত্র। তাই না শ্রীকৃষ্ণ সদাই বশ্য গোপী প্রেমে। ব্রজেন্দ্র নন্দন যখন যেখানেই থাকুন, গোপীর ডাকে সাড়া দিতেই হবে। সুতরাং এই গুণেও অন্য চার রস থেকে মধুর বড়। রাম রায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ভাগবত থেকে উদ্ধার করলেন এই শ্লোকটি:

'ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ স্নেহো ভবতীনাং মদাপর্নঃ॥'

— কৃষ্ণ গোপীদের বলেছিলেন আমার প্রতি ভক্তিই জীবের মোক্ষের কারণ। সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ আছে, এটা পরম মঙ্গলের বিষয়, কারণ এই রকম স্নেহ দিয়েই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কান্তা প্রেম আরেক প্রেক্ষাপটেও পঞ্চ রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।'

— যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সেইভাবে ভজনা করি।

— গীতার এই প্রতিজ্ঞা বাক্যটি শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করতে পারেন শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু পারেন না শুধু মধুর অর্থাৎ কান্তা প্রেমের ক্ষেত্রে। যে প্রেমের অধিকারিণী শুধুমাত্র ব্রজ-বনিতারা। তাই ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপীদের কাছে ঋণী থেকে যান, যে ঋণ তিনি স্বীকারও করেছেন। যেমন,

'ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ তদবঃ প্রতিযাতু সাধুনাঃ॥'

কান্তাপ্রেমে নন্দলালার ঋণ থাকে কেন ভানুবালা আর গোপী-দের কাছে? কই, অন্য চার রতির ভক্তদের কাছে তো ঋণ থাকেনা। এই চার রসের ভক্তদের সেবার পেছনে একটা এষণা আছে, সাধ আছে। সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন ইচ্ছাময় অনায়াসে। এবং তাতেই তিনি মুক্ত হন। কিন্তু গোপী এবং গোপীঠাকুরাণীর তো

কোন ইচ্ছা নেই। গোপীর ভজনে কোন পাওয়া নেই, শুধুই দেওয়া। গোপীরা শুধু দেন, চান না কিছুই। তাঁরা যে সেব্যের সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন ভাবেন। কি তাঁরা দিয়েছেন? কি না দিয়েছেন? দেহ, গেহ, পতি, পুত্র, কুল, মান, লজ্জা, ভয়—এমন কি কামও সমর্পণ করেছেন ঐ অচ্যুত চরণে এমনই তাঁদের আত্মাহুতি। অথচ এই সব কিছু সমর্পণের পেছনে কোন এষণা নেই তাঁদের। এষণাই নেই, তিনি আর পূরণ করবেন কি? তাহলে তো ঋণ রয়েই গেল। এবং সে ঋণ তিনি স্বীকারও করলেন ঃ 'ন পারয়েঽহং ....' —না, আমি আর পারলাম না। কি পারলেন না? সাধুকারিতা রক্ষা করতে পারলেন না। গীতার প্রতিজ্ঞা বাক্য রক্ষা করতে পারলেন না। আর এইজন্যই না নন্দ নন্দন গোপীদের বশ্য।

কান্তাপ্রেম বরিষ্ঠ। এ কথাটার চতুর্থ প্রমাণ দিলেন রায় ঃ

"যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধূর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য॥"

প্রমাণ দিলেন এবং প্রমাণ আরও দৃঢ় করার জন্য ভাগবতের সমর্থন উল্লেখ করলেন ঃ

"তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥"

—সেই রাস মণ্ডলে স্বর্ণ বর্ণ মণিগণ মধ্যে মহা মরকত যেমন শোভা পায়, তেমনি সেই স্বর্ণ বর্ণা ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত বা আলিঙ্গিত হয়ে ভগবান দেবকীনন্দনও অত্যন্ত শোভা পেতে লাগলেন।

তাহলে সাধ্যের নির্ণয় হয়ে গেল। না, হল আর কোথায়? প্রভু যে আবার বললেন, 'কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥' প্রভুই বললেন, '......... এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।' আবার সেই প্রভুই বলছেন, 'কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥'

কি মুশকিল! মুশকিলের আসান হয়েও হয়না। বিস্মিত হলেন রায়, আর সে বিস্ময় প্রকাশও করলেন:

"রায় কহে ইহার আগে পুছে হেনজনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥"

বিস্ময় প্রকাশ করলেন, আবার ভাবতেও লাগলেন। এতদিন না জানলেও অজানা বস্তু ভুবনে থাকবে না— এমন কথাই বা কি করে বলা যায়?

রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস প্রভু 'আগে কিছু হয়' বলেছেন যখন, নিশ্চয়ই এরপর আরও কিছু আছে। রায় ভাবতে লাগলেন। আবার এও ভাবলেন প্রভুর কথা প্রভুই বলাবেন। তিনি তো ঠোঁট নাড়ছেন মাত্র। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ না বলালে কে বলতে পারে? যথার্থ বাক্য।

এই তো প্রভুরই কৃপায় রায়ের বদন থেকে নিঃসৃত হল:

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥"

বলেই দুটো শ্লোক উচ্চারণ করলেন। প্রথমটি পদ্মপুরাণ থেকে এবং দ্বিতীয়টি ভাগবত থেকে। যেমন,

'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥'

— রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, তাঁর কুণ্ডও তেমনি প্রিয়স্থান। গোপীদের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

এবং দ্বিতীয়টি ঃ

"অনয়রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।'

— গোপীরা কৃষ্ণের সন্ধান করতে করতে রাধাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'হে সখিবৃন্দ, এই নারী নিশ্চয়ই ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করেছেন, কারণ কৃষ্ণ আমাদের ত্যাগ করে হৃষ্ট চিত্তে এঁকে নির্জন স্থানে নিয়ে গেলেন।

প্রভু বললেন, 'বেশতো, বেশ বলেছ। তোমার কথা বড়ই মধুর। রাধা প্রেমই সাধ্য শিরোমণি। শিরোধার্য না হয় করলাম, কিন্তু রাধাকে রাসবিহারী রাসস্থলী থেকে গোপনে স্থানান্তরে নিয়ে গেলেন কেন? তাহলে তো বলতে হয় অন্য গোপীদের অপেক্ষা করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন, উপেক্ষা করতে পারেন না। যেখানে অন্যাপেক্ষা, সেখানে কি শুধুমাত্র ভানুসুতার প্রেমকেই সাধ্য শিরোমণি বলা চলে?' উত্তর দিলেন রায়, 'না, না, তাতো নয়। রাস বিনোদিয়া তো রাসস্থলী থেকে রাধাকে নিয়ে পালিয়ে যাননি। রাধাকে না দেখে শ্রীকৃষ্ণ সব গোপীদের সামনেই রাসস্থলী ত্যাগ করে চলে যান। নন্দদুলাল ভানুদুলালীর সন্ধানে ব্রতী হলেন। পরিশেষে ব্যর্থ হয়ে অনুতাপাহত হয়ে যমুনা তীরের কুঞ্জ মধ্যে বিরহ বেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন।' বলেই তিনি গীতগোবিন্দ থেকে দুটো শ্লোক উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্য সুদৃঢ় করলেন ঃ

'কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজ সুন্দরী॥'

— কংসনিসূদন শ্রীহরিও সারতম রাসলীলা বাসনায় বন্ধনশৃঙ্খলা-স্বরূপা শ্রীরাধিকাকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করে অন্য গোপীদের ত্যাগ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় শ্লোকটি হচ্ছে ঃ

'ইতস্ততস্তামনুস্মৃত্য রাধিকামনঙ্গ বাণ ব্রণ খিন্ন মানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দ তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥'

—কামদেব বাণাহত হয়ে বেদনাহত হলেন শ্রীকৃষ্ণ আর এদিক ওদিক অন্বেষণ করে রাধাকে না পেয়ে অনুতাপানলে দগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তীরের একটি কুঞ্জে বসে বিষাদ প্রকাশ করতে লাগলেন।

না, থামলেন না রামানন্দ। বলে চললেন, শ্রীরাধা রাস-মণ্ডলী ত্যাগ করলেন। কেন? ভানুবালা যেমন আলাভোলা গোয়ালিনী। তেমনি মানিনী, আবার সময় বিশেষে তেমনি ভামিনী। রাস লীলায় সবাই মত্ত। শত কোটি গোপী, গোপীঠাকুরাণী আর শ্রীকৃষ্ণ।

এমন সময় রাধা লক্ষ্য করলেন কৃষ্ণ রাসক্রীড়া করছেন শতকোটি গোপীর সঙ্গে আবার তাঁর সঙ্গেও। না, এ তো হতে পারেনা। তাহলে তো তিনি আর গোপীরা এক। সবার সমান ঠাঁই? তাহলে তো তাঁর সেই বরিষ্ঠ স্থানটি রইলনা। তাই মানিনী রাইধনি হলেন ভামিনী। আর তাঁর প্রেম ধরল— কুটিল রূপ।'

বামা প্রেম সময় বিশেষে কুটিলরূপ ধারণ করে কারণে—

অকারণে।

ফলে কি হল? আবার রামানন্দের কণ্ঠ অনুরণিত হল:

"ক্রোধ করি রাস ছাঁড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥"

যেখানে রাধা নেই সেখানে রাস নেই। আবার যেখানে নেই ভানুবালা, সেখানে নেই নন্দলালা। তাই বলছেন রাম রায়:

"তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥"

প্রভু মৃদু মৃদু হাসছেন। আনন্দালোকে উজ্জ্বল তাঁর নয়নদ্বয়। শুধোলেন, 'বল, বল রায়, বল। বড়ই মধুর। অন্বেষণের ফল কি হল? প্রভুর সুখেই রায় সুখ মানেন। প্রভু বলছেন, তাই তিনি বলছেন। বলে চললেন রায়,

'ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হইয়া॥'

আর সিদ্ধান্তের রেশটুকু টানলেন এইভাবে:

'শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধার গুণ॥'

পুলকে প্রফুল্ল প্রভু বললেন, 'সার্থক তোমার সাধ্য সাধন নিরূপণ। সার্থক আমার দক্ষিণ দেশে পরিভ্রমণ। কিন্তু রায়, আমার আরও কিছু জানবার আছে তোমার কাছে। উৎফুল্ল রায় বললেন, 'বেশ তো. বলনা। তোমার সঙ্গে— এই আলাপনে যে আনন্দ পেলাম. তা তো ইন্দ্রলোকেও দুর্লভ।

তখন প্রভু শুধোলেন,

'কৃষ্ণের স্বরূপ কহ— রাধিকা স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ?'

প্রভুর চারটে প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব। উত্তর দেবেন কে? — না, রায় রামানন্দ। কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরের মাঝখানে এসে গেল আন কথা। স্তুতি কথা। কে কাকে স্তুতি করছেন? উভয়ে উভয়কে। প্রভু রায়ের স্তুতি করছেন, আর রায় প্রভুর স্তুতি করছেন। গুরু শিষ্যের স্তুতি, আবার শিষ্য করছেন গুরুর। ভগবান করছেন ভক্তের, আর ভক্ত ভগবানের।

এও এক লীলা। পরম আস্বাদ্য বস্তু। মধুর, বড়ই মধুর!

প্রভু বললেন, 'রায়, এতক্ষণ তো সাধ্য সাধন তত্ত্বের নিরাকরণ করলে। নির্ভুল নির্ণয় তোমার। ভারি মধুর। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই রয়ে গেল। এখন এই চার তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করে আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর, কারণ তুমি ছাড়া এসব তত্ত্ব আর কে নিরূপণ করতে পারবে? প্রভুর সোচ্চার প্রশস্তিতে রায় লজ্জারুণ হলেন। অধোবদনে বললেন, 'নিরূপণ আমি কি করব? তুমিই না নিয়ামক। জীবজগতের নিয়ামক। আমি তো ঐ জীবজগতেরই এক জীব। টিয়ে পাখি। তুমি যা শেখাও, তাই বলি অবিকল। টিয়ে অর্থ বোঝে না— অর্থ আমিও বুঝিনা। জগৎ রঙ মহলের তুমিই না পরিচালক। কখন কাকে কিভাবে চালাবে, তা কি কারুর বোঝার ক্ষমতা আছে?

রায় রামানন্দ মহারাজ। মহাজনও বটেন। পরম ভাগবত,

পরম পণ্ডিত। পণ্ডিতের পণ্ডিত যে সার্বভৌম, তাঁর চেয়েও বড় পণ্ডিত। একথা ভট্টাচার্যই প্রকারান্তরে বলেছেন প্রভুকে। সেহেন ব্যক্তি এহেন উক্তি করলেন কেন? তবে কি বৈষ্ণব সুলভ দৈন্যোক্তি? আপাতত তাই। তবে গূঢ়ার্থে নয়। সত্যিই তো কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ না বলালে কে বলতে পারে? গোরা রায়ই না শক্তি সঞ্চার করেছেন রাম রায়ের মনে। আর সেই শক্তিতেই এই উক্তি।

না, দীনতায় কেউ কম যান না। ভগবানের লীলার হেতু কে বুঝতে পারে? বুঝতে পারলেন না রায়ও। কি করে বুঝবেন? যখন,

'প্রভু কহে— মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল॥
তেঁহো কহে— আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি হেথা॥
তোমার ঠাঁই আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিঞা।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিঞা॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা— সেই গুরু হয়॥'

প্রভু বললেন তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। হরিনাম যাঁর বদন ছাড়তে পারেনা, এক পল-বিপলের জন্যও, তিনিই কিনা মায়াবাদী।

এটা দৈন্যোক্তি ছাড়া আর কি?

হ্যাঁ এটা ঠিক যে তিনি নিয়ম রক্ষার্থে ঐ দশ মায়াবাদীর এক মায়াবাদী সম্প্রদায় মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সে তো আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গ মাত্র। অন্তরঙ্গে তো তিনি ভক্ত। কলি-হত জীবকে ভক্তি বিতরণ করতেই তাঁর অবতরণ। গৌড়বঙ্গে, বিশেষ করে, নদীয়ায়, নীলাচলে এবং সমগ্র দক্ষিণাপথে এই ভক্তিই তিনি বিতরণ করেছেন এবং ভক্তি সুরধুনীতে স্নাত হয়েছেন অগণন জন। সেই প্রভু আজ বলছেন, 'ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি।'

আবার বলছেন, 'সার্বভৌম সঙ্গে মোর নির্ম্মল হৈল।' মায়া-বাদের মালিন্যে যাঁর মন মুকুর ছিল অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন এবং তুমুল সম্মুখ সমরের পর যাঁর মন প্রভু করলেন সংস্কৃত, আজ সেই প্রভু বলছেন কিনা তাঁর মন নির্মল হয়েছে সার্বভৌম সান্নিধ্যে।

সবটাই প্রভুর দৈন্যোক্তি। নিজ আচরণেই এই দীনতা শিক্ষা দিতে চান। ভক্তির আবেগে ভক্ত তাঁকে ভগবান জ্ঞানে দেখুক— এটা প্রভু কোনদিনই চাননি। আজও চাননা রায়ের কাছে। ঈশ্বর বোধে কি হয়? —না, মানুষ দূরে যায়। মানুষ তাঁর মনের কথা মনের ব্যথা খুলে বলে না। কিন্তু প্রভু তা চাননা। তিনি যে মানুষ হয়ে এসেছেন মানুষের মধ্যে মানুষেরই জন্য।

রাম রায় শূদ্র। আর গোরা রায় ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমানে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হলেই তাঁকে স্তব-স্তুতি করতে হবে— এটা প্রভুর পছন্দ নয়। কৃষ্ণনামে তো সবারই অধিকার। সমান অধিকার। তাইনা

তিনি প্রারম্ভেই নদীয়া লীলায় ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মুচি, মেথর, কামার, কুমোর, জল-চল, জল-অচল, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সবাইকে ষোল নামের এক চন্দ্রাতপ তলে এনেছেন।

কৃষ্ণানুশীলন নেই। শুধুমাত্র জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ কুল পেয়েছেন। সেই কুলের গুরুভারেই তিনি হবেন গুরু? প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন. কিন্তু কৃষ্ণ চর্চ্চা নেই। শুধুমাত্র সন্ন্যাসীর চাপরাসেই তিনি হবেন দীক্ষা গুরু? সাম্যের সামগান যিনি গেয়ে আসছেন সেই নদীয়া লীলা থেকে, তিনি, এই আগাছা কলুষের মূলোৎপাটন করেছেন প্রারম্ভেই। তাই বললেন, 'দেখ রায়, সন্ন্যাসী হলেই গুরু হওয়া যায় না। আবার বংশ গৌরবেও গুরুর গুরু দায়িত্ব বহন করা যায় না। গুরুর দায়িত্ব গ্রহণ ও বহন করতে পারে যে কোন ব্যক্তি। তিনি ব্রাহ্মণ হোন, আর শূদ্রই হোন, যদি সেই ব্যক্তি কৃষ্ণানুশীলন করেন, কৃষ্ণতত্ত্বে পারীন হন। কাজেই তুমি রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আমার হৃদয় জুড়াও। আমার মন বড়ই ব্যাকুল হয়েছে, রায়। আর দেরী করোনা।'

প্রভুর আর অপেক্ষা সয় না। কিন্তু রায় যে দ্বিধান্বিত। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বলছেন, 'আমি তো তোমার হাতে পুতুল মাত্র। তুমি যেমনি নাচাও আমি তেমনি নাচি।'

এমনি চলল স্তুতি-প্রতিস্তুতি। এই হচ্ছে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ। ভক্ত-ভগবান সম্পর্ক। ভক্ত ভগবানকে চান. আবার ভগবানও ভক্তকে চান। ভগবানের জন্য যেমন ভক্তের হৃদয় ব্যাকুল হয়, তেমনি আকুল হয় ভগবানের হৃদয় ভক্তের জন্য। দুই হৃদয়ের

এমনি নিবিড় যোগ। যথার্থ বলছেন ভাগবত :

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম।
মদন্যতে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

— সাধুরাই আমার হৃদয়, আর আমিও তাদের হৃদয় স্বরূপ। তারা যেমন আমাকে ছাড়া কিছু জানে না, আমিও তাদের ছাড়া আব কিছু জানি না।

স্তুতি পর্ব শেষ হল। শুরু হল কৃষ্ণতত্ত্ব। রায় বক্তা, গোরা রায় শ্রোতা।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন. বলছেন রাম রায় :

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব রস পূর্ণ॥'

— বলেই রায় ব্রহ্মসংহিতা থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধার করলেন :

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম॥'

— সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সকলের আদি এবং তাঁর আদি আর কেউ নেই। তিনি গোবিন্দ এবং সর্বকারণীভূতা মায়ারও কারণ।

যথার্থ বললেন রাম রায়। কৃষ্ণই পরমেশ্বর। পরাৎপর

পরতত্ত্ব— ঈশ্বরানাং ঈশ্বরঃ। তিনি স্বয়ং ভগবান।
রায়ের কণ্ঠে ভাগবতের প্রতিধ্বনি ঃ

'এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।'

— অন্যান্য অবতার অংশ, কেউ বা কলা-ভগ্নাংশ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

রায় বললেন 'সর্ব্ব অবতারী।' অর্থাৎ সর্ব অবতারের মূল। ভাগবত কথাই রায়ের কণ্ঠে যেমন,

'এতৎ নানাবতারানাং নিধানং বীজব্যয়ম।' ঠিক এই জন্যই জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দশাবতারের অন্যতম অবতার রূপে গণ্য করেননি ভক্ত কবি। করবেন কেন? শ্রীকৃষ্ণই যে দশাবতারের উৎস। তাই তিনি 'কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ' বলে স্তুতি করলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণও একই কথা বলছেন ঃ

"এতস্মৈ বাপরে হনন্তা অবতারা মনোহরাঃ।
মহাগ্নেরিহ ভাস্বৎস্ফ্যুরুল্কা শতসহস্রশঃ॥"

— 'যেমন শতসহস্র বিস্ফুলিঙ্গঃ মহাগ্নিতে বিলীন হয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি অসংখ্য অনন্ত অবতার সমূহ শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হন।'

শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণ প্রধান কেন? তিনিই যে একমাত্র কারণ অথচ তিনি নিজে কারণাতীত। স্বয়ংসিদ্ধ, তাই কারণাতীত। তিনিই একমাত্র আশ্রয় তত্ত্ব। আর সবাই যেমন, কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কোটি বৈকুণ্ঠ, কোটি অবতার, তাঁরই আশ্রিত। সবাই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছাধীশ। ঠিক একই কথার প্রতিধ্বনি শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠে ঃ 'তাঁর ইচ্ছা বই একটি পাতাও নড়বার যো নাই।' ঐ একই

সুর রবীন্দ্রকণ্ঠে ঃ

'সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ।
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ॥'

তিনি ত্রেধাত্মা। সৎ, চিৎ ও আনন্দের নির্ঝর। সৎ অর্থাৎ তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন। চিৎ অর্থে প্রজ্ঞা, আর আনন্দই হচ্ছে প্রেম। প্রেমেই আনন্দ। অর্থাৎ কিনা তিনি প্রতাপ ঘন, প্রজ্ঞা ঘন এবং প্রেম ঘন। বৈষ্ণব পরিভাষায় সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী।

তিনি ব্রজরাজ নন্দের পুত্র। এ সম্পর্কটি অভিমান জাত। অভিমান উভয়ের। নন্দ-যশোদা যেমন অভিমানে বলেন কৃষ্ণ তাঁদেব পুত্র, তেমনি শ্রীকৃষ্ণেরও অভিমান তিনি তাঁদের পুত্র। এ সম্পর্কটি বাৎসল্য রস আস্বাদন করার জন্য, নইলে তাঁর আবার জন্ম কি? তিনি যে অজ। স্বয়ম্ভূ।

সমগ্র ঐশ্বর্য ও শক্তির তিনিই মূলাধার। তাই না তিনি সৎ অর্থাৎ প্রতাপ ঘন।

তিনি 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ রসের অফুরাণ প্রস্রবন। তাই রসেশ্বর। রসের ধূর্য রাসে। তাই রসেশ্বরই রাসেশ্বর। সমগ্র ব্রজভূমিই রসভূমি তাই তাঁর সর্বাতিশায়ী ঐশ্বর্য মাধুর্যের অনুগত। ঐশ্বর্যে রসাস্বাদন নেই। ব্রজভূমি মাধুর্য প্রধান। তাই রসাস্বাদনের ভূমি একমাত্র ব্রজভূমি। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের আস্বাদন শুধু-মাত্র এই ধামে— ব্রজধামে। কত মধুর সেই লীলা আর সেই লীলারসের আস্বাদন!

প্রভুর শক্তি সঞ্চারে বলে চলেছেন রায়ঃ

'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম গায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥'

মদন মায়িক জগতের স্থূল বস্তুতে কামনা বাসনা জাগায়। মত্ততা আনে জীবের মনে। শ্রীকৃষ্ণও মত্ততা আনে, কিন্তু সে মত্ততায় প্রাকৃত জগতের ভোগ লিপ্সা নেই। ইনি যে অপ্রাকৃত মদন। চিন্ময় বস্তুতে লিপ্সা জাগায়। সে লিপ্সা এমন তীব্র, এমন দুর্বার যে তা শুধু বাড়তেই থাকে। নিশি দিশি বর্ধিত হয়। তাই রাইধনি বলছেন,

'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।'

কই, রাইধনি তো বলছেন না 'তৃপ্ত করিল মোর প্রাণ।' বলবেন কেন? কৃষ্ণ প্রেমে যে তৃপ্তি নেই। এ প্রেম তো দেহগত বা প্রাকৃত প্রেম নয়— এ যে '...... নিকষিত হেম। কাম গন্ধ নাহি তার।' আর প্রাকৃত মদন কি করে? প্রাকৃত বস্তুর জন্য লিপ্সা বাড়িয়ে দেয়। আবার বাড়তে বাড়তে প্রশমিত হয়ে আসে। এর তৃপ্তি-তুষ্টি-ক্ষণপ্রভার প্রভা। তাছাড়া প্রাকৃত বস্তুর লিপ্সা-লালসায় ও ভোগে কোন নূতনত্ব নেই। কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছেন নবীন মদন। নিত্য নবায়মান। তাই শ্রীমতী বলছেনঃ

"সখি, কি পুছসি অনুভব মোর।
সেই পিরিতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হয়।'

যে কৃষ্ণ মাধুর্য প্রতি পলে বিপলে নূতন হয়, তার অধিষ্ঠান শ্রীবৃন্দাবন। একমাত্র ধাম। ত্রিভুবনে এই নিত্য নবায়মান রস ও তার আস্বাদনের দ্বিতীয় ঠাঁই নেই।

শ্রীকৃষ্ণের এই চিন্ময় সৌন্দর্য মাধুর্য জীবকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণ করে প্রাবল্যে করে তীব্রতায়। কিন্তু জীব যে মায়িক বস্তুর লিপ্সায় মত্ত। আকর্ষণে সাড়া দেবে কি করে? পথ আছে। সে পথটি হচ্ছে সাধন পথ। সাধনেই সাধ্য বস্তু, সেই চিন্ময় বস্তু লাভ করা যায়। সাধন প্রণালী কি? — না কামবীজ আর কাম গায়ত্রী। এই প্রণালীতেই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নবীন মদন রূপ চিত্ত দর্পণে প্রতিফলিত হয়।

ভক্ত তাঁর ইষ্ট বস্তুর পুজো করেন কিভাবে? — না, বীজ মন্ত্র আর গায়ত্রী গেয়ে। গায়ত্রী মানে কি? গানকারীকে যিনি ত্রাণ করেন। শৃঙার রসরাজ মূর্তিধর, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদনের গায়ত্রী হচ্ছে কাম গায়ত্রী। কাম গায়ত্রী কেন? এই গায়ত্রী গাইলে কামনা জাগে গানকারীর মনে। কার প্রতি কামনা জাগে? — না, অপ্রাকৃত মদনের প্রতি। কেন এই কামনা? কেন এত আকর্ষণ?

নীলাকাশে এক চন্দ্র। সেই চন্দ্রের রূপচ্ছটাতেই মাতোয়ারা ধরাবাসী। আর শ্রীকৃষ্ণের নীলাবয়বে আছে সাড়ে চব্বিশটি চন্দ্রমা। একেই ব্রজেন্দ্রনন্দন অখিল সুধার আকর, তার ওপর রয়েছে তাঁর অঙ্গে সাড়ে চব্বিশটি সুধাকর। সে হেন অপ্রাকৃত নবীন মদন দর্শনে কে না মোহিত হবে? শুধু কি মোহিত?

বারবার দর্শন লাভের জন্য মন আকুল হবে। শুনেই না প্রাণ আকুল হয়ঃ 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো / আকুল করিল মোর প্রাণ।' তাহলে দর্শনে কি হবে? দর্শনে সে আকুলতা বাড়বে অমিতমাত্রায়, আর প্রাকৃত কামনা-বাসনা চলে যাবে যোজন দূরে। তাইতো তিনি

'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম গায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥'

কৃষ্ণতত্ত্ব চিত্রিত করে চলেছেন রাম রায়। কত বড় নিপুণ চিত্রী। প্রভুর মনের কথাই বললেন ঃ

'পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥'

বলে সমর্থনের জন্য শ্লোক আনলেন ভাগবত থেকে ঃ

'তাসাম বিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধর স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥'

— শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন, শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজ বনিতাবৃন্দের সমীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মুখ কমল প্রফুল্ল, পরিধানে পীতবাস, গলে বনমালা, রূপ সাক্ষাৎ মদনমোহন।

বলে চলেছেন রায়.

'নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেইসব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥'

আকর্ষণ করেন, অয়স্কান্ত মণির মত আকর্ষণ করেন। তাই না তাঁর নাম কৃষ্ণ। আকর্ষণ করেন তিনি প্রাণী-অপ্রাণী, স্ত্রী-

পুরুষ— সবাইকে। পাখী-শাখী, মৃগ-খগ, লতা-মহীলতা, ভূচর, খেচর, জলচর সবই তাঁর আকর্ষণ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ।

মদনদেব জীবের মন মথিত করেন। তাই তাঁর নাম মন্মথ। আর কৃষ্ণ সেই মন্মথের মনও মথিত করেছেন। তাই তিনি মন্মথেরও মন্মথ।

ভক্তের কাজ ভগবানের সুখ বিধান করা। কিভাবে করতে হবে? ভাবের অভাব নেই। যার যেমন ভাব। যার রুচি যে ভাবে। যে ভাব যার সয়— মনের মত হয়। বড় সহজভাবে বুঝিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ:

'......রুচি ভেদ আর অধিকারীর ভেদ আছে। ......রুচি-ভেদ কি রকম জান? কেউ মাছটা ঝোলে খায়, কেউ ভাজা খায়, কেউ মাছের অম্বল খায়, কেউ মাছের পোলাও খায়।' বারান্তরে ঠাকুর বলছেন: 'তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়িতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া করে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারুর জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন।'

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— এই পাঁচ ভাবেই ভাবগ্রাহীকে ভজন করা যায়। ভক্ত অপুত্রক। বেশতো, গোপালই তাঁর পুত্র। বাৎসল্য রসে তিনি ভজনা করেন। কোন ভক্ত ভাবছে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ভর্তা, আর তিনি ভৃত্য। দাস্য ভক্তিতে তিনি ভজন করছেন। আবার কোন ভক্ত ভাবছেন, 'না, না, তিনি তো আমার প্রভু নন, আমিও তাঁর দাস নই— আমি যে তাঁর

সখা— প্রাণ সখা। সখ্য প্রেমের বাঁধনে বাঁধলেন তিনি তাঁর প্রাণ সখা কানাইকে।

আবার এই সকল রসে ঋদ্ধা হয়ে গোপীরা ভাবছেন তিনি যে তাঁদের প্রাণবল্লভ। মাধুর্য প্রেমে বাঁধলেন তাঁরা তাঁদের প্রাণকান্তকে।

এই পাঁচ রসের লক্ষণ কি? — শান্ত রসে আছে কৃষ্ণ নিষ্ঠা একটি লক্ষণ। দাস্যে দুটি— নিষ্ঠা ও ঐশ্বর্যবোধে সেবা, সখ্যে তিনটি নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাস, বাৎসল্যে চারটি— নিষ্ঠা, সেবা, বিশ্বাস ও মমত্ববোধ, আর মধুরে পাঁচটি— নিষ্ঠা, সেবা, বিশ্বাস, মমত্ব-বোধ ও আত্মসমর্পণ।

পরমাশ্চর্য সেব্য তাঁদের— কিনা তিনি একাধারে বিষয় ও আশ্রয়। বিষয় ভগবান, আর ভক্ত আশ্রয়। আবার ক্ষেত্র বিশেষ তিনিই একাধারে বিষয় ও আশ্রয়।

এটা কি করে হয়? হয়। ব্রজেন্দ্রনন্দনের ক্ষেত্রে হয়। হয় একমাত্র ব্রজধামে। সকলই সম্ভবে কৃষ্ণে। রস আস্বাদন করছেন ভগবান রূপে, আবার করছেন ভক্তরূপেও। উভয়বিধ রস আস্বাদন করছেন একই সত্তায়। রসাস্বাদনে এতই লোভ তাঁর। তিনি যে রসেশ্বর, তাই এত লোভ।

ব্রজ রাখালেরা গোষ্ঠে ধেনু চরান। তাঁদের নায়ক কে? — না, রাখালরাজ কানাই। শুধু কি ধেনুই চরান? — না, বেণুও বাজান। শুধু কি বেণুই বাজান? — না, খেলাও খেলেন। কি খেলা? — কত রকমের খেলা! খেলায় আবার শর্ত থাকে:

যিনি হারবেন তিনি কাঁধে নেবেন তাঁকে যিনি জিতবেন। এক সখা হেরে গেলেন কানাইয়ের কাছে। তখন সেই সখা কাঁধে নিলেন কানাইকে। এখানে কৃষ্ণ সখ্য রসের বিষয়।

আর এই কানাই আশ্রয় কখন? — যখন তিনি হারেন। কানাই হারেন? — হ্যাঁ, কানাইও হারেন। অবশ্যই হারেন। নইলে তো খেলাই জমবে না। তাই কানু হারলেন। এখন কি হবে? কি আর হবে? কানুকেই কাঁধে নিতে হবে সেই বিজয়ী সখাকে। নিলেনও তাই।

এখানে তিনি হলেন সখ্য রসের আশ্রয়।

ভারি চমৎকার তো। যিনি আস্বাদক, তিনিই আস্বাদ্য। বিষয়রূপে আস্বাদক, আর আশ্রয়রূপে আস্বাদ্য।

এমনই রসামৃত মূর্তি— অখিল রসামৃত মূর্তি এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন। যথার্থ বলেছেন রূপ গোস্বামী ঃ

'অখিল রসামৃত মূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামললিতা রাধাপ্রেয়ান বিধুর্জয়তি ॥'

— শান্তাদি সমস্ত রসের আশ্রয় যাঁর পরমানন্দ মূর্তি, প্রসরণশীল কান্তি দ্বারা যিনি তারকা ও পালি নাম্নী গোপীদ্বয়কে বশীভূত করেছেন, যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করেছেন এবং যিনি শ্রীরাধার প্রিয়, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের জয় হোক।

হ্যাঁ, অখিল রসামৃতই মূর্ত ব্রজেশ তনয়ে। এই রসেশ্বরের হৃদয় দ্বারে কোন খিল নেই। তাই তিনি লীলা পুরুষোত্তম, মর্যাদা পুরুষোত্তম নন। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র খিলযুক্ত— খিল

মুক্ত নন। মর্যাদা মানে সম্মান বা গৌরব নয়, সীমা-পরিচ্ছিন্নতা।

সূর্পনখা এল প্রেম নিবেদন করতে। তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। কারণ কি? না, তিনি সীতাপতি। যে সীতার জন্য তিনি নিবেদিত প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেন, সেই সীতাকেও তিনি ত্যাগ করলেন। এখানেও সেই মর্যাদার বেড়াজাল। স্বর্ণশৃঙ্খল। কি না তিনি রাজা। প্রজানুরঞ্জনই রাজার প্রথম ও প্রধান কৃত্য। তাতে যদি রাজ মহিষীকেও ত্যাগ করতে হয়, তবে সেটাই একমাত্র কৃত্য। কিন্তু লীলা পুরুষোত্তম নিখিল রসামৃতের মহোদধি।

অক্রুর কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে এলেন মথুরায়। গ্রামের ছেলে তো, তাই শহর দেখছেন অবাক চোখে। ব্রজেন্দ্রনন্দন নয়ননন্দন। নয়ন কেড়ে নিলেন কুব্জার। কুব্জা আর চোখ ফেরাতে পারেনা। ভাবছে কুব্জা, 'তাইতো, এমন ভুবন ভোলানো রূপও মানুষের হয়। যদি ভালবাসতে হয়, তাহলে এমন পুরুষকেই বাসতে হয়। কুব্জা দেখছে তো দেখছেই। পিঠে কুঁজ তো, বড় কষ্টেই দেখছে। তবুও লোভ ছাড়তে পারছেনা। কুব্জার হাতে ছিল অঙ্গ সজ্জার সামগ্রী। দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ গো, আমাদের সাজিয়ে দেবে।' কুব্জা হাতে চাঁদ পেল। তুষ্টি ঝরা কণ্ঠে ঝটিতি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেব। অন্তরের প্রীতি উজাড় করে সাজাল দুভাইকে। প্রীত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। কুব্জার হাত ধরে উর্ধ্ব মুখে আকর্ষণ করলেন। কোথায় কুঁজ? এক টানেই উধাও। কুব্জা হল এক অনবদ্যাঙ্গী। এক সৈরিন্ধ্রীর জন্যও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় দ্বার অখিল— কোন বাধা, অর্গল, সীমা সরহদ নেই।

পরম আহ্লাদে বলে চলেছেন রাম রায়। বললেন শ্রীকৃষ্ণই মূর্তিমান শৃঙার। অর্থাৎ কিনা মধুর রস। এই রসে হরণ করেন সকলের মন। বিশেষতঃ গোপীদের মন, প্রধানত গোপীঠাকুরাণীর মন। এমন কি নিজেরও। এ কথার প্রমাণ? প্রমাণ আছে গীতগোবিন্দে। যেমন,

'বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর শ্রেণী শ্যামল
কোমলৈরুপ নয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ শৃঙার সখি
মূর্ত্তিমানিব মধৌ-মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥'

— হে সখি! বাঞ্ছাতিরিক্ত প্রেমরস প্রদানে ব্রজসুন্দরীগণের আনন্দ বর্ধন পূর্বক ইন্দীবর অপেক্ষা মনোহর করচরণাদি দ্বারা ব্রজ-ললনা হৃদয়ে মদনোৎসবের উদয় করিয়ে এবং তাদের দ্বারা প্রতি অঙ্গে সুখে আলিঙ্গিত হয়ে সাক্ষাৎ শৃঙারস্বরূপ শ্রীহরি বসন্ত ঋতুতে বিহার করছেন।

এহেন মধুর রসের চিন্ময় সত্তা শ্রীকৃষ্ণ আর কার মন হরণ করেন? হরণ করেন এমন কি লক্ষ্মীপতি নারায়ণের মনও। বলেই ভাগবতের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন:

'দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দি দৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তায়।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে॥'

— ধর্ম রক্ষার্থে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জুন! তোমাদের উভয়ের দর্শনের অভিপ্রায়ে আমি দ্বিজ বালকদের আত্মার পুরে নিয়ে এসেছি। পৃথিবীর ভারস্বরূপ যে অসুর, সেই অসুরদের

আবার সংহার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

কে এই শ্লোকটির বক্তা? শ্লোকে উল্লেখ নেই। এর পশ্চাতে আছে একটি উপাখ্যান। সে ঐক বিচিত্র উপাখ্যান:

রাজধানী দ্বারকার কাছেই থাকেন এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ মন্দভাগ্য। একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে নটি সন্তান হারালেন ব্রাহ্মণ দম্পতি। সন্তান বিয়োগে বেদনাহত। নিয়তি এতই নিষ্করুণ! একটি পুত্রও তাঁদের কোল আলো করলনা। দ্বারকায় এত দারক আছে— নেই শুধু তাঁদের ঘরে। একটিও না। যখনই একটি পুত্রের মৃত্যু হয়, তখনই ব্রাহ্মণ সেই মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে রাজার কাছে ছুটে যান। শোকার্ত কণ্ঠে নিবেদন করেন, 'আপনি আমাদের রাজা। আমাদের পালক ও রক্ষক। আমাদের পুত্র রক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই করতে পারবেন না?'

না, কোন বিহিত ব্যবস্থাই হয় না। রাজদ্বারে রোদন অরণ্যে রোদন হয়। তখন তিনি প্রচার করলেন যে রাজার দোষেই তিনি সন্তান হারা হচ্ছেন।

তখন অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। জানতে পারলেন কথাটা। ছুটে গেলেন ব্রাহ্মণের কাছে, বললেন, 'আপনি নটি পুত্র সন্তান হারিয়েছেন। এতে আমি সত্যিই ক্লেশক্লিষ্ট। তবে এরপর যদি আপনার স্ত্রীর কোন সন্তান হয়, তাহলে তাকে আমি রক্ষা করব। আর যদি ব্যর্থ হই, তাহলে আগুনে আত্মাহুতি দেব।'

যথাসময়ে ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হলেন। ব্রাহ্মণ অর্জুনকে জানালেন। অর্জুন সূতিকাগৃহ শরজালে দুর্গের মত নিরাপদ করলেন।

ব্রাহ্মণীর পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। দু-চারবার ক্রন্দনও করল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর যথারীতি আকাশ পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বারকাধিপতির কাছে ছুটে এলেন ব্রাহ্মণ। দেখেন অর্জুন তাঁর পার্শ্বদেশেই উপবিষ্ট। ক্রোধোন্মত্ত হলেন ব্রাহ্মণ। কণ্ঠ থেকে রোষ ঝরল, 'কেন মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলে আমাকে? বলরাম, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ যেখানে আমার সন্তানদের রক্ষা করতে পারেন নি, সেখানে তুমি রক্ষা করবে আমার সন্তান? ধিক, শতধিক তোমাকে!'

কটু কাটব্যের জ্বালায় অস্থির হলেন ফাল্গুনি। গাণ্ডীব হাতে নিলেন। মৃত্যুর পর জীব যমপুরীতে যায়। তৃতীয় পাণ্ডবও গেলেন যমপুরীতে। কই, যমপুরীতে তো ব্রাহ্মণের কোন সন্তানই নেই। তাহলে গেল কোথায়? উন্মত্তের মত ছুটতে লাগলেন। না, কোন স্থানই বাদ রাখলেন না। একে একে গেলেন ঐন্দ্রী, আগ্নেয়ী, নৈঋতী, সৌম্যা, বায়ব্যা ও বারুণী পুরীতে। না, রসাতল, সুরলোক, ব্রহ্মাদির স্থানও বাদ রাখলেন না। না, কোথাও সন্ধান পেলেন না। তাহলে উপায়? না, উপায় আর নেই। আছে শুধু একটি অপায়। তা হচ্ছে আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ। প্রস্তুত হলেন। প্রতিজ্ঞা বাক্য রক্ষা করতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ বাধা দিলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ কুমারদের পেলে না তো। চল, আমি দেখছি। আমার সঙ্গে চল।'

দিব্যাশ্ব রথে যোজিত হল। রথ চলতে থাকল। রথ কত গিরি, কত নদী, কত সাগর, পার হয়ে শেষে এল মহাকাল পুরীতে।

এই পুরীর ভূমাপুরুষই কৃষ্ণার্জুনকে সম্বোধন করেছিলেন ঐ শ্লোকে।

কে এই ভূমা পুরুষ? স্বয়ং নারায়ণই এই ভূমা পুরুষ। নারায়ণ বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ দর্শন মানসেই আমি ব্রাহ্মণ কুমারদের এখানে এনেছি। আমি জানতাম অনুসন্ধান করতে করতে তোমরা এখানে আসবেই।'

আর কার মন হরণ করেন এই মনচোর? শুধু লক্ষ্মীপতির না। মন হরণ করেন স্বয়ং লক্ষ্মীরও। একথা বলে রাম রায় ভাগবতের এই শ্লোকটি দিয়ে প্রমাণ দিলেন:

'কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেনুস্পর শাধিকার:।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীল'লনাচরত্তপো বিহায় কামান সুচিরং ধৃতব্রতা॥'

— কালিয় নাগের পত্নী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'হে দেব! যা পাওয়ার বাসনায় কমলা বহুকাল নিখিল কামনা বিসর্জন দিয়ে ধৃতব্রত হয়ে তপশ্চরণ করেছিলেন, সেই পদরেণু এই কালিয় নাগ যে কি পুণ্যে লাভ করল, তা আমরা অবগত নই।'

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শেষ কথা শোনাচ্ছেন রাম রায়। কি সে কথা? — না,

'আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥'

'ললিত মাধব' এর এই শ্লোকটি রায়ের উক্তি সমর্থন করে। যেমন,

'অপরিকল্পিত পূর্ব্ব: কশ্চমৎ কারকারী স্ফুরতি মম
গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপুর:।

অয়মহংপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতা সরভসমুপভোক্তুং
কাময়ে রাধিকেব ॥'

— অহো! এই অদৃষ্টপূর্ব চমৎকারী আমার মাধুর্য সম্মুখস্থিত মণিস্তম্ভে স্ফূর্তি পাচ্ছে। প্রতিফলন দেখে আমিও লুব্ধ চিত্ত হয়ে শ্রীরাধার মত সবলে উপভোগ করতে ইচ্ছা করছি।

একদিন কি হল— স্ফটিক স্তম্ভে নিজ অবয়ব দেখতে পেলেন শ্রীকৃষ্ণ। স্ফটিক স্তম্ভ দর্পণের মত স্বচ্ছ। দেখেই স্তম্ভিত হলেন। হলেন চমৎকৃতও। তাইতো, এত রূপ, এত সৌন্দর্য তাঁর! মাধুর্য উপভোগ করতে প্রলুব্ধ হলেন। কেমন সে প্রলোভন? —না, যে প্রলোভনে উপভোগ করতে ইচ্ছা করেন শ্রীরাধিকা, আজ সেই প্রলোভনে উপভোগ করতে ইচ্ছা করলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।

কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করলেন রামানন্দ রায়। পবম পণ্ডিত। পরম ভক্ত। দ্বিভুজ কৃষ্ণের দ্বিবিধ রূপ— ঐশ্বর্য ও মাধুর্য। দুইরূপেরই বাঙ্ময় রূপ দিলেন রায়। ঐশ্বর্য রূপে তিনি সর্ব অবতারের অবতার। তাঁদের নিজ নিজ ধামেরও তিনি মূল। আবার শতকোটি ব্রহ্মাণ্ডেরও মূল ও আশ্রয়।

এই সর্বাতিশায়ী ঐশ্বর্য তিনি কোথা থেকে পান? বলছেন শ্রীকৃষ্ণ:

'আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥'

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য কেমন? — না, অসমোর্ধ্ব। তিনি রসামৃতের মহোদধি। রূপ মাধুর্যে তিনি আকর্ষণ করেন সবাইকে।

এমনকি নিজেকেও। যে মদন রূপ মাধুর্যের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু, সেই মদনকেই তিনি মথিত করলেন। তাইনা তিনি মন্মথ মদন। কামদেবের কথায় কাজ কি? স্বয়ং নারায়ণ তাঁর দর্শন বাঞ্ছা করেন। আচ্ছা লক্ষ্মীপতি না হয় আকৃষ্ট হলেন, তাই বলে কি লক্ষ্মীদেবীও আকৃষ্টা হবেন! তিনি না সদাই নারায়ণ বক্ষোবিলাসিনী।

তিনি সবাইকে আকর্ষণ করেন। আচ্ছা, তাঁকে কেউ আকষণ করেন না? হ্যাঁ করেন, একজন। ত্রিভুবনে মাত্রই একজন। কে এই একজন?

উত্তর দিচ্ছেন স্বয়ং গোবিন্দ ঃ

'মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥'

শুধু কি নয়নই জুড়োয়? — প্রতি অঙ্গ— অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ দুই-ই জুড়োয়। তাই বলছেন ঃ

'মোর স্বর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥'

না, শুধু এই দুটি ইন্দ্রিয়ই না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই রাধামাধুর্যে বশীভূত। এ জগতে এত সুরভি এল কি করে? তিনি দিয়েছেন, তাই। সেই সর্বসুরভিস্রষ্টা বলছেন ঃ

'মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধার অঙ্গ গন্ধ।'

ব্রজভূমি রসভূমি। ব্রজেন্দ্র লীলাবিহার করেন, তাই রসভূমি। সেই রসেশ্বর বলছেন ঃ

'রাধার অধর রসে আমা করে বশ।'

জগৎ এত শীতলতা পেল কার কাছ থেকে? যাঁর স্পর্শে কোটীন্দু শীতল, তাঁর কাছ থেকেই। সেই তিনিই বলছেন:

'রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল।'

আর সবশেষে বলছেন:

'এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু।'

যাঁর কণামাত্র কৃপা ভেষজে জীবের আর আধি-ব্যাধি থাকে না, সেই সার্বভৌম নিয়ামক বলছেন:

'রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু।'

কৃষ্ণতত্ত্ব সমাপ্ত হল।

পুলকোজ্জ্বল নয়নে প্রভু বললেন, 'ভারি আহ্লাদ হল তোমার মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব শুনে। আহ্লাদ হল, কিন্তু মন যে আরও আকুল হল। এখন রাধাতত্ত্ব শোনাও। তোমার মুখে শুনে সার্থক হোক আমার দক্ষিণাপথ ভ্রমণ।'

রাধাতত্ত্ব আরম্ভ করলেন রায়। প্রভুরই কৃপায় মুখর হলেন রায়। বললেন, 'কৃষ্ণের শক্তি অন্তবিহীন। এ কথা তুমি সবই জান, প্রভু। জেনেও জানতে চাইছ। এও এক লীলা তোমার। তুমি বলাচ্ছ, তাই বলছি। সেই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি, আর এই দুয়ের মধ্যে জীবশক্তি যার অপর নাম তটস্থা শক্তি।

আবার এই তিনশক্তিই সমান নয়। এই ত্রিশক্তির মধ্যে চিৎশক্তির অধিষ্ঠান সর্বশীর্ষে। যার অপর নাম স্বরূপ শক্তি।

স্মিত হাস্যে উজ্জ্বল আস্যে প্রভু বললেন, 'বেশ, বেশ, বড়ই মধুর। এখন তোমার কথার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দাও।'

বিষ্ণুপুরাণ থেকে সমর্থন শ্লোক উল্লেখ করলেন রায়ঃ

'বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরিষ্যতে॥'

— বিষ্ণুশক্তি ত্রিবিধঃ পরা অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ তটস্থ শক্তি, আর অবিদ্যা অর্থে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।

প্রমাণে প্রফুল্ল হলেন প্রভু। নয়নে নির্দেশ দিলেন অগ্রসর হতে। রায় আবার বলতে লাগলেন, 'এই স্বরূপ শক্তি আবার ত্রিবিধঃ স্বরূপে কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। ইঙ্গিতে প্রভু প্রমাণ চাইলেন। রায় হচ্ছেন সেই কৌঁসিলী রুলিং যাঁর অধরাগ্রে। ঐ বিষ্ণুপুরাণ থেকেই উচ্চারণ করলেন এই শ্লোকটিঃ

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকারী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥'

— ধ্রুব ভগবানকে বলেছিলেন, 'হে ভগবন! তুমি সর্বাধার। তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ, এই প্রধান তিনটি শক্তি অধিষ্ঠিত আছে। তুমি ত্রিগুণাতীত, এই কারণে তোমাতে হ্লাদকরী ও তাপকরী মিশ্রা শক্তি নেই।'

হৃষ্ট হলেন প্রভু। বললেন, 'মধুর, রায়, বড়ই মধুর। এখন একটু বিশদ করে বল।'

গোরা রায়ের আনন্দই রাম রায়ের আনন্দ। আনন্দে উৎসাহিত

হলেন রায়। ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হলেন, 'হ্লাদিনীই এই শক্তি ত্রয়ের ধুর্য। এই শক্তিই কৃষ্ণকে আহ্লাদিত করে। এই শক্তি বলে শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজে রস আস্বাদন করেন, তেমনি ভক্তেরাও সুখ আহরণ করেন এই একই শক্তি বলে। এ সুখের আর অবধি নেই। থাকবেই বা কেন? — কৃষ্ণ যে সুখরসের সাগর।

হ্লাদিনীর নির্যাসই প্রেম। অপ্রাকৃত প্রেমরস। চিন্ময় রস। প্রেমানন্দের চিন্ময় রস। প্রেমের শ্রেষ্ঠতম ও প্রেষ্ঠতম পরিণতি হচ্ছে মাদনাখ্য মহাভাবে। এই মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র গোপী-ঠাকুরাণী রাধারাণীরই গোপিত সম্পদ।' রায়ের উক্তির যুক্তি মেলে উজ্জ্বল নীলমণিতে :

'তয়োবপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈ রতি বরীয়সী॥'

— গোপীদের মধ্যে রাধিকা ও চন্দ্রাবলী প্রধানা। আবার উভয় মধ্যে রাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠা। ইনি মহাভাব স্বরূপিনী এবং গুণে বরীয়সী।

বৃষভানু নন্দিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যানে আনন্দের সুরধুনী বয়ে চলেছে রায়ের চিত্ত দেশে। সেই ধারায় পুণ্য স্নাত হয়ে রায় বলে চলেছেন :

'প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥'

আর সমর্থন আনলেন ব্রহ্মসংহিতা থেকে :

'আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপ
তয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদি পুরুষং
তমহং ভজামি॥'

— আনন্দ চিন্ময় রসদ্বারা প্রতিভাবিত গোপীদের সঙ্গে যে সর্বাত্ম-ভূত আদি পুরুষ গোলোকে অবস্থিতি করেন, আমি সেই গোবিন্দকে আরাধনা করি।

সাধ্যতত্ত্ব নিরাকরণে দেখা গেছে দশটি স্তর : স্বধর্মাচরণ থেকে কান্তা প্রেম। ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে শীর্ষ— শীর্ষতম স্তরে পৌঁছেছে।

অনুরূপ অবস্থা ভক্তির ক্ষেত্রেও। ভক্তি মন্দির এক বিশালায়তন হর্ম্য। তাতে আছে দশটি তল। আছে দশটি সোপান। সাধ্যতত্ত্বের মত এখানেও দশটি।

এই দশটি সোপানের প্রথমটিতে রতি বা ভক্তি। রতি থেকে উত্তরণ প্রেমে।

প্রেম কি? — 'রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়।' প্রেমের লক্ষণ কি? — ধ্বংস হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস হয় না। আর লক্ষ্য কি? — উৎকর্ষে আরোহণ। শান্ত রসের ভক্তদের অধিকার এই প্রেম পর্যন্ত। উৎকর্ষে আরোহণ করে প্রেম যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন প্রেমের রূপান্তর হয় স্নেহে। স্নেহ কি করে? — না, প্রেমবস্তুর উপলব্ধিকে প্রকাশ করে। কি রকম সে উপলব্ধি? — রূপ বারবার দেখেও অতৃপ্তি।

পরবর্তী সোপান মান। মানের কাজ কি? — না, স্নেহ

উৎকৃষ্টতা পেয়ে পূর্বের অনুভূত মাধুর্যকে নতুন ভাবে অনুভব করিয়ে বাইরে কুটিল রূপ ধারণ করায়। একদিন বনবিহার করছিলেন বনমালী ভানুবালার সঙ্গে। একে বনবিহার, তার ওপর বন-বিহারীর সুখ সঙ্গ— পরম সুখাবেশে রাইধনির চোখ জোড়া জলে ভরে গেল। এই সুখাশ্রুর কারণ গোপন করতে চাইলেন ভানু-নন্দিনী। ভাবনায় পড়লেন। তাইতো, একটা অছিলা যে প্রয়োজন। অদূরে গাভী বিচরণ করছিল। ধুলো উড়ছিল। পেয়ে গেলেন সেই অছিলা। ডাকলেন নাগর শেখরকে। বললেন, 'এই দেখ না, চোখে ধুলো লেগে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।'

নটবর বললেন, 'বেশ তো, এতে আর ভাবনার কি আছে? আমি এক্ষুণি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছি।' বলে ফুঁ দিতে গেলেন চোখে। গোপী ঠাকুরাণী দু'পা পিছিয়ে গেলেন। বললেন, 'থাক, তোমাকে আর ফুঁ দিতে হবে না। দেখেছি তোমার ভাল-বাসার অভিনয়। বলে মানিনী হলেন।'

এক সোপান থেকে আরেক সোপানে উত্তরণ। নিচ থেকে ওপরে। মান পরিণত হয় প্রণয়ে। কখন? — না, মান যখন বিস্রম্ভ জন্মায় মনে। কি সে বিস্রম্ভ বা বিশ্বাস? দয়িতার মনে অভিন্নতার বিশ্বাস। দয়িতা তখন বিশ্বাস করে যে তাঁর দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি দয়িতের এই সকলের সঙ্গে অভিন্ন।

শ্রীরাধার রহঃকেলি। স্থান কুঞ্জাঙ্গন। যুগলে উপবিষ্ট সেই কুঞ্জাঙ্গনে, উভয়ের চলছে সুখ বিলসন।

দূর থেকে দেখে রূপ মঞ্জরী তাঁর এক সখীকে বলছেন,

'দেখ., দেখ. সখি! রসিক নাগর আমাদের ঠাকুরাণীর কুচোপান্ত স্পর্শ করলেন। আর তাতে রাইধনি ঐ নটবরের কাঁধে মাথা রাখলেন। আবার ঐ দেখ., আমাদের রাইবিনোদিনী ভ্রূকুটি করছেন। কিন্তু ভ্রূকুটি করলে কি হয়? ওদিকে দেখ., সুখ বিলাসে সুখাশ্রু ওঁর চোখে। আর চোখের জল মুছছেন ঐ গোপবেশ বেণুকরের পীত বসনে। ভাবছেন ওটা ওঁর নিজেরই বেশবাস।

ক্রমশই রূপ পরিবর্তন। এখন তৃষ্ণা এবং তার গাঢ়তার প্রশ্ন। ইষ্টে যখন তৃষ্ণা গাঢ় হয়. তখনই হয় রাগ। অর্থাৎ প্রণয় যখন আরো উৎকর্ষ লাভ করে, তখন চরম দুঃখকেও সুখ বলে মনে হয়। উপলাকীর্ণ গিরিতট। নিদাঘের মার্তণ্ডতাপে সেই উপল হয়েছে আগুনের গোলা, আগুনের গোলায় কি কেউ পা রাখতে পারেন? — পারেন। পারেন শুধু একজন। তিনি শ্রীমতী। শ্রীমতীর যেন মনে হচ্ছে তিনি চরণ দুখানি হিম শীতল কুসুম শয্যায় রেখেছেন। কেন এ রকম মনে হচ্ছে? তিনি যে প্রগাঢ় তৃষ্ণায় তাঁর নয়নে তাঁর প্রাণ গোবিন্দের বদন সুধা পান করছেন। এই হচ্ছে রাগ।

রাগ পরিপক্ক হয় অনুরাগে। অনুরাগে কি হয়? মহাজন বলছেন,

'সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হয়॥'

বিকারের ভূমিকা এই প্রথম। চিত্তের প্রথম বিকার। অনুরাগের

উত্তরণ ভাবে। চিত্ত ছিল নির্বিকার। সেই চিত্তে শৃঙার রসে রতি স্থায়ীভাবের প্রাদুর্ভাব ঘটল। এতে জন্ম নিল ভাব।

ভাবের গাঢ়তাই আনে মহাভাব। মহাভাব গোপীদের গোপিত ধন। আর কারুর এ ধনে অধিকার নেই।

মহাভাবের ধুর্য হচ্ছে মাদনাখ্য মহাভাব। এ ধনে ধনী একমাত্র রাইধনী। একা-একেশ্বরী। ত্রিভুবনে আর কারুর অধিকার নেই এই ধনে। কেন, শ্রীকৃষ্ণের? — না, শ্রীকৃষ্ণেরও নেই। নেই বলেই না তাঁর এত লালসা এই ধনে। লালসার যে কি পরিণাম সে আখ্যান আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে নদীয়া লীলায়।

হ্যাঁ, রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন রায়। আবার আরম্ভ করলেন, 'এই মাদনাখ্য মহাভাব নিয়ে কি করেন রাধা? — না, তাঁর দয়িতের ইচ্ছা পূরণ করেন। একাই পূরণ করেন।'

হ্যাঁ একাই পূরণ করেন। কিন্তু ভাগবত যে বলেন লীলা পুরুষোত্তম গোপীবল্লভ লীলাবিলাস করেছিলেন শতকোটি গোপীর সঙ্গে। ভাগবত বাক্য মাণিক্য। আবার রামানন্দও পরম ভাগবত। ভাগবতকে অনুসরণ করেই রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। তাই বলছেন, যথার্থই বলছেন ঃ

'ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ।'

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ বহু কান্তার অঙ্গ সঙ্গ সুখ আস্বাদন করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন একা রাধা। কিভাবে? — না, কায়ব্যূহরূপ ধারণ করে। কিন্তু ললিতাদি

সখী যে আকৃতিতে আলাদা। আলাদা বলেই না রায় বলছেন কায়ব্যূহরূপ অর্থাৎ রাধারাণীই শতকোটি সখীর রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের বহুকান্তার বাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন।

বলছেন রায়, 'প্রভু, এই প্রেমবিলাস একা এবং একমাত্র রাধা দ্বারাই সম্ভবপর। শ্রীমতীর সমস্ত দেহটাই যে প্রেম সুবলিত। প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ তিনি। আর তাঁর ব্যবহৃত সমস্ত বস্তুই চিন্ময়। তাঁর লীলাবিলাসও চিৎশক্তি বিলাস। প্রাকৃত নয়।

তাই তাঁর বিলসনও কোন সময় সীমার বাঁধন মানে না। রাই ধনির দেহ বল্লরী কারুণ্য, তারুণ্য. আর লাবণ্যের মূলাধার।

এরপর রামানন্দ শ্রীরাধার বেশবাস, দেহ সৌন্দর্য, তাঁর মৃদু মধুর হাসি, সখীদের প্রতি তাঁর প্রণয় ইত্যাদি বর্ণনা করে বললেন ঃ

'ধীরা ধীরাত্মকাগুণ অঙ্গে পটবাস।'

ধীরা ধীরা মানে কি? অষ্টবিধ নায়িকার অন্যতম নায়িকা খণ্ডিতা। খণ্ডিতারই একটি রূপ ধীরাধীরা। এঁর আচরণ কি রকম?

সংকেত স্থান ঠিক ছিল। ঠিক ছিল সংকেত সময়ও। ঠিক নেই শুধু নাগরের। সারা নিশি অপর নারীর কুঞ্জে যাপন করে শ্রীমতীর কাছে এসেছেন বিহান বেলায়। এসেই চতুর শিরোমণি নতশির হয়েছেন ভানুবালার চরণে। হলে কি হবে? রোষে-বেদনায় রাই কিশোরীর তখন আঁখিপাতে আষাঢ়ের আসার। বাক্যবাণ নিক্ষেপ করলেন রাজনন্দিনী, 'ওহে কপট শিরোমণি, যাও, যাও, চলে যাও। আমাকে আর কাঁদিও না। এক্ষুণি চলে যাও। তুমি যতক্ষণ এখানে থাকবে, ততক্ষণই তোমার প্রাণপ্রিয়া

রুষ্টা হবেন। সারারাতই তো তুমি তাঁর পায়ে পড়েছিলে। তোমার মাথার মালাই তার বড় সাক্ষী। ঐ মালাতেই না রয়েছে তাঁর পায়ের আলতার দাগ। কি আর লুকোবে? যাও, ঐ মালা দিয়ে তাঁরই পদ বন্দনা কর।'

গোপী ঠাকুরাণীর গুণগান গেয়ে চলেছেন রায়:

'সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাবভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥'

সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব কি? পাঁচটি বা সব সাত্ত্বিকভাব এককালে প্রকাশিত হয়ে যদি পরম এবং চরম উৎকর্ষ লাভ করে, তাহলে তাকে বলে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব। এই উদ্দীপ্তই সুদ্দীপ্ত হয় মহাভাবে। তাই এই ভাব শুধুমাত্র শ্রীমতীতেই বর্তমান। যথার্থই উল্লেখ করলেন রামানন্দ।

শুধু কি এই? শ্রীরাধার যে অনন্ত গুণ। শ্রীকৃষ্ণেরই মত। রাম রায় বললেন একমাত্র এই ব্রজদেবীর মধ্যেই কিলকিঞ্চিতাদি বিশটি ভাব প্রকট।

কিল কিঞ্চিত ভাব কি? অধিক আনন্দের জন্য গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটি মানসিক অবস্থার এককালীন উদ্ভব হচ্ছে কিল কিঞ্চিত ভাব।

সখার সঙ্গে সখার সুখের আলাপ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সখা সুবলকে, 'ভাই সুবল, 'শ্রীরাধা অদূরে দাঁড়িয়ে। আর দাঁড়িয়েছে তাঁর সহচরীরা। কুসুম কলিকার মত শ্রীমতীর পয়োধর। আমি সেই পয়োধর স্পর্শ করলাম। বিদ্যুৎ চমকের মত ফল হল।

ভানুবালা তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখি তাঁর মধ্যে প্রকট হয়েছে একইসঙ্গে সাতটি ভাবঃ গর্ব. অভিলাষ, রোদন, হাস্য. অসূয়া, ভয়, ক্রোধ। এই সাতটি ভাবের স্ফুরণে তাঁর মুখকমল যে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল, তা আমার মনে বারবার ভেসে উঠছে।'

ভানু নন্দিনীর গুণ কীর্তন করে চলেছেন মহানন্দে রামানন্দঃ

'সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥'

প্রেম বৈচিত্ত্য। রাধারাণীর এক লীলা। ভারি মধুর লীলা। এক পরমাশ্চর্য লীলা। পরমাশ্চর্য কেন? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কোলেই শায়িত আছেন, কিন্তু প্রেমোৎকর্ষ অতি প্রবল। এই প্রাবল্য এনেছে ভ্রান্তি। সেই ভ্রান্তিতে শ্রীমতী ভাবছেন তাঁর প্রিয়তম তাঁর কাছে নেই। তাই দেখা দিল বিরহ ব্যাকুলতা। বৈচিত্ত্যের বিচিত্র চিত্র চিত্রন করেছেন গোবিন্দ দাস এইভাবেঃ

'নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ পাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ হুতাশে॥
এ সখি, আরতি কহনে ন যাই।
হেম আঁচরে রহু ভরমিত ঐছন
খোঁজ ফিরত আন ঠাঞি॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।

কাতর হোই মহীতলে লুঠই
বিরহ বেদনে রহু জাগি ॥'

মণিহারের সুষমা বর্ধন করে মধ্যমণি। আর শ্রীরাধার মণিহারের মধ্যমণি হচ্ছে এই প্রেম বৈচিত্ত্য।

রায় রাই কিশোরীর গুণকীর্তন অবিরাম গেয়েও শেষ করতে পারছেন না। পারবেনই বা কি করে? অগণন যে তাঁর গুণ। ললনা কনক অলঙ্কার কর্ণে ধারণ করে দেহ সুষমা বর্ধনের জন্য। শ্রীমতীর কর্ণে কনকভূষণ নেই। নেই আন আভরণ। শুধু কৃষ্ণ নাম-গুণ- যশ— শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করছে নিরন্তর। এই বস্তুই তাঁর একমাত্র অলংকার। সর্বোত্তম অলংকার। শুধু কি শ্রবণে? বদনেও। শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট হয়ে নিঃসৃত হচ্ছে বদন পথে। বদন আন কথা বলেনা। শুধু বলে, অবিরাম বলে কান কথা। শুধু কি বলে? —বাক স্রোত বয়ে চলে।

আর কি করেন ব্রজদেবী? রাধা গুণ কীর্তনে মুখর রায় বলছেন ঃ

'কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥'

দয়িতের নাম নিরন্তর নিঃসৃত হচ্ছে নিজ বদন পথে। আর দয়িতের বদন পথে দিচ্ছেন শৃঙার রসপুষ্ট মদন মত্ততা রূপ মধু। শৃঙার রসের রঙ শ্যাম। সেই শ্যামরস মধু পান করাচ্ছেন শ্যাম-রায়কে রাইধনি। আর কি করছেন? সলীল শ্যামসুন্দরের কত যে বাসনা! কখন কোন্ বাসনা তাঁর মনে জাগবে, তা কি কেউ বলতে

পারে? হ্যাঁ, পারে। পারে একজন। তিনি রাইকিশোরী। সেই বাসনা জেনে রাই কি করেন? সেই বাসনা পূর্ণ করেন। সব বাসনাই পূর্ণ করেন। তা করতে যদি তাঁর কলঙ্ক হয়? হোক। তাই রাই বলছেন:

'কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥'

শ্রীমতীর আর কি কি গুণ আছে? আছে আরো অনেক গুণ যেমন,

'কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা কাস্য
প্রেয়স্যনুপগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্মং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেহস্যাঃ
বাঞ্ছা পূর্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা॥'

— শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় প্রস্রবন কে? —না, রাধারাণী। একা রাধারাণী। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে? — অনবদ্যগুণা এক শ্রীমতী। অন্য কেউ না।

ভানুনন্দিনীর কুন্তলে কুটিলতা। নয়নে তরলতা, পয়োধরে কঠিনতা, এহেন অনবদ্যাঙ্গী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সব বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। তাই না তিনি রসিকশেখরের প্রেয়সী।

গেয়ে চলেছেন রায়— রাইধনির গুণকীর্তন। সর্বাধিক সৌভাগ্য কার? — না, রাজ মহিষী সত্যভামার। — সমগ্র বামা

রাজ্যেই। সে হেন সত্যভামা কায়মনোবাক্যে কামনা করেন রাধা সৌভাগ্যগুণ। কলার চৌষট্টি বিদ্যাই গোপীদের করায়ত্ত। তবুও তাঁরা গোপী ঠাকুরাণীর কাছে পাঠ নেন। ব্রজদেবীর এহেন সৌন্দর্য। এহেন গুণই বাঞ্ছা করেন রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা লক্ষ্মী ও পার্বতী। পতি নিষ্ঠায় আদর্শস্থানীয়া কে? — না অরুন্ধতী। সেহেন অরুন্ধতীও শ্রীমতীর পাতিব্রত্য আকাঙ্ক্ষা করেন একান্তভাবে।

এখন উপসংহার টানতে চাইছেন রায়। কিন্তু তার আগে শেষ কথাটি তিনি বলছেন। কি সে শেষ কথা? — না, শ্রীরাধার গুণ শুধ্ অগণনই নয়, অন্তবিহীন। তাইতো, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অন্ত খুঁজে পান না, জীব তো কোন্ ছার?

রায় মুখে রাইতত্ত্ব শুনলেন প্রভু এতক্ষণ। সন্তুষ্টিতে স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভুর সর্ব অবয়ব। বললেন, 'রায়, এতকাল কত ভক্ত, কত পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এসেছি— কই, তোমার মত তো রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেনি কেউ। সাধু, সাধু! মধুর, অতি মধুর!! কিন্তু আমার সাধ যে এখনও অপূর্ণ। আমার বড় সাধ তোমার মুখে রাধাকৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব শোনার। যদি শোনাও, তাহলে আমার সাধ পূর্ণ হয়।'

রায় আর কি করেন? যে পদে প্রপন্ন তিনি, সেই প্রভুরই সাধ। তাঁর সাধ তো পূর্ণ করতেই হবে।

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব— এই চারতত্ত্ব জানতে প্রভু ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রায় আনন্দ দিলেন প্রভুকে এতক্ষণ। প্রভুর হাস্যোজ্জ্বল বদনই তার বড় প্রমাণ।

কিন্তু রায় যে মাত্র দুটি তত্ত্বের দিগদর্শন করলেন। প্রথমে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং পরে রাধাতত্ত্ব। তাহলে প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের কি হল? এ দুটি তত্ত্ব কি রায় মুখে অনালোচিত থেকে গেল? — না, আলোচিত হয়েছে। মধুর— অতি মধুর ভাবেই হয়েছে। কৃষ্ণতত্ত্বের মধ্যেই রয়ে গেছে রসতত্ত্ব, আর রাধাতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাতেই আছে প্রেমতত্ত্বের দিগদর্শন।

তাহলে বিলাস তত্ত্বের জিজ্ঞাসা প্রভু মুখে কেন? এত আলোচনার পর বিলাসতত্ত্ব বিচারণার আর কি বাকী থাকতে পারে? কিন্তু রসাস্বাদন যে অন্ত বিহীন। তাই না প্রভুর এই নির্দেশ, আর তাই ঃ

'রায় কহে— কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥'

চরিত্রগুণে নায়কের চার আসন। ভিন্ন ভিন্ন আসন ঃ ধীর ললিত, ধীর শান্ত, ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত।

শ্রীকৃষ্ণ ধীর ললিত কেন? ধীর ললিত নায়কের বৈশিষ্ট্যই বা কি? সংবাদ দিয়েছেন রূপগোস্বামী ঃ

'বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীর ললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সী বশঃ॥'

— যিনি বিদগ্ধ, যিনি নব যুবা, যিনি পরিহাসপটু, যিনি নিশ্চিন্ত এবং যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, সেই প্রেয়সীর প্রেমে সেইরূপ বশীভূত, তাঁকে ধীর ললিত নায়ক বলে।

ব্রজের নবকিশোর নটবরের মধ্যে কি এই গুণগুলি আছে?

এই সঙ্গে আরেকটি কথা : বিলাস মানে কি ? — কেলি, ক্রীড়া বা লীলাই বিলাস।

কলাবিদ্যা চৌষট্টি রকম। নৃত্য. গীত, বাদ্য, নাট্য ইত্যাদি বিদ্যায় নিপুণ এই চিকনকালা রসিক নাগর। তাই তিনি বিদগ্ধ। বয়সে নব কিশোর। হাস্য-পরিহাস আস্বাদন করেন গোপীদের সঙ্গে, বিশেষত গোপী ঠাকুরাণীর সঙ্গে।

তাঁর তো কোন চিন্তা নেই। চিন্তা আর কি ? বংশীবটে যান আর বংশীবাদন করে চলে আসেন।

তিনি বহুবল্লভা। যে দয়িতার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাই তিনি পূরণ করেন।

সুতরাং যথার্থই বললেন রায়, '……… কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।'

কামক্রীড়া বলতে গোপীসঙ্গে বিহার। সদাই বিহার করেন। বিহার করেন বনে বনে। তাই তিনি বনবিহারী – বনোয়ারী। বিহার করেন রাসস্থলীতে। রাসবিহারীর সে কি মধুর বিহার !

সদাই বিহার করেন, তাহলে অন্যবিধ লীলা কখন করেন— যেমন. গোষ্ঠে গমন. নবলক্ষ ধেনুর গোচারণ, স্বগৃহে প্রত্যাগমন।

যখন তিনি গোপী সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকেন, তখন এই স্বল্পকালীন বিরহ মিলনের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দেয়। দর্শনেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়, তাই সর্বাধিক সক্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়। আর তাই অন্তরে বিহার করেন গোপীদের সঙ্গে।

বলে চলেছেন রায় :

'রাত্রি দিন কুঞ্জ ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে॥'

এই ভাবটির রূপ দিয়েছেন রূপগোস্বামী এইভাবে :

'বাচাসূচিত শর্ব্বরী রতিকলা প্রাগলভ্যায়া রাধিকাং ক্রীড়া কুঞ্চিত লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখী নামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্র কেলিমকরী পাণ্ডিত্যপারং গত কৈশোরং সফলী করোতি কলয়ন কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥'

— একদিন শ্রীমতী কুঞ্জ মধ্যে সখীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি আসন গ্রহণ করে ঐ সখীদের সামনেই প্রগলভ বাক্যে গত রাত্রির রতি কলার কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। রাধা লজ্জায় নেত্র কুঞ্চিত করলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁর কুচদ্বয়ে চিত্র কেলি মকরাদি চিত্রিত করে সখীদের কাছে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিলেন। হরি এইরূপ রস-লীলা দ্বারা কুঞ্জাভ্যন্তরে বিহার করে কৈশোর বয়স সফল করেন।

রায় বড় আশা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রভূপানে। আশা এইবার প্রভু নিশ্চয়ই পরম তুষ্টি লাভ করেছেন। এরপর তো আর কিছুই বলার নেই— থাকলেও তাঁর বুদ্ধির অতীত।

আশা ভঙ্গ হল। কারণ

'প্রভু কহে এই হয়, আগে কহ আর।' '··· আগে কহ আর' বললে কি হবে? রায় হতাশার সুরে বললেন, ······ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর।' বলে চুপ করে রইলেন রায়। কাটল কিছুক্ষণ। আবার মুখ খুললেন। চুপ করে আবার মুখ খুললেন যে। উনি কি আর খুললেন। রাম রায়ের অন্তরে বলাধান করছেন গোরা রায়। তাই মুখ খুললেন :

'একদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রেম বিলাস বিবর্ত ঘটে গেল।' বলেই রায় বললেন, 'এই বিলাস বিবর্তের ফলস্বরূপ যে কথাটি বলব, তা তোমার চিত্তপটে কি চিত্র আঁকবে'— আশঙ্কা প্রকাশ করলেন রায়।

বিবর্ত মানে কি?— না, বৈপরীত্য, ভেদ নেই— এই জ্ঞান। এরপর রায় স্বরচিত একটি গান গাইলেন:

'পহি লহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল— অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি! সেসব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোঁজলু দূতী, না খোঁজল আন।
দুহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেম কি ঐছন রীতি॥"

বৈপরীত্য? কি রকম সে বৈপরীত্য? আকর্ষণ করেন, তাই কৃষ্ণ। কাকে আকর্ষণ করেন? কাকে না করেন? সচল-অচল, স্থাবর-জঙ্গম, প্রাণী-অপ্রাণী, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে আকর্ষণ করেন। অনাদিরাদিগোবিন্দ সেই আদিকাল থেকেই আকর্ষণ করছেন।

নিয়ামকের এই নিয়মে এক বিপরীত নিয়ম দেখা দিল। সেটি কি? — না, আকর্ষণকারীই আকর্ষণে আবদ্ধ হয়েছেন। আর তখনই দেখা দিল বিবর্ত বিলাস। কার আকর্ষণে তিনি ধরা

পড়লেন ? মাদনাখ্য মহাভাবের অধিকারিণী রাধারাণীর আকর্ষণে।

আকর্ষণ জালে আবদ্ধ হয়ে কি করলেন ? দূতী পাঠালেন। ব্রজেশ তনয় দূতী পাঠালেন ভানু দুলালীর কাছে। রাই কিশোরী তখন কি করলেন ? বললেন সেই দূতীকে, 'সখি ! আমাদের রাগ-অনুরাগের কথা তোমাকে আর কি বলব ? এই অনুরাগ কি আজকের ? এ যে অনাদিকালের। এর আদি নেই। অন্তও নেই। নেই কোন সীমা। আর সেই আকর্ষণ অনুদিন বাড়তেই থাকল।'

বলে চলেছেন রাইধনি, 'সখি, কি আর শুনবে তুমি আমাদের প্রেম কথা। এক সময় সে ছিল দয়িত, আর আমি ছিলাম দয়িতা। কিন্তু কামদেব তাঁর বাণাঘাতে আমাদের চিত্তবৃত্তি পেষণ করে ফেলল। তাতে কি হল জান ? না রইল সে কান্ত, আর না রইলাম আমি তাঁর কান্তা। ভেদ গেল। উভয়ে হলাম অভেদ। উপাধি গেল। রইল প্রেম। শুধুই প্রেম। নিরুপাধি প্রেম।

এতকাল তাঁর বাসনা আর আমার বাসনা ছিল এক। প্রকারে এক। আকারে অন্য। আত্মসুখ বাসনা না ছিল আমার, না ছিল তাঁর। ছিল শুধু একে অপরের সুখ বিধান করার ইচ্ছা। প্রকারে এক, আকারে ভিন্ন। তাই ফুলধনু আকারেও এক করে দিল। এবার আকারে-প্রকারে এক হলাম।

রাইধনি আবার বলছেন, 'আমরা এই প্রেমের বাঁধনে নিজে নিজে বাঁধা পড়েছি। না, না, কোন দূতী আসেনি আমাদের

প্রেমডোরে বাঁধতে। আসেনি অন্য কোন জন।

আকারে-প্রকারে এক হল। ছিলেন দুই ভিন্ন তনু। হলেন এক অভিন্ন তনু।

ছিলেন এক। লীলারস আস্বাদন করতে হলেন দুই। যুগের বিবর্তন। ঘটল প্রেম বিলাসেরও বিবর্ত। তাই দুই হলেন আবার এক। এক-এ দুই, দুই-এ এক। অন্তঃ কৃষ্ণ, বহিঃ রাধা। 'রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ।' আর কোন সম্বন্ধ রইল না। পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধ রইল না। পুরুষ প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয় কেন? পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি গুণের অভাব আছে বলে। আবার প্রকৃতি পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় তার মধ্যে পুরুষগুণের অভাব আছে বলে। উভয় ক্ষেত্রেই অভাবের অপেক্ষা। প্রেম অভাবের অপেক্ষা করবে কেন? এই গুণাপেক্ষা. কান্ত-কান্তার সম্বন্ধ এসব তো প্রেম পরাকাষ্ঠার পরিপন্থী। প্রেমের তীব্রতা হ্রাস করে, গভীরতায় আনে অগভীরতা। আর এসব মুক্ত হলে শুধু থাকে প্রেম। শুধুই প্রেম। নির্ভার, নিরুপাধি, নিরপেক্ষ প্রেম।

শ্বেত চন্দন ও রক্ত চন্দন আকারে ভিন্ন, প্রকারে এক। দুই চন্দন একসঙ্গে পেষণ করলে আকারে প্রকারে হয়ে যায় অভিন্ন। আর আলাদা করা যায় না। তখন থাকে শুধু এক সুমিষ্ট সুরভি।

এ প্রেম তাই সব সম্বন্ধের অতীত। আবার অন্যভাবে ও ভাষায়ও কথাটি বলা যায়। অর্থাৎ সব সম্বন্ধেই তিনি। প্রেমের ফাঁদ পাতা নিখিল ভুবনে। সেই ভুবনেই তিনি করছেন লীলা-বিলাস। সম্বন্ধে পূর্ণতা এল। পূর্ণতা যাতে আসে, তার তো

আর স্বীয় সত্তা থাকে না— বিলীন হয়ে যায়। অস্তিত্বে আসে শূন্যতা। শুধুমাত্র থাকে প্রেম— সম্বন্ধ মুক্ত প্রেম।

পূর্ণতা ও শূন্যতা ভাবে এক, ভাষায় আন। যেমন দীঘি। সসীম এক জলাশয়। যখন প্লাবিত হয়, তখন দীঘির আর অস্তিত্ব থাকে না— বয়ে চলে অসীম জলস্রোত।

গীতটি শ্রবণ মাত্রই প্রভু ত্রস্ত হস্তে রায়ের মুখ আচ্ছাদন করলেন। করেই—

'প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥'

শ্রোতা বক্তার মুখ নিজ হাতে ঢেকে দিলেন কেন? আবার ঝটিতি বললেন কেন সাধ্য বস্তুর সীমা নির্ধারিত হয়ে গেছে।

এ ও এক প্রভুর লীলা। ঐশ্বর্যবোধে লীলা হয় না। কেন? ঐশ্বর্যে প্রীতি নেই, আছে ভীতি। ভীতিতে লীলা হয় না। প্রীতিতে হয় লীলারসের আস্বাদন। তাই ধরা দিয়েও ধরা দিতে চান না।

আচম্বিতে-হতচকিত হলেন রায়ঃ 'কোথায় গেলেন সেই নবীন সন্ন্যাসী? এই তো একটু আগেই আমার সামনে ছিলেন। আমি বক্তা আর তিনি শ্রোতা— একেবারে মুখোমুখি। আমার চোখের সামনেইঃ মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে রাতুল কৌপীন। নধরকান্তি। স্বর্ণোজ্জ্বল দেহ বর্ণ। সুদীর্ঘ কলেবর আর আয়ত নয়ন।'

এ হেন সন্ন্যাসীর স্থলে কি দেখছেন রায়? দেখছেন তাঁর

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নবকিশোর নটবর গোপবেশ বেণুকর। আরও দেখছেন সেই বেণুকরের সামনে নৃত্য করছেন এক কনক প্রতিমা। যাঁর অঙ্গচ্ছটায় ঝলমল করছেন সেই শ্যামল তনু কানু।

রায়ের মনে ধন্দ দ্বন্দ্ব ঃ এ কি তাঁর স্বপ্নাবেশ? এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরসনের সুযোগ পেলেন না রায়। প্রভু ঝটিতি পরবর্তী প্রশ্নে এলেন। তবে রায় এ দৃশ্যটি মনে ধরে রাখলেন।

প্রভু শুধোলেন, 'রায়, তুমি পরম ভাগবত। ভগবৎ কথা তোমার মুখে কতভাবেই না জানলাম। সাধ্যতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, বিলাসতত্ত্ব— সবই জানলাম। জেনে পরম তুষ্টি লাভ করলাম। কিন্তু রায় একটি কথা যে বাকী রয়ে গেল। সাধ্যতত্ত্ব বললে। সাধন ছাড়া কি সাধ্য লাভ করা যায়? সুতরাং বল, কোন্ সাধনে সেই সাধ্য লাভ করা যায়?

দৈন্যোক্তি করলেন রায় ঃ

'ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়ানটে হইবেক স্থির॥
মোর মুখে বক্তা তুমি। তুমি হও শ্রোতা।'

— না, ঠিক দৈন্যোক্তি না। যথার্থই বললেন রায়। রামানন্দ পরম ভক্ত। তাই ধ্যান-জ্ঞানও যথার্থ। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ না বলালে কে বলতে পারে?

রায় সাধন রহস্য অনাবৃত করতে আরম্ভ করলেন ঃ

'অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা।'

বলে চলেছেন রাম রায়, 'প্রভু, তুমি তো সবই জান। তবুও

বলাচ্ছে, তাই বলছি। দাস্য বাৎসল্যাদি রসের ভক্তদের শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা সেবায় অধিকার নেই।. শুধু ব্রজধামের কেন, অন্য কোন ধামেরও এই রসের পরিকরদের যুগল কিশোরের লীলাসেবায় অধিকার নেই। কেন নেই, তাতো তুমি জানই। তবুও বলছি। এই সব ভাবের ভক্তদের মধ্যে মহাভাব নেই। কৃষ্ণ প্রেমের চরম পরিণতি মহাভাবে। এই মহাভাবের অধিকারিণী শুধুমাত্র গোপী-রাই, বিশেষ করে গোপীঠাকুরাণী রাধারাণী।'

তাহলে অন্য ভক্তদের রাধাকৃষ্ণ লীলাসেবার সাধ কিভাবে পূর্ণ হবে? রায় দিচ্ছেন রাম রায়ঃ 'পূর্ণ হবে যদি এই ভক্তেরা গোপীর শরণ নেন। গোপীকৃপা লাভ করলেই এঁরা লাভ করবেন লীলা সেবার অধিকার।'

রাম রায়ের সিদ্ধান্ত সার্বিকভাবে সুসিদ্ধান্ত। এই সুসিদ্ধান্তের প্রমাণ শতকে শতকে। গত শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ লীলা সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন গোপীবেশে— মধুর রসে, কান্তা প্রেমে। এই গোপীভাবে ভজনের জন্য ঠাকুর শাড়ী পড়তেন, নাকে, কানে, গলায়, হাতে গহনা পরতেন। না, কোন খুঁত রাখতেন না ঠাকুর। খুঁত রাখলে যে গোপীভাব আসবেনা। কিন্তু কেশ-কলাপ? হ্যাঁ, তার ব্যবস্থাও হয়েছিল পরচুলা দিয়ে। হাঁটা, চলা, বসা, কথা বলা— সব মেয়েদের মত। তাঁর নিকট জন তাঁর নিকটে বসেও তাঁকে চিনতে পারেন নি। এমনই নিখুঁত সে গোপী সাজ।

শ্রীশ্রীবন্ধু সুন্দরেরও একই নির্দেশ:

'গোপীভাব লওরে গুরুগতি, কৃষ্ণপতি।' আরও বিশদ করে বলেছেন ঃ

'গুরু রূপা সখী বামে নেহারি নয়নে।
নিরবধি রহিব চরণ সেবনে॥
ভনে জগদ্বন্ধু দ্বিজ, কবে দোঁহ মুখাম্বুজ
হেরিব সখীর পাশে বসি।
(সখীর পাশেতে রহি) (মঞ্জরীর হাত ধরি)
(অশ্রুনীরে অঙ্গ ভরি) (হেরব যুগল মাধুরী)'

গোপীদের এই শ্রেষ্ঠত্ব কেন ?

ললিতা বিশাখা শ্রীরূপ মঞ্জরী আদির এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রসাদলব্ধ প্রয়াসে এ ধন লাভ করা যায় না। যায় না বলেই তাঁরা অন্যান্য রমণীর ন্যায় প্রাকৃত রমণী নন। আর তাই তাঁদের স্বসুখ বাসনা নেই। বাসনা শুধুমাত্র একটাই— যুগল কিশোরের সুখ বিধান। এতেই তাঁরা কোটি সুখ পান। বলছেন রাম রায় ঃ

'কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥'

কেন ? উত্তর দিচ্ছেন রামানন্দ ঃ

'রাধার স্বরূপ— কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥'

যথার্থ বললেন রায়। লতা বাঁচলে তো বাঁচবে পাতা।

শ্রীরাধিকা হচ্ছেন লতিকা— কৃষ্ণপ্রেম লতিকা। সেই লতিকার পুষ্টিতেই সখীপাতাদের পুষ্টি। তাই রাধার আনন্দে তাঁদের আনন্দ। তাঁর সুখেই তাঁদের সুখ।

আবার তাঁদের ঠাকুরাণীর মনটিও তেমনি। গোপীরা যাতে সেই রসিক নাগরের অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা তিনিই করেন। ছলে, কৌশলে রাই বিনোদিনী রাসবিনোদিয়াকে গোপীদের কাছে পাঠান তাঁদের বিনোদনের জন্য। আর তাতে ভানু সুতার কি হয়? সংবাদ দিচ্ছেন রামানন্দ রায়ঃ

'আত্ম কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়।'

সবই মধুর, অতি মধুর। কিন্তু ঐ যে কামায়ন গন্ধ। না, না, কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের এই কামক্রীড়া প্রাকৃত নয়। সর্বদা ও সর্বথা অপ্রাকৃত। তাঁরা নিজেরা যে থাকছেন নিরাসক্ত। আত্ম সুখ থেকে যোজন দূরে। সব কিছুই ঐ কালিয়া বঁধুর সুখের জন্য। প্রাকৃত কামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলেই এই ভ্রম। আসলে সবটাই অপ্রাকৃত।

গোপীর ভজন কি প্রকার? বলে চলেছেন রাম রায়ঃ

'গোপীর হচ্ছে রাগানুগা ভজন। তাঁরা বেদের বর্ণাশ্রম ধর্ম মানেন না। তাঁরা যে আলাভোলা গোয়ালিনী। শাস্ত্র জ্ঞান নেই। নেই কোন বালাই নিয়ম কানুনের। আছে শুধু একটিই ধ্যান-জ্ঞান— ঐ বেণুকর নাগরের সুখ বিধান।

সুর সাধক সুরদাস গোপী সংবাদ দিচ্ছেন এইভাবেঃ

'উধো ! জোগ জোগ হম নহী ।
অবলা গ্যান সার কহ জানৈঁ কৈসৈঁ ধ্যান ধরাহী ॥'

উদ্ধব— অত বড় নাম কি আলাভোলা অবলা পল্লীবালাদের মুখে আসে ! তাই বলছেন 'উধো' । বলছেন, 'দেখ বাপু, ঐ যোগ ফোগ আমরা জানি না । জানি না আমরা শাস্ত্র-টাস্ত্রও । ধ্যান করতে গেলে ঐ জ্ঞানের দরকার । কাজেই ওসব আমরা করতে পারব না .'

সংবাদ দিয়ে চলেছেন রামানন্দ । কি সে সংবাদ ? — না, ব্রজেশতনয় চরণ লাভ করতে হলে গোপীভাব অঙ্গীকার করে রাগানুগা ভক্তিতে ভজন করতে হবে । এ কথার প্রমাণ ? — প্রমাণ শ্রুত্যভিমানিনী দেবীরা । সেই দেবীরাই বলছেন ঃ

'নিভৃত মরুন্মনোক্ষ দৃঢ় যোগযুজো হৃদি যন্মনয় উপাসতে
তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ ভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো বয়মনিতে সমাঃ
সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ ॥'

— শ্রুত্যভিমানী দেবতারা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে দৃঢ় যোগ যুক্ত মুনিরা হৃদয় মধ্যে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মাখ্যতত্ব উপাসন করে প্রাপ্ত হন, তোমার শত্রুরাও তোমাকে স্মরণ করে সেই ব্রহ্মাখ্যতত্ব পেয়েছে । আর সর্প রাজের শরীরের মত তোমার বাহুর প্রতি প্রলুব্ধ শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজদেবীরা তোমার যে চরণ সরোজসুধা বক্ষে ধারণ করে, সেই রাধা প্রভৃতি তোমার নিত্যকান্তার আনুগত্য লাভ করে আমরাও তাঁদের মত তোমার সেই চরণ

সরোজসুধা লাভ করেছি।

ঐ একই কথা বললেন রায়। অধিক গুরুত্ব আরোপ করাই উদ্দেশ্য। কিসের গুরুত্ব? — না, গোপী আনুগত্যের গুরুত্ব। কথাটা ঘুরিয়ে বলছেন রায় অর্থাৎ গোপী আনুগত্য স্বীকার না করে যিনি ঐশ্বর্যজ্ঞানে ভজন করেন, তিনি কখনও ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পান না, যেমনটি পাননি লক্ষ্মীদেবীও। দেবী দুশ্চর তপস্যা করলেন ঐ ঐশ্বর্য জ্ঞানে। অর্থাৎ 'হে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি। তুমিই একমাত্র ভগবান। আর আমি অতিক্ষুদ্র জীব, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র— বালুকণা থেকেও ক্ষুদ্র। আমি তোমার চরণ কমল প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করছি।'

এ দুশ্চর তপস্যার ফল কি হল? কিছুই হলনা। তপস্যা-টাই নিষ্ফল হল। যেমন, ভাগবত বলছেন:

'নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্ত রতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং
নলিন গন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কাঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্
ব্রজ সুন্দরীণাম॥'

— রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাহুপাশে আবদ্ধা ও কণ্ঠলগ্না হয়ে ব্রজাঙ্গনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় তাঁরা যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন, সেই প্রসাদ নারায়ণের সদাবক্ষোলগ্না পরম প্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নি এবং পদ্মগন্ধা ও পদ্মকান্তা অপ্সরাগণও লাভ করেন নি। অন্য রমণীদের তো কথাই নেই।

লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠেশ্বরী— বৈকুণ্ঠেশ্বরের সদা বক্ষোলগ্না। প্রভুত্বেই

অভ্যস্তা— আনুগত্যে নয়। হবেনই বা কি করে? ব্রহ্মাদি দেবতারা না সদাই দেবীর স্তুতি করছেন। চরণ বন্দনা করছেন। সে হেন দেবী কি অন্যের আনুগত্য স্বীকার করবেন? তাও আলাভোলা গোয়ালিনীর? না, গোয়ালিনীর না। কিন্তু করবেন। এবং করলেন শুধুমাত্র সরাসরি ব্রজেশ তনয়ের। ফলে প্রয়াসের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হলেন। রায় তাই বলছেন:

'তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

সাধন রহস্যের উন্মোচন সমাপ্ত হল। প্রেমানন্দে প্রেমালিঙ্গন দিলেন গোরা রায় রাম রায়কে। আনন্দের সুরধুনী বইতে লাগল উভয়ের নয়নে।

প্রেমাবেশে কাটল কিছুক্ষণ।

এক সময় উভয়েই আবেশ মুক্ত হলেন। তখন রায় বললেন, 'প্রভু, একটি নিবেদন আছে। তুমি তো দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে বেরিয়েছ। বেশীদিন আটকে রাখার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে একটি মিনতি: অনুগ্রহ করে অন্তত দশটি দিন আমাকে তোমার সুখ সঙ্গ দাও। তোমার প্রেম সঙ্গে আমার বিষয় দুষ্ট মন পরিশুদ্ধ হোক।'

দৈন্যের কি মধুর বিনিময়!

প্রভু বললেন, 'সে কি! তোমার মন পরিশুদ্ধ হবে কি? আমিই তো এলাম তোমার কাছে আমার মন পরিশুদ্ধ করতে— তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনে আমার মন পরিশুদ্ধ করার আশায়।

তা আমার আশালতা পুষ্পিত হয়েছে। তোমার গুণের কথা শুনেছিলাম মাত্র। আর এখানে তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনে প্রত্যক্ষ করলাম। আর এটাই প্রত্যক্ষ করলাম যে একমাত্র তুমিই রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব ও বিলাসতত্ত্বের শেষ সীমা। আর দশ দিনের কথা কি বলছ? জীবনের শেষ পর্য্যন্তই যে তোমার সঙ্গ লাভের লোভ আমার। তুমি নীলাচলে চলে এস। তুমি আর আমি নীলাচলে থাকব, আর সারাটা জীবন কাটাব কৃষ্ণ কথায়। কৃষ্ণকথা বড়ই মধুর— হৃদয় জুড়োয়।'

এরপর বিরতি। তত্ত্ব কথার আলোচনায় বিরতি। বক্তা-শ্রোতা নিজ নিজ কাজে চলে গেলেন। প্রভু শুধোলেন, 'রায়, আমাদের কৃষ্ণানুশীলনের ইষ্ট গোষ্ঠি আবার কখন হবে?' উৎসাহী রায় উত্তর দিলেন, 'বিষয় তো এখনও ছাড়তে পারিনি। দিনের শেষেই বসি। আমিই আসব।'

পুনর্মিলন সন্ধ্যাবেলায়। শুরু হল প্রশ্নোত্তরে ইষ্টগোষ্ঠি। প্রভুর প্রশ্ন, রায়ের রায়। আসলে কিন্তু প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা ঐ প্রভুই।

প্রভু শুধোলেন, 'আচ্ছা রায়, বলতো কোন্ বিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ?' কৃষ্ণগত প্রাণ রায় উত্তর দিলেন, 'কৃষ্ণভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।' হাস্যোজ্জ্বল চোখে তাকালেন প্রভু। কেন? রায় যে ঠিক উপনিষদের কথাটিই বললেন। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন,

'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।'

সত্যিই তো, যাঁকে জানলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোন কিছু জানার

বাকী থাকেনা, সেটাই না সর্ব বিদ্যার সার। অন্যসব বিদ্যাই অসার। কৃষ্ণই পরাৎপর পরতত্ত্ব। কিন্তু তাঁকে জানতে হলে চাই ভক্তি। কৃষ্ণভক্তি। তাই কৃষ্ণভক্তিই সর্ব বিদ্যার সার।

জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কি? 'কীর্তির্যস্য স জীবতি।' উত্তম উক্তি। এক ব্যক্তি বিশ্ব বিশ্রুত বিজ্ঞানী। প্রথিত যশা পণ্ডিত— এ খ্যাতিতে তিনি বাঁচবেন? কতদিন বাঁচবেন? কাল যে সবই হরণ করে। কিন্তু হরণ করতে পারে না একটি বস্তু। কি সে বস্তু? —না, কৃষ্ণ প্রেম। অটুট থাকে কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণই অটুট রাখেন। ভক্তের মহিমা খ্যাপনে যে তাঁর বড়ই আনন্দ। তাই রায় উত্তর দিলেন:

'কৃষ্ণ প্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি।'

জীবের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী কে? মণি, মুক্তা, হীরা, চুনী, পান্না, প্রাসাদ, রাজ্য সাম্রাজ্য— সবই প্রাকৃত ধন। তাই 'কাল স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।' কিন্তু ভেসে যায়না একটি মাত্র ধন যার নাম প্রেমধন। রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন।

প্রভুর চতুর্থ প্রশ্ন:

'দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?'

উত্তর দিলেন রায়: 'কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।' রায় যেন প্রভুর মনের কথাটিই বললেন। এ জগতে কত কিছুই না আছে— স্থাবর-জঙ্গম, অচল-সচল, চর-অচর, প্রাণী-অপ্রাণী, অগণন বস্তু আছে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের বিরহে জগৎ শূন্য মনে হয়। সত্যিই তো, সে ইষ্টগোষ্ঠি করবে কার সঙ্গে? ইষ্টগোষ্ঠি করতে

করতেই না সে ইষ্ট দেবতা পাবে। তাই কৃষ্ণ ভক্তের বিহনে যে তাঁর দুঃখ, সেই দুঃখই গুরুতর।

'মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি?' — শুধোলেন প্রভু। সেই ব্যক্তিই মুক্ত, যখন প্রাকৃত কোন বস্তুই তাকে আকর্ষণ করে না। কৃষ্ণ সকলকেই আকর্ষণ করেন তাই না তাঁর নাম কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণের এই আকর্ষণ অনুভব করবে কে? — না, যার মধ্যে জেগেছে কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণ প্রেমের উদয় তার মনে কখন হবে? — যখন জাগবে তার মনে অনাসক্তি— সংসারের প্রতি অনাসক্তি। অনাসক্তি মানেই আসক্তি— কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি। এই আসক্তিই আনবে কৃষ্ণ প্রেম। তাই যথার্থ উত্তরই দিলেন রায়:

'কৃষ্ণ প্রেম যার— সেই মুক্ত শিরোমণি।' রায়ের এই উক্তি যুগে যুগেই সত্য।

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি:

'তাঁকে ভালোবাসলে বিবেক বৈরাগ্য আপনি আসে। স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। .... সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটি কর্মভূমিই মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিন্তু কলকাতা কর্মভূমি। কলকাতায় বাসা করে থাকতে হয় কর্ম করবার জন্য।'

'গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম?'
— প্রভুর ষষ্ঠ প্রশ্ন।

'জীবের নিজধর্ম হচ্ছে রাধাকৃষ্ণ লীলা কীর্তন।'

— উত্তর দিলেন। রায়ের উত্তর যথার্থ। নিজের জয়গান তো জীবের ধর্ম নয়। আত্ম জয়গানে হয়ত আপাতত আত্ম তুষ্টি আসে। কিন্তু এতো নিতান্তই সাময়িক তুষ্টি। তাহলে শাশ্বত তুষ্টি কখন আসবে? — যখন জীব যুগল কিশোরের লীলাকীর্তন গাইবে।

প্রভুর প্রশ্ন চলছে অবিরাম। রায়ও ইষ্টগোষ্ঠি লাভে বড়ই প্রীত। তাই প্রীতিতেই সাজাচ্ছেন উত্তরমালা। এও এক সুভাষিত।

বলে চলেছেন রায়ঃ 'কৃষ্ণভক্ত সঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল।' কেন? — ভক্ত সঙ্গেই যে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়।

সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণ কি? — 'কৃষ্ণনাম গুণ লীলা স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণ।' — বললেন রায়।

আর ধেয় মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান কি? — 'যুগল চরণকমলই সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান।' — উত্তর দিলেন রায়।

কোথায় বাস সর্বাধিক প্রশস্ত? — 'সর্ব প্রাকৃত বস্তু ত্যাগ করে ব্রজধামে বাসই সর্বাধিক প্রশস্ত'— রায়ের সিদ্ধান্ত।

সর্বাধিক প্রশস্ত কেন? — মথুরা কর্মভূমি আর দ্বারকা ধর্মভূমি এই দুইয়ের ঊর্ধ্বে হচ্ছে রসভূমি-- লীলাভূমি। শ্রীধাম বৃন্দাবনই হচ্ছে এই লীলারসভূমি। এই ব্রজধামেই হচ্ছে রাসস্থলী আর এই রাসস্থলীতেই রাসেশ্বর রাসলীলা করেছেন রাসেশ্বরী ও গোপীদের সঙ্গে। শৃঙার রস— উজ্জ্বল রসের আকর এই মধু বৃন্দাবন। তাই এই ব্রজধামই বরিষ্ঠ বাসধাম।

সর্বাধিক কর্ণপেয় কোন কথা? এ প্রশ্নের উত্তরে রায় জানালেন রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস কথাই সর্বাধিক শ্রুতি রসায়ন।

এখন প্রভুর দ্বাদশ প্রশ্ন রায়ের কাছে ঃ

শ্রেষ্ঠ উপাস্য কে ? বাঃ, উত্তম প্রশ্ন। উত্তরও উত্তম। উত্তর দিলেন রাম রায় ঃ 'যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।' একা কৃষ্ণ না, আব একা রাধাও না। যুগল স্বরূপই পরম স্বরূপ। তাই সদাই যুগল।

এ কথাটি দাস গোস্বামী সমর্থন করেছেন এইভাবে ঃ

'রাধেতি নাম নবসুন্দর গীত মুগ্ধং কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধম।

সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগ হিমেন রম্যং কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে॥'

-- রাধা নামটি নতুন সুন্দর অমৃতের মত মনোমুগ্ধকর, আর কৃষ্ণ নামটি মধুর, অদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধ তুল্য। হে ক্ষুধিত রসনা, সুরভি রাগরূপ হিমের দ্বারা রমণীয় করে তা সর্বক্ষণ পান কর।

নরোত্তম ভক্তোত্তম। তাঁর সুধাকণ্ঠেও ঐ সুধা মাখা যুগল নাম ঃ

'যুগল চরণে প্রীতি পরম আনন্দ তথি
রতি প্রেমা হউ পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম উপাসনা রসধাম
চরণে পড়িয়া পরানন্দে॥
... ...
... ...
রাধাকৃষ্ণ নাম গান সেই সে পরমধ্যান
আর না করিহ পরমান।

কৃষ্ণনাম গানে তাই রাধিকা চরণ পাই
রাধানামে পাই কৃষ্ণচন্দ্র ॥'

শেষ প্রশ্ন করলেন প্রভু। প্রশ্ন সংখ্যা এটি নিয়ে দাঁড়াল তের। এই ত্রয়োদশ প্রশ্নটি হচ্ছে:

'মুক্তি-ভক্তি-বাঞ্ছা যেই কাঁহা দোঁহার গতি?'

মুক্তিকামীর গতি কি? আর যাঁরা ভক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁদেরই বা গতি কি?

উত্তর দিলেন রায়:

'স্থাবর দেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি।'

মুক্তির প্রকার ভেদ আছে। সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য ইত্যাদি। মুক্তিকামী সাধক সিদ্ধাবস্থায় ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করে। সাধক ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। ব্রহ্মে আনন্দ বৈচিত্রী নেই। ফলে আনন্দ বৈচিত্রীর রসাস্বাদন থেকে সাধক বঞ্চিত হন। রায় বলছেন এঁরা যেন স্থাবর। শাখী-শৈল কিঞ্চিৎ মাত্র আনন্দ অনুভব করে, আনন্দ বৈচিত্রীর আস্বাদন করতে পারেন না। তেমনি মুক্তিকামীরাও ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে আনন্দ বৈচিত্রী উপভোগ করতে পারেনা।

ভক্তের ভাব স্বতন্ত্র। তিনি চিনি হতে চান না। চিনি খেতে চান। চিনির স্বাদ গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ পদাম্বুজে থেকে তাঁর চরণ সেবা করতে চান, তাঁর সুখ বিধান করতে চান। রায় বলছেন— এঁরা দেবদেহে অবস্থান করেন। দেবদেহাবিষ্ট জীব নির্বাধে নানাবিধ সুখ অনুভব করেন। তেমনি এইসব ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের

পার্ষদরূপে বৈচিত্রীময় লীলারস আস্বাদন করেন।

একটার পর আরেকটা। সাত সাতটা তত্ত্ব। সেই সাধ্যতত্ত্ব থেকে শুরু। সাধ্যতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, বিলাস-তত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব। সাতটি তো তত্ত্ব নয়— একেবারে সপ্তসিন্ধু। প্রভু প্রকাশ করলেন রায় মুখে। এর পরেও তেরটি প্রশ্ন। তারও উত্তর দিলেন রায়। প্রভু তুষ্ট। হাস্যোজ্জ্বল তাঁর মুখাবয়ব। রায়ও তুষ্ট। প্রভুর তুষ্টিতে রায়ের তুষ্টি।

এত যে তৃপ্তি-তুষ্টি রায়ের মনের কোণে কিন্তু সেই দ্বিধাটি রয়েই গেছে। আপাতত আর কোন আলোচ্য বিষয় নেই। রায় দেখলেন— এই তো সুযোগ। সংশয়ের নিরশন করতেই হবে। রায় তাই শুধোলেন, 'প্রভু, আমার সেই দ্বন্দ্ব-ধন্দের তো নিরাকরণ হলনা। তাহলে এখন আমার সেই সন্দেহ ভঞ্জন কর।'

প্রভু মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ তো, বল না কি তোমার সংশয়?'

রায় বললেন, 'কি আর বলি, প্রভু। আমাতে তোমাতে আলোচনা হচ্ছিল। আমি গৃহী, তুমি সন্ন্যাসী। হঠাৎ দেখি আমার সামনে সন্ন্যাসীটি নেই। তাহলে কে আছেন? আছেন এক অনবদ্য মূর্তি: শ্যামল তনু, হাতে নিয়ে বেণু। আর তাঁর সামনে নৃত্য করছেন এক স্বর্ণ প্রতিমা। তাঁর কনকচ্ছটায় সেই শ্যামল তনু ঝলমল করছেন।'

প্রভু হেসে বললেন, 'আরে না, না, ওসব কিছুনা। ও তোমার চোখের ভুল। তাছাড়া, কৃষ্ণপ্রেম তোমার মধ্যে অতি প্রগাঢ়।

কাজেই যেদিকেই তাকাও, সেই দিকেই তুমি তোমার ইষ্ট দেবতাকে দেখতে পাও। আন দেখতে তুমি কান দেখ। শ্যামময় দেখ ত্রিভুবন। বলেই ভাগবত থেকে সমর্থন দিলেন :

'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥'

— নিমি মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে হবি যোগীন্দ্র বললেন, 'হে রাজন! যিনি সর্বভূতে স্বীয় উপাস্য ভগবানের বিদ্যামনতা দর্শন করেন এবং স্বীয় উপাস্য ভগবানে ও সকল প্রাণীকে দর্শন করেন· তিনি ভাগবতোত্তম। প্রভু আরেকটি উদ্ধৃতি দিলেন ভাগবত থেকেই :

'বনলতাস্তরব আত্মানি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পা ফলাঢ্যা।
প্রণতভাব বিটপ, মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥'

— ফল-পুষ্প পরিপূর্ণ, অতএব নম্রশাখ এবং পুলকিত দেহ বনলতা সকল আপনাতে বিষ্ণু বিরাজ করছেন, যেন এই কথা প্রকাশ করে আনন্দে মধুধারা বর্ষণ করছে এবং সেই লতাদের প্রতি তরুগণও লতাদের মত আনন্দ প্রকাশ করছে। প্রভু আরও বললেন, 'দেখলে তো রায়, গোপীরা যেমন প্রেমবতী, তাঁরা মনে করেন বনের তরু-লতাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবতী। এই যে তরুলতা থেকে মধুধারা ক্ষরিত হচ্ছে, গোপীরা মনে করছেন, না, এ মধুধারা নয়, এ তাদের প্রেমাশ্রু। শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে তাদের দেহে রোমাঞ্চ হয়। যে পত্রাঙ্কুর বা পুষ্পাঙ্কুর দেখছ, ওসব পত্রাঙ্কুর বা পুষ্পাঙ্কুর নয়, তাদের প্রেম জনিত রোমাঞ্চ। কাজেই, এই তরুলতাতেই যখন এই কৃষ্ণ প্রেমে এই অবস্থা, তোমার মত কৃষ্ণগত প্রাণ তো আন দেখতে কান

দেখবেই।'

রায় এসব কথায় আর ভুললেন না। দৃঢ় গলায়—

'রায় কহে তুমি প্রভু! ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥'

প্রভু ধরা না দিয়ে আর পারলেন না। তিনি রায়কে স্বরূপ দেখালেন। কি সে স্বরূপ? — না,

'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥'

তখন রায়ের কি দশা হল?

'দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মুর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ — পড়িলা ভূমিতে॥'

এরপর প্রভুর স্পর্শে সংজ্ঞা ফিরে পেলেন রায়। তখন প্রভু বললেন, 'তোমার কাছে আমার কিছুই গোপ্য নেই। তাই প্রকাশ করলাম। তবে তুমি কিন্তু গোপিত রাখবে। জনসমাজে প্রকাশ করবেনা। আমরা যে পথের পথিক, তাতে আমি এক বাতুল, আর তুমি আরেক বাতুল। আমাদের মনের অবস্থা লোক বুঝতে পারবেনা। উপহাস করবে। তাই কোনদিনই প্রকাশ করবেনা।

প্রভু রায়ের প্রার্থনা রক্ষা করলেন: দশদিন দশরাত্রি কাটালেন রায়ের সঙ্গে। নিরন্তর ঐ একই কথা। যে কথার ওপর আর কোন কথা নেই, সেই কথা, যাঁর কথা জানলে ত্রিলোকের সব কথা জানা যায়, সেই কৃষ্ণ কথা।

সুখে কাটল। পরম সুখে কাটল দশটি দিন। বিদায় কাল এসে গেল। বিদায় নিতে এলেন প্রভু রায়ের কাছে।
বললেন,

'বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাহা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥"

— বলে প্রভু রামানন্দকে প্রেমানন্দে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন।

একাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ দেশের তীর্থে তীর্থে

বিদায় নিলেন প্রভু। রামানন্দ সঙ্গোৎসব বড়ই মধুর। মধুরিমায় প্রভুর মন ভরপুর। তার রসাস্বাদন চলছে। রসাবিষ্ট প্রভু হৃষ্ট চিত্তে চলেছেন। চলেছেন অন্তঃ কৃষ্ণ— বহিঃ রাধা হয়ে। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু হয়ে। বদনে আন নাম নেই— শুধুই কান নাম।

এ আবার কেমন ভাব? নিজেই না অন্তঃ কৃষ্ণ। আবার নিজেই নিজের নাম নিচ্ছেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। অন্তঃ কৃষ্ণ, আবার বহিঃ রাধা। রাইকিশোরী নবকিশোরের প্রেমে মাতোয়ারা। মধুরিমা আস্বাদন করেন। সেই মধুরিমা আস্বাদনে রাই বিনোদিনীর হৃদয়ে যে সুখের উদয় হয়, তা জানতে ভারি লোভ হয় রাই বিনোদের। তাই এলেন বহিঃ রাধা হয়ে।

কিন্তু প্রভু যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাচ্ছেন আর বিতরণ করছেন কৃষ্ণনাম। যথার্থই করছেন। এটাই তো ভক্তের কাজ। ভক্তের কাজই তো তাঁর ইষ্টের নাম প্রচার করা। তাই না তিনি বলেছেন:

'আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥''

তাই মধুমাখা হরিনাম অবিরাম গেয়ে চলেছেন। এতে কি হচ্ছে? — না, হচ্ছে রাইধনির সুখ বিধান, আর অগণন গণের বিমোচন।

কি রকম বিমোচন হচ্ছে? সংবাদ দিচ্ছেন কবিরাজ ঃ

'পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন।
যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের যতজন॥
সবেই ভক্ত হয়— কহে কৃষ্ণ হরি।
অন্যগ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি॥'

কত রকমের যে লোক দক্ষিণ দেশে! আছে জ্ঞান মার্গী —জীবই শিব। আবার আছেন এক জনসমাজ যাঁরা কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী। আর আছে পাষণ্ডী যারা বেদের বিধান মানেনা। কি এক বিসদৃশ জনসমাজ!

যাঁরা হোম যজ্ঞে বিশ্বাসী তাঁরা নাম যজ্ঞে ব্রতী হয়ে হরিনাম গাইবেন কেন? আবার যাঁরা নিজেরাই ব্রহ্ম, তাঁরাই কিভাবে কৃষ্ণনাম মুখে আনবেন? আর বেদ বিরোধী বৌদ্ধদের তো কথাই নেই।

এ তো গেল একটা দিক। এঁরা পরস্পর একেবারেই বিসদৃশ। আবার আছে অন্য এক জনসমাজ। সবাই বৈষ্ণব, কিন্তু

সম্প্রদায়ে ভিন্ন। ছিন্ন-ভিন্ন। যেমন, তত্ত্ববাদী, এঁরা নারায়ণের উপাসক। আচার্য মধ্বের অনুগামী। আবার আছে আরেক ভিন্ন সম্প্রদায়ের সমাজ। এঁরা রামানুজের অনুগামী। এঁদের ইষ্ট দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ।

লক্ষ্মীনারায়ণ স্বকীয়া তত্ত্ব, আর রাধাকৃষ্ণ পরকীয়া তত্ত্ব। প্রতীপ তত্ত্ববাদী রাধাকৃষ্ণ বা কৃষ্ণনাম নেবেন কেন?

বিসদৃশ এই ধর্ম নাট্যমঞ্চে এক অঘটন ঘটল। ঘটালেন প্রভু। সব এক হয়ে গেল। সবার মুখে এক নাম। যেমন,

'সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥'

পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু মালা অভিন্ন। এক মালা। কবি-রাজ জানাচ্ছেন ঃ

'সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ উপাসক হৈল— লয় কৃষ্ণনামে॥'

পথ চলছেন প্রভু। বদনে অবিরাম কৃষ্ণনাম। চলতে চলতে গৌতমী গঙ্গায় এলেন। স্নান সমাপন করলেন। এলেন মল্লিকার্জুন তীর্থে। তীর্থ দেবতা শিব। প্রণতি জানালেন প্রভু। মুখে কৃষ্ণনাম। আর সেই কৃষ্ণনাম গাইল সব তীর্থবাসী। তীর্থের পর তীর্থ। না, কোন তীর্থই বাদ দিলেন না প্রভু। প্রভুর তীর্থ পঞ্জীতে বাদ বিয়োগ নেই। সবই যোগ। যে যেখানে যেভাবেই আছে, সবাইকে একনামে যোগ। কৃষ্ণনামে যোগ।

এরপর দাসরাম মহাদেব, অহোবল নৃসিংহ এবং তারপর

সিদ্ধিবট। সিদ্ধিবটের অধিপতি স্বয়ং সীতাপতি।

এই সিদ্ধিবটে সাক্ষাৎ হল এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। এঁর ইষ্ট দেবতা রঘুপতি। পরম ভক্ত। মুখে কোন আন নাম নেই— শুধু রাম নাম। নিমন্ত্রণ করলেন প্রভুকে। রামপ্রেমী নিমন্ত্রণ করলেন কৃষ্ণ প্রেমীকে। প্রভু ভিক্ষা করলেন এইদিন এই ব্রাহ্মণের গৃহে।

তারপর আবার ছুটলেন। বিরাম নেই চরণ যুগলের। বিরাম নেই মুখ কমলেরও— কৃষ্ণনাম অবিরাম গাইছেন। এলেন স্কন্দ ক্ষেত্রে। দেবতা কার্তিকেয়। প্রণতি জানালেন প্রভু। এরপর ত্রিমঠ।

আবার ফিরে এলেন সিদ্ধিবটে— সেই রাম প্রেমীর গৃহে। এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সেই রাম প্রেমী গাইছেন কৃষ্ণনাম। প্রভু শুনছেন, মৃদু মৃদু হাসছেন আর মনে মনে বলছেন— কুসুম ভিন্ন, মালা যে এক।

ভিক্ষা সমাপনান্তে স্মিত হাস্যে প্রভু শুধোলেন, আচ্ছা ব্রাহ্মণ, তোমাকে একটা কথা না বলে পারছিনা। এর আগে দেখলাম তোমার মুখে সদাই এবং শুধুই রামনাম। অন্য নাম নেই। আবার এখন দেখছি শুধুই কৃষ্ণনাম, আন নাম নেই— এমন কি রামনামও নেই। তোমার এই দশা পরিবর্তন ঘটল কিসে?

গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন বিপ্র, 'প্রভু, কি আর বলব? সবটাই তোমার দর্শন প্রভাব, নইলে রাম নাম কি আমি আজ থেকে নিচ্ছি— নিচ্ছি সেই শিশুকাল থেকেই। তবুও দেখ, কি পরমাশ্চর্য ঘটনা! তুমি কৃষ্ণ ভক্ত— তোমার রসনায় সদাই কৃষ্ণ নাম।

সেই নাম অবিরাম শুনতে শুনতে আচম্বিতে আমার রসনায়ও কৃষ্ণ নাম এল। আর একবার এল কি নিরন্তর চলতেই থাকল— যেমন চলছে এখনও। রাম নাম আর মুখে আসে না। আরেকটা মজার কথা তোমাকে বলি। শিশুকাল থেকেই আমার এক নেশা ছিল নাম মাহাত্ম্য সংগ্রহ করা। এই যেমন পদ্মপুরাণ থেকে রাম নাম মাহাত্ম্য সংগ্রহ করেছি।

'রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদে নাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥'

যাঁর মহিমা অনন্ত, যিনি সত্যানন্দস্বরূপ, যিনি আত্মান্তর্যামী, যোগীরা তাঁর মধ্যে রমণ করেন বলে সেই পরম ব্রহ্মই রাম নামে অভিহিত হন

এ তো গেল পুরাণের কথা। আবার মহাভারত থেকেও শ্লোক সংগ্রহ করেছি ঐ নাম মাহাত্ম্যের সন্ধানে:

'কৃষিভূ'বাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥'

কৃষি সত্তাবাচক ধাতু, ণ আনন্দবাচক। এই উভয় মিলে কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম নামে আখ্যাত হন

'তাহলে তো রাম ও কৃষ্ণ— এই দুই নামই সমান অর্থাৎ পরম-ব্রহ্মকেই বোঝায়।'

কিঞ্চিৎ বিরতির পর সেই বিপ্র বললেন, 'আবার অন্য প্রমাণও পেয়েছি নাম বৈশিষ্ট্যের। যেমন, পদ্মপুরাণ বলছেন,

'রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে॥'

মহাদেব পার্বতীকে বললেন, 'হে বরাননে! রাম নাম বিষ্ণুর সহস্র নামের তুল্য। তাই আমি রাম নাম কীর্তন করে শ্রীরাম চন্দ্রে পরমানন্দ লাভ করি।

বলে চলেছেন বিপ্র, 'আবার দেখ, লঘু ভাগবতামৃত বলছেন,

'সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥'

পবিত্র বিষ্ণুর সহস্র নাম তিনবার পাঠ করলে যে ফল হয়, কৃষ্ণের একটি নাম একবার পাঠ করলেও সেই ফল হয়।

'এত যে কৃষ্ণ নামের মহিমা, তবুও কৃষ্ণ নাম এতকাল মুখে আসেনি। কেন জান? শৈশব থেকেই আমার ইষ্ট দেবতা হচ্ছে রাম। অষ্টপ্রহর তাঁর নামই নিই, তাই অন্য নামের জন্য আর সময় পাই না। কিন্তু তোমার দর্শন মহিমাতেই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। রসনায় আসন নিল কৃষ্ণনাম।' —এই কথা বলতে বলতেই হঠাৎ ব্রাহ্মণ প্রভুপদে পতিত হলেন। কান্না-ঝরা কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু, তুমিই সেই কৃষ্ণ।'

প্রভু তাঁকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন।

এরপর প্রভু বৃদ্ধ কাশীতে এসে শিব দর্শন করলেন। এখান থেকে চলে এলেন অন্য এক গ্রামে। কি সে লোক সংঘট্ট! মাথা আর মাথা। কার সাধ্য গণনা করে। যেমন কবিরাজ বলছেন,

'প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥'

প্রভুর অনবদ্য অবয়ব। একবার যে দেখে, সে আর চোখ

ফেরাতে পারে না এবং আকৃষ্ট হয়ে যায় তাঁর প্রেমাবেশ দেখে। তারা নিশ্চিত হয়— ঐ প্রেমাবেশ প্রাকৃত জীবে সম্ভবপর নয়। তাই, 'সভে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ।'

'……বৈষ্ণব হৈল সব দেশ।' হলেও জনসমাজের এক বিসদৃশ অংশ ধেয়ে এলেন। এলেন প্রভুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে। এঁরা হচ্ছে নৈয়ায়িক, মীমাংসক, আচার্য শঙ্করের অনুগামী অদ্বৈতবাদী, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দার্শনিক, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র পণ্ডিত। সত্যিই তো, এতকাল জনসমাজ মান্য করেছে এঁদের, আর আজ কিনা ভিনদেশী এক সন্ন্যাসী এসেই অধিপতি হয়ে গেলেন সমস্ত সমাজটার।

বাঁধল তর্কযুদ্ধ। প্রভু অসংকোচে গ্রহণ করলেন এই আহবের আহ্বান। কেন করলেন? প্রভু সুদর্শন। প্রভুর মধ্যে লোকাতীত প্রেমাবেশ। এই দুই গুণে আকৃষ্ট হয়েছে অধিকাংশ দক্ষিণ দেশ। তাই বলে সবাই হবে— এমন তো কথা নেই। একাংশ, হোক ভগ্নাংশ, নাও হতে পারে। কিন্তু প্রভুর দৃষ্টিতে যে বিয়োগ নেই। সবই যোগ। বিবিধ কুসুম, কিন্তু মালাটি এক। তাই যুযুৎসুদেরও তিনি গ্রহণ করতে চান। আর তা করতে গেলে যুদ্ধকেও যে গ্রহণ করতে হয়।

বাঁধল যুদ্ধ। যুক্তি— পাল্টা যুক্তি। প্রচণ্ড যুদ্ধ। প্রভু তাঁদের সব যুক্তিই করলেন খণ্ড খণ্ড। সর্ব শাস্ত্রের সর্ব পণ্ডিত হলেন পরাস্ত। গ্রহণ করলেন প্রভুরই মত। তাই কবিরাজ বলছেন :

'এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণ দেশ।'

করলে কি হবে? পাষণ্ডী রয়েছে যে! বৌদ্ধরা পাষণ্ডী।

বেদ বিরোধী, তাই পাষণ্ডী। অগণন গণের প্রভু হলেন গৌরসুন্দর। ফলে পাষণ্ডীদের এতকালের প্রভুত্ব যে আর অটল থাকে না। পোক্তক্ত অশক্ত হল। তেড়ে এলেন তাঁরা। আবার বাঁধল তর্ক যুদ্ধ। সহজে হার মানেন না এঁরা। যুক্তি, কুযুক্তি ও কূট যুক্তির জাল বিস্তার করলেন। সব জালই ছিন্ন করলেন প্রভু। তথাগত শরণাগতেরা হেটমুণ্ড হলেন। হলেন হাস্যাস্পদ। মনে মনে ক্ষিপ্ত হলেন। ষড় করলেন। নবীন সন্ন্যাসীর অহিত করার ষড়। কুকুর ভোজ্য অন্ন এনে দিলেন একটা থালাতে। মুখে বললেন বিষ্ণু প্রসাদ। অন্তরে জানলেন প্রভু। তবুও তো প্রসাদ বলেছেন ভিক্ষুরা। তাই করে ধারণ করলেন।

প্রভু এসেছেন 'জগদ্ধিতায়।' জগতের হিত চিন্তা করেন তিনি। তাঁর কি কখনও অহিত হয়? না, হয় না। কোনদিনই হয় না। হয় না বলেই না আচম্বিতে দেখা দিল এক বিশালকায় বিহঙ্গ। চঞ্চুপুটে থালাটি নিয়ে গেল। আর সেই কলুষিত অন্ন ঝর ঝর করে পড়তে লাগল ঐ সন্ন্যাসীদের মাথায়। পক্ষী বৃহদাকার হলে কি হয়— ধরে রাখতে পাবল না থালাটি তার ঠোঁটে। বড় বেশী ভারি। ঠোঁট থেকে পড়ে গেল। আর পড়বি তো পড়, পড়ল ঐ বৌদ্ধাচার্যের মাথায়। থালার কানার আঘাতে মাথা ফেটে গেল। রক্ত ঝরল। আঘাত সহ্য করতে পারলেন না আচার্য। ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়লেন। আচার্যের প্রাণ চান তাঁরা। গোপী প্রাণ-বল্লভের নাম নিতে বললেন প্রভু। আর বললেন, 'সবাই মিলে কৃষ্ণ নাম কানে দাও তোমাদের গুরুর। এক্ষুনি চৈতন্য লাভ করবেন

এবং কৃষ্ণ নাম বলবেন।'

প্রাণের দায় তো— তাই প্রভুবাক্য মান্য করলেন সন্ন্যাসীরা। কাজও হল। একেবারে তাৎক্ষণিক ফল। কৃষ্ণ নাম 'কানের ভিতর দিয়া / মরমে পশিল...'' আর অমনি গুরু চেতনা ফিরে পেলেন, আর হরি হরি বলে উঠে বসলেন। বুদ্ধের অনুগত হয়েও এতকাল অজ্ঞান তিমিরেই ছিলেন এঁরা। এই এখন প্রভু কৃপায় জ্ঞান লাভ হল। বৌদ্ধাচার্য প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন, 'প্রভু, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আমরা মহা অপরাধী। আপনি স্বয়ং ভগবান। আপনিই কৃষ্ণ।'

অগণন জনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দোর্দণ্ড প্রতাপ বৌদ্ধাচার্য। তিনিই আজ প্রভুপদে পতিত। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

লোকের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই প্রভু স্থান ত্যাগ করলেন। প্রভু ধরা দিতে চান না। কেন? প্রভু মানুষের মধ্যে এসেছেন মানুষের রূপ নিয়ে মানুষেরই জন্য। ধরা দিলে তো লীলা হবে না। মানুষ দূরে সরে যাবে। দূরে গেলে মানুষকে আপন করবেন কিভাবে? কিভাবে করবেন কলিহত জীবের উদ্ধার? কিভাবেই বা করবেন অকাতরে প্রেমদান আচণ্ডালে? প্রেমধন যে অন্তরের ধন। দূরে চলে গেলে কি অন্তরের ধন দান করা যায়? আর এই প্রেমধন বিতরণে বিয়োগ নেই। কেউ বাদ যাবেনা। মিত্র-অমিত্র অভেদ। অভেদ? হ্যাঁ, অভেদ। অমিত্রও মিত্র হবে। নাম ধন লাভ করবে। — যেমনটি লাভ করলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা।

দক্ষিণ দেশে অগণন তীর্থ। তীর্থে তীর্থে ছুটে চলেছেন প্রভু। তারা তো কেউ আসবেনা। না আসুক। তিনিই যাবেন তাদের কাছে। কেন? তিনি যে তাদের দুঃখে কাতর। কলিহত জীব জানে না কিসে তাদের উদ্ধার হবে। তিনিই জানাবেন। নামধন দান করে জানাবেন। তাই তিনি ছুটে চলেছেন তীর্থে তীর্থে। অবিরাম পরিভ্রমণ। অবিরাম নামকীর্তন।

প্রভু এলেন ত্রিপদী ত্রিমল্লে। শ্রীরাম চন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করলেন। বেঙ্কট পর্বতে এসে বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করলেন। উভয় বিগ্রহ দর্শনে হৃষ্ট হলেন। প্রণত হলেন। এরপর প্রণতি জানালেন পানা নরসিংহে। পানা নরসিংহ— এ আবার কেমন নাম? এখানে নৃসিংহ দেবকে শুধ্ পানা অর্থাৎ সরবৎ ভোগ দেওয়া হয়।

প্রভু তীর্থে তীর্থে গমন করছেন। আর অগণন জন চমৎকৃত হচ্ছে প্রভুর প্রেমাবেশ দেখে।

প্রভু শিব কাঞ্চীতে এসে শিব স্তুতি করলেন। আর রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই সবাই সমস্বরে ধ্বনি দিল হরিবোল, হরিবোল। এরপর বিষ্ণুকাঞ্চী। বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণ। এখানে প্রভুর অবস্থিতি দুদিন। সবাই কৃষ্ণভক্ত হল।

ত্রিমল্লের পর ত্রিকাল হস্তি! মহাদেব দর্শন করে প্রণতি জানালেন। এরপর প্রভুর গমন পক্ষতীর্থে। তীর্থপতি শিব। পরবর্তী তীর্থ বৃদ্ধ কোল। তীর্থ দেবতা শ্বেতবরাহ। এখান থেকে ছুটে চললেন প্রভু পীতাম্বর শিবস্থানে— শিয়ালী ভৈরবী দেবীস্থানে। চলতে চলতে এলেন কাবেরীর তীরে। দর্শন করলেন গোসমাজ

শিব। পরবর্তী স্থান বেদাবন। বিগ্রহ মহাদেব। এরপর প্রভু দর্শন করলেন অমৃত লিঙ্গ শিব। সবই শিবালয়। সবাই শৈব। কিন্তু প্রভু প্রভাবে সবাই হল বৈষ্ণব। এরপর প্রভু দেবস্থানে এসে বিষ্ণু মূর্তিতে প্রণতি জানালেন। ইষ্টগোষ্ঠী করলেন রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের সঙ্গে। না, প্রভুর জীবনে বাদ-বিয়োগ নেই। সবই যোগ। সবাইকে বুকে টেনে নিচ্ছেন— দিচ্ছেন প্রেমালিঙ্গন।

এরপর শিবক্ষেত্র। কত যে শিবালয় এই দক্ষিণ দেশে! নিকটেই কাবেরী। অপার আনন্দে অবগাহন করলেন প্রভু। অবগাহনান্তে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে করলেন আগমন। এখানে দর্শন করলেন রঙ্গনাথ। প্রেমাবেশে করলেন নর্তন-কীর্তন।

এখানে মিলন হল এক বৈষ্ণবের সঙ্গে। নাম বেঙ্কট ভট্ট। পরম ভক্ত। উপাস্য যুগল বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণ। প্রভুর অনবদ্য রূপে আকৃষ্ট হলেন ভট্ট আর প্রেমাবেশে হলেন মুগ্ধ। বললেন, 'প্রভু, একটা নিবেদন আছে। যদি সাহস দেন তো বলি।' প্রভু মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ তো, বল না। এত দ্বিধার কি আছে।' তবুও আমতা আমতা করে ভট্ট বললেন, 'বলছিলাম কি প্রভু, চাতুর্মাস্য তো এসেই গেল। স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটলে চাতুর্মাস্য পালন করা কঠিন হবে। তাই বলছিলাম এ কটা মাস এই দীনের কুটিরেই কাটিয়ে দাও। চাতুর্মাস্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে। আসল কথা, আসল লাভ আমার। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনতে পারব। আমার মানব জনম সার্থক হবে। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনে কে না মাতোয়ারা হয়েছে ?'

প্রভুর ভারি আহ্লাদ হল ভট্টের আন্তরিকতায়। হেসে বললেন, 'বেশ তো, তোমার যখন এতই আগ্রহ, তোমার গৃহেই চাতুর্মাস্য পালন করব।'

দিন সুখেই কাটতে লাগল। সখা সনে সুখ। সখা কে? — না, ভট্ট। বড়ই মাখামাখি ভাব। সখা তো, তাই রঙ্গরসও চলে। চলে খুনসুটিও— নানা কথার ছলে। প্রভুর পরম সুখ রঙ্গনাথ দর্শনে। প্রতিদিন কাবেরীতে স্নান। স্নানান্তে বিগ্রহ দর্শন। দর্শনে প্রেমাবেশ। আর প্রেমাবেশে নর্তন-কীর্তন।

চারমাস দীর্ঘ সময়। প্রভুর অবস্থান বার্তা রাষ্ট্র হল চারদিকে। প্রভু যেখানে, লোকসংঘট্টও সেখানে। কত জনপদ থেকে যে কত লোক এলেন! এলেন গৃহী, সন্ন্যাসী, এলেন কত ভক্ত। একেক জন আসেন, আর প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করেন। শেষে এমন হল যে অনেকেই নিরাশ হলেন। প্রভুর ভিক্ষার সুযোগ পেলেন না। সময় ফুরিয়ে গেল। চার মাস পার হল।

এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এক রঙ্গ হল এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ঘিরে। পরম ভক্ত, তবে পরম পণ্ডিত নন। বরং অপণ্ডিত, বিশেষত সংস্কৃতে। নিত্য গীতা পাঠ করেন। অশুদ্ধ পাঠ। পণ্ডিতেরা হাসেন। না, শুধু হাসেন না, করেন উপহাসও। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই বৈষ্ণবের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিন্দুমাত্রও নেই। পাঠ করছেন। পাঠ করছেন আবিষ্ট হয়ে আপন মনে— নিবিষ্ট চিত্তে।

প্রভুর প্রবল কুতূহল হল। তাইতো! ব্রাহ্মণের পাঠ তো সম্পূর্ণ অশুদ্ধ। কিন্তু এই যে এত পণ্ডিত বিদ্রূপ করছেন— কই

ব্রাহ্মণের তো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার যতক্ষণ পড়ছেন, ততক্ষণই তাঁর দেহে দেখা দিচ্ছে পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ। তাই ঃ

'মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়।
কোন অর্থে জানি তোমার এত সুখ হয়॥'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'প্রভু, আমি মুর্খ। ব্যাকরণের জ্ঞান নেই। উচ্চারণও ঠিক হয় না। শব্দার্থ তো জানিই না। তবে কি জান, যখনই পাঠ করি, তখনই দেখি ঐ রথী অর্জ্জুনকে আর তাঁর সারথি বাসুদেবকে। আহা! কি মধুর কণ্ঠে উপদেশ দিচ্ছেন পার্থসারথি পার্থকে।' প্রভু প্রেমানন্দে প্রেমালিঙ্গন দিলেন ব্রাহ্মণকে। বললেন, 'সার্থক তোমার গীতা পাঠ। যদি এখানে একজনেরও গীতা পাঠের অধিকার থাকে, সে অধিকার শুধু তোমারই।'

শুনেই ব্রাহ্মণ প্রভু পদে পতিত হলেন। বললেন, 'তুমিই সেই কৃষ্ণ প্রথম দর্শনেই আমি চিনতে পেরেছি।' প্রভু তাঁকে কিছু তত্ত্ব কথা জানালেন, আর তিনিও প্রভুর সঙ্গ ছাড়লেন না। চার মাস রইলেন প্রভুর সঙ্গে।

প্রভু ব্রাহ্মণকে কাছে টেনে নিলেন কেন? তাঁর মধ্যে ভক্তের লক্ষণ দেখলেন যে। ভক্তের লক্ষণ কি? — না, প্রেমাবেশে জগৎ ভুল হয়ে যাবে। তাতে কি হবে? এর উত্তর দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এক কীর্তনের আসরে আখর যোগ করে ঃ 'আমি আন হেরিতে শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন।' আর এই ব্রাহ্মণও আন দেখতে দেখছেন পার্থ ও পার্থ সারথিকে। শুধু এই গুরু-শিষ্যকে। যুদ্ধক্ষেত্রে আর কিছু নয় বা অন্য কারুকে নয়। এঁর অন্তরের অন্তঃপুরটি রবীন্দ্রনাথ

এঁকেছেন এইভাবে ঃ

'আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি-তাই, তাই গো।
তুমি ছাড়া এ জগতে কেহ নাই, কিছু নাই গো॥'

পাণ্ডিত্য নয়, ভাবই একমাত্র ধন। তাই ভাবগ্রাহী জনার্দন। তাই নারদ পাঞ্চ রাত্রি বলেন;

'মূর্খো বদতি বিষ্ণায়, বুধো বদতি বিষ্ণবে
নম ইত্যেবমর্থঞ্চ দ্বয়োরেব সমং ফলম্।
যস্মৈ দত্তঞ্চ যজ্ জ্ঞানং জ্ঞানদাতা হরিঃ স্বয়ং
জ্ঞানেন তেন স স্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ॥'

আর ভাবরহিত পণ্ডিতের অবস্থা কিরকম? — না,

'বাগ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশলম।
বৈদগ্ধ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥'

— এঁদের শাস্ত্র ব্যাখ্যার সবটাই হচ্ছে বাগ বৈখরী। কথার তুবড়ী, শব্দের ঝরণা। এর দ্বারা ভোগ হয়, যশ হয়; কিন্তু মোক্ষলাভ হয় না। তর্ক করে তক্র খায় পণ্ডিত, আর তর্ক না করে ননী খায় ভক্ত। যেমন,

'মথিত্বা চতুরো বেদান সর্বশাস্ত্রানি চৈব হি।
সারস্তু যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥'

— চার বেদ মন্থন করে ভক্তিহীন পণ্ডিত খান ঘোলের জল, আর ভক্ত খান দুধের সার অর্থাৎ ননী।

হাতা দিয়ে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। খাদ্যের আস্বাদন

হাতা করতে পারেনা। পণ্ডিতের অবস্থাও ঐ হাতার মত। যেমন,

'পঠন্তি বেদশাস্ত্রানি বিবদন্তি পরস্পরম।
জানন্তি পরং তত্ত্বং দধী পাকরসং যথা॥'

প্রাকৃত উপমায় দৃষ্টান্ত দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ:

'চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে, তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা।'

সেই মুখের কথা— শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের কথাই শোনেন অপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। কিন্তু গীতা পাঠ যে ভুল হচ্ছে। হোক। সে তো চিঠির কথা।

ব্রাহ্মণের ভুল গীতা পাঠে পণ্ডিতেরা হাসি-ঠাট্টা করছেন। পণ্ডিতের উপহাস আন কথা। ব্রাহ্মণের আন কথায় কান নেই। কান আছে কোন কথায়। তিনি স্পষ্ট বাসুদেব কৃষ্ণের উপদেশ শুনতে পাচ্ছেন। আর দেখছেন নতশির শ্রোতা ফাল্গুনিকে। নিবিষ্ট চিত্তে শুনছেন সেই হিতোপদেশ।

পণ্ডিতেরা যদি মাছি, তাহলে এই ব্রাহ্মণ মৌমাছি। মধুর মধুর-সংবাদ মৌমাছিই রাখে। মাছি নয়। যথার্থ বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ:

'গভীর বনে ফুল ফুটেছে। মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায় না।'

এদিকে প্রভু আছেন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে। দুজনের মধ্যে ভাব জমে উঠেছে। খুবই মাখামাখি। সখ্যভাব। সখ্যভাব? হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্রভুই সখা করে নিয়েছেন। দূরে থাকলে অন্তরঙ্গ

কথা হয় না। কৃষ্ণকথা যে অন্তরঙ্গ কথা। অন্তরঙ্গ ভাবটি খুবই গভীর। তাই মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টাও হয়। তত্ত্বের তর্ক। প্রণয় কলহে বর্ণাঢ্য।

একদিন তর্ক তুললেন প্রভু। বললেন, 'দেখ ভট্ট, তোমার সেব্য লক্ষ্মীনারায়ণ। আর আমার ঠাকুর হচ্ছেন ব্রজ রাখাল। গোষ্ঠে যান গোচারণ করতে। লক্ষ্মীতো নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী। সেহেন লক্ষ্মী তোমার সেব্যের বক্ষ ছাড়লেন। ছাড়লেন বৈকুণ্ঠের সুখ ভোগ। এই সব ছেড়ে তিনি কঠোর তপস্যা করলেন আমার সেব্যের সঙ্গলাভের জন্য। অথচ আমার কৃষ্ণ তো বেণু বাজান, আর ধেনু চরান। আর এতে লক্ষ্মীদেবীর পাতিব্রত্যই বা রইল কোথায়?'

লক্ষ্মীদেবী যে তপস্যা করেছিলেন ভাগবতই তার প্রমাণ। যেমন,

'কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান সুচিরং
ধৃতব্রতা॥'

— কালিয় নাগের পত্নী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'হে দেব, যা পাবার ইচ্ছায় কমলা বহুকাল নিখিল কামনা বিসর্জন দিয়ে ধৃতব্রত হয়ে তপস্যা করেছিলেন, সেই পদরেণু এই কালিয় নাগ যে কি পুণ্যে লাভ করার অধিকার পেল, তা আমরা অবগত নই।'

ভট্ট বললেন, 'আচ্ছা পাতিব্রত্য নষ্ট হবে কেন? যিনি

নারায়ণ, তিনিই না কৃষ্ণ। স্বরূপত এক। তবে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গসুখ কামনা করেছিলেন তাঁর বিশেষ গুণাবলীর জন্য। যে গুণাবলী নারায়ণে নেই। এই গুণাবলী হচ্ছে রূপ মাধুর্য, লীলা মাধুর্য, বেণু মাধুর্য ও প্রেম মাধুর্য। এই গুণাবলীর আস্বাদন যদি রাসবিলাসে লক্ষ্মী পান, তাহলে সেটা তাঁর অধিক লাভ। এতে আর দোষ কি. আর এ নিয়ে পরিহাসই বা করছ কেন ?

প্রভু মৃদু হেসে বললেন, 'না, না, দোষ ধরছিনা। তবে কি জান, তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ পাননি রাসলীলায়, অথচ শ্রুত্যভিমানিনী দেবীরা তাঁর চরণ কমল লাভ করেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী পেলেন না, আর দেবীরা পেলেন— এর কারণ কি ?'

লক্ষ্মীদেবী যে রাসবিহারীর অঙ্গ সঙ্গ পাননি— একথা ভাগবত সত্য ঃ

'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং
নলিন গন্ধ রুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠলব্ধা শিষাং য উদগাদ্
ব্রজসুন্দরীনাম ॥'

— রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতা দ্বারা কণ্ঠলগ্না হয়ে তাঁদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীরা যে প্রসাদ লাভ করেছেন, সেই প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের বাম বক্ষে নিয়ত বর্ত্তমান থেকেও পরম প্রেমবতী লক্ষ্মীও পাননি। পদ্মের মতো সুরভি ও সুষমা যাঁদের, সেই সুরাঙ্গনারাও পাননি। অন্য রমণীদের আর কি কথা ?

আবার দেবীরা যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ লাভ করেছিলেন তাও

ভাগবত সত্য ঃ

'নিভৃত মরুন্মানোবৃক্ষ দৃঢ় যোগযুজো হৃদি যন্মুনয়
উপাসতে তদরযোঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগভুজ দণ্ড বিষক্ত ধিয়োমপি তে
সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি— সরোজসুধাঃ॥'

— শ্রুতি মানিনী দেবীরা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে মুনিরা হৃদয় মধ্যে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মাখ্যতত্ত্ব উপাসনা করেন, তোমার শত্রুরাও সর্বদা তোমার অনিষ্ট চিন্তায় বা ভয়ে তোমাকে স্মরণ করে সেই ব্রহ্মাখ্যতত্ত্ব লাভ করেছে। আব সর্পরাজের দেহতুল্য তোমার ভূজদণ্ডে আসক্ত যে শ্রীরাধা প্রভৃতি তোমার নিত্য কান্তারা তোমার পদাম্বুজসুধা বক্ষে ধারণ করেন, তাঁদের আনুগত্য আশ্রয় করে আমরাও তাঁদের মত সেই পাদ-পদ্মসুধা লাভ করেছি।

প্রভু শুধোলেন, '··· ··· ··· ··· ··· ·· ইথে কারণ?'
ভট্ট সহজ ও সরল মানুষ। সহজ স্বীকৃতি জানিয়ে বললেন,
'··· ··· ··· ইহাঁ প্রবেশিতে নারে মোর মন।'
মন কেন পারে না? নিজ দৈন্য স্বীকার করে বললেন,

'আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি— সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গম্ভীর॥'

আবার একেবারে আত্মসমর্পণ করে বললেন;

'তুমি সেই সাক্ষাৎ জান নিজ কর্ম।
যারে জানাহ, সেই জানে তোমার লীলাধর্ম।'

যথার্থ বললেন ভট্ট। প্রভুর লীলাধর্মই বটে। পাত্রানুযায়ী লীলা। রায়ের সঙ্গে করেছেন একরকম। আবার ভট্টের সঙ্গে অন্য রকম। লোক হিতার্থেই আজ এ তর্ক তুলেছেন প্রভু। যেমনি তুলেছেন, তেমনি তর্ক মাধ্যমে দিগদর্শনও করছেন তিনিই। এই দিগদর্শনে কি হবে? ভ্রান্তি দূর হবে। ঈশ্বর প্রাপ্তির পথের সন্ধান মিলবে। তাই এ তর্ক।

ভট্ট তো আত্মসমর্পণ করলেন। এর ওপর কিছু বলার থাকে না। তাই প্রভুই রহস্য উন্মোচন করলেন, 'দেখ ভট্ট, ঐশ্বর্যে কৃষ্ণকৃপা লাভ করা যায় না। ব্রজভূমি মাধুর্য ভূমি। ব্রজজন তাই কৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে— দেখেন না। মা যশোদা দেখেন পুত্ররূপে শ্রীদাম-সুদাম দেখেন সখারূপে। আর গোপীরা ভজন করেন তাঁকে তাঁদের প্রাণ কান্তরূপে। এ কথারও প্রমাণ ভাগবত :

'নায়ং সুখাপো ভগবান দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তি-মতামিহ ॥'

— শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন, 'এই গোপিকাসুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান ব্যক্তিদের যেমন সুলভ বা অনায়াস লভ্য, দেহাভিমানী ব্যক্তিদের পক্ষে, দেহাভিমান শূন্য জ্ঞানীদের পক্ষে, এমনকি ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরূপ-গণের পক্ষেও তিনি তত অনায়াস লভ্য নন।

'বুঝলে হে ভট্ট' প্রভু আবার আরম্ভ করলেন, 'তোমার লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠেশ্বরী। তিনি তো দেহাভিমান ছাড়তে পারেন নি। গোপীর আনুগত্য স্বীকার করেননি। লক্ষ্মী লক্ষ্মীদেহেই তপস্যা করেছিলেন।

তাই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ লাভ করতে পারেননি। আবার মজা দেখ, গোপীরাও বিপরীত মেরুতে বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপত এক ও অভিন্ন। কিন্তু গোপীরা চেনেন তাঁকে গোপ নন্দন হিসেবেই। তাঁদের আকর্ষণ শুধু একরূপের ওপর নবকিশোর নটবর গোপবেশ বেণুকর। অন্য কোন রূপ নয়। এমনকি নন্দ মহারাজের পুত্রটি যদি চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে আসেন, গোপীরা কিন্তু ফিরেও তাকাবেন না।

ভট্ট চুপ করে শুনছেন। ভট্টের মন ক্ষুণ্ণ হতে পারে এ সব কথায়, কারণ নারায়ণ তাঁর ইষ্ট দেবতা। তাই প্রভু আবার বললেন, 'ভট্ট, ব্যথিত হয়ো না। এসব পরিহাস মাত্র। আসলে সবই এক। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানলে অপরাধ হয়। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে গোপী লক্ষ্মী এক। লক্ষ্মী যে আকৃষ্ট হন— এতে আর দোষ কোথায়? কৃষ্ণ নারায়ণ তো এক। তবে লক্ষ্মী আকৃষ্টা হন, শ্রীকৃষ্ণের চারটি বিশেষ গুণের জন্য। এই গুণগুলি তুমি জানই। তবে যার যে রকম ধ্যান, সেই রূপেই তিনি দেখা দেন। একই বিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই নানা রূপে দেখা দেন।'

ভট্টের অকারণ দম্ভ ছিল: তাঁর ইষ্ট দেবতা নারায়ণই একমাত্র ভগবান। এ দম্ভটি ভ্রান্তি মাত্র। ভ্রান্তি দূর করা প্রয়োজন। তাই প্রভু ভট্টের ভ্রান্তি দূর করলেন। মনের মালিন্য কাটল; চিত্ত দর্পণে তত্ত্বের আসল রূপটি ভেসে উঠল। ভট্ট তখন প্রভুপদে পতিত হয়ে কান্না ঝরা কণ্ঠে বললেন, 'লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপাতেই তোমার দর্শন পেয়েছি। সার্থক আমার জীবন। তোমার

শ্রীমুখেই শ্রীকৃষ্ণ মহিমা শুনলাম। কৃষ্ণভক্তিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রথম জানলাম।

এদিকে চাতুর্মাস্য সমাপ্ত হ'ল। ভট্টের কাছে বিদায় চাইলেন প্রভু। চাইলে কি হবে— ভট্ট যে ছাড়ছেন না। প্রভুসঙ্গ বড়ই মধুর, বড়ই আকর্ষক। অয়স্কান্ত মণির মত আকর্ষণ করে। তাই প্রভুও চললেন, আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভট্টও চললেন। পরিশেষে অনেক কষ্টে প্রভু ভট্টকে ঘরমুখো করলেন।

এরপর ঋষভ পর্বত। সুখ সংবাদ পেলেন প্রভু। কি সে সুখ সংবাদ? — না, পরমানন্দ পুরী এখানে আছেন চারমাস ধরে। পরম পুলকিত প্রভু। আর কি অপেক্ষা সয়? ধেয়ে চললেন প্রভু গোঁসাইজীর কাছে। পুরীজী কে? — না, মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। আরেকটু পরিচয় আছে। পুরীজীর সঙ্গে প্রভুও সম্পর্কিত। প্রভুর মন্ত্র গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী ও পরমানন্দ পুরী পরস্পর গুরুভাই। সম্মানে পুরীজী প্রভুর গুরুতুল্য। তাছাড়া, পুরীজী সন্ন্যাসী জগতে পুরোধা পুরুষ। তাই প্রভুর আনন্দ আর ধরে না।

মিলন হ'ল। মহামিলন। প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন দুই সন্ন্যাসী। প্রবীণের সঙ্গে নবীন। নবীন শুধোলেন, 'আমি তো দক্ষিণ দেশের তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি। আরো কয়েকটি তীর্থ বাকী আছে। তা, আপনার ভ্রমণসূচী কি?' হাস্যোজ্জ্বল বদনে পুরী বললেন, 'আমার এখানকার ভ্রমণ সমাপ্ত। এখন পুরী যাব। পুরী থেকে যাব গৌড়বঙ্গে। গঙ্গাস্নান করার ইচ্ছা।' হৃষ্টচিত্তে

প্রভু বললেন, 'বেশ তো, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তবে আমার একটি অভিলাষ আপনি গঙ্গা স্নানান্তে অনুগ্রহ করে পুরীতে আসুন। এখানে সেতু বন্ধই আমার শেষ তীর্থ। এটি সেরেই আমি যথাশীঘ্র পুরীতে ফিরব। ফিরে আপনার সঙ্গে কৃষ্ণকথায় কাল যাপন করি এই আমার বাসনা।'

পুরীজী প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বললেন, 'বেশ তো, তোমার বাসনাই পূর্ণ হবে।'

প্রভুর অন্তর আনন্দে ভরপুর। কাল বিলম্ব না করে ছুটলেন। স্থান দক্ষিণ মথুরা। প্রভুর মিলন হল এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। ব্রাহ্মণটি কি রকম? সংবাদ দিচ্ছেন কবিরাজঃ 'রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন।' ব্রাহ্মণটি মহাজন, কিন্তু বিরক্ত কেন? বিরক্ত মানে কি? — সংসারের প্রতি বিরক্ত। আসক্তিশূন্য। প্রাকৃত সব বস্তু থেকে যোজন দূরে তাঁর বাস। অকিঞ্চন— তাই সদাই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহে লীলাস্মরণ করেন। বাহ্যবোধ নেই বললেই হয়। সবটাই ভক্তের লক্ষণ। জগৎ ভুল হয়ে গেছে। আন দেখতে রামময় দেখছেন ত্রিভুবন।

দুপুর হয়ে গেল। রন্ধনের কোন আয়োজন নেই। প্রভু শুধোলেন, 'মধ্যাহ্ন হইল, কেনে পাক নাহি হয়?' উত্তরে বিপ্র বললেন, 'বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।'

তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥'

কি প্রশ্নের কি উত্তর! প্রভু তুষ্ট হলেন। সিদ্ধ ভক্ত। জগৎ ভুল হয়ে গেছে। সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। দেহাত্মবোধ নেই।

আছে শুধু এক জ্ঞান। রঘুপতির জ্ঞান। অন্তর রামময়, বাহিরও রামময়। অন্তর-বাহির এক হয়ে গেছে। অন্তরে বাহিরে সদাই লীলা স্মরণ করছেন। তাই উত্তরও ঐ লীলারই অনুরূপ। তুষ্ট হলেন প্রভু—সিদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ইষ্ট গোষ্ঠীর আনন্দে।

কিন্তু আহারের আয়োজন? হ্যাঁ হল। একটু অবেলায়। যখন ব্রাহ্মণ বাহ্য ফিরে পেলেন। প্রভু ভিক্ষা করলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ যে আহার গ্রহণ করলেন না। প্রভু শুধোলেন, 'কি ব্যাপার? উপোসী রইলে যে। তোমার এত দুঃখ কিসের? কেনই বা এত হা-হুতাশ।

দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিপ্র, 'না, আমার আর বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। আগুনে বা জলেই জীবন দেব। মা জানকী হচ্ছেন জগন্মাতা। মহালক্ষ্মী। আব তাঁকে কিনা স্পর্শ করল দুরাশয় রাবণ।'

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রভু বললেন, 'সে কি, তুমি না পণ্ডিত! পণ্ডিত হয়ে বস্তুর বিচার করনা। আর না করেই অকারণ শোকে জীবন বিসর্জন দিতে চাও। যে সীতাকে ঐ পাপিষ্ঠ স্পর্শ করেছে, সে তো মায়া সীতা। সীতা দেবী ঈশ্বর প্রেয়সী। চিৎ শক্তিরূপিনী। সে হেন দেবীকে কি কোন প্রাকৃত জীব স্পর্শ করতে পারে? স্পর্শ করা তো দূরের কথা, রাবণ তার প্রাকৃত চোখে দেখতেই পায়নি সীতা দেবীকে। তাছাড়া, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ। সেই শাস্ত্রই বলছেন, 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' তুমি বিশ্বাস কর আমার কথা। আমি শাস্ত্র. কথাই বলছি।'

প্রভুর কথায় প্রত্যয় এল বিপ্রের মনে। ক্লিষ্ট বিপ্র হৃষ্ট হলেন। আহার গ্রহণ করলেন।

দক্ষিণাপথ তীর্থময় পথ। অগণন তীর্থ। প্রভুর তাই সময় সংকীর্ণ। ভ্রমণ পথের সবতীর্থেরই দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রভু। পরপর দর্শন করছেন। আর প্রণতি জানাচ্ছেন। দর্শন করলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিড়য় তালা তীর্থে, তিলকাঞ্চীতে শিব, গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে বিষ্ণু মূর্তি, পানাগড়ি তীর্থে সীতাপতি, চামতাপুরে আবার শ্রীরাম লক্ষ্মণ, শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু, মলয় পর্বতে অগস্ত্য, আবার এই স্থলেই কন্যাকুমারী, আমতলাতে শ্রীরামচন্দ্র।

এরপর এলেন মল্লার দেশে। এই মল্লার দেশেই ভট্টমারীদের আখরা। ভট্টমারী মানে বামাচারী সন্ন্যাসী। বামাচারীর বামবুদ্ধি। জটিল-কুটিল। কলুষ-পঙ্কিলতার জীবন এদের। স্থূল মাংসলতায় মত্ত নিশিদিশি। সেই সর্পিল পথে অপরকেও টেনে নিয়ে আসে এরা। কিভাবে? —না, কামিনী-কাঞ্চনের লোভ দেখিয়ে। লোভ দেখাল এরা প্রভু সঙ্গী কৃষ্ণদাসকেও।

কৃষ্ণদাসের শুভ বুদ্ধির অভাব। তাই সহজে এদের শিকার হল। গৌরসুন্দরের সঙ্গ লাভ করে রামানন্দের কি রকম আনন্দ হয়েছিল? —না রায়ের মন যেন গেয়ে উঠেছিল:

'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে, সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, শুদ্ধ অন্তর
সুন্দর হে, সুন্দর॥'

সেহেন গৌরসুন্দরের সঙ্গ ত্যাগ করে কৃষ্ণদাসের মন মেতে উঠল

নারীদেহ উপভোগের জন্য। সব ফুলেই মধু থাকে, কিন্তু মাছি তা আহরণ করতে পারেনা। — আহরণ করে শুধু মৌমাছি। তাহলে মাছি কি করে? ফুলে বঁসে না, মলে বসে।

যথার্থ বলেছেন ভগবান তথাগত তাঁর পালি পদে :

'যাবজীবংসি চে বালো পণ্ডিতং পারিরুপাসতি।
ন সো ধম্মং বিজানাতি দরবী সূপরসং যথা॥'

— সূপকার সর্বক্ষণ হাতা ব্যঞ্জনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও হাতা কিন্তু ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। তেমনি অজ্ঞ ব্যক্তি সর্বজ্ঞের সৎ সংস্পর্শে এসেও ধর্মের লক্ষ্যার্থ লক্ষ্য এবং উপলব্ধি করতে পারে না।

তাহলে রামানন্দ যে সমর্থ হলেন। একই প্রভুর সঙ্গ লাভ করলেন দুজন রামানন্দ ও কৃষ্ণদাস। প্রথম জনের উত্তরণ ঘটল সাধ্যের শীর্ষ দেশে, আর দ্বিতীয় জনের পতন ঘটল নারকীয় তিমির দেশে। দ্বিতীয় জনের পতনের কারণ নির্দেশ করেছেন সুগত ওপরের পদটিতে। আর প্রথমের জনের উত্তরণের কারণও জানা যায় ভগবান বুদ্ধের এই পালি পদটিতে :

'মুহুত্তম' পি চে বিঞ্‌ঞ্‌ পরিরুপাসতি।
খিপ্‌পং ধম্মং বিজানাতি জিব্‌হা সূপরসং যথা॥'

— ভিজে কাঠ জ্বলেনা, শুকনো কাঠ আগুনের স্পর্শ পেলে মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে ওঠে। রসনা যেমন মুহূর্তেই ব্যঞ্জনের রসাস্বাদন করতে পারে, তেমনি বিজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞান নিষ্ণাত সাধুর সঙ্গ লাভ করা মাত্রই লোকোত্তর জ্ঞান লাভ করে। শ্রীনিগমানন্দও এই

সত্যটির দিগদর্শন করেছেন এইভাবে : 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চিরন্তন সত্য, তার দাহিকা শক্তি অপ্রতিহত। ইন্ধন শুষ্ক হলে, তা দপ করে জ্বলে ওঠে, ভিজা হলে ধরতে দেরী হয়।'

চঞ্চল মতির যে গতি, সেই দুর্গতির গর্তেই পতনোন্মুখ হল কৃষ্ণদাস। কিন্তু প্রভু যে পতিত পাবন। পতিতকে ত্যাগ নয়— উদ্ধার। তাই প্রভু সেই ভট্টমারীদের বুঝিয়ে বললেন: 'দেখ তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী। আমাকে কষ্ট দেওয়া তো তোমাদের অকর্তব্য। কাজেই তোমরা আমার ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দাও।'

ব্যস! যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। ভট্টমারীর রক্ত চক্ষু অধিকতর রক্ত বর্ণ হল। শস্ত্র সজ্জিত হয়ে ধেয়ে এল ঐ অর্বাচীন মন্দাত্মারা প্রভুর অঙ্গে আঘাত হানতে। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে একটি আঘাত পড়লনা। সব আঘাতই পড়ল দুঃশীল বামাচারীদের পাপদেহে। এই অবসরে প্রভু কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করলেন।

প্রভু এলেন পয়স্বিনী তীরে আদি কেশব মন্দিরে। প্রভুর কেশব দর্শন মানেই প্রেমাবেশ। ব্রজরস আস্বাদন। কি রকম সে রসাস্বাদন? — না, প্রেমাবেশে তিনি লীলা স্মরণ করছেন। কি রকম সে লীলা? ভারি মধুর সে লীলা। কেলিবিলাসে আলুলায়িত হয়েছে ভানুবালার কুঞ্চিত কুন্তলদাম। আর নন্দলালা বিন্যাস করছেন সেই কেশকলাপ। তাই প্রভু

'কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি-স্তুতি নৃত্যগীত বহুত করিলা॥'

এতে কি হল?

'প্রেম দেখি লোকের হৈল মহাচমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার॥'

সৎকার উত্তম। কিন্তু অত্যুত্তম প্রাপ্তি হল প্রভুর এইস্থানেই। কি সে প্রাপ্তি? — না, ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় লাভ করলেন প্রভু। পুঁথি পেয়ে প্রভুর কি হল?

'পুঁথি পাইয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প, অশ্রু, স্বেদ, স্তম্ভ পুলক বিকার॥'

অপার আনন্দ কেন প্রভুর? কি আছে ঐ পুঁথিতে? — আছে সিদ্ধান্ত, সুসিদ্ধান্ত— সর্বমান্য সিদ্ধান্ত। আছে কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণতত্ত্ব, আছে কৃষ্ণধাম মহিমা। ভক্তজনের বিশ্বাস গ্রন্থটির রচয়িতা স্বয়ং ব্রহ্মা। কিন্তু প্রভুর আনন্দ শুধুমাত্র আত্মতুষ্টিতে নয় —সর্বজনের তুষ্টিতে। গ্রন্থরস পান করাবেন সর্বজনকে। তাই লিখিয়ে নিলেন পুঁথিটি।

তীর্থের পর তীর্থ দর্শন করছেন প্রভু। সর্ব তীর্থেই আনন্দ তাঁর। কম আর বেশী। এক স্থানের সঙ্গে অন্য স্থানের তর-তম ভেদ তো আছেই। একটি তর, অন্যটি তম। সত্যিই রামানন্দ সঙ্গোৎসবে যে আনন্দ পেয়েছিলেন, তা কি এইসব তীর্থে পাচ্ছেন?

প্রভু দর্শন করে চলেছেন অনন্ত পদ্মনাভ, শ্রীজনার্দন, শঙ্কর নারায়ণ, শৃঙেরী মঠে শঙ্করাচার্য স্থান।

এরপর এলেন আচার্য মধ্বের শ্রীপাটে। শঙ্কর আর মধ্ব— দুই আচার্যের সম্প্রদায় থাকেন দুই মেরুতে। মধ্বাচার্যের অনুগামীরা

দ্বৈতবাদী-তত্ত্ববাদী। এঁদের কাছে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বস্তু। উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক এত তিক্ত যে তত্ত্ববাদীরা অদ্বৈতবাদীর মুখ দর্শন করলে সবস্ত্র স্নান করেন। উদ্ভট ধারণা। মানুষ হয়ে মানুষ দেখলে স্নান করে। অজচ্ছল কীটপূর্ণ জলের মধ্যে এরা শুচিতা খুঁজে পান— কিনা দেহ ধুলেই শুদ্ধ হওয়া যায়। এই বিকৃত ধারণা যে মনের বিকার থেকে, সেদিকে লক্ষ্য নেই।

যথার্থ কটাক্ষ করেছেন মীরা:

'নিত্ নাহানেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।'

শঙ্কর পন্থীদের প্রতি এঁদের বিদ্বেষ এত প্রবল যে, যে কোন সন্ন্যাসীকে এঁরা অদ্বৈতবাদী মনে করেন। তাই প্রভুকেও প্রথম দর্শনে মধ্বপন্থীরা সমাদর করলেন না। সমাদর আর কি, কথাই বললেন না।

প্রভু কৃষ্ণ মূর্তি দর্শন করলেন। কৃষ্ণ মূর্তিতেই না প্রভুর অপার স্ফূর্তি। প্রেমাবিষ্ট হলেন প্রভু। নৃত্য-গীত করলেন মনের সুখে। 'আমার পরাণ যাহা চায়/তুমি তাই, তাই গো'— প্রভু এখন এইভাবে ভাবাবিষ্ট।

হ্যাঁ, এইবার ভুল ভাঙ্গল তত্ত্ববাদীদের। প্রভুর পরমাশ্চর্য প্রেমাবেশ দেখে। বৈষ্ণবের প্রাপ্য মানে সম্মান করলেন প্রভুকে। প্রভুও তাঁদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করলেন। ইষ্টগোষ্ঠী উদ্দেশ্যমূলক। একমাত্র উদ্দেশ্য মধ্বপন্থীদের ভ্রান্তির অপনোদন। ভ্রান্তি মোচনের জন্যই প্রভু-বিনয়ভরা কণ্ঠে শুধোলেন তত্ত্ববাদীদের আচার্যকে:

'সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥'

প্রশ্নের উত্তরে

'আচার্য কহে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥'

বর্ণাশ্রম ধর্ম ও কৃষ্ণে কর্মাপণ— রায় রামানন্দ সাধ্যতত্ত্ব নিরূপণে উত্তর দিয়েছিলেন প্রভুর প্রশ্নে। প্রভু 'এহ বাহ্য' বলে নাকচ করেছিলেন। এখন আচার্যের উত্তরেও প্রভু একই কথা বললেন, 'না তা কি করে হয়? শাস্ত্র যে অন্য কথা বলেন। শাস্ত্র বলেন শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি নববিধা ভক্তিই সাধন আর শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সেবাই হল সাধ্য।

প্রভু বাক্যের প্রমাণ স্বয়ং ভাগবত। যথা,

'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েৎ ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥'

— শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন— এই নববিধা ভক্তি ভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পিত হয়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তাকেই আমি উত্তম মনে করি।'

এই 'আমি' কে ? কাকেই বা এই শ্লোক দুটো শুনিয়েছিলেন ?

হিরণ্যকশিপু অমর হতে চাইলেন। না শুধু অমরই না, হতে চাইলেন অজেয়, অমর, অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। একেবারে রাজচক্রবর্তী। মন্দর পর্বতে গেলেন। কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। ইষ্টদেবতা স্বয়ং ব্রহ্মা।

ইন্দ্র দেখলেন এই তো উত্তম সুযোগ। দৈত্যপুরীর মহানায়কই অনুপস্থিত। মন্দর পর্বতে তপস্যায় মগ্ন। দৈত্যপুরী থেকে মন্দর পর্বত যোজন দূরে। ইন্দ্র আক্রমণ করলেন। আক্রান্ত দৈত্যরা প্রাণ নিয়ে পালাল। ইন্দ্র আর একটি কাজ করলেন। অবশ্য এ কাজটি তিনি বরাবরই করেন। তাই না তাঁর নাম পুরন্দর। পুর ধ্বংস করেন, তাই পুরন্দর। দৈত্যপুরীও ধ্বংস করলেন।

আরেকটি অচিন্ত্য অকৃত্য করলেন। দৈত্যরাজ মহিষী তখন গর্ভবতী। তাঁকে নিয়ে চললেন। পথে নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

নারদের চক্ষু রোষারুণ হল। উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'এ কি করছ দেবরাজ! জয়োল্লাসে মত্ত হয়ে নারী নির্যাতন পর্যন্ত করছ। তার ওপর এই রমণী তো অন্তঃস্বত্ত্বা। ভারি তো বীরত্ব! দৈত্যরাজ পুরীতে নেই, সেই সুযোগে এই লুটতরাজ করছ।'

তিরস্কারে সুফল ফলল। রাজমহিষী শুধু মুক্তই হলেন না, তিনি সঙ্গ পেলেন এক মুক্ত পুরুষের। দেবরাজ দেবর্ষির হাতেই মহিষীকে অর্পণ করলেন

দেবর্ষি নিজাশ্রমে নিয়ে এলেন মহিষীকে। কন্যার মত পালন

করতে লাগলেন। মহাভাগ্যবতী এই রাজভার্যা। নারদ তাঁকে ভক্তি তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। বক্তা এক শ্রোতা দুই। দুই কি রকম? রকম ভারি মধুর। ভাগ্যবলেই হয়। এক হচ্ছেন গর্ভবতী, আরেক হচ্ছেন গর্ভান্ধকারে যিনি আছেন।

যথাসময়ে গর্ভমুক্ত হলেন মহিষী। নবজাতক পুত্র সন্তান। নাম রাখা হল প্রহ্লাদ।

ওদিকে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তো তপস্যা করেই যাচ্ছেন। অবশেষে ব্রহ্মার বর লাভ করলেন। সেই বর বলে এই বলী প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করলেন সুরলোক। বিজয়ীর মুকুট শিরশীর্ষে ধারণ করে রয়ে গেলেন ইন্দ্রলোকেই।

গুরুগৃহে অধ্যয়নের সময় হল। দৈত্যরাজ যথাসময়ে পুত্রকে গুরুগৃহে পাঠালেন। অধ্যয়নান্তে ফিরে এলে দৈত্যরাজ শুধোলেন, 'পুত্র! এতকাল গুরুগৃহে অধ্যয়ন করে কি শিখলে? শোনাও তো দেখি দু-একটি কথা।'

তখন প্রহ্লাদ এই শ্লোক দুটো উচ্চারণ করলেন।

অধ্যয়নের জন্য দৈত্যরাজ পাঠিয়েছিলেন দৈত্যরাজগুরু শুক্রাচার্যের দুই পুত্রের কাছে। একজনের নাম ষণ্ড। অপর জন অমার্ক। দুয়ে মিলে ষণ্ডামার্ক। এঁরা কেমন গুরু? সারা অধ্যয়ন কালটায় শিখিয়েছিলেন শুধু বিষ্ণু বিদ্বেষ। তবে যে বিষ্ণু ভক্তির শ্লোক উচ্চারণ করলেন প্রহ্লাদ! ধরাধামে আসার আগেই তাঁর মনোভূমি হয়েছিল হেমময় নারদের প্রেমময় বীণা-বাণীতে। ষণ্ডামার্কের কোন শিক্ষাই সেই হিরন্ময় মানস-ক্ষেত্রে মালিন্য আনতে পারেনি।

কাঞ্চন যে চির অমলিন।

প্রভু সেই তত্ত্ববাদীদের আরও বললেন,

'পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি, মুক্তি দেখে নরকের সম॥

ভাগবতই এর প্রমাণ। যেমন,

'সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥'

'সার্ষ্টি, সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥'

আবার ভাগবতই স্কন্ধান্তরের আরেকটি শ্লোকে বলেছেন:

'যো দুস্ত্যজান ক্ষিতিসুত স্বজনার্থ দারান
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকম।
নৈচ্ছন্ নৃপস্ত-দুচিতং মহতাং মধুদ্বিট
সেবানুরক্ত মন সাম ভবোঽপি ফল্গু॥"

— ভরত মহারাজের প্রসঙ্গ উপলক্ষে— শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছিলেন, 'সাধারণত লোক যা ত্যাগ করতে পারে না, যেমন পৃথিবীর রাজত্ব, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ এবং পত্নী এবং অমরোত্তমদের প্রার্থনীয়া সদয়-দৃষ্টি-সম্পন্না লক্ষ্মীকেও যে ভরত মহারাজ ইচ্ছা করেননি, তা তাঁর মত লোকের পক্ষে উচিত কাজই হয়েছে; কারণ যে সব মহাপুরুষের চিত্ত মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরক্ত, তাঁদের কাছে মোক্ষও অকিঞ্চিৎকর।

স্কন্ধান্তরে ভাগবত আরও বলছেন:

'নারায়ণ পরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি
স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ।'

— নারায়ণের ভক্তেরা কোন কিছুতেই ভয় পাননা, কারণ তাঁরা স্বর্গ, মুক্তি ও নরক সমান দর্শন করেন।

অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর মহারাজ চিত্রকেতু। সবই তাঁর ইষ্টদেবতা অনন্তদেবের কৃপা। একদিন আকাশপথে বিচরণ করছিলেন। হঠাৎ একটি বিসদৃশ দৃশ্যে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। মুনিদের সভা বসেছে। সেই সভায় পার্বতী মহাদেবের অংকশায়িনী আর শিব তাঁকে আলিঙ্গন করে বসে আছেন। না, চিত্রকেতু আর থাকতে পারলেন না। সোজা মহাদেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পরিহাস তারল্যে বললেন, প্রাকৃত মানুষ যে আচরণ করতে লজ্জা বোধ করে, আপনি লোকগুরু এবং ধর্মবক্তা হয়ে মুনিদের সভায় সেই আচরণ কিভাবে করছেন?'

চিত্রকেতুর বিদ্রূপবাক্যে সভা স্তব্ধ। শুধু একজনের চক্ষু থেকে রোষাগ্নি নির্গত হল। পার্বতী রোষতপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'চিত্রকেতু, আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি— তুমি অসুর যোনি প্রাপ্ত হবে।'

চিত্রকেতু চিত্রের মত অবিচল রইলেন। চিত্ত তাঁর নিস্তরঙ্গ। অটল। বললেন, 'মা, আমি জানি তোমার অভিশাপ অমোঘ। জেনেও আমি তা অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করছি। আমি জানি কর্মফল আমাকে ভোগ করতেই হবে, নইলে এ রকম বিসদৃশ দৃশ্য আমার দৃষ্টিপথে আসবে কেন? মায়াময় প্রাকৃত জগৎ। মায়িক গুণ সমূহের প্রবাহ চলেছে অবিরাম। এখানে শাপই বা কি, আশীর্ব্বাদই

কি? কি বা স্বর্গ, কিবা নরক? সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? সবই সমান। ঐ গুণ প্রবাহ মাত্র। মা, শাপ মোচনের জন্যও আমি প্রার্থনা করছিনা। তবে একটা কথা ঃ আমি যা বলেছি, তা সাধু হলেও তুমি অসাধু মনে করছ। তুমি কৃপা করে তাই ক্ষমা কর।' বলেই চিত্রকেতু বিমানে আরোহণ করে চলে গেলেন।

চুপ করে সভার সবাই শুনলেন। মুখ খুললেন স্বয়ং শিব। চিত্রকেতুব গুণগান গাইলেন। কীর্তন করলেন নারায়ণ ভক্তের মহিমা। পার্বতীকে বললেন, 'দেখলে তো, হরিভক্তেরা প্রাকৃত বস্তুতে কিরকম নিস্পৃহ। পরমাশ্চর্য তাঁদের মাহাত্ম্য। হে প্রিয়ে! নারায়ণ ভক্তেরা কোন কিছুতেই ভীত হন না। তাঁরা অভীক, স্বর্গ, নরক ও মুক্তি — এই তিনকেই তাঁরা সমান মনে করেন। দেখলে না, তোমার অভিশাপে চিত্রকেতু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।'

প্রভু আরও বললেন, 'আমার কৌপীন বাস দেখে আমাকে ভুল বুঝেছ। ভেবেছ আমিও মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আসলে আমি হচ্ছি বৈষ্ণব ভক্ত। শাস্ত্র বলেন ভক্ত সাধন হিসাবে কর্মকে এবং সাধ্য হিসাবে মুক্তিকে পরিহার করে। আর তোমরা এই দুইকে সাধ্য-সাধন হিসেবে গণ্য করেছ।'

প্রভু এক নতুন তত্ত্বের দিগদর্শন করলেন তত্ত্বাচার্যের কাছে এবং সাধ্য সাধনের এই তত্ত্ব মেনেও নিলেন আচার্য। তবুও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁর মনে। তাঁদের গুরু মধ্বাচার্য যে তাঁদের জন্য প্রাগুক্ত তত্ত্বই দিয়ে গেছেন। তাই দ্বিধা-দীর্ণ কণ্ঠে বললেন,

'তথাপি মধ্বাচার্য যে করিয়াছে নির্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সভে সম্প্রদায় সম্বন্ধ॥'

তবুও প্রভু সাধুবাদ জানালেন। বললেন, 'কর্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ভক্তিহীন। তোমরা এঁদের পথই অনুসরণ করেছ। তবুও আমার আহ্লাদ হল বৈষ্ণব ভক্তের মত তোমরাও ঈশ্বরের বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দময় মনে কর— জ্ঞানীর মত মায়িক মনে করনা।'

প্রভু ছুটে চললেন আবার তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে। চলতে চলতে এলেন পাণ্ডুপুরে। এসেই একটি সুখ সংবাদ শুনলেন। কি সে সুখ সংবাদ? — না,

'মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম॥'

প্রভুর আর অপেক্ষা সয় না। পুরী দর্শনে চললেন। দর্শন মাত্রই দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

পুরীজী প্রভুকে হাত ধরে তুললেন। প্রেমালিঙ্গন দিলেন প্রেমাবেশে। পুরীজীর মনে কেমন যেন এক ধন্দ: তবে কি মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে এই নবীন সন্ন্যাসী সম্পর্কিত। সম্পর্কিত না হলে এই অপ্রাকৃত প্রেমাবেশ আসবে কোথা থেকে? পুরীজী তাঁর অনুমান ব্যক্ত করলেন প্রভুর কাছে। পুরীজীর অনুমান প্রমাণে দাঁড়াল যখন প্রভু মুখ খুললেন, 'হ্যাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ। ঈশ্বরপুরী আমার মন্ত্রগুরু।'

উভয়ের সঙ্গোৎসব চলল সপ্তাহ ধরে। কত কথা। প্রাণের কথা। প্রাণকৃষ্ণের কথা। আবার আত্মকথাও কিছু। এই আত্মকথারই ছলে পুরী জানলেন প্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপ। স্মরণ পটে ভেসে উঠল এক সুখময় স্মৃতি। পুরীজী বললেন, 'বটে,

বটে, তোমার পূর্বাশ্রম নবদ্বীপে ছিল। তা আমি আমার গুরুজীর সঙ্গে নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। অবশ্য অনেককাল আগেকার কথা। আমরা উঠেছিলাম জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে। মিশ্রের অতিথি প্রীতি অবিস্মরণীয়। সে কি সমাদর— সন্ন্যাসী সম্মান! কি সে রান্না জগন্নাথ পত্নীর! প্রতিটি পদই অমৃত আজও মুখে লেগে আছে— বিশেষ করে মোচা ঘণ্ট। হ্যাঁ, মনে পড়ছে— তাঁর এক পুত্র সন্ন্যাস নিয়েছিল। সন্ন্যাসের পর তার নাম হয় শঙ্করারণ্য। এই তীর্থেই তাঁর সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে।'

উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন প্রভু। বললেন, 'হ্যাঁ, আপনারা আমাদের গৃহেই গিয়েছিলেন। পূর্বাশ্রমে জগন্নাথ মিশ্র আমার পিতৃদেব আর শঙ্করারণ্য আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।'

চমকিত ও চমৎকৃত হলেন পুরী। পরমাশ্চর্য যোগাযোগ। সঙ্গোৎসব সাঙ্গ হল। শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা চলে গেলেন আর প্রভু এলেন কৃষ্ণবেণ্বা তীরে।

সার্থক ভ্রমণ কৃষ্ণ বেণ্বায়। কৃষ্ণবেণ্বার পরিচয় দিয়েছেন ঠাকুর বিল্বমঙ্গল। ইনিই না সেই নব রসিকের এক রসিক। রসিকগণে ঠাঁই পেলেন রসিক নাগরের গুণ কীর্তন করে তাঁর গ্রন্থে। নাম 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম।'

প্রভুর আনন্দ আর ধরেনা। সার্থক — সার্থক তাঁর আগমন এই পুণ্য স্থানে। এর আগে সংগ্রহ করেছেন ব্রহ্মসংহিতা। আর সংগ্রহে সংযুক্ত হল এই মহার্ঘ গ্রন্থটি। প্রভু লিখিয়ে নিলেন পূর্ণগ্রন্থটি।

এরপর প্রভু একাধিক তীর্থ ভ্রমণ করলেন। নতি-প্রণতি জানালেন। আবার ফিরে এলেন বিত্থানগরে।

ফুলের রসের সন্ধান পায় মৌমাছি। আর রসরাজের সন্ধান পান রসিক। প্রভুর আগমন সংবাদ মুহূর্তের মধ্যেই পেয়ে গেলেন রসিক রামানন্দ। আর দর্শন মাত্রই প্রভুর পদাম্বুজে পতিত হলেন। প্রভু তাঁকে হাত ধরে তুলে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। প্রেমানন্দ উভয়েরই নয়নে আনল প্রেমাশ্রু।

প্রভু তীর্থ যাত্রার কথা বিশদভাবে বললেন, আর বললেন 'কর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্মসংহিতার' কথা। পুঁথি দুটো রায়ের হাতে দিয়ে বললেন, তুমি সাতটি তত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত দিয়েছ, সে সব তত্ত্ব এই দুই গ্রন্থে আছে।

যেখানে গোরা রায়— রাম রায়, সেইখানেই বাঁকু রায়। বঙ্ক বিহারীর কথাতেই কেটে গেল সাতটা দিন। রামানন্দ বললেন, 'তোমার ইচ্ছাতে আমি মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে লিখেছিলাম। তোমার কৃপাতেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে : মহারাজ আমাকে নীলাচলে ফিরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন।'

হৃষ্ট প্রভু মিষ্ট মুখে বললেন, 'বেশ তো ভালোই হল। চল, তাহলে একসঙ্গেই ফিরি।' রায় বললেন, 'তাতে একটু অসুবিধে আছে। আমি রাজ প্রতিনিধি তো, তাই সঙ্গে থাকবে হাতি, ঘোড়া লোক লস্কর, আরো অনেক কিছু। ওসব তোমার ভাল লাগবেনা। তুমি বরং আগে রওনা হও। আমি এ দিকটার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে যথাশীঘ্র তোমার সঙ্গে মিলিত হব।'

প্রভু যে পথে এসেছিলেন, ফিরলেনও সেই পথে। আবার প্রভু যেখানে, লোক সংঘট্টও সেখানে। কতশত লোক! মুখে শুধু হরিবোল। হরিধ্বনি শোনেন, আর আহ্লাদে ভরে যায় প্রভুর অন্তর।

এইভাবে চলতে চলতে এলেন আলালনাথে। সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে পাঠালেন নিত্যানন্দ প্রমুখকে সংবাদ দিতে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎ গতিতে। সংবাদ শুনে পার্ষদদের মনে আনন্দের সুরধুনী বয়ে চলল। আহা! কতকাল পরে প্রভুর সঙ্গে মিলন হবে। কতকাল? তা, প্রায় দু বছর তো হবেই।

১৫১০ এর এপ্রিল মাসে প্রভু দাক্ষিণাত্যে শুভ বিজয় করেছিলেন। আর ফিরে এলেন ১৫১২র হেমন্তে। অবধূত আথে ব্যথে অস্থির হলেন। ছুটলেন। ছুটলেন সবাই। ছুটলেন জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ, আচার্য গোপীনাথ। বড়ই মধুর সে দৃশ্য। সবাই ঊর্ধ্ববাহু। নৃত্য করতে করতে চলেছেন। নিত্যানন্দের তো উদ্দণ্ড নৃত্য। মেদিনী কাঁপিয়ে চলেছেন। বলি হারি! সবার মুখে এক কথা 'চল ত্বরা করি' আর চলছেনও তাই— একেবারে সিংহ গতিতে। কি দিয়ে বরণ করবেন প্রভুকে— এতকাল পরে মিলন। তাঁরা যে অকিঞ্চন। কিছুই নেই তাঁদের। লোক বল নেই, অর্থ বল নেই, নেই প্রতিপত্তি বল। আছে শুধু নামের বল। মুখে শুধু হরিবোল। এই হরিবোলের বোলে-কলরোলেই এঁরা বরণ করলেন প্রভুকে মাঝপথে। বরণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমালিঙ্গন। প্রেমাবেশে প্রেমাশ্রু। সবশেষে এলেন সার্বভৌম। সাষ্টাঙ্গ

প্রণাম জানালেন সার্বভৌম। প্রভু হাত ধরে বুকে তুলে নিলেন। প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বললেন, 'কত তীর্থে কত বৈষ্ণব দেখলাম, কিন্তু তোমার মত বৈষ্ণব আর চোখে পড়লনা।'

সবাই উপস্থিত হলেন নীলাচলে। কাশীমিশ্র প্রভু পদে পতিত হলেন। প্রভু তাঁকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন।

সার্বভৌম প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করলেন। প্রভু সপার্ষদ ভিক্ষা করলেন সার্বভৌম গৃহে। আর রাত্রিও যাপন করলেন এই গৃহেই। নিদ্রায় নয়— কৃষ্ণ কথায়, তীর্থ ভ্রমণ কথায়। কথায় কথায় প্রভু সার্বভৌমকে বললেন, 'মণি মানিক চেনে। তুমি হচ্ছ মণি, তাই মানিকের সন্ধান দিয়েছিলে। রামানন্দ সত্যি মাণিক্য— বৈষ্ণব মাণিক্য।'

পরম তুষ্টির হাসি হেসে ভট্টাচার্য বললেন, 'তাহলে দেখলে তো প্রভু, আমি নিজে ভক্ত না হলেও, ভক্তের সন্ধান রাখি— অবশ্য সবই তোমারই কৃপায়।'

পার্ষদবৃন্দ তীর্থকথা শুনতে শুনতে—

'চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেমধন।'

— — —

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব মিলন

এক মাস নয়, দু মাস নয়— দীর্ঘ চব্বিশটি মাস প্রভু ছিলেন দক্ষিণ দেশে। প্রবাসে। প্রভুর প্রবাস, আর ভক্তের হা-হুতাশ —কবে পাবেন প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গের বাস।

১৫১০ এর তেইশে ফেব্রুয়ারী। প্রভু নদীয়া থেকে এলেন নীলাচলে। দোলযাত্রা দেখলেন। উতলা হয়ে পড়লেন দক্ষিণ দেশে যাত্রার জন্য। এপ্রিলেই দক্ষিণাপথে যাত্রা করলেন। মাত্র মাস দেড়েকের অবস্থান। প্রভু বঝতে পারেননি কত ভক্ত তাঁর প্রেমডোরে বাঁধা পড়েছেন।

দাক্ষিণাত্য গমনে ভক্ত বাড়ল, আব বাড়ল তাঁদের ব্যাকুলতা। কেন? প্রভুর বিরহে তাঁদের মনে হচ্ছিল:

'শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী॥'

প্রভু দক্ষিণ দেশের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছেন। যোগাযোগ নেই। তাই ভক্তবৃন্দের এত উৎকণ্ঠা। হৃদয়ের দ্বার খুলে দিন গুণছেন, বলছেন:

'কোথায় তুমি পথ ভোলা,
তবু থাকনা আমার দুয়ার খোলা।'

আর আকুল প্রাণে আহ্বান করছেন:

'আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত নাথ হে ফিরে এসো।'
... ...

আমার চিরবাঞ্ছিত এসো,
আমার চিত সঞ্চিত এসো
... ...
... ...
... ...
... ...
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো
আমার শয়নে স্বপনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো।'

আর এই দীর্ঘ বিরহে কি হল? — হৃদয় পরিশুদ্ধ হল—হল বিশুদ্ধ হেম। কবীর গেয়েছেন:

'বিরহ অগিন অন্দর জারে।
তব পাওয়ে পদ পূরে॥'

ভক্তের এত আর্তি-আকুলতায় কি প্রভু সাড়া না দিয়ে পারেন? পারেন না। তাই ফিরে এলেন তাঁদের মাঝে। ভক্তবৃন্দের সে কি আনন্দ! আনন্দে, মহানন্দে ও প্রেমানন্দে যেন গাইলেন:

'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার॥

তখন যেন কোকিল গাইল গান, আর ভ্রমর ধরল তান। মন্দ মন্দ বইল পবন, আর চাঁদের আলোয় ভরল গগন।

১৫১২। হেমন্ত ঋতু। প্রভু নীলাচলে ফিরে এলেন। দক্ষিণাপথে যাবার আগে স্বল্পকালীন অবস্থান নীলাচলে। সূর্যোদয় হলে লোক পায় আলোক। প্রভু মাহাত্মও স্বয়ংপ্রভ। এই স্বল্পকালের মধ্যেই সে প্রভা ছড়িয়ে পড়েছে।

ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। রাজধানী কটকেও। সেখানে কে আছেন? আছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রতাপরুদ্র। যে শ্রীক্ষেত্রে প্রভু আছেন, সার্বভৌম আছেন, সেই নীলাদ্রিও এই স্বাধীন নৃমণির অধীন।

রাজা প্রভুর বাণী শুনতে চান। দর্শনেরও প্রবল ইচ্ছা। প্রভু তখন দক্ষিণ দেশেব তীর্থে তীর্থে। এই সময় মহারাজ তলব করলেন রাজ পণ্ডিত সার্বভৌমকে। রাজধানীতে এলেন রাজপণ্ডিত রাজ আজ্ঞায়।

রাজা মানী-গুণী। মানীর মান রাখতে জানেন। সার্বভৌম রাজপ্রাসাদে এলেন। মহারাজ নতমস্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

মহারাজ বললেন, 'একটা সুখ সংবাদ আমার কানে এসেছে। আপনি তো ধন্য। আপনারই কাছে এসেছেন সেই মহাত্মা। আমি চৈতন্যদেবের কথাই বলছি। আপনি তাঁর কৃপাধন্য। তাঁর দর্শন সুখ লাভ করতে আমার মন বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে ব্যবস্থা করুন।'

সার্বভৌম বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, আপনি যথার্থই শুনেছেন।

তবে তাঁর দর্শন লাভে আপনার বাধা আছে।'

বিষণ্ণ বদনে রাজা শুধোলেন, 'কি সে বাধা?' ভট্টাচার্য বললেন, 'প্রভু সন্ন্যাসী। ঘর, ঘরণী, জননী সব ত্যাগ করেছেন। বিষয়ীর সান্নিধ্য থেকে যোজন দূরে থাকেন। রাজদর্শনের কথা তো স্বপ্নেও ভাবেন না। তিনি অকিঞ্চনের আকিঞ্চন পূরণ করেন। তবুও কোন এক কৌশলে ব্যবস্থা করতে পারতাম; কিন্তু তাতো এখন সম্ভবপর হচ্ছেনা— প্রভু এখন সুদূর দাক্ষিণাত্যে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছেন।

প্রতাপরুদ্র শুধোলেন, 'জগন্নাথধাম ছেড়ে প্রভু দাক্ষিণাত্যে গেলেন কেন?'

ভট্টাচার্য বললেন, 'দেখুন মহারাজ, নিষ্কিঞ্চন পরম পুরুষদের লীলাই এইরকম। তীর্থভূমি অগণন দুর্জনের স্পর্শে অপবিত্র হয়। এই সব মহাপুরুষদের চরণস্পর্শে তীর্থস্থান আবার পবিত্র হয়। আবার যে পথ দিয়ে তাঁরা যান, সে সব স্থলের পাপী-তাপী তাঁদের পদরেণু মাথায় নেয়। এতে তাদের বিষয়াশক্তি কমে আসে এবং তারাও উদ্ধার লাভ করে।'

এ কথার প্রমাণ স্বয়ং ভাগবত। যেমন,

'ভগদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥'

—যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলেছিলেন, 'হে প্রভো! আপনার মত ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ মহাত্মারাই স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তীর্থ ভ্রমণে আপনাদের বিন্দুমাত্র স্বার্থ লক্ষিত হয় না, বরং এতে তীর্থস্থলেরই সৌভাগ্য

বলতে হয়; কারণ যেসব তীর্থস্থান কলুষজন সংস্পর্শে অতীর্থ হয়, আপনাদের হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠিত গদাধর ভগবানের দ্বারা সেই সব তীর্থ পূত হয়ে আবার তীর্থত্ব প্রাপ্ত হয়।

রাজা বললেন, 'সবই বুঝলাম, তবুও প্রভুকে যেতে দিলেন কেন? পায়ে ধরেও তো রাখতে পারতেন?' মৃদু হেসে সার্বভৌম বললেন, 'তা কি কখনো হয়, মহারাজ? তিনি যে স্বয়ং কৃষ্ণ। স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। আমরা চলি তাঁরই ইচ্ছায়, আমাদের ইচ্ছাতে কি আর তিনি চলবেন? তাঁর লীলা বোঝা দায়।'

গজপতি বললেন, 'তা ঠিক। আপনি পণ্ডিত— পণ্ডিতের পণ্ডিত। সে হেন পণ্ডিত যখন প্রভুকে কৃষ্ণ জ্ঞানে ভক্তি করেন, তাহলে তিনি যথার্থই কৃষ্ণ। এখন আমার নিবেদন, প্রভু যখন ফিরে আসবেন, তখন আমি যেন তাঁর দর্শন পাই। প্রভুর শ্রীবদন দর্শনের জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল।'

ভট্টাচার্য বললেন, 'হ্যাঁ, সে কথা আমার মনে আছে— তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই ফিরে আসবেন। তবে তার আগে প্রভুর একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয় যে।'

প্রতাপরুদ্র শুধোলেন, 'কি রকম বাসস্থানের কথা বলছেন?'

ভট্টাচার্য বললেন, 'রকম আর কি? নির্জন স্থান। ঠাকুর আর সাগরের কাছাকাছি হলেই ভাল হয়।' রাজা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, তাহলে তো এটা কোন সমস্যাই নয়। কাশী মিশ্রের বাড়ীই তো এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হবে। কাশী মিশ্র আমারই গুরু। আমার গুরুকে আমি চিনি। আপনি গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলে ঐ বাড়ীতেই

প্রভুর থাকার ব্যবস্থা করুন।'

মহারাজার ইচ্ছা ভট্টাচার্য জানালেন কাশী মিশ্রকে। রাজার অনুমানই প্রমাণ। শুনেই

'কাশী মিশ্র কহে— আমি বড়ই ভাগ্যবান।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥'

বাসস্থানের সুব্যবস্থা হল। কিন্তু প্রভুর দর্শন মিলবে কি করে? এদিকে সব আয়োজন সমাপ্ত। ভক্তবৃন্দের আর অপেক্ষা সয় না। উৎকণ্ঠিত তাঁরা, আকুল তাঁরা। তখন সব ভক্ত সার্বভৌমকে ধরলেন। প্রভুর সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করতেই হবে। তখন

'ভট্টাচার্য কহে — কালি কাশী মিশ্রের ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাইব সভারে॥'

ইষ্টবস্তু প্রাপ্তির উপায় কি? —না, ব্যাকুলতা। উৎকণ্ঠা— ব্যাকুলতাই একমাত্র উপায়। বিশেষ কোন স্থান নয়, কোন তীর্থ নয়, নয় কোন বিশেষ উপকরণ, নয় কোন আয়োজন। শুধুই ব্যাকুলতা। ভক্ত যেখানেই থাকুন, শুধুমাত্র ব্যাকুলতাতেই তিনি তাঁর ইষ্টের দর্শন পান।

এ কথার প্রমাণ :

'যস্য শ্রীভগবৎ প্রাপ্ত্যা বুৎ কটেচ্ছা যতো ভবেৎ।
স তত্রৈব লভেত্তামুং ন তু বাসোন্যে লাভকুৎ॥'

—যাঁর যে স্থানে শ্রীভগবানের প্রাপ্তি বিষয়ে উৎকট ইচ্ছা জন্মে, তিনি সেই স্থানেই তাঁকে লাভ করতে পারেন। প্রভু অমুক স্থানে থাকেন, সুতরাং সেই স্থানেই তাঁর দর্শন মিলবে— এ রকম কোন

নিয়ম নেই।

সত্যি, এমন কোন নিয়ম নেই। তিনিই না যোগক্ষেম বয়ে নিয়ে যান ভক্তের কাছে। ভক্তকে আসতে হয় না। কি মধুর প্রতিজ্ঞা বাক্য: 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম।'

ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু তিনি। ভক্তের বাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করেন। তিনি শুধু পূর্ণ ই করেন না, সেই লব্ধ বস্তু রক্ষাও করেন তিনি। দাতারই দায়। কি মধুর করুণা লীলাময়ের। মানুষও দান করে। দান করেই খালাস। আর কোন দায় নেই, আর ভগবান দান করেই দায়ে পড়েন। কি সে দায়? —না, রক্ষার দায়। আর তাই তিনি যোগক্ষেম বয়ে নিয়ে যান। গ্রহীতাকে দান গ্রহণের জন্য আসতে হয় না।

নাম নাগ মশায়। পুরো নামের খবর নেই। পেশায় ডাক্তার। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত। একদিন ঠাকুরের একটি কথায় পেশাই ত্যাগ করলেন। ডাক্তারী বাক্সটি জলে ফেলে দিলেন। সংসারী লোক। সংসারেই আছেন, তবে অকিঞ্চন হয়ে। আকুলতা-ব্যাকুলতা শুধু ঠাকুরের জন্য। আর চিন্তা নেই। শুধু ঠাকুর চিন্তা। আর বাসনা নেই— শুধু ঠাকুর কৃপা। এমনই আকুলতা, এমনই ব্যাকুলতা। অর্ধোদয় যোগ। পুণ্যার্থীরা সব কলকাতায় আসছেন গঙ্গাস্নানের জন্য। নাগ মশায় তখন কলকাতায়। হঠাৎ কি খেয়াল হল চলে গেলেন তাঁর দেশের বাড়ীতে। বাবা তো অবাক। তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'তুই একটা কি মানুষ রে! এই যোগের সময় সারা দেশের লোক ছুটছে কলকাতায়। আর তুই কলকাতাতেই

ছিলি সেই মানুষ চলে এলি এই গ্রামের বাড়ীতে।

নাগ মশায় স্বল্প বাক্। শুধু বললেন, 'ব্যাকুলতায় মা গঙ্গাই ভক্তের বাড়ীতে আসবেন।'

যথাসময়ে অর্ধোদয় যোগ এল। হঠাৎ দেখা গেল নাগ মশায়ের বাড়ীর উঠোন ফেটে চৌচির হয়ে জলধারা বয়ে চলেছে। গ্রাম শুদ্ধ লোক এসে ভক্তিভরে সেই জল মাথায় নিলেন।

ঘটনাটা অভক্তের কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ভক্ত প্রবর স্বামীজী শুনে বললেন, 'এতে তো অবাক হবার কিছু নেই। নাগ মশায় সিদ্ধ ভক্ত। ভক্তের ব্যাকুলতায় ভগবান তো সাড়া দেবেনই।'

সাড়া দিলেন প্রভু। কাশী মিশ্রের বাড়ীতে এলেন। এখন ভক্ত সনে হবে মিলন—মহামিলন। আহা! কি মধুর।

নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দ নিয়ে প্রভু বসে আছেন। আর এক এক করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন সার্ব্বভৌম। সর্ব প্রথম পরিচয় করাচ্ছেন ঃ

'জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন॥'

এরপর পরিচয় দিয়ে বলছেন, 'এঁর নাম কৃষ্ণদাস। ইনি সোনার বেত হাতে নিয়ে প্রহরীর কাজ করেন। আর এই শিখি মাহিতী হচ্ছেন হিসাব রক্ষক। আর এঁর নাম জগন্নাথ দাস। হ্যাঁ, ইনি নীলাদ্রিনাথ জগন্নাথের দাসই বটেন-- জগন্নাথ দেবের প্রধান পাচক। আর এঁরা হচ্ছেন প্রদ্যুম্ন মিশ্র, মুরারি মাহিতী, চন্দনেশ্বর, বিষ্ণু দাস, পরমানন্দ— এঁরা সবাই তোমার ভক্ত।

পরিচয় দানের সঙ্গে প্রত্যেকে প্রভুপদে পতিত হলেন। প্রভু সবাইকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন।

এরপর এলেন রায় ভবানন্দ। বড়ই মধুরভাবে এঁর পরিচয় দিলেন সার্বভৌম :

'সার্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥'

রামানন্দের নাম শুনেই প্রভু ভাবে বিহ্বল হলেন। শ্রীবদন মুখর হল রায়ের গুণগানে। বললেন, 'রামানন্দ তোমার পুত্র। ধন্য তোমার জীবন। তোমার মহিমা কি কীর্তন করে শেষ করা যায়? তুমি যে সাক্ষাৎ পাণ্ডু। আর তোমার পঞ্চপুত্র হচ্ছে পঞ্চ পাণ্ডব। তোমার জীবন ধন্য।'

স্তুতিতে স্ফীত না হয়ে বিনয়াবনত হলেন ভবানন্দ। গদগদ কণ্ঠে বললেন, আমি শূদ্র অধম। তার ওপর বিষয়ের বিষ বাস্পে জর্জরিত। আমি তোমার দর্শন লাভ করে ধন্য হলাম এবং বুঝলাম তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। স্বতন্ত্র, তাই অন্যের বিচার-আচার মাননা, আর তাই আমাকে এমনি করে দিলে প্রেমালিঙ্গন। পাঁচপুত্র সহ তোমারই চরণে শরণ নিলাম। আর এই বাণীনাথ তোমার কাছেই থাকবে, তোমার সেবা করবে।'

'বেশ তো, তাই হবে। তুমি তো আমারই গণ। এই তো আর মাত্র চার-পাঁচদিন পরেই রামানন্দ আসবে। আমি এত পেয়েও পূর্ণানন্দে নেই। আমার আনন্দ পূর্ণ হবে রামানন্দ এলে।' —বলে প্রভু ভবানন্দকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। আর চার পুত্র

প্রভুর চরণ শিরে ধারণ করলেন।

এই এতক্ষণে প্রভু কালা কৃষ্ণদাসের কালা কাহিনী প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'তোমাদের কৃষ্ণদাসকে তোমাদের হাতেই ফিরিয়ে দিলাম। আর আমার দায়-দায়িত্ব নেই।'

কৃষ্ণদাস কাঁদতে লাগলেন। যাই হোক, প্রভু মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সারতে উঠে গেলেন। তখন চারভক্ত মিলে পরামর্শ করতে লাগলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর— এই চার-জন। কিসের পরামর্শ? গৌড়বঙ্গে কাকে পাঠান যায়? প্রভু ফিরে এসেছেন— এ সংবাদটা নদীয়াবাসীকে জানাতে হবে। সেখানে আছেন প্রভুর অগণন ভক্ত। আছেন অদ্বৈত, শ্রীবাস, ঠাকুর হরিদাস, বাসুদেব, মুরারি, শিবানন্দ, বক্রেশ্বর, গদাধর, শ্রীরাম, দামোদর, শ্রীমান, শ্রীধর, রাঘব, নন্দন আচার্য— আরও কতশত গণ। আর আছেন ভিন গ্রামের সত্যরাজ, মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন। সর্বোপরি আছেন শচীমাতা আর প্রিয়াজী।

সেই রত্ন চতুষ্টয় ঠিক করলেন প্রভুর্বাতা পাঠাবেন ঐ কালা কৃষ্ণদাসকে দিয়ে। কিন্তু তাঁদের সার্বভৌম নিয়ামক প্রভুর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। তাই প্রভুর অনুমতি চাইলেন। প্রভু হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, 'তোমাদের যা অভিরুচি।'

মহাপ্রসাদ শিরে ধারণ করে কৃষ্ণদাস এলেন নবদ্বীপে। প্রথমেই এলেন শচীমায়ের ঘরে। অমনি ঝটিতি ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। একেক ভক্ত একেকভাবে বিহ্বল হলেন। যেমন, অদ্বৈত

কি করলেন ?

'শুনিয়া আচার্য গোসাঞি পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্যগীত কৈলা॥'

সবারই মন ছুটে গেছে সেই নীলাচলে। যেন বাতাসে ভর করে যাবেন বিশ দিনের পথ বিশ ঘণ্টায়। যাহোক, ভাবাবেশ প্রশমিত হলে সবাই গেলেন আচার্য অদ্বৈতের গৃহে। ঠিক হল শচীমাতার অনুমতি নিয়ে যথাশীঘ্র নীলাচল যাত্রা করবেন।

এমন সময় নদীয়ায় উদয় হলেন পরমানন্দপুরী। দাক্ষিণাত্য থেকে সোজা শচীমাতার গৃহে। উদ্দেশ্য গঙ্গাস্নান। এটা পূর্ব নির্ধারিত। প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণ দেশেই একথা হয়েছিল। এসেই প্রভুর্বাতা শুনলেন। শুনেই আর স্থির থাকতে পারলেন না। আথে ব্যথে অস্থির হলেন। মন চলে গেল নীলাচলে। শুধু দেহটাই পড়ে রইল নবদ্বীপে। এঁদের জন্য আর অপেক্ষা করলেন না। ছুটলেন নীলাচল পানে।

নীলাচলে পৌঁছুতেই প্রভু তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। আর পুরীজীও প্রেমালিঙ্গন দিলেন প্রেমানন্দে। প্রভু বললেন, 'আমার বড়ই বাসনা আপনার সঙ্গে নিত্য ইষ্টগোষ্ঠি করি। আপনি কৃপা করে নীলাদ্রিতেই বাস করুন।'

হাস্যোজ্জ্বল পুরী বললেন, 'বিলক্ষণ। সেই উদ্দেশ্যেই না গৌড় থেকে সরাসরি শ্রীক্ষেত্রে এলাম। আমার আর অপেক্ষা সইল না, তোমার নদীয়ার পার্ষদরাও আসছেন।'

প্রভু কাশীমিশ্রের একটা ঘর দিলেন পুরীজীকে। তটিনীর

জলধারা ব্যাকুল হয় মহোদধির সঙ্গে মহামিলনের জন্য। ভক্তবৃন্দের ভক্তিধারা ব্যাকুল হয়েছে তাঁদের মধ্য-মহোদধি মহাপ্রভুর সঙ্গে মহামিলনের জন্য। তাই

'আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর॥'

পরমাশ্চর্য গুণনিধি এই স্বরূপ। ছিলেন পুরুষোত্তম আচার্য নদীয়া লীলায় প্রভুর পার্ষদ। কি রকম গুণনিধি?

'সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥'

প্রভু সন্ন্যাস নিলেন— পুরুষোত্তমের বড়ই অভিমান হল। না, যে নবদ্বীপে প্রভু নেই, সে নবদ্বীপে তিনিও নেই। এখন নদীয়ার আকাশে শুধু সকলঙ্ক চাঁদের উদয় হয়, অকলঙ্ক গোরাচাঁদের তো আর উদয় হয় না। তাই নদীয়া ত্যাগ করলেন। অভিমানে কাশীতে গিয়ে সন্ন্যাস নিলেন। নাম হল স্বরূপ। সন্ন্যাস নিলেন অভিমানে, আকর্ষণে নয়। তাই সন্ন্যাসের বিধি-বিধান পুরোপুরি মানলেন না: শিখাসূত্র ত্যাগ করলেন— যোগপট্ট গ্রহণ করলেন না।

চৈতন্যানন্দ তাঁর গুরু। গুরুর আদেশ বেদান্ত পঠন-পাঠনের। নিয়ম নিগড়ে দেহটাকে বাঁধা যায় হয়ত বা। মনকে বাঁধা যায় না। যেমন গেলনা স্বরূপের। মন যাঁর পড়ে আছে নীলাচলে, যেখানে আছে তাঁর অকলঙ্ক চাঁদ— গোরাচাঁদ, তিনি কি আর কাশীতে পড়ে থাকতে পারেন ঐ শাস্ত্রের বাক বৈখরীতে মত্ত হয়ে?

তাই নীলাচলে ছুটে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন প্রভুর চরণারবিন্দে এই শ্লোকটি মধু-ঝরা কণ্ঠে গেয়ে ঃ

'হেলোদ্ধূনিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদা মোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মদয়া।
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥'

—হে শ্রীচৈতন্য! হে দয়ানিধে! যার দ্বারা অনায়াসে সকল দুঃখ দূরীভূত হয়, যা অত্যন্ত নির্ম্মল, যার দ্বারা আনন্দ প্রকাশ পায়, যার দ্বারা শাস্ত্র বিবাদ প্রশমিত হয়, যা ভক্তিরস প্রদান করে, যার দ্বারা চিত্তে উন্মাদ নামক সঞ্চারিভাব অর্পিত হয়, যা থেকে নিরন্তর ভক্তিসুখ লাভ হয়, এবং যা মদ নামক ভাবের সঙ্গে বর্তমান, সেই মাধুর্য মর্যাদাবশতঃ সমধিক প্রকাশপ্রাপ্তা তোমার দয়া আমার প্রতি প্রকাশিত হোক।

প্রভু-স্তুতিতে স্বরূপ প্রভুর মাধুর্য মর্যাদার কথা বললেন। মর্যাদা মানে চরম সীমা। অন্যান্য অবতারে লীলাময় লীলা প্রকাশ করেছেন ঐশ্বর্য প্রকাশ করে। এতে কি হয়েছে? —না, অসুর-কুল বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু অসুরদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান যে প্রেমময়, এ পরিচয় তারা পায় নি। ত্রাসময় জেনেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু নদীয়া লীলায় ঐশ্বর্য নেই। থাকলেও তা মাধুর্যের অনুগত। স্বরূপ জ্ঞানে বৃহস্পতি, তাই তাঁর স্তুতিও যথার্থ।

প্রভুর মাধুর্য মর্যাদা কিরকম? একটি-দুটি নয়, আট-আটটি

বিশেষণে ভূষিত করে প্রভুর মর্যাদা প্রকাশ করেছেন স্বরূপ। পরমাশ্চর্য গুণ বিশ্লেষণ।

প্রভুর মাধুর্য লাভে জীবের কি হয়? —না, দুঃখ দূর হয়। দুঃখের কারণ কি? পাপ পুণ্য রূপ কর্মফল এবং মায়ার গুণ-রাগই দুঃখের মূল। গৌরসুন্দরের কৃপা লাভেই জীবের এই কর্মফল আর থাকে না এবং মায়া গুণ রাগ পাশ থেকে তারা মুক্ত হয়।

প্রভুর মাধুর্যে আর কি হয়? চিত্ত মালিন্য দূর হয়। জীবের চিত্তটি কি রকম? —না, দর্পণের মত। সে দর্পণ নিশিদিশি মলিন হচ্ছে। ফলে সে আর নিজেকে দেখতে পারে না পারে না বলেই পথভ্রষ্ট হয়। প্রভুর মাধুর্য ধন্য যে হয়, সে নির্মল দর্পণে নিজেকে দেখে চিনতে পারে। তখন অবস্তু ত্যাগ করে বস্তু লাভে অগ্রসর হয়।

প্রভু তো স্বয়ং সামোদ দামোদর। সে হেন প্রভুর মাধুর্য কিঞ্চিৎ মাত্র যে লাভ করেছে, তারই হয়েছে আমোদ আর আহ্লাদ। সে তখন একটা কথাই জানতে পারে 'আনন্দধারা বহিছে ধরা মাঝে।'

এক অন্তবিহীন বিবাদ-বিভেদ চলছিল তখন সারাদেশে। চলছিল মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে। কি নিয়ে এই বিবাদ? —না, শাস্ত্র নিয়ে। জীবের কৃষ্টিকলা, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং তার আন্তর সত্তার মানবিক গুণ— এসব কিছু না। তাহলে সবকিছু কোথায়? —না, শাস্ত্রের নামে যত রাজ্যের জটিলতা-কুটিলতায়।

শাস্ত্র নয়, শস্ত্র নয়, ঐশ্বর্য নয়, ধনবল নয় একমাত্র মাধুর্য বলেই প্রভু বিবাদ-বিভেদ দূর করে সবাইকে নিয়ে এলেন নামের—

অর্থাৎ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের এক চন্দ্রাতপ তলে। এ চিত্র সমগ্র জনসমাজ দর্শন করেছে প্রভুর নদীয়া লীলায় এবং দক্ষিণ দেশ বিজয় লীলায়।

স্বরূপ বললেন প্রভুর এই মাধুর্য 'রসদয়া।' রসদান করে। কি রস দান করে? —না, ভক্তিরস দান করে। এই অফুরাণ রসভাণ্ডার তিনি পেলেন কোথায়? কেন, অখণ্ড রসবল্লভা ভানু-বালার কাছে। তাই না তিনি এসেছেন অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ রাধা হয়ে, আর তাই জীবকে অকাতরে দান করছেন ব্রজরস।

পরমাশ্চর্য মাধুর্য প্রভুর। যাঁরা সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছেন। ফলে তাঁরা কখন হেসেছেন, কখন নেচেছেন, কখন গেয়েছেন, কখন প্রলাপ বকেছেন, আবার কখনও বা আথে ব্যথে অস্থির হয়ে ইতি-উতি ছুটেছেন। যেমন ভাগবত বলছেন,

'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ,
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনু শীলয়ন্ত্যজং ভবন্তীতুষ্ণীং পরমত্যে নিবৃত্তাঃ।'

—ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁর নামগান করেন, কখন তাঁর গুণকীর্তন করতে করতে অশ্রু বিসর্জন করেন।

প্রভুর এই মাধুর্যের প্রকাশ হয় কোথায়? —না, ভক্তিরাজ্যে। যেখানে ভক্তির বিকাশ,. সেইখানেই মাধুর্যের প্রকাশ।

প্রভুর এই মাধুর্যে আর কি আছে? —আছে মদ নামক এক ভাব। এই ভাবের উদয় হলে আহ্লাদের আধিক্য হয়। ফলে,

হয় গতির স্খলন, বাক্যের স্খলন, অঙ্গের স্খলন, নেত্রঘূর্ণা ও নেত্রের রক্তিমাদি। এই মদনামক সঞ্চারিভাবই প্রভুর অসমোর্ধ্ব মাধুর্যকে অধিক মনোরম করে।

প্রভু তাঁর পদাম্বুজে পতিত স্বরূপকে আবেগে ও সবেগে ঝটিতি তুলে নিয়ে বক্ষে ধারণ করলেন। এই এতদিনে তিনি তাঁর মনের দোসর পেলেন যাঁর সঙ্গে মনের কথা খুলে বলতে পারবেন। এই যে এত শত বৈষ্ণব ভক্তের সঙ্গে প্রভুর মিলন হল, এদের কাছে তো প্রভু মনের মণি কোঠা খুলতে পারেন নি। তবে হ্যাঁ, এখন পারবেন। দু জনের কাছে পারবেন। এ দুজন হচ্ছেন স্বরূপ আর রায় রামানন্দ। স্বরূপ এই এলেন, আর রায় আসছেন, আসেন নি এখনও। এ হেন মনের মানুষ স্বরূপকে বক্ষে ধারণ করে কি হল?

'দুইজনে প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন।'

এক সময়ে উভয়েই চেতনা ফিরে পেলেন। তখন প্রভু বললেন, 'স্বরূপ, কি আর বলব তোমাকে আমার মনের কথা। তুমি যে আসবে, তা আজ স্বপ্নেই আমি দেখেছি। আজ আমার কেমন আনন্দ হল জান? অন্ধ চক্ষুষ্মান হলে যে আনন্দ পায়, আজ তোমাকে পেয়ে আমার সেই আনন্দ হল।'

এ কথায় কান্না ঝরা কণ্ঠে স্বরূপ বললেন, 'প্রভু, আমি মহা-পাতকী। তোমার ওপর অভিমান করে চলে গিয়েছিলাম। সবটাই ভ্রান্তি। ভ্রান্তিতে শান্তি পাই নি। পাবই বা কেন? তুমি যে প্রেমডোরে বেঁধে রেখেছ। তাই আবার ছুটে এসে তোমার চরণ কমলে আশ্রয় নিলাম।

প্রভু স্বরূপের জন্য একটি নিভৃত কক্ষ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

প্রভুর কাছে ভক্তবৃন্দ আসছেন এক অবিরাম স্রোতধারার মত। এরপর আগমন হল গোবিন্দের। কে এই গোবিন্দ ? তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিলেন। ছিলেন ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য। পুরীজী সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দ্দেশেই তাঁর আগমন। কি সে নির্দেশ ?— প্রভুর সেবার ভার গ্রহণ করার নির্দেশ। তাই তাঁর আগমন।

দীর্ঘকালের সংস্কার দীর্ঘকালের ব্যাধির মত। তাই সার্বভৌম আজও ব্যাধিমুক্ত হতে পারেননি : তাইতো, গোবিন্দ যে শূদ্র। এই শূদ্র কি করে পুরীজীর সেবক হল ?

তাঁর এই দ্বিধা দূর করলেন প্রভু। বললেন, 'দেখ ভট্টাচার্য, ঈশ্বরের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বেদ ধর্ম বা লোক ধর্মের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর কাছে জাতি ছার প্রীতিই সার।' বলে প্রভু বিদুরপত্নীর হাতে কৃষ্ণের আহার্য গ্রহণ কাহিনীটি উল্লেখ করলেন।

একদিন হল কি শ্রীকৃষ্ণ বিদুর গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। বিদুর গৃহে ছিলেন না। বিদুর ঘরণী ভক্তিভরে আসন দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা। রাজা আহার করেন রাজভোগ। রাজভোগ তো দূরে কথা, সামান্য আহার্য বস্তুও অনেক সময় বিদুরের ঘরে থাকেনা। বিদুরপত্নী আতিপাতি করে খুঁজে পেলেন কয়েকটি কলা। আহ্লাদে মন ভরে গেল। আনন্দে জগৎ ভুল হয়ে গেল। তাই এই ভুলের বশে বিদুরপ্রিয়া কি করলেন ? কলাগুলো ছাড়িয়ে খোসাগুলো দিলেন, আর কলাগুলো ফেলে দিলেন। ভক্ত প্রেমভরে

দিচ্ছেন। প্রেমের ঠাকুর তাই খোসাগুলো খাচ্ছেন। সামোদ দামোদর না করলেন জাতির, না করলেন আহার্যের বিচার।

ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক এমনই মধুর। প্রীতি নির্ভর, জাতি নির্ভর নয়। ভগবান প্রভু, আর জীব তাঁর দাস। সে জীব যে দেহই আশ্রয় করুক না কেন। কীট, পতঙ্গ, পশু-পক্ষী অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যে দেহই জীব আশ্রয় করুক, সবই সমান—সেখানে ব্রাহ্মণও ভগবানের দাস, আর শূদ্রও ভগবানের দাস। উভয়েই এক পংক্তিভুক্ত একই পরিচয় অর্থাৎ কিনা দাস।

ভট্টাচার্য বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাই বর্ণের প্রশ্ন তাঁর মনে; কিন্তু প্রভুর অনুরক্ত হয়ে তিনি নিজেই তো কৃষ্ণভক্ত আজ, অথচ সেই কৃষ্ণই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নন। প্রসঙ্গান্তরে প্রভু তাই বলেছেন:

'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্ণাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতব্ধে গোপীভর্ত্তুঃ
পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ॥'

—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই, আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বাণপ্রস্থী নই, যতি নই, কিন্তু আমি নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃত সমুদ্রস্বরূপ গোপীজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসানু দাস।

এরপর প্রভু গোবিন্দকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন, আর গোবিন্দ প্রণত হলেন প্রভু পদে।

কত ভক্ত যে আসছেন প্রভু দর্শনে! এইতো এলেন ব্রহ্মানন্দ

ভারতী। মুকুন্দ জানালেন প্রভুকে। প্রভু লোকশিক্ষার্থে লৌকিক ব্যবহার বিষয়ে সদাই সজাগ। বললেন, 'সে কি মুকুন্দ! ভারতী আমার দর্শন চাইবেন কি, আমিই তো তাঁর দর্শন চাইব— তিনি যে আমার গুরু স্থানীয়। চল, চল, আমরাই যাই ওঁর কাছে।' — বলেই প্রভু বাইরে এলেন। দেখেন এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন পরিধানে অজিন। দেখে হৃষ্ট হলেন না, ক্লিষ্টই হলেন: সন্ন্যাসী তো সবই ত্যাগ করেছেন। তবুও এই বাহ্যাড়ম্বর কেন? তাই যেন দেখতে পাননি ভাব করে মুকুন্দকে শুধোলেন, 'কই, তোমার সন্ন্যাসী কোথায়?' মুকুন্দ হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ তো, তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।'

প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখ মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান। ভারতী গোঁসাই কেন চর্ম্মাম্বর পরতে যাবেন? ওটাতো এক ধরণের দম্ভ। সন্ন্যাসী যে সব কিছু ত্যাগ করেছেন, সেই ত্যাগের দম্ভ।'

মুকুন্দ চুপ, কিন্তু চুপ রইলেন না ভারতী। ভুল বুঝতে পারলেন। কর্ণমূল রাঙা হল। বললেন, 'হ্যাঁ. আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম, আর চর্ম্মাম্বরও ত্যাগ করলাম।'

ভারতীর সংকল্প শুনে তুষ্ট হলেন প্রভু। ঝটিতি বহির্বাসের ব্যবস্থা করলেন। বসন বদল করলেন ব্রহ্মানন্দ। প্রভু তাঁর চরণে প্রণত হলেন। এতে ভারতী একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। বললেন, 'লোক শিক্ষার্থে ই তোমার এই প্রণাম। তবে এই প্রথম এবং এই শেষ।' বলেই প্রেমালিঙ্গন দিলেন। আর প্রভু স্তুতিতেই মুখর হলেন, 'এখন তো নীলাচলে দুই ব্রহ্ম—চল ও অচল। চলের বর্ণ

গৌর আর অচলের বর্ণ শ্যাম।'

প্রভু রসিক নাগর— চতুর চুড়ামণি। উত্তর দিলেন ঝটিতি, 'হ্যাঁ, এতকাল এক ব্রহ্মই ছিলেন নীলাচলে। বর্ণ তাঁর শ্যাম। কিন্তু তোমার আগমনে ব্রহ্ম হল দুই। আকৃতি প্রকৃতিও পৃথক হল। আকৃতিতে তো সম্পূর্ণ আলাদা, আবার প্রকৃতিতে তুমি চল, জগন্নাথ দেব অচল।' না, ব্রহ্মানন্দ হারবার পাত্র নন। সালিসি মানলেন ভট্টাচার্যকে। বললেন, 'ভট্টাচার্য, তুমিই বিচার কর। শাস্ত্র বলেন জীব ব্যাপ্য, আর ব্রহ্ম ব্যাপক। ভগবান নিয়ামক, আর ভক্ত তাঁর নিয়মের অধীন। তাই যদি না হবে, তাহলে তাঁর নিয়ম শাসন মেনে চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করে বহির্বাস পরলাম কেন?'

প্রণয় কোন্দল জমে উঠেছে। বড়ই মধুর। এবার মধ্যস্থ মুখ খুললেন, 'হ্যাঁ ভারতী, বিচারে তোমাই জয় হল।'

প্রভু ছাড়বার পাত্র নন, 'ঠিকই তো, ভারতী গোঁসাই আমার গুরুস্থানীয়। গুরুর কাছে শিষ্যের পরাজয়ই তো স্বাভাবিক।'

ব্রহ্মানন্দ বললেন, 'বেশ তো, তোমার পরাজয় হয়েছে মানলাম, কিন্তু যে অর্থে তুমি বলছ, সে অর্থে না। ভক্ত ভগবান অর্থে কথাটা ঠিক। ভক্তের কাছে ভগবান হেরেই আনন্দ পান। তুমি যদি ভগবানই না হবে, তাহলে তোমাকে দেখে মুখে কৃষ্ণনাম আসে কেন? অথচ আমি তো এতকাল নিরাকার ব্রহ্মেরই ধ্যান করে আসছি। 'আমার দশা কেমন হয়েছে জান, ঐ বিল্বমঙ্গলের মত।' বলেই বিল্বমঙ্গলের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন:

'অদ্বৈত বীথী পার্থ কৈবা পাস্থা! স্বানন্দ সিংহাসনলব্ধ দীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥'

—আমরা অদ্বৈত পথের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং নিজানন্দ সিংহাসনে পূজা লাভ করতাম। আর এখন এক গোপবধূ লম্পট শঠ বলপূর্ব্বক আমাদেরকে তাঁর দাস করে ফেলেছে।'

এর উত্তরে

'প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়॥'

এর প্রত্যুত্তর ব্রহ্মানন্দ দিলেন না। দিলেন উক্ত মধ্যস্থ ভট্টাচার্য, 'আমি তর্কের মীমাংসা করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক যে প্রগাঢ় প্রেমে ভক্ত যেখানে তাকায়, সেখানেই সে কৃষ্ণ দর্শন করে, আবার একথাও ঠিক ঐ প্রগাঢ় প্রেমে কৃষ্ণ এসে সামনে দর্শন দেন, এই যেমন তুমি দর্শন দিয়েছ।'

এ কথায় প্রভু কানে আঙ্গুল দিয়ে তিনবার বিষ্ণুনাম স্মরণ করে বললেন, 'ভট্টাচার্য, তুমি তো জানই অতি স্তুতি নিন্দারই সামিল।'

প্রণয়-কোন্দল হাস্যোজ্জ্বল বদনে সমাপ্ত হল। প্রভু ভারতীকে নিজ ঘরে নিয়ে এলেন।

প্রভু দর্শনে সব শেষে এলেন কাশীশ্বর গোঁসাই। প্রভু তাঁর যথাযোগ্য সম্মান করে নিজ নিকেতনেই রাখলেন। এইভাবে

'সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সভারে রাখিলা নিজস্থানে॥'

—×—

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উড়িয়া গৌড়ীয়া যত গৌর ভক্তবৃন্দ

দক্ষিণ দেশ থেকে প্রভু ফিরলেন। ভক্তবৃন্দের উৎকণ্ঠা দূর হল। ভক্ত ভগবানের মিলন হল। প্রভুর বিরহে পরিকরেরা যেন হাহাকার করে বলছিলেন ঃ

'শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী॥'

তাই যেন আকুল প্রাণে আহ্বান জানিয়েছিলেন ;

'এসো হে এসো হৃদয়ভরা,
এসো হে এসো পিপাসাহরা,
এসো হে আঁখি শীতল করা,
ঘনায়ে এসো মনে।'

আজ তাঁরা প্রভুর দর্শন ধন্য হয়ে বলছেন, না, আজ আর শূন্য নয়, পূর্ণ। তাঁদের হৃদয় মন্দির পূর্ণ। তাঁদের নগরী পূর্ণ। নগরীতে হাজারো লোক, তবুও প্রভু বিহনে সেই নগরী হয়েছিল শূন্য। এতো লোক, তবুও সে নগরী শূন্য হয়েছিল একজন বিহনে।

আজ তিনি এসেছেন। এসেছেন তাঁদের মধ্যে। তাঁদের তৃষিত-তাপিত হৃদয় জুড়াতে, তাঁদের উৎকণ্ঠা আকুলতায় সাড়া দিতে। তাই আজ তাঁরা দেখছেন দশদিকই পূর্ণ। পূর্ণ সব কিছুই।

পূর্ণ কেন ? তাঁদের প্রাণধন যে তাঁদের প্রাণেই ফিরে এসেছেন। প্রাণ জুড়িয়েছে ভক্তের।

সার্বভৌম দেখলেন এই তো উত্তম সময়। উত্তম সুযোগ। রাজার বাসনা তাঁর মনে বাসা বেঁধে আছে। তিনি যে রাজাকে কথা দিয়ে এসেছেন ঃ প্রভু ফিরলেই রাজার আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে জানাবেন।

কি সে আকাঙ্ক্ষা ? না, প্রভুর দর্শন লাভ। সার্বভৌম সময় সুযোগের সন্ধানেই ছিলেন। পেলেন সেই সুযোগ।

তবুও মন তাঁর দ্বিধা-দীর্ণ। একবার এগোচ্ছেন, আবার পিছিয়ে আসছেন। কি জানি, হৃষ্ট প্রভু যদি ক্লিষ্ট হন। আবার ভাবছেন রাজার কথা। ভাবছেন নিজের কথা। তিনি নিজেই না কথা দিয়ে এসেছেন রাজাকে। এই রাজানুগ্রহেই না তিনি ভোগ করছেন রাজসুখ। তাই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে

'আর দিনে সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে।
অভয় দান দেহ, তবে করি নিবেদনে॥'

প্রভু মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ তো বলই না, নির্ভয়েই বল। আমি সন্ন্যাসী। সংসারীর সব কথা তো রাখতে পারিনা। তবে যদি রাখার মত হয়, নিশ্চয়ই রাখব।'

এই এতক্ষণে সার্ব্বভৌম আসল কথাটি পাড়লেন, 'রাজা

প্রতাপরুদ্র বহুদিন থেকেই তোমার দর্শন লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত।'

ব্যস! বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু কানে আঙ্গুল দিলেন, আর বিষ্ণুনাম স্মরণ করলেন। বললেন, 'ভট্টাচার্য, তুমি তো নিজেই পণ্ডিত। শাস্ত্রের বিধান তোমার অজানা নয়। সন্ন্যাসীর রাজ-দর্শন তো স্ত্রীলোক দর্শনের মত বিষভক্ষণ তুল্য।'

'হ্যাঁ প্রভু, যথার্থ তোমার উক্তি, কিন্তু প্রতাপরুদ্র অন্যান্য রাজা থেকে স্বতন্ত্র। ইনি ভক্তোত্তম।'

প্রভু বললেন, 'তবু তো তিনি রাজা। তুমি তো জান পুতুল নারী মূর্তি স্পর্শেও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। একটু থেমে প্রভু জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা যদি এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি কর, তাহলে আমাকে আর পাবে না।'

সন্ন্যাসীর সঙ্গ সন্ন্যাসীর সঙ্গেই নিরাপদ। সন্ন্যাসী ত্যাগী, আর রাজা ভোগী। রাজার রয়েছে তিন এষণা; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। লোকৈষণা অর্থাৎ তিনি লোকমান্য হবেন এই বাসনা। এ বাসনা থাকলে মহৎ হওয়া যায় না।
সংবাদ জানাচ্ছেন মিল্টন:
'Fame is the ··· ···last infirmity of noble mind.'
আর প্রাণ মহৎ না হলে ত্যাগ আসে না, আবার ত্যাগ না এলে ভক্তি আসে না। তাই পরমপুরুষ রাজা এবং রাজপুরুষের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকেন।

দূরে থাকতেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণও এই তিন এষণা থেকে। যেমন, ঠাকুর বলতেন টাকা মাটি, মাটি টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের

কৌতূহল হল : দেখা যাক তো কেমন টাকা মাটি, মাটি টাকা। ঠাকুরের বিছানার নিচে একটি টাকা রাখলেন একদিন। ঠাকুর বিছানার দিকে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন। কিছুতেই বিছানায় বসতে পারছেন না। আবার একদিন মথুর বাবু ঠাকুরকে বললেন, 'আর কদিনই বা বাঁচব। আমার জীবৎকালে আমি কিছু জমি তোমার নামে লিখে দিতে চাই।'

ব্যস! যেই না বলা, আর অমনি ঠাকুর মথুরবাবুকে এই মারেন তো, সেই মারেন। তপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'দেখেছ, শালা আমাকে বিষয়ী করতে চায়।'

না, মথুরবাবু তবুও হাল ছাড়লেন না। ঠাকুরের মাকে ধরলেন। কলাকৌশলে বললেন, 'দিদিমা আমার কাছ থেকে তোমাকে কিছু নিতেই হবে। না নিলে আমি বুঝব, তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না।'

বৃদ্ধা আতি-পাতি করে খুঁজলেন : তাইতো মথুর এত করে বলছে— কি নেওয়া যায় তার কাছ থেকে? শেষে একগাল হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, পেয়েছি রে, পেয়েছি। আমার বয়স হয়েছে তো, তাই মনে থাকেনা। কদিন থেকে আমার দোক্তা নেই। খান কতক তামাক পাতা পাঠিয়ে দিস তো।'

আচ্ছা, দর্শনের ব্যাপারে প্রভু এত কঠিন হচ্ছেন কেন? দণ্ড দুয়েকের দর্শন মাত্র। এতে এমন কি আর শাস্ত্রীয় বিধানের প্রত্যবায় হবে? তাছাড়া, প্রতাপরুদ্র পরম ভক্ত। প্রভু দর্শন মানসে ভক্তের আকুতি রয়েছে তাঁর মধ্যে। ইনি সামান্য রাজা থেকে স্বতন্ত্র। এসব

কথা কি প্রভু জানেন না?-- জানেন। এইতো একটু আগেই পরম নির্ভরশীল ভক্ত সার্ব্বভৌমও জানিয়েছেন। তবুও যে এমন বজ্রকঠিন? সবটাই লোক শিক্ষার্থে। প্রভু এখন হাজারো মানুষের শিরোমণি। ভক্তবৃন্দের নয়নমণি। শিরে আরোহণ করলেই তো হল না। সর্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করলে সর্ব বিধ বিধিও তাঁকে মানতে হয়। মুখে মান্য করলেই হয়না। আচরণেও পালন করতে হয়। শুধু পালন করলেই হয় না। —নিখুঁত ভাবে পালন করতে হয়। সামান্য খুঁত দেখলেই ঐ লোক সমাজ আর শিরে ধরে রাখবে না। ফলে বিফল হবে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য। কলিহত জীবের আর উদ্ধার হবে না।

ভক্তি সরণী বড়ই দীর্ঘ। সাময়িক একটা ভাবাবেগ ভক্তির লক্ষণ নয়। ঐ আবেগ যেমনি বেগে আসে, তেমনি বেগেই চলে যায়। তাই ভক্তি পথে প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রভু সজ্ঞানেই প্রতাপ রুদ্রের পথ প্রস্তুত করছেন পর্যায়ক্রমে। তাঁরই কল্যাণার্থে, অথচ বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে বরং প্রতীপ রূপটি। প্রভু এই-ভাবেই লীলা করেন। সহজে ধরা দেন না। অধরা থাকেন অনর্হের কাছে। তাঁর লীলা বোঝা দায়। দায় এমন কি সার্ব্বভৌমের পক্ষেও. অথচ সার্ব্বভৌম পরম পণ্ডিত। পরম ভক্ত। এমনই রহস্যময় প্রভুর লীলা।

গজপতি প্রতাপরুদ্র এখনও এই তিন এষণারই অধীন। তবে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন এই তিন অপায়ের পাশ থেকে মুক্ত হতে। প্রয়াসের প্রসাদ লাভ সময় সাপেক্ষ। সেই সময়ের অপেক্ষা

প্রতাপরুদ্রকে করতেই হবে। করতে হবে ভক্তির পথে চলতে চলতে। ভক্তি সরণীর একেকটি ধাপ অতিক্রম করতে করতে।

প্রতাপরুদ্রের সেই প্রস্তুতি পর্ব চলছে সাধু সঙ্গে। প্রভু ও তাঁর পার্ষদবৃন্দের সান্নিধ্যেই তাঁর ভক্তি পথ সুগম হচ্ছে। যথার্থ বলেছেন কুলার্ণব তন্ত্র ঃ 'সতাং সঙ্গো হি ভেষজম।'— সাধু সঙ্গই হচ্ছে ওষুধ। সেই ওষুধেরই ক্রিয়া হচ্ছে রাজার মনে। আরো বিশদ ভাবে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ :

'সাধুসঙ্গ করলে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা হয়।'

প্রতাপরুদ্রের মধ্যে শ্রদ্ধা এসেছে। তাই প্রভু পরীক্ষার ছলে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন নিষ্ঠার পথে; কিন্তু রাজা তা জানতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না। রাজা কেন, প্রভুর কৃপাধন্য সার্বভৌমও তা জানতে পারছেন না। কেন জানাচ্ছেন না প্রভু? জানালে যে প্রস্তুতি ভূমি আর অনড় থাকবে না। ফলে ভক্তি পথের শেষ ধাপে আর উপনীত হতে পারবেন না প্রতাপরুদ্র। প্রভু এতই কৃপাময় —এতকথা ভাবছেন রাজার জন্য। তিনি নিজেই নিতি নিতি তাঁকে যোগ্য করে নিচ্ছেন। লীলাময়ের এমনই বিচিত্র লীলা।

ভগবান দয়াল ভয়াল। ভয়াল ভক্তের প্রস্তুতির জন্য— যোগ্যতা অর্জনের জন্য। এটা বাইরের রূপ। অন্তরের রূপ দয়াল। বাইরের রূপে যে ভক্তের উত্তরণ হয়, সেই ভক্ত তখন তাঁকে অন্তরের দয়াল রূপে পান। সার্থক হয় তাঁর জীবন। রাজার এই মুহূর্তের প্রার্থনাটি কবি গেয়েছেন এইভাবে ঃ

'আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে—
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হঁতে যাও যে সরে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য করে—
আধা ইচ্ছার সংকট হতে—
বাঁচায়ে মোরে।'

প্রভুর সাবধান বাণীতে প্রমাদ গণলেন সার্বভৌম। না, রাজার ব্যাপারে এখন আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। এক ডুবে রত্ন না পেলে রত্নাকরকে রত্নহীন বলা যায় না। প্রভুও সেই রত্নাকরের মতই গভীর। সেই গভীরে প্রবেশ করা তো সত্যি সময় সাপেক্ষ। কাজেই একাধিক প্রয়াসে প্রভুর প্রসাদ লাভ করতে হবে। সার্ব্ব-ভৌম প্রণতি জানিয়ে এখনকার মত নিজগৃহে চলে গেলেন।

গজপতি এলেন শ্রীক্ষেত্রে। সঙ্গে রায় রামানন্দ। রামানন্দ সরাসরি এলেন প্রভুর কাছে। প্রণত হলেন। প্রভু প্রেমালিঙ্গন দিলেন। ভক্তের মধ্যে তর-তম আছে। রামানন্দ তমের মধ্যে। অগণন ভক্তের মধ্যে মাত্র দুজনের কাছে প্রভু মনের দ্বার খুলতে পারেন। রামানন্দ ও স্বরূপ— এই দুজন। সেই রায়কে পেলেন গোরা রায়। আর কি প্রভু স্থির থাকতে পারেন? প্রেমালিঙ্গনে প্রেমাশ্রু বইতে লাগল। বেগবতী তটিনীর ধারার মত। এ দৃশ্য

অন্যান্য ভক্তের কাছে অভিনব। বিস্মিত হলেন তাঁরা। হলেন চমৎকৃত।

প্রেমাবেশ কেটে গেলে রায়ই মুখ খুললেন। রাজার প্রভু দর্শনের ইচ্ছার কথাটা রায় পাড়লেন। তবে সরাসরি নয়। মন্ত্রী তো— বাকপতি। কথার কলাকৌশল জানেন। বললেন, 'রাজাকে আমার পদত্যাগ এবং তোমার পদ সেবার কথা জানাতেই রাজা এক কথায় সম্মতি জানালেন। তোমার নাম উচ্চারণ করতেই রাজা কণক আসন ছেড়ে আমার হাত ধরে প্রীতি জানালেন। শুধু এইটুকুই নয়। বললেন আমি কাজ না করলেও মাসিক বেতন যথারীতি পেয়ে যাব।'

রাজার গুণ কীর্ত্তন করে রায় প্রভুর মুখের দিকে তাকালেন। না, কোন প্রতিকূল রেখা নেই। তাই আবার বললেন, 'রাজা বড়ই হা-হুতাশ করলেন। বললেন দেখ রায়, আমি রাজা হয়েও প্রভুর দর্শন পেলাম না। আর তুমি আমারই রাজপুরুষ হয়ে তাঁর কৃপাধন্য হয়েছ। আমার জীবন নিরর্থক, আর তোমার জীবন সার্থক। আমি এ জীবনে না পাই, জন্মান্তরে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে দর্শন দেবেন। তিনি যে স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণ সদাই কৃপাময়।' বলেই আবার রায় বললেন, 'প্রভু, তুমি বিশ্বাস কর, আর নাই কর, রাজার ব্যাকুলতার লেশমাত্রও আমার মধ্যে নেই।'

প্রভু রাজার ব্যাপারে আগের মতই অনড়। বললেন, 'রায়, তুমি হচ্ছ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত। তোমাকে যিনি ভালবাসেন, তিনি

তো ভাগ্যবান। তাই রাজাও ভাগ্যবান। এই ভাগ্য বলেই তিনি কৃষ্ণ কৃপা লাভ করবেন।' এরপর রায় রত্ন চতুষ্টয় পদে প্রণত হলেন। পরমানন্দ পুরী, ভারতী গোঁসাই, স্বরূপ ও নিত্যানন্দ এই চার রত্ন। জগদানন্দ প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে করলেন প্রেমালিঙ্গন। হঠাৎ প্রভু শুধোলেন, 'আচ্ছা রায় জগন্নাথদেব দর্শন করে এসেছ তো ?' রায় বললেন, 'না সরাসরি তোমার কাছেই এসেছি। এই এখন যাব দর্শন করতে।'

বিস্মিত প্রভু শুধোলেন, 'এ তুমি কি করলে রায়! ক্ষেত্রে এসে ক্ষেত্রাধিপতি দর্শন না করে আমার কাছে এসেছ ?'

রায় মৃদু হেসে বললেন, 'মন যে ভাবে চায়, সেই ভাবেই না, পা দু'টো চলে ? মন তোমার কাছে পড়ে রয়েছে। আর আমি আগে গেলাম জগন্নাথ দর্শনে — এ হেন বিসদৃশ দর্শনে কি লাভ হত ?'

এদিকে প্রতাপরুদ্র পুরীতে নিজ প্রাসাদে এসে সার্ব্বভৌমকে ডেকে পাঠালেন। ভট্টাচার্যকে প্রণতি জানিয়ে রাজা শুধোলেন, 'আমার দর্শন বাসনার কথা জানিয়েছেন তো প্রভুকে ?'
সার্বভৌম বললেন, 'শুধু জানানো কেন— বহু অনুনয় বিনয় করেছি, কিন্তু সম্মতি পেলাম না। বেশী পীড়াপীড়ি করলে তিনি শ্রীক্ষেত্রই ত্যাগ করবেন বলে জানালেন।'

বিষাদ ঝরা কণ্ঠে রাজা বললেন, 'আমি বিষয়ী— পাপী-তাপী। কিন্তু তিনি তো জগাই-মাধাই উদ্ধার করেছেন। আমি কি তবে ঐ দুই পাষণ্ডেরও অধম! তাহলে কি আমি এই বুঝব শুধুমাত্র আমাকে ছাড়া তিনি আর সবাইকে উদ্ধার করবেন।'

আবার অভিমানাহত হয়ে বললেন, 'বেশ তো, তিনি যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাকে দেখা দেবেন না, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি আমি তাঁর দর্শন না পেলে এ জীবনই ত্যাগ করব। যে জীবন প্রভু কৃপা ধন্য নয়, সে জীবনের আর কি মূল্য আছে?' রাজার এতই আর্তি, এতই আকুলতা! তিনি রাজসিংহাসন চান না, রাজ মহিষী চান না, চান না রাজকুমার, চান শুধু প্রভুপাদপদ্ম।

জীবন ত্যাগ! প্রভু চরণ না পেলে রাজা জীবন ত্যাগ করবেন!— কথাটা শুনে সার্বভৌমের মন চিন্তা ও বিষাদে ভরে গেল। সত্যিই তো, এ এক মহাসংকট ভট্টাচার্যের জীবনে। মহাসংকট কেন— উভয় সংকট। একদিকে উৎকল নৃমণি তাঁর অন্নদাতা, অন্যদিকে গৌরগুণমণি— তাঁর সংত্রাতা-প্রেমদাতা। উফ্! এমন সংকটেও মানুষ পড়ে। আচ্ছা না হয় ভাগ্যবৈগুণ্যে পড়েছেন, কিন্তু রাজার প্রাণটা তো আগে বাঁচান প্রয়োজন। তাই সার্ব্বভৌম বললেন, 'দেখুন মহারাজ! প্রভু লীলাময়। কখন কি লীলা করবেন আমরা জানতে পারি না। সে লীলা কি ভাবে করবেন, তাও লীলার পূর্ব্বে জানা দুঃসাধ্য। তবে আপনার মধ্যে যে ভাব লক্ষ্য করছি, তাতে আমার স্থির বিশ্বাস, আপনার প্রভু দর্শন হবেই। আমরা যথাসময়ে সেই সুযোগের সন্ধান দেব।'

এর তিনদিন পর জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। কত আকুতি নিয়েই না প্রভু দিন গুণছিলেন এই দিনটির জন্য। এই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার জন্য।

প্রভু স্নানযাত্রা দর্শন করলেন। আনন্দ সাগরে ভাসলেন।

কিন্তু তারপরই বিষাদ সাগরে ডুবে গেলেন। স্নানযাত্রার পরই যে অনবসর। চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অঙ্গরাগ হয় জগন্নাথদেবের। একমাত্র সেবক ছাড়া অন্য কেউ এ সময় দর্শন করতে পারেন না। তাই পারলেন না প্রভুও। গোপী বিরহভাব জাগল প্রভুর মনে। সেই ভাবে ভাবিত হয়েই প্রভু চলে গেলেন আলালনাথে।

এদিকে এক বৃহৎ ব্যাপার। বৃহৎ সংবাদ। সুখ সংবাদ। গৌড় থেকে ভক্তবৃন্দ এসেছেন। সংখ্যায় তাঁরা অনেক। দশ নয়। বিশ নয়। একেবারে দু'শ। প্রভু তো আলালনাথে। সার্বভৌম সসঙ্গী ছুটলেন প্রভুর কাছে। আলালনাথ থেকে ফিরলেন প্রভুকে নিয়ে। সব দায়ই যেন সার্ব্বভৌমের। কে বলবে ভট্টাচার্য একজন উত্তর পঞ্চাশ ব্যক্তি? সর্বত্রই তিনি ছুটছেন। এই যে প্রভু নীলাচলে ফিরে এলেন — এ সংবাদটাও তো গজপতিকে জানানো প্রয়োজন। তাই ভট্ট আবার ছুটলেন রাজার কাছে।

গৌড় থেকে গৌরের কাছে এসেছেন দু'শ ভক্ত। এঁরা তো এলেন। কিন্তু এই অধিক সংখ্যক ভক্তের অশন অবস্থানের ব্যবস্থা হবে কি ভাবে? এ তো দু-চার জনের ব্যাপার নয় যে গোপীনাথ একাই সামলাতে পারবেন? এ যে একেবারে দু'শ। তাই গোপী নাথ এলেন রাজার কাছে। সেখানে ভট্টাচার্যও আছেন। ভালই হল। ভট্টতো গৌর ভক্ত। ভক্তের সঙ্গে ভক্তের নাড়ীর টান। আচার্য ভক্তদের আগমনের সংবাদ জানালেন। শুনলেন ভট্টাচার্য আর প্রতাপরুদ্র। প্রভুর গণ বলে কথা। রাজার উৎসাহ দ্বিগুণিত হল। ভক্তবৃন্দের সমস্যার সমাধান হল এক নিমেষেই; রাজা

জানালেন তিনি এই মহাভাগবতদের জন্য উত্তম ও উপযুক্ত ব্যবস্থাই করবেন। তাঁর মন পড়ে আছে ভক্তদের ওপর। মুখাবয়বে দেখা দিল আনন্দের হিরণ কিরণ। বললেন, 'ভট্টাচার্য, একে একে সব ভক্তের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিন তো।'

সার্ব্বভৌম বললেন, 'আমি আর পরিচয় করাব কি? আমি তো সবাইকে চিনিইনা। সবাইকে চেনে এই গোপীনাথ। গোপীনাথই পরিচয় করিয়ে দেবে। তবে এভাবে তো এত লোকের সঙ্গে পরিচয় করা সম্ভবপর নয়। চলুন, আমরা তিন জন বরং প্রাসাদের ওপরে উঠি। ত্রিরত্ন অট্টালিকার ওপরে উঠলেন।

প্রথমে এলেন স্বরূপ ও গোবিন্দ। রাজা এঁদের কারোকেই চেনেন না। আচার্য পরিচয় দিয়ে বলছেন, 'এই যে দেখছেন প্রথম জন, এঁর নাম স্বরূপ। ইনি প্রভুর দ্বিতীয় রূপ। আর পরের জন হচ্ছেন গোবিন্দ— ইনি প্রভুর অঙ্গ সেবক। স্বরূপ ও গোবিন্দ মালা পড়ালেন অদ্বৈতের গলায়। রাজার জিজ্ঞাসায় গোপীনাথ বললেন, 'এই জোতির্ময় পুরুষটি হচ্ছেন আচার্য অদ্বৈত— সবারই পূজনীয়। ইনি প্রভুরও ভক্তি ভাজন।

গোপীনাথ একে একে সব ভক্তের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীবাস, বক্রেশ্বর, বিদ্যানিধি, গদাধর, গঙ্গাদাস, শঙ্কর, মুরারী গুপ্ত, ঠাকুর হরিদাস, শিবানন্দ, বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, রাঘব, নন্দন আচার্য, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, বল্লভ সেন, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, সত্যরাজ খান প্রমুখের। ভক্তেরা কীর্তন করছিলেন। রাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। আনন্দে

শরীর রোমাঞ্চিত হল। কদম্ব কেশরের মত। তাই—

'রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর ॥
কোটি সূর্য্যসম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্যে ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥'

রাজার এই কথায় সার্বভৌম বললেন, 'যথার্থ বলেছেন মহারাজ। কীর্ত্তন তো এতকাল সীমায়িত ছিল ব্যষ্টির মধ্যে। গৃহ কোণ থেকে প্রকাশ্য রাজপথে —সমষ্টির মধ্যে নিয়ে এলেন প্রভুই। তিনিই পিতা —সংকীর্ত্তন পিতা। আর অবতীর্ণ হয়েছেন যোগ্য পরিকর নিয়ে।'

একথা ভক্তের আবেগময় অনুমান নয়— একবারে ভাগবত প্রমাণ যেমন,

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধষঃ ॥'

রাজার বিপন্ন বিস্ময়। তাইতো, পরমাশ্চর্য ঘটনা! এঁরা এসেছেন পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রে। পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রে এসে সেই পুরুষোত্তম দর্শন না করে এঁরা আগে গেলেন প্রভুর কাছে। কাশী মিশ্রের গৃহে আছেন প্রভু। মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখ দিয়েই যেতে হয় মিশ্রের গৃহে। সেই সিংহদ্বারের সম্মুখে এসেও এঁরা কেউ প্রবেশ করলেন না মন্দিরে ক্ষেত্রাধিপতিকে দর্শন করতে! একথা ভেবে রাজার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। বিস্ময়

গোপনও করতে পারলেন না। তাই ভট্টকে শুধোলেন এর কারণ। সার্ব্বভৌম বললেন, 'এঁদের উৎকণ্ঠা একজনকে ঘিরে এই ভূমণ্ডলে। সেই জন হচ্ছেন গৌরসুন্দর। গৌরগত প্রাণ এঁদের। গৌরময় দেখেন ত্রিভুবন। তাই প্রভুকে সর্বাগ্রে দর্শন করে উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়ে জগন্নাথদেব দর্শন করবেন এঁরা।

এবার রাজার দ্বিতীয় চমক। কাশী মিশ্রের বাড়ীর দিকে এত প্রসাদ যাচ্ছে কেন? কাদের জন্য এ প্রসাদ? শুধোলেন সার্ব্ব-ভৌমকে। সার্বভৌম বললেন, 'কেন, গৌড়ীয় ভক্তদের জন্যই।' চমকে উঠলেন রাজা, 'সে কি! তীর্থে এসে মস্তক মুণ্ডন করতে হয় এবং প্রথম দিন উপবাসী থাকতে হয়। তা, এঁরা সে সব নিয়ম বিধি মান্য না করে মহানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছেন। এতে তো শাস্ত্রীয় বিধান লঙ্ঘন করা হল।'

ভট্টাচার্য বললেন, 'আপনার যুক্তি অকাট্য, মহারাজ। অকাট্য বৈধীভক্তির নিয়ম-অনুযায়ী। শাস্ত্রের বিধান মতে। কিন্তু এঁদের হচ্ছে রাগভক্তি। তাই বেদ স্মৃতির সব বিধানই তাঁদের ইষ্ট বস্তুতে গিয়ে মিশেছে। শাস্ত্রীয় বিধানের প্রত্যবায় হলে পাপ হবে এবং তাতে নিরয়গামী হতে হবে— এসব এঁরা চিন্তাও করেন না। এঁরা চিন্তা করেন শুধু তাঁদের চিন্তামণির কথা—তাঁদের হৃদয় হরণের কথা— তাঁদের গৌরসুন্দরের কথা। সেই গৌরসুন্দরের নির্দেশই তাঁরা শিরে ধারণ করেছেন। আমিও সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধান লঙ্ঘন করে বাসি বসনে, বাসি বদনে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছি প্রভুরই নির্দেশে।'

অবশ্য প্রভুর এই নির্দেশ ভাগবত সমর্থিত। যেমন,

'যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্ম ভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম।'

—শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ! ভগবান যখন যাঁকে অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোকধর্ম্মে ও বেদধর্মে পুষ্ট বুদ্ধিকে ত্যাগ করেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের বুদ্ধি স্বচ্ছ। মন তাঁর মুক্ত। মুক্ত মন সৎ বস্তু গ্রহণ করে। রাজা বুঝতে পারলেন বহুকালের আচারের বালুরাশি শুদ্ধ ভক্তিসুরধুনীর ধারা গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে এক আচার সর্বস্ব ভঙ্গপয়ার সমাজের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রভুর আচরণে তাঁর দৃষ্টি খুলে গেল। দিগদর্শন হল। যেমন,

'তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা।
কাশী মিশ্র পরিছা পাত্র দোঁহা বোলাইলা॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুইজনে।
প্রভুস্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে॥
সভারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ, যেন নহে বাদ॥'

এখন প্রভুর বৈষ্ণব মিলন। পথেই মিলন। বৈষ্ণব ভক্তগণ ছুটছিলেন কাশী মিশ্রের গৃহের দিকে, আবার ওদিকে সার্বভৌম প্রভুকে নিয়ে ফিরছিলেন আলালনাথ থেকে। একেবারে মুখোমুখি মিলন। আহা, কি মধুর মিলন!

প্রথমেই অদ্বৈত। আচার্য প্রভুর চরণ বন্দনা করলেন। আর গৌরসুন্দর দিলেন গৌর আনা ঠাকুরকে প্রেমালিঙ্গন। এর পর প্রভু সবাইকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে পথ ছেড়ে ঘরে এলেন।

আহা মরি মরি! বলিহারি, বলিহারি!! কতকাল পরে প্রভু নিজগণদের নিজের কাছটিতে পেলেন। প্রভুর সে কি আনন্দ! মনের তারে সোনার সুরে সোনার বীণা বেজে যাচ্ছে। প্রভু সবাইকে কাছে বসালেন। সবাইকে নিজ হাতে দিলেন মালা চন্দন। জগন্নাথ দেবের প্রসাদী মালা চন্দন। এই মহামিলনে যোগ দিলেন আচার্য আর ভট্টাচার্য।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রভু বললেন, 'ভট্টাচার্য, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সার্থক আমার। সচল-অচল—দুইরকম গ্রন্থই সংগ্রহ করেছি দক্ষিণ দেশ থেকে। সচল স্বয়ং রামানন্দ আর অচল শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ও ব্রহ্ম সংহিতা। স্বরূপের কাছে রেখেছি। লিখে নাও ওর কাছ থেকে। না, শুধু স্বরূপ না, লিখে নিলেন সবাই।

সকলের সঙ্গেই তো মিলন হল, কিন্তু হরিদাস? প্রভুর পরাণের পরাণ হরিদাস? প্রভু ভক্তারণ্যে খুঁজলেন। আতি পাতি করে খুঁজলেন। না, পেলেন না। অমনি হাঁক দিলেন, '.... ....
কাঁহা হরিদাস?' কোথায় হরিদাস? তিনি কাশী মিশ্রের গৃহ তো দূরের কথা, মন্দির এলাকার ত্রিসীমানার মধ্যেই নেই। তাহলে কোথায়? পথে পড়ে আছেন—দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে আছেন। ভক্ত বৃন্দ ছুটলেন হরিদাসকে আনতে। না, হরিদাস আসবেন না। তিনি যবন! দূরের এই টোটাতে যদি একটুখানি ঠাঁই হয়, তাহলেই

তাঁর জীবন ধন্য।

না, প্রভু আর থাকতে পারলেন না। তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল ভক্ত হরিদাসের জন্য। নামাচার্য হরিদাসের জন্য। পুজো নেই, পাঠ নেই, অর্চনা নেই, নেই কোন বাহ্যাচার। শুধু নামই সার। একমাত্র নাম। দিনে তিন লক্ষ—তিন লক্ষেরও কিঞ্চিৎ অধিক। অর্থাৎ মাসে এককোটি নামের অধিকারীর কাছে ছুটে এলেন প্রভু। না এসে কি পারেন। যাঁর স্থান প্রভুর হৃদয় পটে, তিনি পড়ে আছেন কি না ঘাটে বাটে। প্রভু তাই আথে ব্যথে আকুল হলেন। ছুটে এলেন। হৃদয়ের ধন হৃদয়ে ধারণ করতে। দর্শন মাত্রই হরিদাস প্রভু পদপল্লবে পতিত হলেন। প্রভু ঝটিতি ভক্তি পাবনকে বক্ষে ধারণ করলেন। কত বারিই যে সঞ্চিত ছিল উভয়ের নয়নে। এখন মিলনে সবেগে বইতে লাগল। উভয়েই হলেন বিকল। প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল, আর ভৃত্যগুণে প্রভু বিকল।

হরিদাস বললেন, 'প্রভু, মিনতি করছি আমাকে স্পর্শ করোনা। আমি যে নীচ, অপবিত্র, অস্পৃশ্য পামর।' এ কথায় প্রভু আরও প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললেন,

'.........তোমা স্পর্শি পবিত্র হৈতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥'

প্রভু বাক্য অবিতথ। ভাগবত সমর্থিত। যেমন,
'অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥'
—দেবহূতি কপিলদেবকে বলেছিলেন, 'যাঁর জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান থাকে, তিনি কুকুর মাংসভোজী নীচ জাতির হলেও পুজ্য হন। যাঁরা তোমার নাম কীর্তন করে থাকেন, তারাই সদাচার সম্পন্ন। তাঁরাই তপস্যা করেছেন। তাঁরাই হোম করেছেন, তাঁরাই তীর্থ স্নান করেছেন এবং তাঁরাই বেদ অধ্যয়ন করেছেন।

এরপর প্রভু হরিদাসকে একটি নির্জন কুটিরে নিয়ে গেলেন, বললেন, 'হরিদাস, তুমি তো মন্দির থেকে দূরে নির্জনে স্থান চেয়েছিলে, তাহলে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এই কুটির থেকেই তুমি মন্দিরের চূড়ো দেখবে, আর তাতেই তোমার জগন্নাথ দর্শন হবে। আর নাম কীর্ত্তনের কথা তোমাকে কি আর বলব, তুমি তো মাসান্তে কোটি নামের অধিকারী হও। অগণন ভক্ত মধ্যে অনন্য তুমি। 'প্রসাদ নিত্যই যথাসময়ে এখানে আসবে আর নিত্যই আমি তোমার সঙ্গসুখ আস্বাদন করতে আসব।' বলে প্রভু বিদায় নিলেন।

প্রভু নিজালয়ে চলে এলেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হয়েছে। তাই চলে এলেন। প্রভুর আসার প্রয়োজন কি? ভোজনের সুব্যবস্থা তো হয়েই আছে। মহাপ্রসাদ নিয়ে আসবেন বাণীনাথ। বাণীনাথ শূদ্র, আবার এদিকে ভক্তবৃন্দের মধ্যে ব্রাহ্মণও আছেন অনেক জন, তা থাক। এ ব্যবস্থা প্রভুরই। ঐ শূদ্রের হাতেই খেতে হবে ব্রাহ্মণকে।

ভক্তেরা ভোজন করবেন। তার পরিপাটি ব্যবস্থা আগে থেকেই করা হয়েছে। তবুও প্রভু এলেন কেন? ভক্তেরা যে তাঁর নিজগণ। নিজগণকে নিজহাতে পরিবেশন করবেন। ঐ হাতে আছে প্রেমের স্পর্শ। প্রেমপুরুষোত্তম প্রেম বিলোবেন আহার্যের মাধ্যমেও। ভক্তের প্রভু, নামে প্রভু নন— আচরণে প্রভু। প্রভু জানেন তাঁর কোন্ ভক্তের কোন্ বস্তুটি প্রিয়। যদি অপরে পরিবেশন করেন, তাহলে এ গোপ্যটি তিনি কি করে জানবেন? তাই প্রভু নিজ হাতে পরিবেশন করে ভক্তের প্রিয়ানুষ্ঠান করবেন।

প্রভু পরিবেশন করলেন। শুধু কি পরিবেশন? সেবান্তে সব ভক্তকে তিনি নিজ হাতে মালাচন্দন দিলেন। আহার গ্রহণে দেহে কিঞ্চিৎ উষ্ণতা দেখা দেয়। চন্দন শীতলতা আনে। তাই চন্দন ধারণ। আর মালা? মালায় বিবিধ কুসুমের বিবিধ সুরভি। রূপে-গন্ধে মন আমোদিত হয়। মনের শান্তি তো দেহের শান্তি। দেহের শান্তিতে পরিপাকের সহজতা।

বিদ্যাসাগর মশায়ের তখন দেশ জোড়া নাম-ডাক। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁরই আর্থিক আনুকূল্যে একটি ছেলে বি, এ, পাশ করল। প্রণত হল বিদ্যাসাগর পদে তাঁর বাড়ীতে এসে। আনন্দোজ্জ্বল হল অধ্যক্ষের মুখাবয়ব। হ্যাঁ, মুখ রেখেছে ছেলেটি, বললেন, 'বস্, একটুখানি মিষ্টি মুখ করে যা। এত কষ্ট করে রাত জেগে লেখাপড়া করে পাশ করলি।'

তাঁর পুত্র কলত্র আছে। ডাকলেন না বিদ্যাসাগর তাঁদের নিজ হাতে একটি প্লেট নিলেন। কুঁজো থেকে জল নিয়ে ধুলেন।

তক্তপোষের নীচে হাড়িতে আছে রসগোল্লা। সেই হাড়ি থেকে রসগোল্লা নিয়ে প্লেটে সাজিয়ে ছেলেটির সামনে দিলেন। দিলেন এক গ্লাস জলও। স্নেহঝরা কণ্ঠে বললেন, 'খা।'

এতক্ষণ ছেলেটি এই পরিবেশন পর্বটি যতই দেখছে, ততই কাঁচুমাচু হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগরকে বাধা দেবে— সে সাহসও নেই। ছেলেটি ভাবছে; 'কোথায় উনি কলেজের কর্ণধার, দেশ জোড়া নাম, আর কোথায় আমি একটি পিঁপড়ে তুল্য মানুষ, তাছাড়া তাঁরই টাকায় পড়ে আমি পাশ করলাম। আর সেই বিরাট পুরুষটি আমাকে নিজ হাতে মিষ্টি দিচ্ছেন।'

মনের মধ্যে এক বড় ঝড়। ছেলেটির কাঁদ কাঁদ ভাব তবুও খেতেই হল। না খেয়ে উপায়ও নেই। উনি যে বারবারই বলছেন, 'খা, খা।' খাওয়া শেষ হল। বিদ্যাসাগর এখন পান সাজতে বসলেন। ছেলেটি তো কান্নায় ফেটে পড়ে প্রায়। পান সাজা হলে পানটি ছেলেটির হাতে দিলেন। যেই না দেওয়া, অমনি ছেলেটি হাউ হাউ করে কান্নায় ফেটে পড়ল।

হকচকিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর, বারবার কারণ শুধোলেন। শেষে ছেলেটি কান্নাঝরা কণ্ঠে বিদ্যাসাগরের সব কাজের কথা এবং নিজ দীনতার কথা বলল। রসসাগর বিদ্যাসাগর ওসব কথায় গেলেন না। মৃদু হেসে বললেন, 'আরে তুই এতে এত কাঁদছিস কেন?' মেদিনীপুর উড়িষ্যার লাগোয়া। আমি তো উড়ে। উড়েরা ভালো পান সাজতে পারে। দেখছিস না কলকাতার বেশীর ভাগ পানের দোকানই উড়েদের। খা, পানটা খেয়ে ফেল।'

ভোজনান্তে ভক্তেরা নিজ নিজ ঘরে চলে গেলেন। এখন বিশ্রাম। বিশ্রামে গেলেন দিনের শেষে দিনমণিও। বিশ্রামান্তে ভক্তেরা গাত্রোত্থান করলেন। এখন বেড়া কীর্তনের সময়। জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রদক্ষিণ করে সংকীর্তন।

শুরু হল সংকীর্তন। মধ্যমণি মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর আগে পেছনে চারটি দল। চার দলের চারনায়ক। নর্তন-কীর্তন সুশৃঙ্খল। প্রভু যেখানে, শৃঙ্খলাও সেখানে। সঙ্গীত একটি শিল্প। নাচ ও গানের সুর, তাল, লয়, মাত্রা আছে। এগুলি সুসংবদ্ধ হলেই রস সঞ্চার হয়। প্রভুর সাজ-আয়োজন শিল্প সম্মত। চার দল। প্রথম দল-নায়ক হচ্ছেন আচার্য অদ্বৈত। অবধূতের অধিকারে দ্বিতীয় দল। তৃতীয় দলের ভার বক্রেশ্বরের ওপর। শেষ দলটির অধিনায়ক হচ্ছেন শ্রীবাস। আর সর্ব্বাধ্যক্ষ হচ্ছেন মহানায়ক মহাপ্রভু। সংকীর্তন সুশৃঙ্খল। তাই মধুর— অতি মধুর।

সবদলই ঘুরে ফিরে মহানায়ককে পাচ্ছেন। আর উদ্দীপিত হচ্ছেন। কীর্তনের আসর জম-জমাট। প্রেমরসে ভরপুর। সবাই মাতোয়ারা। প্রভুর তো কথাই নেই। প্রেমবিকার দেখা দিল— অশ্রু, কম্প, পুলকাদি।

অভূতপূর্ব দৃশ্য। শ্রীক্ষেত্রবাসীরা এমন দৃশ্য এর আগে কখনও দেখেননি। এই সাত্ত্বিক বিকার, এমন মধুর নর্তন-কীর্তন, এমন প্রেমরস সঞ্চার ছিল তাঁদের কল্পনায়। প্রত্যক্ষ করলেন এই প্রথম।

না, তাঁরা আর থাকতে পারলেন না। উড়িয়া ভক্তরা

আবেগে-বেগে কীর্ত্তনানন্দে যোগ দিলেন প্রেমানন্দে।

আজ আনন্দ। মহানন্দ। মন্দিরাঙ্গন ঘিরে। মহামিলনের মহানন্দ। উড়িয়া গৌড়ীয়ার মহামিলন। রাজ্যে রাজ্যে মিলন, মেলবন্ধন— প্রেমবন্ধন। না, প্রতাপরুদ্রও স্থির থাকতে পারলেন না। প্রাসাদের ওপর উঠলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হলেন নর্তন-কীর্তন দেখে। অপূর্ব দৃশ্য। অপরূপ দৃশ্য। ভাবছেন গজপতি, আহা, কি মধুর মিলন! উড়িয়া গৌড়ীয়ার মহামিলন। এক রাজ্যের সঙ্গে আরেক রাজ্যের। দুই রাজ্য এখন এক হয়ে গেছে। দুই-এ এক। দুই কখন এক হয়? হয়। গণিত শাস্ত্রে হয় না— ভক্তি শাস্ত্রে হয়। তাই ভক্তদের আর কোন পরিচয় নেই। তাঁরা না উড়িয়া, না গৌড়ীয়া। তাঁরা গৌরের গণ। তাঁদের কোন জাত-পাত নেই। রাজ্যের কোন পরিচয় নেই। নেই রাজারও। তবে কি তাঁদের কোন রাজা নেই। না, নেই! আছে রাজার রাজা। কে এই নৃমণি?— গৌরগুণ মণি। তাঁদের মাথার মণি। তাঁদের মনমণি— কোঠার মণি। তাঁদের একমাত্র পরিচয় তাঁরা ভক্ত। ভক্তের থাকেন ভগবান। তাঁদের ভগবান কে?— না, স্বয়ং গৌরসুন্দর। ভক্তের আর কোন পরিচয় লাগেনা। ভক্তের একমাত্র ধন ভক্তি। অন্তরঙ্গ ধন। এ ধনে যে ধনী তাঁদের বহিরঙ্গ বস্তুর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই জাত-পাতের, নেই কোন জাত-পাতের, নেই কোন রাজার, কোন রাজ্যের।

রাজার লোকবল আছে, অর্থবল আছে। আছে শস্ত্র বল, শাস্ত্র বল। তবুও তো তিনি এই দুই রাজ্যের অগণন জনকে

মহামিলনের সিংহদ্বারে আনতে পারেন নি।

পারলেন কে? — না, এক বহির্বাসধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর তো তাঁর মত শস্ত্র বল নেই, অর্থ বল নেই। আছে শুধু নামের বল। এই নবীন সন্ন্যাসী শুধু এক বলেই বলী—মহাবলী। রাজার চেয়ে শতগুণে বলী।

তাহলে রাজার এই রাজবল, রাজ মহিষী, রাজকুমার, রাজত্ব, রাজবেশ তো নিরর্থক। মলিনতা মাত্র। অহং এর মলিন বস্ত্র। এই মলিনতা থেকে মুক্ত না হতে পারলে তো তিনি প্রভুকে পাবেন না। তাই গজপতি যেন মনে মনে বলছেন:

'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।
দিনের কাজে ধুলা লাগি
অনেক দাগে হল দাগি,
এমনি তপ্ত হয়ে আছে
সহ্য করা ভার।
আমার এই মলিন অহংকার।'

—×—

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণ্ডিচা মার্জন

প্রভুর সঙ্গে মিলনের উৎকণ্ঠা গজপতির মনে আগের মতই জেগে রয়েছে। জেগে রয়েছে নিশিদিশি। তবে তিনি তো রাজা। রাজকার্য না চালালে রাজ্য অচল হয়। রাজধানী কটক। সেই কটক থেকে চিঠি দিলেন সার্বভৌমকে। গোটা চিঠিতে একটিই নিবেদন। কি সে নিবেদন? —না, প্রভুর কাছে যত ভক্ত আছেন — তাঁরা যেন সবাই তাঁর জন্য প্রভুর কৃপা ভিক্ষা করেন। আর কিছু না— শুধুমাত্র একটিবার দর্শন।

চিঠিতে আরও একটি কথা লিখেছেন যা পড়ে ভট্টাচার্য বড়ই উদ্বিগ্ন হলেন। তাইতো, এ তো এক মহাভয়ের কথা: রাজা লিখেছেন প্রভুর দর্শন না পেলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করবেন। না, শুধু রাজ্য ত্যাগই না, প্রাণই ত্যাগ করবেন পথে পথে ভিখিরী হয়ে ঘুরে ঘুরে।

এ হেন পত্র পেয়ে কে না উদ্বিগ্ন হবেন —বিশেষ করে ভট্টাচার্য যিনি রাজপণ্ডিত। না, সার্বভৌম আর স্থির থাকতে পারলেন না।

ছুটে গেলেন সব ভক্তের কাছে। পত্র দেখালেন সবাইকে। শঙ্কাকুল হলেন সবাই। সত্যিই তো, গজপতি নামেই রাজা। আসলে তো প্রভুর ভক্ত।

সার্বভৌমই মুখ খুললেন। সব দায়ই যেন তাঁর। ঘাটে ঘাটে, পদে পদে তাঁর দায়। একটা থেকে মুক্ত হোন তো আরেক-টাতে হন বন্ধ। বললেন, 'এভাবে চিন্তিত হয়ে বসে থাকলে তো চলবেনা, বরং চল, আমরা সবাই মিলে প্রভুর কাছে যাই। না, না, দর্শন দেবার কথা বলব না। রাজার আকুলতার কথা জানাব। সবাই সম্মত হলেন। সবাই গেলেন প্রভুর কাছে। প্রভুর চোখে কিঞ্চিৎ বিস্ময়। শুধোলেন, 'কি ব্যাপার,— একেবারে যূথবদ্ধ হয়ে? মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাইছ, অথচ কেউ কোন কথা বলছনা।'

নিত্যানন্দই মুখ খুললেন, 'কি বলব, প্রভু? বের করতেও পারছিনে। আবার ভেতরেও রাখতে পারছিনে। নিবেদন একটাই। রাজা তোমার চরণ দর্শন না পেলে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন। যোগী হবেন। এই আমাদের নিবেদন আমরা রাখলাম। এখন তুমি রাখবে, কি রাখবে না, সেটা তোমার ইচ্ছা।'

প্রভু বাইরে ভয়াল, অন্তরে দয়াল। রাজ মাহাত্ম্য খ্যাপনই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই রাজার হচ্ছে উত্তরণ স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে। একবারে না। আস্তে ব্যস্তে পরম বস্তু লাভ করলে লোক শিক্ষা হবে, আর রাজ মহিমা সুরভিতে জন সমাজ হবে আমোদিত। তাই প্রভু বাইরে পাষাণ কঠিন, অন্তরে কোরক কোমল। নীরস কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে তোমাদের ইচ্ছে আমি এখন কটকে গিয়ে

রাজাকে দর্শন দিই। এতে পরলোক যাবে। তোমাদের কথা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু ইহলোক? আচ্ছা, ইহলোকে লোক সাধারণের কথাও না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু দামোদর? দামোদরের মুখ আটকাবে কে? সে তো স্পষ্টই বলবে আমি স্বার্থ-লোভে রাজাকে দর্শন দিয়েছি। তাহলে দামোদরই বলুক আমার এখন কি করা উচিত?

অগণন ভক্ত। হঠাৎ দামোদরের নাম এল কেন? দামোদর দৃঢ়চেতা। অন্যায় সহ্য করেন না। সে অন্যায় যদি প্রভুও করেন, তাহলেও তিনি রেয়াত করবেন না। এমনই উচিত বক্তা।

প্রভু চতুর শিরোমণি। ভক্ত হৃদয় পটের ছবি দেখছেন। স্পষ্ট বক্তা ভক্তের মাধ্যমে সবার মন জেনে নিচ্ছেন। দেখা যাক দামোদর কি বলেন?

দামোদর বললেন, 'আহা! আবার আমার ওপর চাপালে কেন? তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আর আমি ক্ষুদ্র জীব। আমি কি কবে বলব রাজাকে দর্শন দিতে।' চতুরে চতুরে চতুরালি। ভক্ত—ভগবানের খেলা বড়ই মধুর। কথাটা বলেই দামোদর চিন্তা করলেন: তাহলে তো রাজার কথা বলা হলনা। অথচ এই উদ্দেশেই এখানে এত ভক্তের আগমন। তাই আবার বললেন, 'তুমি স্বতন্ত্র হলেও প্রেম পরতন্ত্র। প্রেমের বশ। রাজার মধ্যে যে প্রেমের উদয় হয়েছে, তাতে তুমি তাঁকে অচিরেই ধরা দেবে।'

নিত্যানন্দ স্বভাবে আলোভোলা, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলেন কৌশলে। বললেন, 'আহা, কর্তব্য— অকর্তব্যের কথা

দামোদরকে জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমাকে এ জ্ঞান দিতে পারে এমন জন কে আছে এই জনসমাজে? তবে ইষ্ট না পেলে অন্তরে ক্লিষ্ট হয়ে ভক্ত বিনষ্ট হয়। ভাগবতের যাজ্ঞিক আখ্যানই তার বড় প্রমাণ।'

ব্রজবালাদের সঙ্গে বস্ত্র হরণ লীলা করলেন ব্রজেশ তনয়। নিজ নিজ বস্ত্র পেয়ে তাঁরা চলে গেলেন। এদিকে রাখালদের নিয়ে রাখালরাজ ব্রজ থেকে অনেক দূরে এলেন। শ্যামল বনশোভা। দেখে মন ভরল। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে পিপাসার্ত হলেন। এলেন যমুনাপুলিনে। যমুনার নীল জলে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। গাভী-দেরও জলপান করালেন।

কিছুক্ষণ পরে জঠরানল জ্বলে উঠল। শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাখালেরা তাঁদের ক্ষুধার কথা বললেন। ব্রজেন্দ্র নন্দন বললেন, 'তোমরা এক কাজ কর। কাছেই ব্রাহ্মণেরা আঙ্গিরস যজ্ঞ করছেন। দাদা আর আমার নাম করে তোমরা আহার্য চাইলেই তাঁরা দিয়ে দেবেন।'

ব্রজবালকেরা তখন উদর জ্বালায় অস্থির। ছুটলেন যজ্ঞ স্থলে। ও হরি, কার কথা কে শোনে? তাঁরা রাম ও কৃষ্ণের কথা কত করে বললেন। না, শুনেও শুনলেন না। নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। এবার রাখালরাজ বললেন, 'আহা, তাহলে এবার তোমরা ব্রাহ্মণীদের কাছে যাও। ওঁরা আমাকে খুব স্নেহ করেন। চাওয়া মাত্রই দেখবে কত রকমের খাবার ওঁরা তোমাদের দিয়ে দেবেন।'

গোপ বালকেরা আবার ছুটলেন। হ্যাঁ, এবার কথা ফলল।

একেবারে হাতে হাতে ফল পেলেন তাঁরা। বিপ্রপত্নীরা শুনে হৃষ্ট ও বিস্মিত হলেন, 'সে কি! আমাদের কৃষ্ণ এত কাছে আছেন। না, না, তোমাদের আর কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যেতে হবেনা। আমরাই খাবার নিজ হাতে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের কৃষ্ণের জন্য ও তোমাদের জন্য।'

পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা-- কারোর বাধা এঁরা মানলেন না। ছুটে চললেন কৃষ্ণের কাছে। কিন্তু পারলেন না একজন। স্বামী তাঁকে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন। তখন তিনি কি করলেন?— না, অন্তরে তাঁর ইষ্টকে প্রেমালিঙ্গন করে প্রাণত্যাগ করলেন।

তাই নিত্যানন্দ বললেন, 'দুইদিক রক্ষা হয়— এমন একটা উপায় বলছি। তুমি একটা বহির্বাস পাঠিয়ে দাও রাজাকে— তাহলেই রাজা আপাতত প্রাণে বাঁচবেন।'

কথাটা প্রভুর মনে ধরল। আপত্তি করলেন না। নিত্যানন্দ ঝটিতি গেলেন গোবিন্দের কাছে। বহির্বাস নিয়ে এসে সার্বভৌমের হাতে দিলেন। ভট্টাচার্যের সে কি আনন্দ! নিত্যানন্দই এই আনন্দের নির্ঝর। সাধে কি ওঁর নাম নিত্যানন্দ। আলাভোলা পুরুষ, তবুও কি সুন্দর উপায়ে অপায় দূর করলেন। রাজার প্রাণ বাঁচালেন। কই, আর তো কেউ পারলেন না। পারলেন শুধু নিতাইচাঁদ।

না, আর এক লহমাও দেরী না। ভট্টাচার্য রাজাকে বহির্বাস পাঠিয়ে দিলেন। প্রতাপরুদ্র বহির্বাস পেলেন। উৎকণ্ঠিত রাজা উৎফুল্ল হলেন। আহা, তাঁর কতকালের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে।

সার্ব্বভৌমকে তিনি সেই কতদিন ধরে বলে আসছেন। এতকাল ভট্টাচার্য তাঁকে সংবাদ পাঠিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সে সংবাদে তিনি জেনেছেন শুধু না, না, না। আশা হতাশার আলো-আঁধারিতে দিন কাটছিল গজপতির। হতাশায় কখনও কখনও বলেছেন তিনি প্রাণই ত্যাগ করবেন প্রভুর দর্শন না পেলে। তবুও তিনি এই বিশ্বাস, এঁটে ধরে বসে আছেন যে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। রাজা যে বরাভয় বাণীতে উৎসাহিত হয়েছেন, কবি তা বাঙ্ময় করেছেন এইভাবে :

'ছাড়িসনে, ধরে থাক এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে,
ওরে আর নেই ভয়।
ঐ দেখ পূর্ব্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হয়েছে উদয়—
ওরে আর নেই ভয়।'

রাজার উত্তরণ হল। এক ধাপ উঠলেন। রাজার উৎসাহ পালে মন্দ-মধুর বায়ু লাগল।

এদিকে রায় দিন কতক আগেও ছিলেন রাজমন্ত্রী। কথার কলা-কৌশল তাঁর জানা। তাই যখন সুযোগ পাচ্ছেন, তখনই—রাজাকে দর্শন দেবার জন্য মিনতি জানাচ্ছেন। একদিন এমনি এক মিনতিতে প্রভু বললেন, 'দেখ রায়, তুমি নিজে শাস্ত্র পারীণ।

রাজ সান্নিধ্যে সন্ন্যাসীর দুই লোকেরই নাশ হয়। আচ্ছা না হয় পরলোকের কথা ছেড়েই দিলাম। পরলোকের কথা পরেই হবে। আমি চিন্তিত ইহলোক অর্থাৎ ইহলোকের সাধারণের কথা ভেবে। সন্ন্যাসীর আচার-আচরণে ক্ষুদ্রতম রন্ধ্র পেলেই জনসমাজ সেটাকে এক বিশাল প্রত্যবায় বলে গণ্য করবে।'

উত্তরে রায় বললেন, 'প্রভু, তুমি কত পাপী-তাপী উদ্ধার করেছ, আর প্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথ সেবক এবং তোমার একান্ত অনুরক্ত। সে হেন গজপতি কি না বঞ্চিত হবে তোমার চরণ দর্শন থেকে?'

প্রভু বললেন, 'রায়, তুমি যথার্থ বলেছ। রাজা সর্বগুণবান; কিন্তু ঐ রাজা নামটাই এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। তবে তোমার কথার অমর্যাদা করা আমার পক্ষে কঠিন। তাই বলছি রাজা নয়, রাজ তনয়কে তুমি নিয়ে এস আমার কাছে। আমার সঙ্গে এই যে পুত্রের মিলন, সেই মিলন পুত্রের পিতার সঙ্গেই মিলন হবে। তুমি তো শাস্ত্রবাণী জানই: 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।'

প্রভুর বাক্য পেয়ে বাক্যহারা হলেন রায় আনন্দে। রাজাকে জানালেন সুখ সংবাদ। রাজার আরেক ধাপে উত্তরণ হল। এই তো রাজার জয়ের পতাকায় সুপবন বইছে। আনন্দে ঝলমল রাজার মুখাবয়ব।

অনবত্তাঙ্গ রাজপুত্র। বয়সে নবকিশোর। সেই নবকিশোর নটবরের বেশই ধারণ করল। দেহ বর্ণ শ্যাম। আয়ত চপল নয়ন, পীত আবরণ, মণিময় আভরণ। এহেন রাজকুমারকে রায় নিয়ে

এলেন প্রভুর সামনে। দেখেই প্রভু প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বললেন :

'এই মহাভাগবত— যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্র নন্দন স্মৃতি হয় সর্বজনে॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে॥'

প্রভু পরশমণি। স্পর্শমাত্রই রাজপুত্র আর সেই রাজপুত্র নেই। সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। মুখে শুধু কৃষ্ণনাম। অবিরাম সেই নাম। মধুমাখা হরিনাম। শুনে প্রভুর হল আত্মার আরাম। নিতাই তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন।

পুত্র পেয়ে রাজা বুকে তুলে নিলেন। আনন্দের সুরধুনী বইল তাঁর হৃদয় মরুতে। তৃষিত প্রাণ জুড়োল এই— এতদিনে। জুড়োবে বৈ কি। এতকাল যে তার মনে এই একটি সান্ত্বনা ছিল :

'প্রভু, তোমার লাগি আঁখি জাগে ;
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।
....
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই
সেও মনে লাগে ভালো।
দেখা নাই পাই,
ব্যথা পাই,
সেও মনে লাগে ভালো।'

তাঁর আশা স্বর্ণলতা সোনাঝরা আলোয় ঝলমল করছে। তাই পুত্রকে আলিঙ্গন করে তাঁর মনে আনন্দের সাগর বইছে।

জ্যৈষ্ঠের পরই আষাঢ়। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় প্রভু দেখলেন জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। বড়ই হৃষ্ট হলেন। কিন্তু প্রভু বড় আশা নিয়ে আছেন আষাঢ়ের জন্য। আষাঢ়েই যে রথযাত্রা। প্রভুর আনন্দ আর ধরেনা। শ্রীক্ষেত্রে এই প্রথম হবে তাঁর রথযাত্রা দর্শন। প্রভুর আর তর সইছেনা। আহা রে, দিনগুলো যদি তরতরিয়ে ফুরিয়ে যেত!

দিন ফুরোলো। রথযাত্রার দিন এগিয়ে এল। প্রভুর মন উদ্দীপিত হল। প্রথমেই মনে এল গুণ্ডিচা মার্জনের কথা। প্রভু ডাকলেন তিনজনকে। কাশী মিশ্র, পড়িছা পাত্র ও সার্বভৌম— এই তিনজনকে। প্রভুর বদনে সুমিষ্ট হাসি। বললেন, 'দেখ, আমি বড়ই সুভগ যে এই প্রথম রথযাত্রা দর্শন করব নীলাদ্রিতে। আমি পূর্ণানন্দ পেতে চাই গুণ্ডিচা মন্দির নিজ হাতে পরিষ্কার করে।'

গুণ্ডিচা মন্দির পরিষ্কারের প্রয়োজন হয় বৈকি। রথযাত্রার দিন রথের রশির টান শেষ হওয়ার পর জগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রবেশ করেন। আটদিনের অবস্থান। উল্টো রথের দিন ফিরে আসেন। অর্থাৎ ব্যবহৃত হয় মাত্র আটদিন, বারমাসের মধ্যে। বাকী পৌনে বার মাসই মন্দির বিগ্রহ শূন্য থাকে। ঐ শূন্য স্থান পূরণ করে ঐ পৌনে বারমাসের ধুলো ময়লা। গুণ্ডিচা মন্দিরের ধোয়া পাখলা কাজটি ভৃত্যরাই করে। ভর্তা বা. ভক্তেরা করেনা।

এটাই নিয়ম। ব্যতিক্রম দেখা দিল প্রভুর বেলায়। প্রভু ভক্ত রূপে দেখা দিলেন। ভক্তের কৃত্য কি? —না, সেব্যের সুখবিধান। সেই সুখ বিধান করতে হয় ভক্তকে নিজ হাতে। তবেই না সেব্যের সুখ হয়। আর সেবকেরও হয় সুখ সন্তোষ।

লীলাপুরুষোত্তমও সেবার ভারই নিয়েছিলেন। নিজে যেচে নিয়েছিলেন। কোথায়? —না, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সভায়। ব্রাহ্মণদের পাদ প্রক্ষালনেব ভার নিয়েছিলেন, অথচ যজ্ঞের বরণ পেয়েছিলেন তিনিই। আর আজ সেই লীলাপুরুষোত্তম দেখা দিয়েছেন প্রেম পুরুষোত্তমরূপে। ভূমিকা বড়ই ব্যাপক। প্রেম যে বিলিয়ে দেবার ধন। তাই আজ একা নন। মন্দির মার্জন কাজে নিয়ে এলেন সব ভক্তদের; কিন্তু ভক্তরা যে প্রভুকে ভগবান জ্ঞানে ভক্তি করেন। সেই ভগবান আজ ভক্তের ভূমিকায় এলেন কেন?

ভগবান ভক্তের সেবা পেয়ে আনন্দ আস্বাদন করেন; কিন্তু এই সেবা দিয়ে ভক্ত কি আনন্দ পান, তাতো আস্বাদন করা যায় না ভগবানের বেশে। তাই আসতে হয় ভক্তের বেশে। আর তাই প্রভু এসেছেন আজ ভক্তের বেশে সেই রস আস্বাদন করতে, যে রস আস্বাদন করেছেন নদীয়ালীলায়।

> প্রভুর ইচ্ছায় 'তবে একশত ঘট শত সমার্জ্জনী।
> নূতন প্রভুর আগে দিল পড়িছা আনি॥
>
> ....

শ্রীহস্তে সভারে দিল একেক মার্জ্জনী।
সবগণ লৈয়া প্রভু চলিলা আপনি॥'

প্রথমে ঝাঁটা দিয়ে ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলা হল। যেখানে প্রভু, সেখানেই কাজের পরিপাটি। ধুলো দূর না করে জল ঢাললে পরিচ্ছন্নতা আসে না। জল শুকিয়ে গেলে অপরিচ্ছন্নতা ফুটে ওঠে। তাই আগে সমার্জ্জন, পরে প্রক্ষালন।

গান, কাজে উৎসাহ দেয়। এঁদের মুখে তাই গান। কার গান? যাঁর মন্দির, তাঁর গান। গুণগান। এই সমার্জন ও প্রক্ষালন সময় ও শ্রমসাপেক্ষ; কিন্তু সবাই নামের আনন্দ সাগরে ভাসছে। কাজ অনেক। মন্দিরের অভ্যন্তর, বহির্ভাগ, ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, পাকশালা ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ। কাঁটা গুল্মের পাহাড় জমেছে অঙ্গনে। গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছেই নৃসিংহ দেবের মন্দির। সেই মন্দিরের ময়লাও দূর করা হল।

প্রভু যেমন চতুর চূড়ামণি, তেমনি কৌতুকী, কৌতুক করছেন ভক্তদের সঙ্গে। যেমন,

'কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠাপানা লব।'

অর্থাৎ যে অল্প কাজ করবে, তাকে পিঠাপানা জরিমানা দিতে হবে। রসিক নাগর তো— রঙ্গরসে কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন। আবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে নৃত্য কীর্তনও চলছে:

'চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ সম॥

স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার॥
....
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥"

আচার্য অদ্বৈতের এক পুত্রও আছেন এঁদের মধ্যে। নাম শ্রীগোপাল। তাকেও প্রভু নৃত্য করতে বললেন। প্রেমাবেশে অচেতন হল শ্রীগোপাল। আস্তে ব্যস্তে আচার্য তাকে কোলে নিলেন। কিন্তু কই, গোপালের নাকে তো শ্বাস নেই। হাহাকার করে উঠলেন আচার্য। তবে কি গোপালকে অপদেবতা ভর করেছে? নৃসিংহ দেবের মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলে অপদেবতা দূর হয়। তাই করলেন আচার্য। না, গোপালের তো— চেতনা ফিরে এলনা। আচার্য রোদন করতে লাগলেন। অশ্রুধারা বইতে লাগল ভক্তদের চোখেও। প্রভু তখন গোপালের বক্ষ স্পর্শ করলেন। গোপাল চৈতন্য ফিরে পেল। ভক্তেরা হরি হরি বলে ধ্বনি দিলেন।

সমার্জন ও প্রক্ষালন সমাপ্ত। এখন নিজেদের পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। প্রভু ভক্তদের নিয়ে সরোবরে গেলেন। অবগাহনান্তে তীরে উঠে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করলেন। নৃসিংহদেবকে প্রণতি জানিয়ে উপবনে গিয়ে বসলেন।

এখন আহারের সময়। আহার্যও প্রস্তুত। বাণীনাথ এলেন প্রসাদ নিয়ে। সবভক্ত বসে গেলেন। সাতজন ছাড়া। এই সাত জনের ওপর পরিবেশনের ভার। স্বরূপ, জগদানন্দ, দামোদর,

কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ ও শঙ্কর— এই সাতজন। প্রভু পংক্তিতে বসেই হরিদাস বলে হাঁক দিলেন। হরিদাস মিনতির সুরে বললেন, 'প্রভু, আমি অতি ছার। তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর। পরে বহির্দ্বারে গোবিন্দ আমাকে প্রসাদ দেবে।'

পংক্তি ভোজন চলছে। পিঠাপানা ইত্যাদি কত রকমের যে পদ! প্রতি পদেই অমৃতের আস্বাদ। হবেই তো। সবই যে জগন্নাথের প্রসাদ। পংক্তি ভোজন দৃশ্য দেখে প্রভুর মনে পুলিন ভোজনলীলার উদ্দীপন হল। প্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন রাধাভাবে।

ব্রজলীলায় লীলাপুরুষোত্তম ব্রজরাখালদের নিয়ে যমুনা পুলিনে ভোজন করলেন। রাখালরাই নিজ নিজ আহার্য নিজ নিজ গৃহ থেকে নিয়ে এলেন। তাঁরা মণ্ডলাকারে বসলেন, আর মধ্যস্থলে তাঁদের মধ্যমণি। তাঁরা পরমানন্দে নিজেরা ভোজন করলেন এবং করালেন তাঁদের পরাণ সখা মধ্যমণি নীলমণিকে। আহা! কি নয়ন নন্দন দৃশ্য। এ দৃশ্য রাইধনীর দেখার কথা নয়— শোনার কথা। শুনেই দেখে নিয়েছেন। 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই। /নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।'— রাইকিশোরী সদাই এইরকমই ভাবেন। ভাবেন বলেই পুলিন ভোজন লীলা আস্বাদন করলেন। প্রভু এখন রাধাভাবে ভাবিত। তাই এই উদ্যানে পংক্তি ভোজনে সেই আস্বাদনের উদ্দীপন হল প্রভুর মনে।

যেখানে অদ্বৈত অবধূত, সেইখানেই প্রণয় কলহ। খুনসুটি। ব্যাজস্তুতি মালায় জমে উঠল। ব্যাজস্তুতিতে দুটি অর্থ থাকে। একটি ওপরকার, অপরটি ভিতরকার। নিন্দার আবরণে স্তুতির

আভরণ। যেমন,

'অদ্বৈত কহে— অবধূত সঙ্গে এক পঙক্তি।
ভোজন করি, না জানিয়ে হবে কোনগতি॥'

বড়ই মধুর পরিহাস। কিন্তু আপাতত নিন্দা বলেই মনে হয়। কি রকম নিন্দা? অদ্বৈত নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিতাই তো অবধত। বর্ণাশ্রম ধর্ম মানেন না। চার বর্ণের কোন চিহ্নই নেই তাঁর মধ্যে। আবার চার আশ্রমের কোন্ আশ্রমে তিনি আছেন, তাতো আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। উনি নিজেও তো তা জানেন না। এক স্বেচ্ছাচারী অবধূত। লোকাচার নেই, বেদাচার নেই, নেই কোন সামাজিক আচার। এ হেন আচারভ্রষ্টের সঙ্গে— আহার করছি। হায় রে, আমার অদৃষ্টে যে কি আছে! ইহকাল তো গেলই। এই সমাজচ্যুত হলাম বলে। আর পরকালে নির্ঘাত নরক যন্ত্রণা।

এই দূষণের আবরণটি সরিয়ে নিলেই প্রভু নিত্যানন্দ ভূষণে ঝলমল করেন। অর্থাৎ আচার্য বলছেন, 'যারা মায়াবদ্ধ প্রাকৃত জীব, তারাই বর্ণ ও আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করে। যিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁর পক্ষে এই বাহ্যাচার নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বর— বেদাচার, লোকাচারের অতীত তাঁর জীবন। সেহেন ঈশ্বরের সঙ্গে ভোজন করে— আমার কি যে পরমাগতি লাভ হবে, তা আমি জানিনা।

জবাব দিতে হয়। উপযুক্ত জবাব না দিলে— খুনসুটি জমে না। নিত্যানন্দ দিলেন তাই ঃ

'নিত্যানন্দ কহে— তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বাধে শুদ্ধভক্তি কার্য্য॥'

এর নিন্দার্থ ধরলে নিত্যানন্দ অদ্বৈতকে বলছেন, 'তোমার অদ্বৈতবাদমূলক সিদ্ধান্তের অনুসরণ যাঁরা করেন, তাঁরা এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই মানেন না। তাঁদের কাছে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এমনকি শ্রীবিগ্রহকেও তাঁরা মায়িক বলে গণ্য করেন।'

আবার এর প্রসংশার্থ হচ্ছে, 'হে অদ্বৈত, শ্রীহরির সঙ্গে তোমার দ্বৈত বা ভেদ নেই। তাই তুমি অদ্বৈত। আর ভক্তির শিক্ষাগুরু তুমি, তাই আচার্য। দুইয়ে মিলে 'অদ্বৈত আচার্য।' অদ্বৈতবাদ মূলক সিদ্ধান্তে সেব্য সেবকত্ব নষ্ট হয় বলে তা শুদ্ধ ভক্তির বিঘ্ন ঘটায়, কিন্তু তুমি যে আচার্য, আচার্যের ভূমিকায় তুমি সিদ্ধান্ত দিচ্ছ, তা শুদ্ধভক্তির অনুকূল, আর তাই জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক।'

এমন করে জমে উঠল প্রণয় কলহ। বড়ই মধুর। ভক্তেরা আস্বাদন করলেন পরম আহ্লাদে।

আহারপর্ব সমাপ্ত হল। সবাই হরিধ্বনি দিয়ে উঠে পড়লেন; কিন্তু প্রভুর আরো কিছু কাজ বাকী আছে। ভক্তের জন্য তাঁর প্রাণ সদাই আকুল। সেই আকুলতায় প্রভু সব ভক্তের হাতে দিলেন মালা চন্দন। ভক্তেরা তখন যেন বলছেন:

'আলোয়— আলোকময়— ক'রে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার

মিলালো মিলালো।

সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যেদিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবই ভালো।'

স্নানযাত্রার পর পক্ষকাল জগন্নাথদেবের দর্শন মেলেনা। তখন চলে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ। আবার রথযাত্রার আগের দিন হয় জগন্নাথ দেবের চক্ষুদান। ভক্তেরা বলেন নেত্রোৎসব! শ্রীজগন্নাথের অদর্শনে ভক্তবর্গ উৎকণ্ঠিত হন। আবার এই দিনটিতে উৎকণ্ঠা চলে যায়। তাঁরা উৎফুল্ল হন দর্শনানন্দ লাভ করে।

প্রভুও এই নেত্রোৎসবের দিনটির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। উৎফুল্ল হলেন দিনের পর দিন ফুরিয়ে যখন এই দিনটি এল। প্রভু তাই ঝটিতি ভক্তদের নিয়ে মন্দিরের দিকে ছুটলেন।

প্রভুর আনন্দ আর ধরে না। যতই শ্রীবিগ্রহ দেখছেন, ততই তাঁর আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। তৃপ্তি হচ্ছে না। মন-প্রাণ আকুল হচ্ছে। এমনই রূপ। কেমন সে রূপ?— না,

'প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন যুগল।
নীলমণি দর্পণ কান্তি গণ্ড ঝলমল।
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত তরঙ্গ॥
শ্রীমুখ সৌন্দর্য মধু— বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্ত নেত্রভৃঙ্গ— করে পানে॥'

আজ সেই 'রূপ লাগি'ই আঁখি ঝুরছে প্রভুর। ক্ষুধা-তৃষ্ণার হয়েছে বিস্মরণ। মধ্যাহ্ন কৃত্যের যে সময় পার হয়ে যায়। তাই ভক্তেরা এসে প্রভুকে নিয়ে গেলেন। প্রভু এখন অপেক্ষায় রইলেন রথযাত্রার। স্বল্প সময়ের অপেক্ষা। এই শুধু রাতটুকু। প্রভাতেই প্রস্তুতি পর্ব রথযাত্রার।
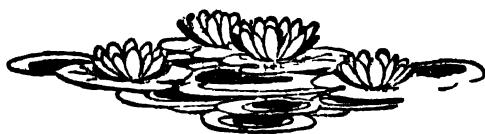
পঞ্চদশ অধ্যায়

— রথযাত্রা —

ভোর হল। দোর খুলল। শাখীর পাখি ডাকল। প্রভুর উৎকণ্ঠা— কতক্ষণে পাণ্ডুবিজয় দর্শন করবেন। সুনিদ্রা হল না। উৎকণ্ঠায় উত্থান করলেন। স্নানকৃত্য সারলেন। প্রভুর পরিকরেরাও প্রভুকেই অনুসরণ করলেন।

পাণ্ডুবিজয় আরম্ভ হল। ছোট্ট শিশু। হাঁটতে পারেনা। হামা দিয়ে চলে। তাঁকে হাঁটা শেখাতে হয় হাত ধরে, উৎকলে এই হাঁটাকে পহাস্তি বলে। পহাস্তি থেকে পাণ্ডু। বিজয় হচ্ছে গমন।

জগন্নাথদেব রথে উঠবেন। তাঁকে কি পাঁজা কোলে করে তোলা হবে? না, তা হবে কেন? তিনি হেঁটেই যাবেন।

মন্দির থেকে রথের কিছুটা দূরত্ব আছে। এই দূরত্বটা ঢেকে ফেলা হল বালিশ পেতে। পাণ্ডারা সিংহাসন থেকে বিগ্রহ নামিয়ে আনলেন। বালিশের ওপর দাঁড় করালেন। তারপর ধরাধরি করে বালিশ থেকে বালিশান্তরে নিয়ে চললেন। জগন্নাথদেব যেন হেঁটেই গেলেন। কত রকমের বাদ্য বাজল! কত মধুর সে ধ্বনি!!

আর সেই ধ্বনির মধ্যে 'মণিমা' বলে প্রভুর উচ্চ ধ্বনি। মণিমা হলেন সর্বেশ্বর। জগন্নাথদেব।

প্রতাপরুদ্র প্রভুর মন বুঝেছেন। তাঁকে 'তৃণাদপি সুনীচেন' হতে হবে। না, আর দ্বিধা নয়। হাতে তুলে নিলেন সোনার ঝাঁটা। জগন্নাথদেবের পথ পরিষ্কার করলেন। সুরভিত করলেন চন্দন বারিতে।

যাঁর ওপর সারা রাজ্যের ভার, তিনি হলেন কিনা ঝাড়ুদার। হবেনই তো। ভগবানের সেবা যে এইভাবেই করতে হয়। তবেই না ভগবান প্রীত হন। প্রীত হলে কৃপা লাভ হয়। প্রভুও প্রীত এ দৃশ্য দেখে। রাজার এই আচরণই চেয়েছিলেন। চাইছেন আরও। তাই ধরা দিয়েও দিচ্ছেন না।

প্রভু তাকালেন রথপানে। নয়ন নন্দন সাজ-সজ্জা। 'নব হেমময় রথ সুমেরু আকার।' রথময় হিরণোজ্জ্বল দ্যুতি। ঝলমল করছে। দর্পণের ঝলকানি। শতাধিক শ্বেত চামর নীলাদ্রিনাথের ব্যজনের জন্য। আর আছে প্রভু জগন্নাথের নিজ কেতন। সে কি একটা? যদি বল একশ, তাহলেও কম বলা হল।

নীলাদ্রিপতির রাজবেশ। বর্ণময় সেই বেশ। হবেই তো, তিনি যে রাজা। দ্বারকার রাজা। তাই,

> 'ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
> নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথবিভূষিত॥'

তিনটি বিগ্রহ: জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। তিনটি রথ। যাঁর যাঁর রথ তাঁর তাঁর। সর্বপ্রথম রথারোহন করলেন জগন্নাথদেব।

তারপর করলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নী। রথযাত্রা শুরু হল।

প্রভুর আনন্দ আর ধরেনা। ধরবে না তো। শ্রীক্ষেত্রে রথ যাত্রা দর্শন যে প্রভুর এই প্রথম। তাই তাঁর মন এত উদ্বেল। প্রভুর কাজ তো একটাই; সংকীর্তন। প্রভু যেখানে, সংকীর্তনও সেখানে। তিনি যে সংকীর্তন পিতা।

আবার প্রভু যেখানে, পরিপাটিও সেখানে। রথ চলছে। অমনি কি প্রভু কীর্তন আরম্ভ করলেন। না, তা করবেন কেন? সব কাজেরই না একটা সাজগোছ আছে। নিজগণকে নিকটে ডাকলেন প্রভু। মালা চন্দন পরালেন নিজ হাতে। পার্ষদদের শক্তি সঞ্চার করলেন। কীর্তনীয়া সাকুল্যে চল্লিশ জন। চারটি দলে ভাগ করলেন। প্রতিদলে দুজন করে মৃদঙ্গ বাদক। আবার প্রতি দলের মূল গায়েনও প্রভুই ঠিক করলেন। প্রথম দলের অধিপতি হলেন স্বরূপ দামোদর। হবেনই। স্বরূপ যে সঙ্গীতে গন্ধর্ব। দোহার কজন?— না, পাঁচজন: দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত আর গোবিন্দানন্দ। গাইয়ে গেল, গেল বাজিয়েও। নৃত্য করবেন কে? আচার্য অদ্বৈত মনোনীত হলেন নৃত্যের ভূমিকায়।

শ্রীবাস শ্রীবৃদ্ধি করলেন দ্বিতীয় দলের, দল নায়ক হয়ে। এই মূল গায়েনের সঙ্গে গলা যোগ করলেন গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান, শুভানন্দ ও শ্রীরামপণ্ডিত। উদ্দণ্ড নৃত্যের ভূমিকা নিলেন নিত্যানন্দ।

এখন তৃতীয় দল। এই দলের মূল গায়েনের পদ দিলেন প্রভু মুকুন্দকে। আর দোহারের ভূমিকা নিলেন বাসুদেব, গোপী নাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভ সেন। ঠাকুর হরিদাস দলের শোভা

বর্ধন করলেন নর্তনে।

ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের গোবিন্দ ঘোষকে প্রভু দলপতির শিরোপা দিলেন। আর সঙ্গে দিলেন হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব, আর বাসুদেবকে। বক্রেশ্বর এলেন দলনর্তক হয়ে।

শুধু কি এই চার দল?— না। আরও আছে। আরো আছে তিনদল। কুলীন গ্রামের এক দল, শান্তিপুরের এক সম্প্রদায়, আর শ্রীখণ্ডের এক সমাজ। এঁরা স্বনির্বাচিত। প্রভু নির্বাচিত নন। নর্তন-কীর্তন শুরু হল। চার দল রথাগ্রে আর দু'দল রথ-পার্শ্বে। আর এক দল রথ পশ্চাতে। এই সাত দল।

সংকীর্তনের সুমধুর ধ্বনি আকাশের নীলিমা স্পর্শ করল। অন্য বাদ্যের আওয়াজ আর শোনা গেলনা। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করল শুধু একটি ধ্বনি— সংকীর্তন ধ্বনি।

অভিনব এই সংকীর্তন। জগন্নাথদেব তাই হৃষ্ট। এত হৃষ্ট যে রথ অচল করে কীর্তনানন্দ আস্বাদন করছেন।

কীর্তনানন্দের এ দৃশ্য অভূতপূর্ব রাজার কাছে। তাইতো, কতকাল থেকেই না রথযাত্রা চলে আসছে — কিন্তু এমন নর্তন-কীর্তন তো তিনি এর আগে দেখেন নি। আহা! কি মধুর কি মধুর। হৃদয় জুড়োয়। আর নয়নে কি হয়? নয়ন পথে নেমে আসে আষাঢ়ের আসার। প্রভুলীলা বোধগম্য নয়। তাঁর যে অচিন্ত্য শক্তি। একই সময়ে সব দলেই তিনি থাকছেন সর্বাধ্যক্ষ হয়ে। তাই 'সভে কহে— প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।'

না, রাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। অঙ্গ—সর্বাঙ্গ-বিবশ

হল। রাজা প্রভুর মহিমার কথা রাজপুরোহিত কাশী মিশ্রকে বললেন। মিশ্র বললেন, 'তুমি তো পরম সুভগ। সুকৃতি বলেই মানুষ এমন মধুর দৃশ্য দর্শন করেন —এমন কীর্তনানন্দ আস্বাদন করেন। প্রভু তো প্রসন্ন তোমার ওপর— তুমি যে নিজ হাতে নিয়েছ সমার্জনী।'

সংকীর্তন জমে উঠেছে। প্রভু গাইছেন— আর প্রভুর সঙ্গে গাইছেন দশ দোহার। গাইতে গাইতে প্রভু জগন্নাথ দেবের স্তুতি করছেন এইভাবে:

'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥'

—যিনি বেদজ্ঞদের পূজনীয়, যিনি গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি জগতের হিতকারী এবং যিনি গোপালক, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার, নমস্কার।

প্রভুর কম্বু কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে:

'জয়তি জয়তি দেবো দেবকী নন্দনোহসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥'

—এই দেবকী নন্দন দেব জয়যুক্ত হোন। বৃষ্ণিবংশের দিশারী দীপ শিখা কৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন। ভূ-ভার নাশকারী এই মুকুন্দ জয়যুক্ত হোন।

আবার এই ভাগবত পুরুষ ভাগবত থেকে মধুর কণ্ঠে গাইছেন:

জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্ম বাদো
যতুবর পরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্ন ধর্মম।
স্থিরচর বৃজিনঘ্ন সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন কামদেবম্॥'

— যিনি জীবের মধ্যে আছেন, দেবকী যাঁর গর্ভধারিনী বলে প্রবাদ আছে, যাদব শ্রেষ্ঠগণ যাঁর পার্ষদ, যিনি নিজবাহুবলে অধর্ম দূর করেন এবং স্থাবর জঙ্গমাদির দুঃখ হরণ করেন, সেই কৃষ্ণ মধুর হাস্য সমন্বিত সুশোভন মুখকমলদ্বারা ব্রজাঙ্গনা এবং দ্বারকা মথুরার সুন্দরীদের প্রেম উদ্দীপিত করে সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ দেবকীসুত— একথা প্রবাদ বাক্য কেন? প্রবাদ বৈ কি। তিনি যে 'অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণম।' যিনি অনাদি, তাঁর আবার জন্ম কি? তবুও তিনি দেবকী নন্দন। লীলায় তিনি দেবকী পুত্র। পুত্র কেন? বাৎসল্য রসের লীলা হবে তো, তাই। নইলে তত্ত্বে তো তিনি জন্মরহিত— অজ। অজের আবার অম্বা কি?

এরপর প্রভু আরেকটি শ্লোক উচ্চারণ করলেন:

'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো নঃ শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো ব নহো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ।'

— আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থী নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু আমি

প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত পরমানন্দ পূর্ণঅমৃত বারিধি— গোপীজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পদাম্বুজের দাস, দাসানুদাস মাত্র।

সাম্যময় গৌরসুন্দর ছাড়া সাম্যের এই সুখাবহ সামগান আর কে শোনাবে? অবশ্য প্রভু এই গান এই প্রথম গাইলেন না। গেয়েছেন অনেককাল আগেই। সেই নদীয়া লীলায়। সেই জন-সমাজে কেউ ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়, নয় শূদ্র। সবই নয়। তবে হয় কি? হয় একটাই; সমান সবাই। সবাই মিলে এক। দুই নয়। এক চন্দ্রাতপ তলে এক। হরিনামের শীতল ছায়ায় এক। তাদের শুধু এক— একমাত্র পরিচয় তারা বৈষ্ণব। প্রভু এইভাবে জয় করেছেন বঙ্গ, তারপর দক্ষিণ দেশ এবং এখন উৎকল। রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে চলেছেন প্রভু। রাজ্য জয়? হ্যাঁ, রাজ্য জয়। রাজ্যের মানুষ জয়। রাজ্যের মানুষের হৃদয় জয়।

কিন্তু প্রভু যে অকিঞ্চন। তাঁর যে কাঞ্চন সিংহাসন নেই। নাই বা থাকল। তাঁর আছে আসন। মানুষের স্বর্ণহৃদয়ে স্বর্ণ-সিংহাসন। এ স্বর্ণ সিংহাসন সুরলোকের স্বর্ণ সিংহাসনকেও করে নিষ্প্রভ।

'চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।' —শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী। বর্ণ বিভাগ ছিল গুণ কর্ম অনুযায়ী। তাতে জন সমাজ কাজে দক্ষতা অর্জন করত। এটাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিলেই কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?— না, আদৌ না। তাকে গুণ অর্জন করতে হবে কর্মের দ্বারা। তাহলে চণ্ডালও কি ব্রাহ্মণ হতে পারে? —হ্যাঁ পারে। কোন বাধা নেই। শুধু

তাকে গুণ অর্জন করতে হবে। কিন্তু কালের গতি বড়ই কুটিল। যুগে যুগে বাঁক নেয়। নিতে নিতে কর্মগুণ বিলীন হল মহাগর্ভে। কাল সাগরে ভেসে উঠল একমাত্র কুল। বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখা দিল বিকৃতি। সেই বিকৃতি এমন ভয়াল যে নিম্নবর্ণ অন্ত্যেবাসী হয়ে পড়ল। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি অমানুষিক ঘৃণা। প্রভু ক্লিষ্ট হলেন মনে।

আর চার আশ্রম? এতো ব্যক্তি বিশেষের দেহের সঙ্গে একটা সম্পর্ক মাত্র। জীব স্বরূপের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। তাই না প্রভু— নিজে সন্ন্যাসী হয়ে বললেন, 'নাহং বর্ণী……।' ইত্যাদি।

তাহলে জীবের পরিচয় কি?— না, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীবের পরিচয় তার পিতার দ্বারা— জগৎ পিতার দ্বারা। সেই জগৎ পিতা, জগন্নাথের চরণে সবাই সমান।

তিনিই না সর্বজীবের স্রষ্টা। তাঁর চরণের দাস হলে, দাসানুদাস হলে প্রকৃত জগতের আর পরিচয় লাগে না। জগন্নাথের সৃষ্টি যে সাম্যময়, তাই লাগেনা। কিন্তু মানুষ স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাকে করে কলুষময়। আর সেই কলুষ সৃষ্টি করে বিবাদ-বিভেদ। প্রভু তাই উচ্চারণ করলেন এই শ্লোকটি। নিজে ভগবান হয়ে নিবেদন করলেন ভগবানের চরণে ভক্তভাবে। কেন? —না, জনসমাজকে বিবাদ বিচ্ছিন্নতার কলুষ থেকে মুক্ত করতে। না, শুধু মুখে না— নিজ আচরণেও শিক্ষা দিলেন। শেখালেন অশনে, বসনে, চলনে, বলনে।

নর্তনে-কীর্তনে প্রভু প্রেম বিহ্বল। রাধাভাবে আবিষ্ট। মহাভাবে দেখা দিয়েছে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার। নিজ দেহটি আর নিজ বশে নেই। তাই বারংবার ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ছেন: 'সুবর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়।' আর অমনি নিত্যানন্দ প্রভুপানে ধায়। শেষে অবধূত আর অদ্বৈত যুক্তি করলেন: প্রভুকে এই লোকারণ্য থেকে একটু দূরে রাখা দরকার। রথের ওপর রয়েছেন জগন্নাথদেব, অথচ হাজারো ভক্ত উৎকণ্ঠিত— প্রভু দর্শনের জন্য। উৎকণ্ঠিত হলে কি হবে? আগে তো দেখতে হবে প্রভুর দেহের স্বস্তি। প্রভুর শরীর যে আর নিজ বশে নেই।

তাই তিনটি মণ্ডল সৃষ্টি করলেন তাঁরা প্রভুকে ঘিরে। প্রথম মণ্ডলে রইলেন অবধূত। দ্বিতীয় মণ্ডলে দাঁড়ালেন কাশীশ্বর— গোবিন্দাদি। হাতে হাতে হাত ধরে নিরাপত্তাবৃত্ত তৈরী করলেন। আর বাইরে তৃতীয় বৃত্তে দাঁড়ালেন রাজা তাঁর পাত্র মিত্র নিয়ে। তা না হয় হল। লোক সংঘট্ট থেকে প্রভুর দেহ রক্ষা করা গেল; কিন্তু এদিকে যে প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটে গেল। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট। কে কোথায় দাঁড়িয়ে দেখছে, নাচছে, গাইছে— এ সবের হুঁশ নেই। রাজার আগে দাঁড়িয়ে প্রভুর নৃত্য দেখছিলেন পণ্ডিত। এদিকে রাজাও প্রভুর নৃত্য দেখতে ব্যাকুল! পার্ষদ হরি চন্দনের কাঁধে তাঁর হাত। রাজা ব্যাকুল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি পথে বাধা শ্রীবাস। হরিচন্দন রাজার লোক। রাজা এবং রাজ পার্ষদ ছাড়া ভূমণ্ডলে আর কারোকে চেনেনা। শ্রীবাস তো অচিন পুর-বাসী। সামান্য—সাধারণ বসন পরা কোথাকার এক বৈষ্ণব। দাও

ধাক্কা মেরে হটিয়ে। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। ঠেলা খেয়ে ভাবের অভাব ঘটল শ্রীবাসের। বাহ্যে ফিরে রোষাবিষ্ট হলেন এবং কষে চপেটাঘাত করলেন, হরিচন্দনের গালে। হরিচন্দন রাজপুরুষ — তার গালে কিনা চপেটাঘাত, তাও এক ভিন দেশী বৈষ্ণবের হাতে! কোন কষ্ট কল্পনায় কোনদিনই সে ভাবেনি। তাই রোষারুণ মূর্তিতে এগিয়ে গেলেন পণ্ডিতকে উচিত শিক্ষা দিতে। আস্তে ব্যস্তে রাজা এগিয়ে এসে হরিচন্দনের হাত ধরে ফেললেন, বললেন, 'কর কি, হরিচন্দন। ইনি পরম বৈষ্ণব। প্রভুর প্রিয় পার্ষদ। তোমার তো পরম সৌভাগ্য যে তুমি এহেন বৈষ্ণবের স্পর্শ পেয়েছ। আহারে! যদি আমি পেতাম এমন মধুর স্পর্শ।'

রথ চলছে। আবার থামছে। থামছে কেন? জগন্নাথ স্বামী প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখছেন। দেখছেন তাঁর অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। দেখছেন আর দেখছেন। পলক পড়ছে না চোখে। দেখছেন সুভদ্রা বলরামও। দেখে হৃষ্ট হচ্ছেন। তাই বদন ভরা এমন মধুর হাসি।

প্রভুর দেখা দিয়েছ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার। বিকৃত হয়ে যাচ্ছে কথা। জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে ভাবাবেগে। জগন্নাথ দেবের নাম আর নিতে পারছেন না অবিকৃতভাবে। কত চেষ্টাই না করছেন, কিন্তু পারছেন না, তবুও ছাড়ছেন না। নাম তাই 'জজ গগ জজ গগ' হয়ে যাচ্ছে প্রভুর গদগদ কণ্ঠে। এ তো গেল কণ্ঠ। আর নয়ন? নয়নে শ্রাবণের ধারা। সেই নয়ন নির্ঝর ধারায়

সিক্ত হচ্ছে প্রভুর মুখমণ্ডল। আর দেহ ? গৌরের দেহকান্তি তো গৌর। সেই গৌর হয়ে যাচ্ছে কখন অরুণ, আবার কখনও বা শুভ্র। মল্লিকা কুসুম কলির মত শুভ্র। আর চলন? তাও বিচিত্র। এই চলছেন। বিচিত্র নৃত্য করছেন। আবার স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছেন। যিনি উৎক্ষিপ্ত দাণ্ডব মত নর্তন করছিলেন, তিনিই স্থির দণ্ডের মত নিশ্চল হয়ে যাচ্ছেন। আবার কখনও বা ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছেন। শ্বাস পড়ছেনা। আর তখন কি হচ্ছে? নাক আর চোখ থেকে ছুটছে জলের ধারা। মুখ হচ্ছে ফেনিল। এ সব শুধুই জলধারা আর ফেন রাশি? —না, এ সব হচ্ছে অমৃতধারা। চন্দ্র থেকে ক্ষরিত হয় অমৃত। প্রভুর বদনও যে চন্দ্র। তাই না প্রভু গৌরচন্দ্র।

প্রভুর এই বিচিত্র ভাবের খেলা দেখে পার্ষদরা যেন মনে মনে বলছেন, 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—

সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় আস।

আরও যেন বলছেন,

'তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল করে কে তোমারে কাঁদায়
যারে ভালোবাস।'

এক সময় প্রভু বাহ্যে ফিরে এলেন। এসেই স্বরূপকে গান ধরতে বললেন। কোন গান? স্বরূপ জানেন সে গান। জানবেন বৈকি। প্রভুর দ্বিতীয় রূপ, সেই তো স্বরূপ। তাই স্বরূপ ধরলেন,

'সেই তো পরাণ নাথ পাইলু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ।'

উৎকণ্ঠিত রাধারাণী। কই তিনি তো আর এলেন না। শীঘ্র আসবেন বলে সেই যে চলে গেলেন, আর তো এলেন না। গেলেন তো গেলেনই। হায়রে, রসময় নাগর রসভূমি ভুলে গেলেন! আর রাই কিশোরীর কত কাল, কত যুগ, যুগের পর যুগ কেটে গেল দুঃসহ দুঃখে— 'দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।' দয়িত বিহনে উষর হৃদয়ভূমি কত যে তাপিত হয়েছে। তবুও তো প্রাণটি যায়নি। প্রাণা যাবে না তো। দয়িতের সঙ্গে হবে যে মিলন—সুখ মিলন। সেই আশায় বুক বেঁধে ভানুনন্দিনী কাটালেন যুগের পর যুগ। অবশেষে কুরুক্ষেত্রে মিলন: 'সেই তো পরাণনাথ পাইলু।'

এই মিলনের, মধুর মিলনের আনন্দ, পরমানন্দে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নর্তন কীর্তন করছেন। পরমানন্দ তো হবেই। রাইধনীর হৃদয় জুড়িয়েছে যে। আর হৃদয় জুড়িয়েছে রাধাভাবদ্যুতি সুবলিততনু গোরারায়ের।

খেলা চলছে দুজনায়। একদিকে শ্যামরায়, অপরদিকে গোরা রায়। গৌরবর্ণ গৌরসুন্দর যদি রথাগ্রে না থাকেন, তাহলে শ্যামবর্ণ জগন্নাথ সুন্দর থেমে যান। আবার যখন গোরাচাঁদ সামনে আসেন, শ্যামচাঁদ জগন্নাথ চলতে থাকেন। ভারি মধুর খেলা তো। ভাবতেই কত ভাল লাগে! আর যাঁরা দেখছেন, তাঁরা কতই না সুভগ!

আচম্বিতে প্রভুর ভাবান্তর। কি রকম সে ভাবান্তর?— না,

'যঃ কৌমার হরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাস্তে
চোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বনীলা।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥'

— কোন নায়িকা তাঁর সখিকে বলছেন, 'যিনি কৌমারহর, তিনিই আমার এখন বর। তাঁর সঙ্গে প্রথম মিলন হয়েছিল চৈত্র মাসের রাত্রে। এখন সেই চৈত্র মাসের রাত্রিই। সেই মালতী ফুল আজও ফুটছে। সেই সুরভিও পাচ্ছে। সেই মন্দ-মধুর বায়ুও বইছে। সেই তিনি, সেই আমি। তবুও সেই রেবা তটিনীতটে বেতসী তরুতলে সুরত কলাময় ক্রীড়ার জন্য আমার মন উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।

কুরুক্ষেত্রে হাজারো শিবির পড়েছে। সারি সারি। রাইধনী আলাভোলা গোয়ালিনী। তাই শ্রীকৃষ্ণের শিবির খুঁজে পাচ্ছেন না। অবশেষে বহু ক্লেশে পেলেন। মিলন হল। মিলনে দীর্ঘ বিরহতাপ জুড়োল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবান্তর; রাই কিশোরী ভাবছেন, 'না, এ কৃষ্ণ তো তাঁর দয়িত নন। এঁর যে রাজবেশ। তাঁর দয়িত তো নব কিশোর নটবর— গোপবেশ বেণুকর। তাই ভানুবালা বলছেন, 'শ্যাম, ব্রজে চল। এখানে নয়। সঙ্গম সুখের আস্বাদন তো তোমাতে—আমাতে। একান্ত নিভৃতে। সেই নিরালা ধামটি পাবে তুমি ব্রজধামে। এখানে তো রাজ রাজড়ার মহারোল। হাতী ঘোড়ার হট্টগোল। আর আমার মধুর বৃন্দাবন হচ্ছে কুসুমারণ্য। লোকারণ্য নয়। সেখানে ভৃঙ্গ-পিকের কলকাকলী। আর তারই

মাঝে বাজাবে তুমি তোমার মোহন মুরলী। সেই সুধাস্বাদনের এক কণাও তো এখানে নেই। তুমি না বাঞ্ছা কল্পতরু। আমার সেই বাঞ্ছা পূরণ কর। চল, একবার ব্রজে চল।'

গোপী ও গোপীঠাকুরাণীর আর্তি প্রভু ভাগবতের এই শ্লোকে প্রকাশ করলেন :

'আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার কূপ পতিতোত্তর নাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।'

কুরুক্ষেত্র মিলনে সগোপী শ্রীরাধিকা বললেন, 'হে কমলনাভ, পরমজ্ঞানী যোগেশ্বর হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসারকূপে পতিত জনগণের উত্তরণের পক্ষে একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ তোমার চরণকমল—গৃহিনী আমাদের মনেও সদা আবির্ভূত হোক।

সগোপী রাধার এই উক্তির আগে আরেক উক্তি আছে। সে উক্তিটি শ্রীকৃষ্ণের। চতুর চূড়ামণি নটবর কৌতুক চূড়ামণিও। কুরুক্ষেত্রের এক বিজনস্থানে রঙ্গেশ্বর দ্বারকাধীশ্বর সগোপী গোপীঠাকুরাণীকে বললেন, 'এই যে সখীরা, এত দীর্ঘ বিরহের পরও কি আমার কথা তোমাদের মনে জাগে— না কি আমাকে তোমরা শঠ-কপট মনে কর? তবে যা ই মনে কর, একটা কথা শোনো সই, একটা প্রাণের কথা কই। এই যে আমি ব্রজভূমি ছেড়ে এই ভিন ভুঁয়ে আছি— এটা কিন্তু আমার ইচ্ছাকৃত নয়। নিত্যই দেখছ তো, বায়ু কেমন খেলা খেলছে। একবার তৃণদলের সঙ্গে

ধূলিকণা যুক্ত করছে, আবার বিযুক্ত করছে। ভগবানও ঠিক এমনি খেলাই খেলছেন। একবার জীবের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, আবার সরে যাচ্ছেন যোজন দূরে। কাজেই বুঝতেই পারছ, ঈশ্বরই আমাকে তোমাদেব সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। ও, কথাটা মনে ধবল না বুঝি? তাহলে বলতে চাইছ আমিই সেই ঈশ্বর। বেশ তো, মানলাম, তোমাদের কথাই মানলাম। তাহলে তো গোল মিটেই গেল। দেখছনা পঞ্চভূত কেমন পদার্থের ভেতরে বাইরে আছে। ঈশ্বরও ঠিক তেমনি জীবের ভেতর-বাইরে আছেন। এই কথাটা তোমরা জাননা বলেই অকারণ দুঃখ পাচ্ছ আমার বিরহে। আসল কথা কি জান, তোমরা সংসার কূপে পতিত। তোমরা ঘোর সংসারী বলেই এত কষ্ট পাচ্ছ। তাই বলছি কি—বিষয় আশয় চিন্তা কম করে, চিন্তা কর যোগেশ্বরের মত আমার চরণ।'

এত বড় তত্ত্বকথা শুনে অভিমানাহত কণ্ঠে গোপীঠাকুরাণী ও গোপীরা বললেন, 'বঁধু! তোমার প্রতি অঙ্গ এমনই অনবদ্য যে আমাদের প্রতি অঙ্গ তাঁর জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছে। তোমার ঐ রসশূন্য তত্ত্ব কথা আমাদের কানেই ঢুকছে না। হ্যাঁ, তারপর কি বললে যেন? ঐ যোগেশ্বরের মত হৃদয়ে তোমার চরণ চিন্তা করতে বললে তো? হে হৃদয়েশ্বর! হৃদয় তো লোকের একটাই থাকে। সেই একটা যা ছিল, তা তো তোমাকে দিয়েই দিয়েছি। সে তো কবেকার কথা। যোগেশ্বরের মত ধ্যান করব কি গো, আমাদের কি তাঁর মত জ্ঞান আছে? আমরা না আলাভোলা গোয়ালিনী। কৃষ্ণ সেবার কী-ই বা জানি? আমরা শুধু দিতে

জানি। জ্ঞানীর মত চিনি হতে জানি না, চিনি খেতে জানি। আর হৃদয়ের বাইরের দিকটার কথাও বলি। তোমার কি সেই দিনটার কথা মনে পড়ে— যেদিন তোমার ঐ কমলের চেয়েও কোমল চরণ যুগল আমাদের অনম্র স্তন যুগলে ধারণ করে এই আশঙ্কা করেছিলাম, 'আহা, যদি তোমার ঐ চরণযুগল ব্যথাহত হয়! আরেকটা যেন কি কথা বললে? ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে। কি না আমরা সংসার কূপে পড়ে আছি। 'এ কথা কি তোমার মুখে সাজে? এ কথা যে আমাদের কানে বাজে। বাজে কথা তো, তাই বাজে। জন্মাবধিই না আমরা আমাদের দেহ, গেহ, মান, লজ্জা, কুল, পতি, অপত্য— সবই তোমার চরণে অর্পণ করেছি। আমাদের বলে কিছু নেই, সবই না তোমার। তোমার কুশলে কুশল মানি। তোমার সুখেই আমাদের সুখ, আর তোমার দুঃখেই আমাদের দুঃখ। এই যে আমরা এত অঙ্গ সজ্জা করি, তোমার অঙ্গ সঙ্গ লাভ করব বলেই না করি। তোমার নয়নের সুখ দিতে পারব বলেই না করি। আহারে! বৃন্দাবনে কত কেলি বিলাসই করেছি তোমার সঙ্গে। আর এখানে? এখানে রাজ রাজড়ার কূট কচালে তোমার রাজবেশের সামনে আমরা যে প্রাণ খুলে কথাই বলতে পারছি না; কেলি বিলাস তো দূরের কথা। তাই বলছি বঁধু, বৃন্দাবনই তোমার একমাত্র ধাম। চল, ব্রজে চল সখা। আমরা আবার আগের মত তোমাকে নব কিশোর নটবর— গোপবেশ বেণুকরের রূপে পাই, আর নিশি দিশি রহঃকেলি করি।'

রথ চলছে। কীর্তন চলছে। চলছে নর্তনও। আর সর্বোপরি

চলছে প্রভুর শুদ্ধ হেমাচল দেহে বিভিন্ন ভাবের খেলা। এই খেলাতে কি হল? — না,

'দেখিয়া লোকের আশ্চর্য্যয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃতে বৃষ্টো প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥'

আর তাতে কি হল?

'জগন্নাথ সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন॥
প্রভুর নৃত্য দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সভার॥'

এঁরা তো চমৎকৃত হবেনই। স্বয়ং জগন্নাথ বলরামই তো চমৎকৃত, মুগ্ধ, হৃষ্ট। এত হৃষ্ট যে রথের গতি হচ্ছে মন্থর। নৃত্য সুখ আস্বাদন করতে চায় যে তাঁদের অন্তর।

আবার এরই মধ্যে চলছে প্রতাপরুদ্রের পরীক্ষা। অগ্নি পরীক্ষা। হ্যাঁ এটা ঠিক, প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দেবের পথ পরিষ্কার করেছেন। স্বহস্তে সমার্জনী ধরে। কিন্তু সেটা তো সাময়িক ভাবাবেগেও হতে পারে। প্রভু তাই নিশ্চিন্ত হতে চান। প্রভুর এতই কৃপা। আর তাঁর কৃপাধন্য যিনি হয়েছেন, তিনি জানেন:

'শক্তি যাহারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা ঘুচায়ে দাও তার।
না রাখ তাঁর ঘরের আড়াল,
না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তার কর অকিঞ্চন।

নাই থাকে তার মান অপমান,
লজ্জা শরম ভয়;
একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভুবনময়।'

তাইতো প্রভু হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়লেন রাজারই সামনে। রাজস্পর্শ প্রভু পরিহার করে চলেছেন। এ সংবাদ রাজা অনেক কাল আগেই জেনেছেন। জেনেও আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না।

মনে মনে যেন বললেন,

'কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে—
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না,
তারে আগুন দিয়ে দহো।'

বলেই প্রভুকে ধরে তুললেন মাটি থেকে। অমনি প্রভু বাহ্য ফিরে পেলেন এবং দূরে সরে গিয়ে বললেন, 'ছিঃ, ছিঃ, আমার বিষয়ীর স্পর্শ হল।'

রাজার মন আবার দ্বিধা-দীর্ণ হল। তবে কি তাঁর উদ্ধার হবে না? কোন কালেই হবে না?

সার্বভৌম সুচতুর। তিনিও না এক মন্ত্রী। শাস্ত্র মন্ত্রী। রাজার মুখ দেখেই বুঝলেন রাজা আবার সংশয়ে পড়েছেন। ছুটে কাছে এলেন, বললেন, 'মহারাজ, আপনি আর দ্বন্দ্বে-ধন্দে পড়বেন না। প্রভু আপনার প্রতি প্রসন্ন। তাই না পদে পদে পলে

পলে 'আপনাকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। প্রভুর যে আরেকটি কাজও আছে। সেটি হচ্ছে লোকশিক্ষা। লক্ষ্য তো লোক। আপনি উপলক্ষ্য। আপনি ভাববেন না। আপনাকে আমি যথা সময়ে প্রভু মিলনের সময়-সুযোগ বলে দেব।'

রাজা আবার আশায় বুক বাঁধলেন। মনে মনে যেন বললেন,

'যদি তোমায় ভালবাসি
আপনি বেজে উঠবে বাঁশি,
আপনি ফুটে উঠবে কুসুম
কানন ভরে।'

মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলেছে রাজার অন্তরে। লুকোচুরি খেলা। রাজা তাই ভাবছেন। কি ভাবছেন? যেন ভাবছেন,

'আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা—
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা।'

প্রভুর অন্তরে এখন ভাব সমুদ্র। বিবিধ ভাবতরঙ্গ সেখানে। ভাবতরঙ্গের খেলা। এ খেলায় কতই না আনন্দ। সেই আনন্দে আত্মহারা প্রভু। রাধাভাবাবিষ্ট হয়ে কখনো নৃত্য করছেন, আবার কখনো প্রদক্ষিণ করছেন জগন্নাথদেবকে। আবার কখনো বা স্বীয় শিরে রথ ঠেলছেন। মাথা দিয়ে ঠেলছেন, তাই রথ চলছে হড় হড় করে। আর রোল উঠছে হরি হরি। মস্তকে ঠেলছেন কেন? ব্রজেন্দ্র নন্দনকে যে ব্রজে নিয়ে যাচ্ছেন প্রভু। মস্তকে ঠেললে রথগতি দ্রুত হয়।

স্বধামে যতশীঘ্র যাওয়া যাবে, তত শীঘ্রই না রসভূমির রসাস্বাদন করা যাবে। নীলাচল তো দ্বারকা— সুন্দরাচলই বৃন্দাবন।

রথীর'ও যে সেই ইচ্ছা। কতক্ষণে তিনি তাঁর সাধের বৃন্দাবনে পৌঁছুবেন। কতই না তাঁর আহ্লাদ! গোপীঠাকুরাণী রথ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন।

দ্বারকা ধর্ম্মভূমি। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন বাসুদেব কৃষ্ণ এই ধামে। স্বকীয়া ভাবের প্রকাশ। তাই না এই ধাম রসশূন্য। তাহলে রসপূর্ণ কোন ধামটি?

'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥'

সেই পরকীয়ভাবের রসময়ী রস নাগরী কারা? —না, ব্রজ বনিতারা। ব্রজাঙ্গনাদের অঙ্গ সঙ্গ লাভের প্রবল লিপ্সা ব্রজনাথের। রথযাত্রা তো একটা ছল মাত্র। ছল কেন? ছল না করে উপায় কি? রাজ মহিষীরা রয়েছেন যে। তাঁরা ছাড়বেন কেন? আবার স্বকীয়া সঙ্গে নিয়ে তো পরকীয়া রস আস্বাদন করা যায় না। তাতে যে হবে রসাভাস। তাই তো এই ছল। কিন্তু বৃন্দাবন বিহার তো স্বল্প কালের। ছল করে লাভ কি হল? ঐ স্বল্প কালের রসাস্বাদনই যে সারা বছরের সুখস্মৃতি রোমন্থন। বড়ই হৃদয় রসায়ন।

নানাভাবে খেলা খেলে প্রভু চলেছেন রথাগ্রে। আর রথও চলছে। চলতে চলতে এল বলগণ্ডিতে। তারপর এল নারিকেল কুঞ্জে। এরই দক্ষিণে এক নয়ন নন্দন পুষ্পোদ্যান। বৃন্দাবিপিনের

প্রতিরূপ। জগন্নাথের ভোগ লাগায় সবাই এখানে। ছোট বড় বিচার নেই, জাতপাতের ভাবনা নেই, রাজা প্রজার ব্যবধান নেই। নেই কোন স্বদেশী ভিন দেশীর জ্ঞান— সবাই ভোগ লাগায়। সব ভোগ এক হয়ে যায়। সব ভোগই জগন্নাথের। সবাই জগন্নাথের।

এতদূর পথ ধরে নর্তন-কীর্তন। প্রভু বড়ই ক্লান্ত। উপবনে গেলেন। উপবন ফুলময়। সেখানে এক গৃহের দাওয়ায় প্রভু শয়ান হলেন। সব কীর্তনীয়াই শ্রান্ত। বিশ্রাম প্রয়োজন। তাই সবাই এলেন। পুষ্প বিতানের তো অভাব নেই। একেক বিতানে একেক কীর্তনীয়া শয়ান রইলেন।

সেই বিহানবেলা থেকে চলেছে বিরামহীন নর্তন—কীর্তন। সবাই শ্রান্ত। তাই এখন বিরাম।

প্রভুর মন মেজাজের সংবাদ রাখেন সার্বভৌম। রাখবারই কথা। তিনি যে অনেক আগেই প্রভু কৃপা লাভ করেছেন। রাজার অনুরোধ জপমালা করে রেখেছেন। তিনি দেখলেন এই তো সর্বোত্তম সুযোগ। তাই রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এই হচ্ছে আপনার সর্বোত্তম সুযোগ। তবে এই বেশে হবেনা। রাজবেশ ত্যাগ করুন। বৈষ্ণব বেশে— গলায় তুলসী মালা, কপালে তিলক, বাহুমূলে শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন, সর্বোপরি অতি সাধারণ বস্ত্র পরে প্রভুপদে পতিত হোন। আর মুখে রাসপঞ্চাধ্যায় থেকে শ্লোক উচ্চারণ করবেন। আমি নিশ্চিত এবার আপনি প্রভু কৃপা লাভ করবেনই।'

ভট্টাচার্যের কথা পালন করলেন রাজা। প্রথমে প্রভু পার্ষদদের

অনুমতি নিলেন যুক্ত করে। পার্ষদদের অনুমতি নিলেন যে রাজা? ভক্তকৃপা লাভ করলে ভগবৎ কৃপালাভ সুলভ হয়।

প্রভু শয়ান রয়েছেন। নিমীলিত নেত্র। প্রভুপদ স্পর্শ করলেন রাজা। না, প্রভু তো আগের মত বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। সরেও গেলেন না। মনে বল সঞ্চার হল। যত্নের সঙ্গে পাদ সংবাহন করতে লাগলেন। না, এতেও প্রভু কিছু বললেন না। রাজা নিশ্চিন্ত হলেন— প্রভু তাঁকে গ্রহণ করেছেন। তাই দ্বিধামুক্ত হয়ে ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় থেকে শ্লোক আবৃত্তি করলেন। 'জয়তি তেহধিকং' দিয়ে আরম্ভ করলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধ। একত্রিংশ অধ্যায়। উনিশটি শ্লোক। রাজার আবৃত্তি শুনে প্রভুর বীণা ঝংকৃত হল। প্রভু শয়ান অবস্থাতেই বললেন, 'বল, বল, বলে যাও। মধুর, বড়ই মধুর।' শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে রাজা যেই নবম শ্লোক উচ্চারণ করলেন, অমনি প্রভু গাত্রোত্থান করে রাজাকে দিলেন আলিঙ্গন— প্রেমালিঙ্গন। না, শুধু আলিঙ্গনই না, প্রভু প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে বললেন,

'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥'

প্রভু এই নবম শ্লোকটিকে অমূল্য রতন বললেন কেন? মূল্য দিয়ে যা কেনা যায়, তা মূল্যবান। মূল্য দিয়েও যা কেনা যায় না, তা অমূল্য। কি সে অমূল্য শ্লোক?— না,

'তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং কবি ভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদাজনাঃ।'

— গোপীরা বললেন, 'হে কৃষ্ণ, তোমার যে কথামৃত তাপিত জনের জীবনপ্রদ, কবিদেরও প্রশংসিত, যা সর্ব দুঃখ বিনাশক ও শ্রবণমাত্রই মঙ্গলপ্রদ এবং যা সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত ও সর্বব্যাপক, সেই কথামৃত যাঁরা জগতে কীর্তন করেন, তাঁরাই সব কিছু দান করেন।'

প্রাকৃত জীব ত্রিতাপ জ্বালায় ক্লিষ্ট। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ও আধ্যাত্মিক— এই ত্রিতাপ জ্বালা। কৃষ্ণকথা অমৃত। এই ত্রিতাপ দগ্ধ জীবনে সুধা সিঞ্চন করে। জীবনের দুঃখ-তাপ তখন জুড়োয়। তাই না কবিরা তোমার কথার এত গুণকীর্তন করেছেন। কবি কারা? —না, জ্ঞানীরা, জ্ঞানী কারা? —ঈশ্বর জ্ঞানে জ্ঞানী যাঁরা। ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি এই জ্ঞানের অধিকারী। তাই না তাঁরা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। জীবনে চলার পথে কত মলিনতাতেই না চিত্তদর্পণ অস্বচ্ছ হয়। এ অস্বচ্ছতা তো অজ্ঞানতার তমসা। সেই তমসা তোমার কথায় দূর হয়। তোমার কথা শুনলে জীবের কল্যাণ হয়। কি ভাবে হয়? —না, 'কানের ভিতর দিয়া' মরমে প্রবেশ করে। অন্তর কলুষ মুক্ত হলেই জীবের মঙ্গল হয়। তোমার কথায় শ্রী আছে- সুষমা আছে। সে সুষমা দুচোখ দিয়ে দেখে শেষ করা যায় না।

তাই বলতে হয়, 'সবে দুটি আঁখি দিয়াছে বিধাতা/রূপ নিরখিব কি?' তাই হৃদয় মেলে দেখতে হয়। দেখে বলতে হয়, 'আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।' তোমার কথা কোথায় নেই? 'আকাশে, বাতাসে, দেশে দেশেই না তোমার কথা। সেজেন কথা যাঁরা

ত্রিভুবনে কীর্তন করেন, তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। টাকা-পয়সা, ধন দৌলত যাঁরা দান করেন, তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা নন। কেন? তাঁদের দান যে বিনাশশীল। আর তোমার নামের বিনাশ নেই। তোমার নাম যে সুধার আকর—অমৃত সাগর। অমৃত তো অমর্ত্যের ধন— মৃত হয় না কোনদিন। ধনবান দাতা নন— নাম দাতাই— সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

এই যে প্রভু আলিঙ্গন দিলেন, বাহ্য আচরণে কিন্তু প্রকাশ করলেন না যে তিনি রাজাকে আলিঙ্গন দিলেন। অবশ্য অন্তরে তিনি সবই জানেন। অন্তর্যামী যে— জানবেন বৈ কি। তবুও প্রভু শুধোলেন, 'কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? হঠাৎ কোথা থেকে এসে রসরাজের লীলারসামৃত পান করাচ্ছ আমাকে?'

উত্তরে রাজা কহে, 'আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে, এই মোর আশ।।'

রাজার এখন একমাত্র উপলব্ধ সত্য:—

'নামটা যে দিন ঘুচাবে, নাথ, বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে—
আপন গড়া স্বপন হতে তোমার মধ্যে জনম লয়ে।'

উত্তরে হৃষ্ট হলেন প্রভু, কিন্তু পরক্ষণেই দিশা হারালেন রাজা এক বিপুল বিস্ময়ে 'এ কী দেখছি আমি! এই তো সেই ষড়ভুজরূপ যা আমি তিন তিনবার স্বপ্নে দেখেছি। কিন্তু এখন তো আমি স্বপ্ন দেখছি না। এখন তো দ্বিপ্রহর। আমি জেগেই আছি। এই তো সেই ষড়ভুজ মূর্তির ঊর্দ্ধ দুই বাহুতে ধনুর্বাণ, মধ্যের দুই করে বেণুধারণ করে বেণু বাদন করছেন, আর শেষ

ভুজদ্বয়ে নৃত্যভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। ধন্য। আজ আমি ধন্য। রাজপাটে ধন্য নই। ধন্য নই ধন-দৌলতে। ধন্য আমি প্রভুর কৃপায়।'

বিস্ময়াবেশ কেটে গেল রাজাকে প্রভু বললেন, 'আমার এই রূপ গোপ্যবস্তু। সুভদ্র জনই দর্শন পায়। তুমি এই দর্শনের কথা গোপন রাখবে।'

'এরূপর মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।' উদ্যানমধ্যেই প্রভু ও ভক্তেরা মধ্যাহ্ন কৃত্য ও মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন। আহার্য বস্তু কি? —না, প্রসাদ, জগন্নাথদেবের প্রসাদ। প্রচুর প্রসাদ। নিসকড়ি প্রসাদ। তাই ডাল, ভাত, রুটি, তরকারী নেই, আছে ঘৃতপর্ব দ্রব্য, ফলমূল, মিষ্টান্ন আর পানীয়। কত রকমের যে ফলমূল, মিষ্টান্ন আর পানীয়! সত্যি সত্যিই গণনাতীত। ফলই কত রকম। যেমন, আঙ্গুর, আম, কাঁঠাল, নারকেল, নানাবিধ কলা. তাল শাঁস আর নারঙ্গ, ছোলাঙ্গ, টাবা, কমলা ও বীজপুর — এই পাঁচ রকমের লেবু। এতো গেল ফল। এরপর আছে মিষ্টান্ন তাও কত রকমের। যেমন, লাড়ু, অমৃতগুটিকা, ক্ষীরসা, অমৃত মণ্ডা, ছানাবড়া, কর্পূর কুলি, সরামৃত, সরভাজা, সরপুলি, হরিবল্লভ, সেবতী আর পানীয়. তক্র। দুটি বিশেষ পদ আছে। যথা, রসালা ও শিখরিণী। এদুটিও অত্যন্ত উপাদেয় দ্রব্য। ঘন দুধের সঙ্গে চিনি আর কর্পূর মেশালে হয় রসালা, আর ঘন দইয়ের সঙ্গে চিনি কর্পূর মিশিয়ে হয় শিখরিণী।

প্রচুর প্রসাদ। উপবনের আর্ধেকটাই ভরে গেছে প্রসাদে।

তুষ্ট হলেন প্রভু প্রসাদের প্রকার আর আকার দেখে। আহা! জগন্নাথদেব এইভাবেই ভোজন করেন। ভক্তরা মন প্রাণ উজাড় করে এই ভোগ লাগিয়েছে এই বলগণ্ডি স্থানে।

ভক্তেরা প্রভুর নিজগণ। নিজগণকে নিজ হাতে খাওয়াতে হয়। প্রভু পরিবেশন করতে গেলেন কিন্তু ভক্তদের যে ভোজন হয় না। তাঁদের প্রভুর সেবা আগে না হলে তাঁরা কিভাবে আহার করেন? তাই প্রভু ভক্তদের নিয়ে ভোজনে বসলেন।

শুধু কি ভক্তবৃন্দ আর প্রভুই ভোজন করলেন? —না, ভক্ত—অভক্ত, চেনা—অচেনা, গরীব—দুঃখী— কত লোক যে এসেছিল! প্রভু সবাইকে তুষ্ট করলেন প্রসাদ বিলিয়ে দিয়ে। শুধু কি প্রসাদই বিতরণ করলেন? —না, নামও বিতরণ করলেন। প্রভু বললেন, 'জগন্নাথদেবের প্রসাদের শেষ নেই। যতপার ভোজন কর। মুখে শুধু নাম কর। মুখে শুধু হরি বল।' অমনি হরি-বোল ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস, কেঁপে উঠল। আর কেঁপে উঠলেন প্রভু আনন্দে।

আবার রথ টানের সময় হয়ে এল। সুন্দরাচলের পথ বাকী আছে যে। গৌড় জাতীয় লোকেরা এলেন রথ টানতে। এঁরা উড়িষ্যাবাসী। এঁরাই রথ টানেন। টানতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু রথ যে চলে না। অচল জগন্নাথের সচল রথ, অকস্মাৎ অচল হল। শেষে আশাহত হয়ে গৌড়েরা ছেড়ে দিলেন রথের রশি। বিস্মিত হলেন প্রতাপরুদ্র। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে হলেন চিন্তিত।

পাত্র মিত্র নিয়ে প্রয়াসী হলেন। না, তবুও রথ চলে না। রথ অনড়। রাজাদেশে এল মল্লবীরেরা। হরেক রকম কারদানি চলল তাদের। অনেকক্ষণ। না, রথ একটুও নড়লনা। মনুষ্যবলী হেরে গেল। এবার এল জন্তুবলী। এল মত্ত হস্তী। হাতীও হার মানল। হাহাকার পড়ে গেল চরিদিকে। রাজা ভাবছেন, 'তাইতো, এতো এক মহা অপায়।' চিন্তা করছেন, কিন্তু অপায়ের উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রভু পুষ্পোদ্যানে। এই মহা সংকট সংবাদ কানে গেল প্রভুর। শুনেই প্রভু ছুটে এলেন। নিজগণ সঙ্গে নিয়ে এলেন। পার্ষদেরা হাত দিলেন রশিতে, আর প্রভু স্বয়ং রথের পশ্চাৎভাগে মাথা দিয়ে ঠেলতে লাগলেন। মাথারও ছোঁয়া লাগল, আর অমনি 'হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া।'

হ্যাঁ, 'ধাইয়া'ই বটে। ভক্তেরা আর টানার সুযোগ পেলেন না। রথ আপনিই চলতে লাগল। টানের আর অপেক্ষা নেই। থাকবে কেন? রথ তো চলে রথীর ইচ্ছায়। তবে যে থেমে ছিল। ওটা হচ্ছে এক রঙ্গ কৌতুক। রসিক শেখর জগন্নাথ। যে ভানু-বালা নন্দলালাকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর স্বরাজ্যে, সেই ভানুবালাই নেই রথাগ্রে। যাবেন কেন জগন্নাথ?

তিনি তো ইচ্ছাময়। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই রথ চলে। তবে যে গৌরসুন্দর মাথা রথে ঠেকাতেই রথ চলতে আরম্ভ করল? ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছা আর রইল কোথায়? ইচ্ছাটা তাঁর অধীন, কিন্তু তিনি যে ভক্তাধীন। আবার ভানুবালা কি রকম ভক্ত? সে সংবাদ দিচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং। যেমন, 'তার মধ্যে গোপীগণ / সাক্ষাৎ

মোর জীবন / তুমি মোর জীবনের জীবন।' এই যে 'জীবনের জীবন' রাইধনী, সেই রাইধনীর অর্থাৎ রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু প্রভুর প্রেমশক্তির কাছে হার মানল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তি। এ হার আজকের নয়। চিরকালের। চিরকালেরই তো হবে। এ হার যে ব্রজনাথ মণিহার করে নিয়েছেন।

হড়হড় করে রথ চলছে। এখন আর হাহাকার নেই। তবে কি আছে?— না,

'মহানন্দে লোক করে জয় জয় ধ্বনি।
'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি॥

রথ চলছে। চলছে পবনের বেগে। আর তাতে কি হল?

'নিমিষিকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার॥"

চমৎকৃত হয়ে তারা কি করল?

'জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥"

তিন দেব দেবীই নিজ নিজ সিংহাসনে আরোহন করলেন। আজ দ্বিতীয়া। দশমী পর্যন্ত থাকবেন এই গুণ্ডিচা মন্দিরে। এই সুন্দরাচলে। এই বৃন্দাবনে। তারপর প্রত্যাবর্তন। ধর্মভূমি দ্বারকায়। রসভূমি থেকে ধর্মভূমিতে। রসভূমিতে যতক্ষণ, রসাস্বাদনই ততক্ষণ। তাই প্রভু সপার্ষদ করলেন বনলীলা। খেললেন জল খেলা।

রথযাত্রার পর পঞ্চম তিথিতে হোরা পঞ্চমী। লক্ষ্মী বিজয়

উৎসব। কেউ বা বলেন হেরা পঞ্চমী। হোরা আর হেরায় ভাবার্থে ঐক্য। নেই কোন পার্থক্য। হোরা হচ্ছে যাওয়া, আর হেরা হচ্ছে দেখা। না বেরোলে দেখবেন কি করে? কে বেরোচ্ছেন? — না, লক্ষ্মীদেবী। বেরোচ্ছেন কেন? দ্বারকেশ্বরী বেরোচ্ছেন দ্বারকা থাকে কৃষ্ণসন্ধানে। তাইতো, তিনি না দ্বারকানাথের অঙ্ক শায়িনী। সেহেন প্রাণপ্রিয়াকে অঙ্গ সঙ্গ না দিয়ে কাকে সঙ্গ দিতে গেলেন তিনি? তাই রাজধানী থেকে লক্ষ্মীদেবীর রোষভরে নিষ্ক্রমণ।

কৌতুকী পুরুষ গৌরসুন্দরের কৌতূহল হল : দেখাই যাক না রঙ্গটা কি রকম। হ্যাঁ, রঙ্গই বটে। যেমন,

'শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন॥
বান্ধিয়া আনিয়ে পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানা ধনে॥
অচেতন্য রথ তার করেন তাড়নে।
নানা মত গালি দেন ভণ্ডের বচনে॥
লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগলভ্য দেখিয়া।
হাসিতে লাগিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥'

রঙ্গ দেখে প্রভু হাসলেন বটে, তবে এই বহিরঙ্গে তুষ্ট হলেন না। হবেন কি করে? তাঁর মন সদাই রস সন্ধানী। কোন্ রস? কেন, ব্রজরস। ব্রজরসের প্রতি এত আকর্ষণ কেন? এ রস কি সাত রাজার ধন রত্ন দেয়? — না, দেয়না। তবে যা দেয়,

তা পেলে আর কিছু পাওয়ার থাকে না— 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।'

তাই প্রভু বললেন, 'না, এ তো বাহ্য। এর অন্তর লোকের কথাটা যে গোপী প্রেম। আর গোপী প্রেম ধাম হচ্ছে ব্রজধাম। সেই রসের কথা শুনতে চান প্রভু। কে শোনাবেন? কেন রস-তত্ত্বভাণ্ডারী স্বরূপই শোনাবেন। তাই প্রভু শুধোলেন, 'আচ্ছা স্বরূপ জগন্নাথদেব তো নীলাচল থেকে সুন্দরাচলে অর্থাৎ— দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনে আসেন বছরে একবার মাত্র। তাও মাত্র কটা দিনের জন্য। তা, লক্ষ্মী দেবীকে সঙ্গে নেন না কেন? মৃদু হেসে স্বরূপ বললেন, 'প্রভু, বৃন্দাবনে প্রবেশের আধিকার আর কারুরই নেই, নেই লক্ষ্মীদেবীরও। ব্রজভূমি যে শুধু মাত্র ব্রজাঙ্গনাদের ঠাঁই। হ্যাঁ, কৃষ্ণ লক্ষ্মীর বশ, কিন্তু সে তো শুধুমাত্র দেহের। হৃদয়ের নয়। হৃদয় তো কেড়ে নিয়েছন ব্রজবণিতারা।'

আনন্দের অরুণ কিরণে প্রভুর মুখ উজ্জ্বল হল। হবেই তো। আসলে এ সব তো তাঁরই কথা। তিনি যে সর্বদা এবং সর্বথা রসাস্বাদন করতে চান। যেখানে প্রভু, সেইখানে রসাস্বাদন— ব্রজরস আস্বাদন। ভারি মধুর।

স্বরূপ মুখে ব্রজরসামৃত আস্বাদন করছেন প্রভু। আস্বাদনের সুখাবেশে ব্রজদেবীর ভাবাবেশে— আবিষ্ট হলেন প্রভু। প্রভুর যখনই রাধাভাব, তখনই নৃত্য। স্বরূপ তো প্রভুর শুধু নর্ম সহচরই নন, মর্ম সহচরও। মর্ম বুঝেই গান গাইতে লাগলেন। না, শুধু স্বরূপই নন, চার সম্প্রদায়ই গান গাইতে লাগলেন। প্রভুর

তাল দ্বিগুণিত হল।

তা না হয় হল, কিন্তু প্রভুর নৃত্য যে থামে না। এদিকে কীর্তনীয়ারা বড়ই শ্রান্ত। তাঁরা যে আর পারছেন না। কিন্তু প্রভুকে থামাবে কে? থামাতে পারেন কোন জন? মাত্রই এক জন। তিনি নিত্যানন্দ। কিন্তু নিত্যানন্দ যে দূরে রয়েছেন। দূরে কেন? প্রভুর এখন রাধাভাব। দাদা বলদেবকে দেখে রাধারাণী লজ্জারুণ হবেন। তাহলে প্রভুকে নিরস্ত করার উপায়? উপায় উদ্ভাবন করলেন স্বরূপ। অঙ্গভঙ্গি করে বোঝালেন কীর্তনীয়াদের অক্ষমতা। এই এতক্ষণে প্রভু বাহ্যে এলেন।

শ্রান্ত প্রভু ক্ষান্ত হলেন। ক্লান্ত কীর্তনীয়াদের নিয়ে গেলেন এক ফুলবাগানে। বলগণ্ডি স্থানের কাছেই। মধ্যাহ্ন কৃত্য সেরে জগন্নাথের প্রসাদ পেলেন সবাই। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম। বিশ্রামান্তে সন্ধ্যাকৃত্য সেরে সন্ধ্যারতি। নর্তন-কীর্তন। প্রভাতে জগন্নাথ দর্শন। তারপর নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি। ভক্ত সঙ্গে জলকেলি। এরপর বনভোজন। এ সব কেন? এ যে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে ব্রজলীলা করছেন প্রভু। বৃন্দাবনে এ সব লীলা নিত্যলীলা।

এই লীলাই করলেন প্রভু আটদিন ধরে। রথ-দ্বিতীয়ার দিন প্রভু বিশ্রাম নিলেন আইটোটায়— উদ্যান লীলাদি করলেন না। এরপর জগন্নাথদেব রইলেন আটদিন। এই আটদিনই লীলা করলেন প্রভু ভক্তসঙ্গে।

'এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লৈয়া বৃন্দাবন কেলি কৈল॥'

ষোড়শ অধ্যায়

— বৈষ্ণব বিদায় —

দুঃখের কাল যেন কাল। সে কাল আব কাটে না। আবার সুখেব কাল কেমন সুড়সুড় করে সরে যায়। টেরই পাওয়া যায় না। তখন যেন মনে হয় এত ঝটিতি সময় সীমা এসে গেল। গৌড় ভক্তরা তাই মনে করলেন। তাইতো, এরই মধ্যে চার মাস পার হয়ে গেল। চাতুর্মাস্যের শেষ ঘণ্টা বেজে গেল। তাহলে তো প্রভুকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু মন যে আকুল হয়ে কাঁদছে। মন বলছে আহারে! চাতুর্মাস্যের কালটা যদি দীর্ঘতর হত। চাতুর্মাস্য নামটার না হয় ফের-ফেরতা হত। হতো হতোই। তাতে যে আরো অধিক সময়— প্রভুর অঙ্গ সঙ্গ লাভ হত যার আগে প্রাকৃত যে কোন বস্তুই তৃণতুল্য।

কি ভাবে কেটেছে এ চার মাস? কেটেছে অখিলরসামৃত মূর্তির ব্রজরস আস্বাদনে। প্রভু রথযাত্রা প্রকট করলেন এক অভিনব ভাবে। এক অভূতপূর্ব প্রাকট্যে ব্রজরস আস্বাদন করলেন বিবিধ লীলায়। তাই সুন্দরাচল আর সুন্দরাচল রইল না।

লীলাময় প্রভু লীলায় তাকে করলেন বৃন্দাবন। ভক্তেরা এর আগে লীলামৃতের আস্বাদন এমন ভাবে করেন নি, তাই তাঁদের মন আনন্দে ভরপুর। ভরপুর ভাদ্রদিনের নদীর মত। রথযাত্রায় মহাপ্রভুর এক মহামিলনের মহানায়কের ভূমিকা। উড়িয়া—গৌড়িয়া মহামিলন। রাজ্যে রাজ্যে মিলন। শাস্ত্র নয়, শস্ত্র নয়, খেতাব নয়, খেলাত নয়; শুধুমাত্র নাম। প্রেমানন্দে নাম। নাম বন্যায় ভাসালেন দেশ-দেশান্তর। শুধু কি এই? রথযাত্রা কালেই প্রভু কৃপা করলেন মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে। তারপর সুন্দরাচলের আটটি দিন। কি মধুর! কি মধুর!! ভক্তদের নিয়ে করলেন জলকেলি, করলেন বনভোজন।

এরপরেও না আরো কত লীলা! জন্মাষ্টমী, বিজয় দশমীতে লঙ্কা বিজয় লীলা। তারপর দীপাবলী ও রাসলীলা।

এই যে এত লীলাসুখ— এ সুখ কি কোন ভক্ত ছাড়তে চান? কিন্তু নবদ্বীপের ভক্তরা যে অনেক কাল ঘর ছাড়া। সেই আষাঢ়ে তাঁরা এসেছেন, আর এদিকে আশ্বিন পার হয়ে গেল। পড়ে রয়েছে তাঁদের ঘর সংসার, পুত্র-কলত্র, বিত্ত-ক্ষেত্র। হ্যাঁ, পড়ে রয়েছে। থাক পড়ে। তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই, নেই কোন আক্ষেপ। আছে শুধু আকুলতা। প্রভুর সঙ্গে আনন্দ লাভের আকুলতা। কিন্তু ভক্তের ভাব বিহ্বলতায় তো প্রভু কর্তব্য ভুলে যেতে পারেন না। তাই বিদায় আলিঙ্গন দিতে এলেন ভক্তদের। না, সবাইকে একসঙ্গে নয়। সে তো দায়সারা কাজ। এঁরা যে প্রভুর অন্তরের পরম ধন। তাই প্রভু কি করছেন? —না,

প্রতি ভক্তের কাছে আসছেন, আর তাঁর স্তুতি করছেন। আলিঙ্গন দিচ্ছেন। আবার দিচ্ছেন উপদেশও।

স্তুতি করছেন? —হ্যাঁ, প্রভুই ভক্তের স্তুতি করছেন। ভক্ত যেমন ভগবানের স্তুতি করেন, তেমনি ভগবানও ভক্তের স্তুতি—সমাদর করেন। যেমন,

'তস্মিন সমানগুণরূপবয়ঃ সুবেষ- দাসী সহস্র যুতয়ানুসবং গৃহিন্যা। বিপ্রো দদর্শ চমর ব্যজনেন রুক্মদণ্ডেন সাত্বতপতিং পরিবীজয়ন্তা॥'
—দেবর্ষি নারদ সেই ভবনে যিনি সমগুণা, সমরূপা, সমবয়স্কা ও সমবেশা সহস্র দাসীর সঙ্গে সুবর্ণময় দণ্ডবিশিষ্ট চামর ব্যজনের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বক্ষণ বীজন করছিলেন, সেই রুক্মিণী দেবীর সঙ্গে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন।
এর পর কি হল?
'তং সংনিরীক্ষ্য ভগবান সহসোত্থিতঃ শ্রীপর্য্যঙ্কতঃ সকল ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠ আনম্য পাদযুগলং শিরসা কিরীটজুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশ দাসনে স্বে॥'
—তখন ধার্মিকদিগের শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ রুক্মিণী দেবীর পালঙ্ক থেকে গাত্রোত্থান করলেন এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে কিরীটভূষিত মস্তকের দ্বারা তাঁর পদযুগলে প্রণাম করে নিজের আসনে তাঁকে উপবেশন করালেন।

প্রথমেই প্রভু এলেন আচার্য অদ্বৈতের কাছে। অবশ্য এর আগে গৌর-নিতাই দুই ভাইয়ে গোপন যুক্তি হয়ে গেছে। শুধু প্রকাশ্যে প্রভু বললেন, 'শ্রীপাদ, তুমি বাংলায় ফিরে যাও। তোমার উদ্দণ্ড নৃত্যের আসরে আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে পাবে।'

অদ্বৈতকে বললেন, 'আচার্য, তোমাকে তো আমার নতুন করে বলার কিছু নেই। তুমিই না আমাকে এনেছ। এ লীলায় তো শুধু আমার প্রেমের খেলা। সে খেলায় পাত্র-অপাত্র নেই। মিত্র-অমিত্র নেই। নেই পাপাত্মা-পুণ্যাত্মা। নেই কোন বর্ণের বিচার। তাই নির্বিচারে নাম বিলোবে।'

এরপর প্রভু এলেন শ্রীবাসের কাছে। প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বললেন, 'পণ্ডিত, তোমার অঙ্গনে আমি চিরকালই বর্তমান থাকব। শ্রীবাস অঙ্গন কি ভোলা যায়? আমি নিত্যই সেই অঙ্গনে নৃত্য করব। কিন্তু দেখতে পাবে শুধু তুমি, আর কেউ না।'

একটু থেমে আবেগাকুল কণ্ঠে বললেন, 'পণ্ডিত, রাজার দেওয়া এই বস্ত্রটি মাকে দিও। বলো এও এক প্রসাদ— জগন্নাথের প্রসাদ।' বলতে বলতেই প্রভুর দুনয়নে নামল শ্রাবণের ধারা। কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। বললেন, 'পণ্ডিত, মায়ের কাছে আমি মহা অপরাধী। নিমাই ছাড়া যাঁর মুখে আর কোন কথা নেই, নিমাই না খেলে যিনি একদানা অন্ন মুখে দেন না, শাক আর মোচা ভালবাসি বলে নিত্য যিনি কত রকমের শাক রান্না করেন, সেই মাকে ত্যাগ করে কিনা নিলাম সন্ন্যাস। আমার তো অভিষ্ট বস্তু কৃষ্ণপ্রেম। সেই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে সন্ন্যাসের প্রয়োজন হবে কেন? সংসার ত্যাগ না করলে মায়ের সেবা করতে পারতাম, আর মায়ের আশিসেই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতাম। সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্র সাধনে তো মন কঠিন হয়। পাষাণ হৃদয়ে কি কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়? হায়রে সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসীর অভীষ্ট তো মোক্ষ আর

মোক্ষকামী বলেই কৃষ্ণপ্রেমে চিরবঞ্চিত।' বলতে বলতেই কণ্ঠরোধ হয়ে এল প্রভুর। কিন্তু রোধ হলে তো চলবে না। নদীয়ার লীলাসহচরদের মধ্যে একমাত্র শ্রীবাসকেই অন্তরের অন্তঃপুরের কথা বলা যায়। শ্রীবাস পত্নী মালিনীদেবীই না শচীদেবীর সহচরী। কাজেই না বলে থাকতে পারছেন না প্রভু। কিঞ্চিৎ বিবতি।

তারপর রোদন ভরা কণ্ঠে বললেন, 'এই যে আমি নীলাচলে আছি এটাও মায়েরই ইচ্ছায়। আর আমি তো নিতাই যাই, আর নিত্যই খাই। মা যেদিন যেমন রাঁধেন, সেদিন তেমন খাই। মা অবশ্য বিশ্বাস করেন না। ভাবেন, পুত্র চিন্তায় সদা মগ্ন তো, তাই ঐরকম দেখেন। দেখার ভুল, আবার মনের ভুলও বুঝিবা। —বলে মৃদু হাসলেন প্রভু, বললেন, 'তোমাকে একটা মজার ঘটনা বলি ; আমাদের গৃহদেবতা তো শালগ্রাম। মা সেই দেবতা সেবার আয়োজন করেছেন সেদিন বহু উপচারে। উত্তম অন্ন, পাঁচ সাত রকমের ব্যঞ্জন, মোচা ঘণ্ট, পটল ভাজা, লেবু আদাখণ্ড, দধি দুগ্ধ খণ্ডসার। শালগ্রামরূপী বালগোপালকে মা ভোগ দিলেন। ভাল কথা। আনন্দেরই কথা। ও হরি, মা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদছেন আর বলছেন, 'আহারে। আমার নিমাই আজ ঘরে নেই রে। যে বাছা ছিল আমার কোল আলো করে, আজ সে কি না ঘুরছে দেশ-দেশান্তরে। শাক, মোচা ঘণ্ট— কত যে প্রিয় আমার নিমাইয়ের। আমি ছাড়া কে ওকে রেঁধে দেবে এসব? আমার নিমাই যে রাঁধতে জানে না, বাড়তে

জানে না। পারস করে পরিপাটি করে না! সাজিয়ে দিলে বাছা আমার খেতে পারে না। কোন্ পদ সাধতে গেলে না, না করে। কিন্তু আমি তো জানি ওর সাধের পদ কোনটি। আর সেটি যদি জোর করে দিই, কত আহ্লাদেই না সে খায়। আর তা দেখে কত আহ্লাদই না হয় আমার। এমনি করে মা আমার বিলাপ করছিলেন। মায়ের হাহাকার শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না, ছুটে গেলাম, আর সবই ভোজন করলাম।

'মা বাহ্য ফিরে পেয়ে পাত্র খালি দেখে ধন্দে পড়লেন। তাইতো, কে খেল এ সব? আমি তো এতক্ষণ নিমাইয়ের চিন্তায় ছিলাম। তবে কি কোন বেড়াল টেড়াল এসে খেয়ে গেল? নাকি আমিই ভোগ সাজাইনি। এসব কথা ভাবতে ভাবতে সব পাত্র দেখলেন। হ্যাঁ, পাক পাত্রে সব জিনিস একই অবস্থায়—আছে। পাক পাত্র পূর্ণ, আবার এদিকে ভোজন পাত্রে উচ্ছিষ্ট। সংশয়ের আর বিস্ময়ের দোলা মায়ের মনে। যাহোক, মা ঈশানকে দিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে আবার ভোগের আয়োজন করলেন। তা পণ্ডিত, তুমি এক কাজ করো। বিজয়া দশমীর দিনের এই ঘটনাটির উল্লেখ করে আমার মায়ের ধন্দ কাটিয়ে দিও। মা বড়ই সান্ত্বনা পাবে— বুঝবে আমি কাছে না থেকেও কাছেই আছি।'

না, পণ্ডিতের সঙ্গে তো আর বাক্যালাপ চলে না। আরও যে অনেক ভক্ত আছেন। তাঁদের সঙ্গেও তো আলাপ আলিঙ্গন করতে হবে। প্রভু তাই ভাব বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠলেন।

রাঘবকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'রাঘব, তোমার শুদ্ধ প্রেমে

আমি তোমার বশ। এই যে অন্যান্য ভক্তরা এখানে আছ, তোমরাও এই রাঘবের সেবা পুজোর কথা শোনো। সেবার অন্যান্য উপকরণের কথা না হয় বাদই দিলাম, একমাত্র নারকেলের কথাই শোনো। নিজের বাড়ীতে শত শত নারকেল। অবশ্য এ নারকেল এক পয়সায় একটা। কিন্তু না, এ নারকেলে হবে না। এ নারকেল অত মিষ্টি না। তাই মিষ্টি নারকেল আনে রাঘব প্রতিটি চার আনায়। এমনই কৃষ্ণ প্রীতি রাঘবের।'

এখন এলেন প্রভু শিবানন্দ সেনের কাছে। বললেন, 'শিবানন্দ, তোমাকে বাসুদেব দত্তের সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে। আয় ব্যয়ের ভার তোমার ওপরই থাকবে। বাসুদেবের বৈষয়িক বুদ্ধি নেই। সামান্য সঞ্চয় না থাকলে সংসার প্রতিপালনে বিঘ্ন ঘটে। তাতে ভজনও বিঘ্নিত হয়। আরেকটি কথা। তুমি সব ভক্তদের নিয়ে প্রতি বছরই গুণ্ডিচায় চলে আসবে।

এবার কুলীনবাসীর পালা। ভাবাবেশে আলিঙ্গন দিলেন সত্যরাজ খানকে। এটি উপাধিগত নাম। গৌড়েশ্বরের দেওয়া। এঁর কুলগত নাম লক্ষ্মীনাথ বসু। পিতৃদেব উপাধি পান গুণরাজ খান। কুলগত নাম মালাধর বসু। সত্যরাজ ও তাঁর পুত্র রামানন্দকে আলিঙ্গন দিয়ে প্রভু বললেন, 'তোমাদের তো কথাই নেই, তোমাদের গ্রামের কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়, কারণ এ গ্রাম জন্ম দিয়েছে তোমার পিতৃদেবকে, আর তাঁর সোনার কলমে রচিত হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' যাতে আছে আমার প্রিয়তম পয়ারটি 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' যখন পিতা-পুত্র সাধনের নির্দেশ

প্রার্থনা করলেন, তখন

'প্রভু কহে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন ॥

শুনে সত্যরাজ শুধোলেন, 'কে বৈষ্ণব, তাঁকে চিনব কি করে -- কি তাঁর লক্ষণ ?' তখন,

'প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার ॥
এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব পাপ ক্ষয়।
নববিধ-ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥
দীক্ষাপুরশ্চর্য্যা, বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে ॥'

শেষ পয়ারটি বৈপ্লবিক। ক্রান্তদর্শী প্রভুর এই উপদেশ ক্রান্তি কালেই। শুধুই কি উপদেশ ?— না, তিনি নিজ আচরণেই উপদেশের বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তাঁর তো অগণন ভক্ত। তাঁরা শুধু ভক্তই, শিষ্য নন। শিষ্য হবেন কি করে ? তিনি নিজে তো কারুকে কোন দীক্ষা দেননি। কৃষ্ণনাম নিতে দীক্ষার প্রয়োজন হবে কেন ? নাম অতি সহজ, সরল বাংলায়। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় নয়। উচ্চারণও সহজ, অর্থও সহজ। ষোল নাম, বত্রিশ অক্ষর। আমার ইষ্ট দেবতাকে, আমার নামীকে আমি ভালোবাসি। সেই নামীর নাম নিতে অপরের শরণ নিতে হবে কেন ? শরণ তো আমি নামীরই নিচ্ছি। সরাসরি শরণ নিতে বাধা কোথায় ? হ্যাঁ, বাধা আছে। আত্মপ্রস্তুতিতে বাধা।

আত্মপ্রস্তুতির পথে অপায় হচ্ছে চোদ্দটি ইন্দ্রিয়, আর ছটি রিপু। এই অমিত্র যদি আমি নিজে সংযত করতে না পারি, তাহলে গুরুর ক্ষণিকের বাঁধাগতের উপদেশেই কি আমার মধ্যে সংযম আনবে ?

ক্রান্তদর্শী পুরুষের তাই দিগদর্শন— না, শুধুমাত্র দীক্ষা নয়। তবে কি ?

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি॥'

সুদীর্ঘকাল পুষ্ট অচলায়তনে প্রবল আঘাত। ধর্মের নামে যে একটি শ্রেণীর জীবিকা চলছিল, তাতে আঘাত। কাজেই দীক্ষার জন্য সেই দীর্ঘ সারণীভুক্ত কাঞ্চন, ভূষণ, নগদ নারায়ণ নয়। তৃণের চেয়েও নীচ হলে সর্ব অহংকার মুক্ত হবে জীব। যে মানুষটি শাখীর শাখা কাটছে, শাখী তাকেও সুশীতল ছায়া দিচ্ছে। কাজেই সহিষ্ণু হতে হবে এই ছায়াতরুর মত। আর নিজে অমানী হয়ে অপরকে মান দিতে হবে। এই রকম আচরণেই চোদ্দটি ইন্দ্রিয় সংযত হবে, অবদমিত হবে ছটি রিপুও। তখন জীব অনায়াসেই নামের অধিকারী হবে, আর কৃপাময় হরির কৃপা লাভ করবে।

আর পুরশ্চর্য্যা ? প্রভু বললেন কৃষ্ণনাম নিতে এরও অপেক্ষা নেই। অর্থাৎ পুরশ্চরণ ছাড়াই কৃষ্ণনাম ফলপ্রসূ হয়। নিত্য ত্রিকালীন অর্চনা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজন— এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনা হচ্ছে পুরশ্চরণ।

জনসমাজে অজস্র জট-জটিলতা, আময়দা আময়। দেহধারী

জীব, অন্নগত তাঁর প্রাণ। তাঁর নিজ ওদনের অন্নের সংস্থানই দুঃসাধ্য, তার পক্ষে পুরশ্চর্যা তো ফল্গু বচন। তাই পঞ্চাঙ্গ পদ্ধতি অনুসরণ না করেও কৃষ্ণনাম নিলে কৃপা লাভ করা যায়।

এবার প্রভু এলেন শ্রীখণ্ডের ত্রিরত্নের কাছে। মুকুন্দ দাস, মুকুন্দ পুত্র রঘুনন্দন আর নরহরি— এই তিনজন।

রসিক শেখর গৌরসুন্দর মুকুন্দকে শুধোলেন, 'আচ্ছা মুকুন্দ, বলতো তুমিই রঘুর পিতা, না রঘুই তোমার পিতা?' উত্তরের অপেক্ষায় মৃদু মৃদু হাসছেন কৌতুকী প্রভু। প্রভুর প্রশ্ন যেমন, ভক্তেরও উত্তর তেমন। প্রভু ভক্তের মন বুঝে প্রশ্ন করেন, তাই উত্তরও প্রভুর মনের মত হয়। আর তাই

'মুকুন্দ কহে— রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র, এই আমার নিশ্চয়॥'

হৃষ্ট হলেন প্রভু। মনের মত উত্তর পেয়েছেন। পালন করেন, তাই পিতা— লৌকিক পিতা। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভক্তি দান করেন, নিত্য জীবনের সন্ধান দেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পিতা। মুকুন্দ দাসের আগেই রঘুনন্দনের মনে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়েছে। ভক্তির বিচারে রঘুনন্দনই মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ। লৌকিক জন্ম এক, আর ভাগবত জন্ম আরেক। মুকুন্দ পুত্র রঘুর ভাগবত জন্ম হয়েছে মুকুন্দের অনেক আগে এবং পুত্র থেকেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন মুকুন্দ। সুতরাং রঘুনন্দনই মুকুন্দের ভাগবত জন্মদাতা। তাই মুকুন্দ স্পষ্টই বললেন:

'আমা সভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা, আমার নিশ্চিতে॥'

মুকুন্দের এই সদুক্তি

'শুনি হর্ষে কহে প্রভু— কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সেই গুরু হয়॥'

যেমন ভাগবত বলছেন,

'গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ যঃ সমুপেত মৃত্যুম॥'

এমন কথা বলতেন এক বিদেশিনী। মিস ম্যাকলাউড। স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে ভারত প্রেমী হন। এক বয়োতীত মহিলা। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁকে পিসিমা বলতেন। পরিহাস ছলে শুধোতেন, পিসিমা, বয়স কত হল গো?' পিসিমা বলতেন, 'এই চল্লিশ টল্লিশ হবে।' সন্ন্যাসীদের মুচকি হাসি দেখে পিসিমা বলতেন, 'হাসছ কেন গো?' আমার আসল জন্ম কবে হয়েছে জান? —যেদিন থেকে স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসেছি, ঠিক সেইদিন থেকে।'

ভক্তের গুণ কীর্তনে প্রভুর কত যে সুখ! সদাই পঞ্চমুখ। সেই পঞ্চমুখেই প্রশংসা করতে লাগলেন প্রভু। ভক্তদের বললেন, 'শোন, শোন, মুকুন্দের প্রেম যেন দগ্ধ হেম। তোমরা তো জান মুকুন্দ গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক। এটা তার বাহ্য জীবন। অন্তরে রয়েছে কৃষ্ণপ্রেম। সে এমন প্রেম, কৃষ্ণ অঙ্গ সজ্জার যে কোন বস্তু দেখলেই অচেতন হয়। একদিনের ঘটনা শোন: রাজা তো টুঙ্গীতে আসীন। আর মুকুন্দ রাজার সঙ্গে ইলাজের বাত করছে। এমন সময় এক রাজভৃত্য এল বিশাল এক পাখা নিয়ে। ব্যজন

করতে লাগল রাজাকে।

কৃষ্ণ কেমন? —না, যার মন যেমন, যেমন মাধবেন্দ্রপুরী নবঘনের মধ্যে নবঘন শ্যামকে দেখে অচেতন হতেন। আর মুকুন্দ কি দেখল? মুকুন্দ পাখা দেখল না—দেখল পাখার মধ্যে—ময়ূরের পাখা। আর যেই না দেখা অমনি পপাত ধরণীতলে। রাজা মহাচেতা। অমনি ধর ধর বলে উচ্চাসন থেকে নেমে পড়লেন। কেউ ধরল কি ধরল না, তার অপেক্ষাও করলেন না। নিজেই সেবা যত্ন করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। রাজা সহৃদয়তায় বললেন, 'মুকুন্দ, জবর জখম হল তোমার।' মুকুন্দ বলল, 'না, তেমন কিছু না।' রাজা শুধোলেন, 'আচ্ছা, তুমি হঠাৎ পড়ে গেলে কেন?' মুকুন্দ, বলল, 'আমার মৃগী রোগ আছে তো, তাই।' রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'দেখ মুকুন্দ, আমাকে ভাড়িওনা। মৃগী রোগী আমি চিনি। আমি অহিন্দু হলেও বুঝতে পেরেছি তোমার মনের অবস্থা। তোমার কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা নেই।' ভক্তেরা শুনে সাধু সাধু বললেন।

একটু থেমে প্রভু আবার বললেন, 'শোন, শোন, আরেক অলৌকিক ঘটনার কথা শোন। এ ঘটনা নিত্য ঘটছে। রঘু তো মন্দিরে কৃষ্ণ সেবায় সদা ব্যস্ত। উপকরণ সংগ্রহ করে কে? —না, এই মুকুন্দ। আচ্ছা, তোমরা কি কেউ শুনেছ কদম্ব ফুল বার মাস ফোটে? শোননি তো? তবে এবার শোন। ফোটে ভূমণ্ডলে এক স্থানে। ঐ যে রঘুর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির তারই কাছে।

মন্দিরের কাছেই দীঘিটি। ঐ দীঘির পাশেই ঐ পরমাশ্চর্য কদম্ব তরুটি। নিত্যই ফোটে। ফোটে বার মাস ধরে। ফুটবেই তো। মুকুন্দের যে বড়ই বাসনা সে নিত্যই শ্যামল তনু ব্রজেশ তনয়ের দু কানে দু'টো কদম্ব ফুল পরিয়ে দেয়।'

হ্যাঁ, মুকুন্দের বাসনা পূরণ করতেই সর্বকারণের কারণ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁরই অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ফোটে। ভক্তের বাঞ্ছা এ ভাবেই শুধু পূরণ করেন না, ঈপ্সিত বস্তু বহন করে নিয়ে যান। গীতাতেই এই প্রতিজ্ঞা বাক্য তিনি শুনিয়েছেন ঃ

'অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম।'

তাই না ভগবান মুকুন্দ ভক্ত মুকুন্দের জন্য নিত্যই ফুল ফোটান। ছটি ঋতুতেই 'কি বসন্ত, কি শরতে।' মুকুন্দ সুখ্যাতির যেন শেষ নেই। প্রভু

'মুকুন্দেরে কহে পুন মধুর বচন।
তোমার যে কার্য্য ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন॥'

যথার্থ ই বললেন প্রভু। ধর্ম পথে থেকে, কৃষ্ণ সেবার অনুকূল পথে থেকেই, মুকুন্দ রুজি রোজগার করতেন। দেহধারী জীবের বিবাগী হলে চলেনা। আত্মনির্ভরতাই পরম ফল। তবে 'ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন।' করতে হবে, যেমনটি করছেন মুকুন্দ।

ধর্ম পথে থেকে জীবিকা অর্জন করতে হবে— ধর্মের নামে নয়। ধর্মের নামে ব্যবসা ভণ্ডামি— মহাপাতক। মহার্ঘ মন্দির, চারিদিকে জাঁক জমক আর আড়ম্বর। হাজারো লোককে এইভাবে

আকৃষ্ট করে ভজনকে পণ্যে পরিণত করা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। না, না, এপথ ভজনের পথ নয়। মুকুন্দের পথই উত্তম পথ। প্রভু মুকুন্দের মধ্য দিয়ে আরেক দিগদর্শন করলেন।

দুই ব্রহ্মের দুই ঠাঁই। আর এই দুইয়ের জন্য আছেন দুই ভাই। উড়িষ্যায় দারুব্রহ্ম অর্থাৎ স্বয়ং জগন্নাথদেব। আর বঙ্গে জলব্রহ্ম অর্থাৎ গঙ্গা। দেব জীব উদ্ধার করেন দর্শন দিয়ে, আর দেবী করেন সলিল স্পর্শ দিয়ে। আবার এই দুই ভাইয়ের দুই ঠাঁই। একজনের নীলাচল, অপরজনের নবদ্বীপ। তাই প্রভু দুজনকে দিলেন দুরকম নির্দেশ। যেমন,

'সার্বভৌম! কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি! কর জলব্রহ্মের সেবন॥'

এখন এলেন মুরারির কাছে। প্রভু প্রেমালিঙ্গন দিলেন গুপ্তকে। ভক্তদের বললেন, 'ভক্তির সর্বোত্তম লক্ষণ কি জান? নিষ্ঠা আর দৃঢ়তা। আর দুই গুণের অধিকারী হচ্ছে এই মুরারী।' প্রমাণ পেলাম কি ভাবে? সে এক কাহিনী বটে। তোমরা তো জান মুরারি রামভক্ত। আমি তাকে বললাম, 'দেখ, আমার দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ অখিল রসামৃতমূর্তি। তুমি তাঁর ভজনা কর।' মুরারি তো আমাকে বরাবরই মান্য করে। তাই আমার এই কথাটা শিরোধার্য করল। কিন্তু করলে কি হবে? প্রাণ যার রঘুনাথ গত, সে কি তাঁকে ছাড়তে পারে? সারারাত ঘুমোতে পারলনা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানা পোড়নে। শেষকালে প্রভাত বেলার আলো ফুটতে না ফুটতেই আমার পদমূলে পতিত হল। নয়নজলে

ভেসে বলল, 'রঘুপতির চরণ যে আমি ছাড়তে পারি না, আবার এদিকে তোমার আদেশও লঙ্ঘন করতে পারি না। এখন তোমার সামনেই আমার মরণ হোক, আর আমিও মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাই।'

তখন আমি কি করলাম জান— বললাম, 'সাধু, সাধু, গুপ্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। ধন্য তোমার ভজন নিষ্ঠা। শ্রীরাম কিংকর তুমি, সাক্ষাৎ হনুমান।'

এরপর প্রভু প্রেমালিঙ্গন দিলেন বাসুদেব দত্তকে। সহস্র বদনে গুণ কীর্তন করলেন বাসুদেবের। নিজ গুণের কথা শুনে লজ্জারুণ হল দত্ত। প্রভুর চরণে পতিত হয়ে বলল, 'প্রভু, আমার একটিই নিবেদন। জীবের দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সর্ব জীবের পাপ তুমি আমার মাথায় দাও। আমি সেই পাপ ভার নিয়ে নরকভোগ করি। তবুও তুমি জীব উদ্ধার কর।'

আহা, দত্তের চিত্তগগন কত নির্মল! প্রভুর মন দ্রবীভূত হল। বললেন, 'দত্ত, তোমার প্রার্থনা তোমার চিত্তবৃত্তিরই অনুরূপ। তুমি যে সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ।'

যথার্থই বললেন প্রভু। নৃসিংহদেবের কাছে প্রহ্লাদের প্রার্থনাটিও ছিল এই রকম।

'এবং সকর্ম পতিতং ভববৈতরণ্যামন্যোহন্য জন্মমরণাশন ভীতভীতম।
পশ্যন্ জনং স্বপরবিগ্রহ বৈরমৈত্রং হন্তেতি পারচরং পীপৃহি মূঢ়মদ্য॥'

এবং

'নৈতান বিহায় কৃপনান বিমুমুক্ষ একঃ।'

—এদের ছেড়ে আমি একা মুক্তি চাই না।

প্রভু আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বাসুদেব, তুমি যার কল্যাণ কামনা কর, সেই না বৈষ্ণব, আর সেই বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দূর করবেন।'

এইভাবে প্রভু ভক্ত বিদায় করলেন। যে ভক্তের যে গুণ, সেই গুণের কথা কীর্তন করলেন। তারপর প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন।

এই বিদায় দৃশ্যের পরের দৃশ্য কি? —না,

'প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥'

ভক্তেরা তো বিদায় নিলেন। তাহলে প্রভুর সঙ্গে রইলেন কে? রইলেন একাধিক ভক্ত। এঁরা তো থাকবেনই। আজীবনই থাকবেন এঁরা। প্রভুর জন্য এঁরা সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু সব কিছুর জন্য এঁরা প্রভুকে ত্যাগ করতে পারেন না। পারেন না, এক পলের জন্যও। পারবেন কি করে? তিলেক মাত্র প্রভুকে না দেখলে এঁরা আথে ব্যথে অস্থির হয়ে পড়েন। তাই সর্বক্ষণ ছায়ার মত ফিরে থাকেন। এঁরা কারা?

এঁরা হচ্ছেন প্রভুর প্রাণপ্রিয় গদাধর। প্রভু যমেশ্বর টোটায় এঁর বাসের ব্যবস্থা করলেন। আর রইলেন প্রভুর দ্বিতীয়রূপ সেই স্বরূপ। রইলেন অভিমানবিলাসী জগদানন্দ। রইলেন রত্ন চতুষ্টয়ঃ পরমানন্দপুরী, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর।

এঁদের নিয়ে কি করলেন প্রভু ?

'এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে॥'

সপ্তদশ অধ্যায়

'আমায় বলরে, কতদূর বৃন্দাবন।'

'আমায় বলরে, কতদূর বৃন্দাবন।'— প্রভুর এ আকুলতা সেই কবেকার। সেই যে কাটোয়ায় দীক্ষা নিয়েছিলেন, তখনই না এই ভাব ভাবনা উদয় হয় তাঁর মনে। মনের গহনে আর ধরে রাখতে পারেননি। প্রেমোন্মাদে আবিষ্ট হয়ে ছুটে চলেছিলেন। পথের নিশানা নেই। দূরত্বের হিসেব নেই। নেই কোন ধ্যান ধারণা সময়ের। অবধূত অদ্ভুত কৌশলে প্রভুকে ফিরিয়েছিলেন।

এরপর নীলাচল। নীলাদ্রিনাথের ভূমিতে এসেই কত না আর্তি। কত না আকুলতা ব্রজভূমির জন্য, সেই রসভূমির রসাস্বাদনের জন্য। প্রতি বছরই ইচ্ছা জাগে, আর প্রতি বছরই গমনেচ্ছায় প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। প্রাকৃতিক প্রাতিকূল্য তো আছেই, তার ওপর আছে ভক্তের ইচ্ছা। কেন, প্রভুর ইচ্ছা? হ্যাঁ, প্রভুর ইচ্ছা প্রভুরই অধীন, কিন্তু তিনি যে ভক্তের অধীন।

এমনি করেই কাটল পাঁচটি বছর। পাঁচটি বছর? হ্যাঁ, পাঁচটি বছর। সময় তরতর করে চলে। তটিনীধারার বেগে চলে।

অবশ্য এ পাঁচটি বছরে প্রভুর অনেক ইচ্ছারই পূরণ হয়েছে। ব্রজেন্দ্র নন্দনের দেশে আগে যাওয়া হবে কেন? আগে যাওয়া হলে এই পাঁচটি বছরে এই যে এত লীলা, এ সবের কি হত? দক্ষিণ দেশে তখন চলছিল বিবাদ বিভেদ। দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মানুষে মানুষে। সব মানুষকে প্রভু নিয়ে এলেন এক ছত্রছায়ায় – হরিনামের বর্ণোজ্জ্বল চন্দ্রাতপ তলায়।

সংগ্রহ করলেন তিনটি মহার্হ গ্রন্থ। দুটি অচল: ব্রহ্ম সংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতম। একটি সচল: রায় রামানন্দ স্বয়ং। বৈষ্ণব দর্শন প্রকট করলেন নতুন ভাবে। অবসান হল সুদীর্ঘকালের সুদৃঢ় অচলায়তন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ঘটল নব প্রাকট্য সংকীর্তন পিতার সংকীর্তনে।

কৃপা করলেন গজপতি প্রতাপরুদ্রকে। মহারাজ লাভ করলেন মহাজীবন। প্রভু হলেন প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা। রাজ্যে রাজ্যে মিলনের মহামন্ত্র দান করলেন। হল উড়িয়া—গৌড়িয়া মিলন। মহামিলন। প্রেম সম্মিলন। কই, এ হেন মেল বন্ধন তো ঘটাতে পারেননি এই দুই রাজ্যের দুই রাজার কোন রাজাই। না পেরেছেন বঙ্গপতি হোসেন শাহ; না পেরেছেন উৎকলপতি প্রতাপরুদ্র। রাজ্যে রাজ্যে মিলন? সে তো তাঁদের কাছে গ্রহ তারার দেশে গমন। তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যের জনমন বীণাই কি এক সুরে বাঁধা? না। আদৌ না। অথচ তাঁরা জনগণমন অধিনায়ক। অধিনায়ক! কিসের অধিনায়ক? এ বশ্যতা তো কিনেছেন ভয়-ভীতি আর অর্থের দ্বারা। সৈন্যদলের একটি

মাসের তনখাহ্ বন্ধ তো তাঁদেরও তক্ত পতন।

অথচ প্রভু কোন রাজ্যের প্রভু নন। নন কোন ধনপতি। কিন্তু লোকপতি— লাখ লাখ লোকের হৃদয়পতি যেন কোন যাদুমন্ত্র বলে সম্মোহিত করেছেন এই অগণন জনগণের মন। হ্যাঁ, যাদুমন্ত্রই বটে। হরিনামের যাদুমন্ত্র।

নামযজ্ঞের এই প্রধান ঋত্বিকের জীবনে অবসর নেই। সেই স্বরাট বিরাট মানব স্রষ্টাই যে এসেছেন মানবরূপে মানবের মধ্যে মানবেরই উদ্ধার কল্পে। অবসর আর থাকে কি করে? তাই না এই একই ভাবনায় অতিবাহিত হল এই সুদীর্ঘকাল। কালের রথের ধ্বনি শুনতে শুনতে গৌরসুন্দর আজ কোন্ কালসীমায় এলেন?

প্রভুর বয়স এখন উনত্রিশ। ১৪৮৬ সাল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী। নব বসন্ত পূর্ণিমা। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। সন্ধ্যাকাল। শচীমাতার এই অতিমর্ত্য দশম সন্তানটি মর্ত্যধামে অবতরণ করলেন নিজধাম থেকে।

আলোয় ভরে গেল শচীমাতার কোল। আর আঁধারে ভরে গেল ভূমণ্ডল। কেন? চারদিকে আঁধার কেন? চন্দ্র যে তখন রাহুর গ্রাসে। রাহুর কবলে পড়ল কেন? উত্তর দিচ্ছেন কবিরাজ:

'অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন?'

আকাশ বাতাস অনুরণিত হল হরিধ্বনি আর সীমন্তিনীর উলুধ্বনিতে। ধরা আজ ধ্বনি কলরোলে কল্লোলিত কেন? চন্দ্র গ্রহণ বলে? না, তা হবে কেন? তবে?

সংবাদ দিচ্ছেন কবিরাজ ঃ

'নদীয়া উদয়গিরি পূর্ণ চন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥'

যথাসময়ে নামকরণ কাল উপস্থিত হল। মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর। মা ডাকলেন নিমাই। চক্রবর্তী পণ্ডিত তো বটেনই, বিশেষ করে পারীণ জ্যোতিষশাস্ত্রে। পরম ভাগবত পুরুষের সমস্ত লক্ষণ দেখতে পেলেন এই শিশুটির মধ্যে। কিন্তু নীলাম্বরের শাস্ত্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত কি প্রমাণিত হল ?— হ্যাঁ, হল। হল নামকরণ কালে। প্রচলিত প্রথা, তাই পিতৃদেব শিশুর সামনে রাখলেন ধান, খৈ, রজত-কাঞ্চন, অর্থ ও গ্রন্থ। কোন্ গ্রন্থ ? —না, ভাগবত। তা শিশুটি কি করল ?

'সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥'

নিমাইয়ের এখন রিঙ্গনকাল। হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। বড়ই দৃষ্টি রসায়ন দৃশ্য। কটিদেশে কিঙ্কিণী— বাজে রিনিরিনি। পায়ে নূপুর। বাজে রিনিঝিনি। ভারি মিষ্টি ধ্বনি। মিষ্টি হলে কি হবে ? শিশুর খেলা যে সৃষ্টি ছাড়া। হাতের সামনে যা পায়, তাই ধরে। সে সাপই হোক, আর আগুনই হোক। অমনি সবাই ছুটে আসে। শিশুকে সরিয়ে নেয়। খেলায় বাধা পড়ে। শিশু তখন কাঁদে। আর তখন কি হয় ?

'প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়ে করে হরি সংকীর্তন॥'

অমনি শিশুর কান্না থামে'। তা হলে শিশুটির ইচ্ছা কি?

'নিরবধি সবার বদনে হরিনাম।
ছলে বোলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তান॥'

শিশু কি শুধুই কাঁদে? হাসে না? হ্যাঁ হাসে। আবার নাচেও, যখন

'হরি হরি বলি নারীগণে দেয় করতালি।
নাচেন গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী॥'

দিন যায়। শিশু বাড়ে। বাড়তে বাড়তে শিশুটি দেখতে কেমন হল? এ সংবাদটি দিচ্ছেন বৃন্দাবন :

'জিনিয়া কন্দর্পকোটী সর্বাঙ্গের রূপ।
চাঁন্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল-কেশ।
কমল নয়ন যেন গোপালের বেশ॥'

হ্যাঁ, গোপালের বেশই বটে। শুধু বেশ কেন? গোপালই তো এসেছে। নবগোপাল হয়ে।

নিমাই হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করে। বড়ই চঞ্চল। ঘরে রাখা দায়। কখন যে বাইরে চলে যায়। হঠাৎ দুই দুষ্কৃতী হাজির হল। শিশুর সামনে। শিশুর কাছে কেন? শিশুর অঙ্গে যে রয়েছে সোনা। সোনার বরণ শিশুর অঙ্গে— সোনার অলঙ্কার। কে কার অলঙ্কার?— না,

সে ভাব-ভাবনা দুরাত্মাদের নেই। ভাবনা-ফন্দি শুধু একটা। গৌরসোনার শরীর থেকে সোনা সরিয়ে নেওয়া।

ওদের মতলব শিশুটিকে তাদের নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া, তারপর গয়না সরিয়ে নেওয়া। কিন্তু এমনি এমনি তো শিশু যাবেনা। একটা কিছু দেওয়া দরকার ওর হাতে। কি দেওয়া যায়? ও হ্যাঁ, হয়েছে। সব শিশুই সন্দেশ ভালোবাসে। ওদের একজন শিশুটির হাতে একটি সন্দেশ দিয়ে বলল, 'আয় বাবা, আয়। তোকে কাঁধে নিয়ে তোদের বাড়ীতে দিয়ে আসি।' শিশুটি তো আহ্লাদে আটখানা। কাঁধে চেপে সন্দেশ খাচ্ছে আর পা দোলাচ্ছে। এদিকে ওদের মধ্যে কালনেমির লঙ্কাভাগ শুরু হয়ে গেল। একজন বলল, 'আমি কিঙ্কিণী নেব।' অমনি অপরজন তেড়ে বলল, 'তুই কিঙ্কিণী নিবি কিরে, ওটা তো নেব আমি। আমার ভাগ বেশী। আমিই না ওকে সন্দেশ দিয়ে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

নবদ্বীপ তখন অতিমাত্র ব্যস্ত শহর। কার শিশু কার কাঁধে, কে খবর রাখে? আত্মকলহে ওদের দিক ভুল হয়ে গেল। হবি তো হ, একেবারে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে এসে হাজির হল ওরা। শিশু তো তার বাবাকে দেখেই এক লাফে নেমে পড়ল। ছুটে গিয়ে বাবার কোলে উঠল। বাড়ীর সবাই নিমাইকে খুঁজছিলেন। পাথর নেমে গেল তাঁদের বুক থেকে। ঐ দুই দুরাশয়ের বিপন্ন বিস্ময়। তখন 'দে ছুট' বলে পালিয়ে বাঁচল।

দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে শিশুটি পাঁচ বছরে পা দিল। জগন্নাথের ঘরে এলেন এক ব্রাহ্মণ। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করছেন।

ঘুরতে ঘুরতে জগন্নাথ গৃহে। ইষ্ট দেবতা বালগোপাল। ব্রাহ্মণ নিজ হাতে রান্না করে গোপালকে নিবেদন করছিলেন। চঞ্চল নিমাই কোথা থেকে ছুটে এসে সেই ভোগ এক গ্রাস খেয়ে নিল। ব্রাহ্মণ হায় হায় করে উঠলেন। জগন্নাথ পুত্রকে তাড়া করলেন লাঠি নিয়ে। কোথায় নিমাই? এক ছুটে এক নিমেষে কোথায় পালিয়ে গেছে!

জগন্নাথ দ্বিতীয় বার আয়োজন করে দিলেন। ব্রাহ্মণ রান্না করে আবার ভোগ সাজালেন। নিবেদন করতে যাবেন এমন সময় ঝড়ের বেগে এসে এক গ্রাস খেয়ে নিল নিমাই। হাহাকার করে উঠলেন ব্রাহ্মণ। না, আর না। তৃতীয় প্রয়াসে ব্রতী হতে অনীহা প্রকাশ করলেন ব্রাহ্মণ। শেষকালে অনেক অনুরোধে তৃতীয়বার ভোগ সাজালেন নিবেদন করতে যাবেন— হঠাৎ

'সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম— অষ্টভুজরূপ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥'

নাঃ, ব্রাহ্মণ এই পরমাশ্চর্য দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

আর একদিন হল কি নিমাই হাতের সন্দেশ ফেলে দিয়ে মাটি খেতে লাগল। ছেলের কাণ্ড দেখে শচীমাতা মৃদু হাসলেন, অবাকও হলেন! মুখ থেকে মাটি সরিয়ে বললেন, 'এ মা, কি বোকা ছেলে রে! খেতে দিলুম সন্দেশ, আর সেই সন্দেশ ফেলে

দিয়ে খাচ্ছিস কিনা মাটি। নিমাই বলল, 'মা, তুমি আমায় বকছ কেন? মাটিও যা সন্দেশও তা।

হরিনাম করলেই নিমাইয়ের কান্না থামে। একদিন কিন্তু কান্না আর থামলনা। শচীদেবী এটা সেটা, অনেক কিছুই দিলেন! না, কান্না তো থামেনা। তবে কি বায়ুরোগের বিকার দেখা দিল! মা অস্থির কণ্ঠে শুধোলেন, 'আচ্ছা বলতো, কি পেলে তুই কান্না থামাবি?, নিমাই বলল, 'হিরণ্য জগদীশের ঘরের নৈবেদ্য খাব।' সেই বিষ্ণু নৈবেদ্যই নিয়ে এলেন জগন্নাথ। নিমাইয়ের সে কি আহ্লাদ নৈবেদ্য পেয়ে। আর তখন,

'হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥
কথো ফেলে ভূমিতে, কথো কারো গায়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায়॥'

হঁ্যা, লীলাই বটে। কত রকমের লীলা। শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে নদীয়া লীলা। নদীয়া লীলায় কত যে তাঁর পার্ষদ। পার্ষদ নিয়ে এলেন যে! ভাগবত এর দিগদর্শন করেছেন:

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম।'

ভগবান যীশুর তের জন শিষ্য ছিলেন। জাতিতে জেলে— এক জাতের। ভগবান বুদ্ধের পরিকরেরাও এক শ্রেণীর। তাঁরা ছিলেন বণিক। আর প্রভুর পরিকরদের জাত-পাতের বালাই নেই। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল। এই একাধিক জাত কৃষ্ণপ্রেমের মেলবন্ধনে

এক জাত হয়ে গেল। তাঁদের সবার এক এবং একটিমাত্র পরিচয় তাঁরা প্রভুর পার্ষদ।

প্রভুর অগণন গণ। তবে মুখ্য ভূমিকায় এলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, ঠাকুর হরিদাস, মুকুন্দ, মুরারি, জগদানন্দ, চন্দ্রশেখর, স্বরূপ, রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রমুখ।

যুগাবতার যুগ প্রয়োজনে যুগে যুগে আসেন। যোগ্য পরিকর নিয়েই আসেন। ষোড়শ শতকের পর বিরতি। উনিশ শতকে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পার্ষদ প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্তই ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আবার একাধিক পার্ষদ ছিলেন একেবারে বিপরীত মেরুবাসী অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে ছিলেন প্রতিমা পূজারী, সেখানে এঁরা অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ, কেশব চন্দ্র ও বিবেকানন্দ ছিলেন ব্রাহ্ম। প্রতিমাকে মনে করতেন পুতুল। পরমাশ্চর্য ব্যাপারটি শ্রীমকে ঘিরে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও ছিলেন ব্রাহ্ম। সেই গুপ্ত আর গুপ্ত রইলেন না, হলেন ব্যাপ্ত যখন তিনি লিখলেন মা ভবতারিণীর পূজারীর হেজিওগ্রাফী। সে এমন এক হেজিওগ্রাফী যাকে হাক্সলী বললেন, '...... ...... a book unique · .... in the literature of hegiography.'

শ্রীরামকৃষ্ণ তো প্রায় নিরক্ষর। আর মহেন্দ্র গুপ্ত কলেজে পড়াতেন শেক্সপীয়ার। ঠাকুরের নরেন ছিলেন স্নাতক। আর কেশব চন্দ্র ? এঁর পাণ্ডিত্যের কথা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু এ হেন পণ্ডিতও এক অপণ্ডিতের পদদ্বন্দ্বে দণ্ডবৎ হলেন একদিন যেদিন ঠাকুর বললেন, 'ব্রহ্মকে জান, ব্রহ্মময়ীকে জান না ?'

সন্ন্যাস গ্রহণের পর পাঁচ বছর পার হল। পাঁচ বছর পার হয়েছে, তাই জন্মভূমি দর্শন করা প্রয়োজন। প্রভুর প্রবল ইচ্ছা এবার তিনি ব্রজ রজ স্পর্শ করবেনই। বঙ্গভূমি হয়ে গেলে এক কাজে দু কাজ হয়। জননী জন্মভূমি জাহ্নবী দর্শন হয়, আবার বৃন্দাবন গমনও হয়।

প্রভু যাত্রা করলেন। কিন্তু ভক্তরা যে প্রভুসঙ্গ ছাড়তে চান না, বিশেষ করে গদাধর তো একেবারে নাছোড়বান্দা। কত বোঝালেন প্রভু, 'গদাধর, তুমি ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়েছ। তোমার কি শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ কর। চলে?' না, গদাধর কোন কথাই মানেন না। প্রভু পদে পতিত হয়ে রোদনভরা কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু, কোন নিয়মের অধীন নই আমি, আমি শুধু তোমার অধীন। যে স্থানে তোমার অবস্থান, সেই স্থানই না শ্রীক্ষেত্র।'

প্রভুর কণ্ঠ দৃঢ় হল। বললেন, 'দেখ গদাধর, তোমার ধর্ম চ্যুতিতে আমি অধিক দুঃখ-ক্লিষ্ট হব। তুমি তোমার আত্মসুখ ত্যাগ করে যদি আমার সুখ চাও, তাহলে শ্রীক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে গোপীনাথের সেবা কর। এরপর আর কোন কথা বলোনা।'
—'এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চঢ়িলা।'

হ্যাঁ, এরপর সত্যি গদাধর আর কথা বললেন না। বলবেনই বা কি করে? কারণ,

'মূর্চ্ছিত হৈয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা।'

বিজয়া দশমী। ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৫১৪। প্রভু যাত্রা করলেন। নীলাচল থেকে গৌড়বঙ্গে। সেই নৌকো এসে ভিড়ল

পানিহাটির ঘাটে। প্রভুর কে আছেন পানিহাটীতে? কেন, রাঘব পণ্ডিত। হ্যাঁ, পণ্ডিত তো আছেনই, আর আছেন প্রভুর অগণন ভক্ত। কি রকম অগণন?

'প্রভু আইলা' বলি লোকের হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল॥'

সেই লোকসংঘট্ট কাটাতে বড়ই কষ্ট হল রাঘবের। পণ্ডিত প্রভুকে নিযে এলেন নিজালয়ে। মাত্র একটি দিনের অবস্থান। রাত পোহাল। আর প্রভু 'প্রাতে কুমার হট্টে আইলা— যাঁহা শ্রীনিবাস।'

সে কি, শ্রীবাস পণ্ডিত কামারহাটীতে কেন? পণ্ডিত না নবদ্বীপবাসী! বাড়ী তুজায়গাতেই। তবে প্রভুরও গৃহত্যাগ, পণ্ডিতেরও নবদ্বীপ ত্যাগ। নবদ্বীপচন্দ্র হীন নবদ্বীপে কি আর পণ্ডিত থাকতে পারেন? কেন, নবদ্বীপের আকাশে কি আর চাঁদ ওঠে না? ওঠে। নিত্যই ওঠে। সে তো সকলঙ্ক চন্দ্র। আর পণ্ডিতের হৃদয় আকাশে সদা বিরাজ করছেন অকলঙ্ক চন্দ্র গৌর চন্দ্র। তাঁর অন্তরের অন্তঃপুরে আর তো কেউ নেই। আছেন শুধু একজন। তিনি শচী-নন্দন। তাই না তিনি আর কারুকে দীক্ষা দেননি। দীক্ষা দিলে যে দাতার হৃদয়পুরে সেই শিষ্য বাসা বাঁধে। না, না, তা হয়না। হতে পারেনা। তাঁর হৃদয় রাজ্যে রাজত্ব করবেন শুধু একজন— একা একেশ্বর হয়ে শচীনন্দন। তাই না তিনি ভক্তাখ্য। ভক্তের শিরোপা একমাত্র তাঁরই।

যাহোক, প্রভু যেখানে, ভিড়ও সেখানে। কোথাও তিনি থিতু হতে পারছেন না। একটু বিশ্রামও তো প্রয়োজন। কার

প্রয়োজন কে বোঝে ? শুধু লোক আর লোক— লোকারণ্য। এলেন শিবানন্দ গৃহে । এখান থেকে বাচস্পতির গৃহে। দুই ভাই-ই প্রভুর ভক্ত। বাচস্পতি আর ভট্টাচার্য্য । ভিড় আর ভিড়। প্রভু তখন কি করলেন ? —'লোক ভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা।' এবং রইলেন মাধবের গৃহে। না, তাতেও লোকসংঘট্ট এড়ান গেলনা । প্রভু থাকলেন সাতদিন। না থেকে উপায় কি ? অগণন গণ যে তাঁর দর্শন প্রার্থী। না, আর না। হাতে আর সময় নেই। বঙ্গেই আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে। বঙ্গে এসে সীতাপতির গৃহে যাবেন না —একি কখনো হয় ? ওদিকে একটু দূরপথও অতিক্রম করতে হবে ? যেতে হবে রামকেলি। রামকেলি কেন ? রামকেলিতে যে আছে তাঁর দুই ভক্ত। দর্শন বাসনায় সেই কবে থেকে দৈন্যপত্রী দিয়ে আসছেন এই দুই ভাই। নবাবের রাজপাত্র। সাকর মল্লিক আর দবির খাস । প্রথম জন মন্ত্রী, দ্বিতীয় জন মুখ্য সচিব।

শান্তিপুর সত্যিই শান্তিরপুর । অদ্বৈতের আলয় যে এই স্থানেই। সেই আনন্দের আলয়ে এলেন প্রভু। অদ্বৈত অন্তরের সর্বসৌরভ দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। ওদিকে নবদ্বীপে সংবাদ পৌঁছে গেল। শচীমাতা এলেন। মাতৃ বন্দনা করলেন প্রভু। অনুমতি নিলেন বৃন্দাবন গমনের।

এবার সেই দুই ভাই। দর্শন দিতে এলেন প্রভু রাম কেলিতে। দুই ভাই হস্তে এবং দন্তে তৃণ ধারণ করে প্রভুপদে পতিত হলেন। তাঁদের আঁখি জলে প্রভুর চরণ কমল ভাসমান

হল। প্রভুরও আঁখিপাত সিক্ত তাঁদের দৈন্যে। কণ্ঠ হল বাষ্পাকুল। তাঁদের দৈন্যোক্তি

'শুনি প্রভু কহে, শুন 'সাকর দবির খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস।
আজ হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাঁটে মোর মন॥'

নাম বদলের পালা। তিন নামের মালা। পিতৃ দত্ত নাম অমর ও সন্তোষ। বড অমর আর ছোট সন্তোষ। উভয়েই কুমার দেবের পুত্র। কর্ণাট দেশীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। নিবাস যশোর জেলার ফতেয়াবাদ। কর্মসূত্রে এলেন গৌড়ের রাজধানী মালদায়। ঠিক মালদা না। মালদারই কাছে রামকেলিতে। নাম নিবাস দুইয়েরই হল বদল। আমূল বদল। পূর্বনাম হল বিস্মৃতিতে বিলীন। স্মৃতিতে ঝলমল করল নবাবী খেতাব: সাকর মল্লিক ও দবিরখাস। অমর সাকর মল্লিক আর সন্তোষ দবির খাস। নবাবী খেতাব-খেলাৎ, নবাবীখানা আর নবাবী হাভেলী। আর অসর্ফি? লক্ষ লক্ষ মুঠি মধ্যে। আর তাঁদের মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও যশ? স্বয়ং হোসেন শাহর প্রায় কাছাকাছি।

কিন্তু এমন এক চরম মুহূর্ত এল যখন জীবনের চাকা ঘুরে গেল। ছিল ভোগে, এল ত্যাগে। তখন কোথায় গেল মান-মর্যাদা, কোথায় খেতাব-খেলাৎ, খানা-পিনা আর তনখাহ-তরক্কি। কিন্তু কোথা থেকে পেলেন তাঁরা রাজা জনকের এই অনাসক্তি? মিথিলা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। রাজা জনক দেখেও দেখছেন না। বরং বলছেন,

'অনন্তংবত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চিৎ প্রদহ্যতে॥'

—আমার অনন্ত অর্থবিত্ত, কিন্তু এসব আমার কিছুই নয়। গোটা মিথিলা পুড়ে গেলেও আমার কিছুই পুড়ে যাবে না।

তাঁরা এই নির্লিপ্ততা পেলেন করঙ্গ কৌপীনধারী নবীন সন্ন্যাসী গৌরসুন্দরের কাছ থেকে। প্রসাদে সবই হয়, প্রয়াসে নয়।

প্রভু দু ভাইকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন। বিদায়ের আগে বললেন, 'শোন রূপ-সনাতন, তোমাদের চিত্তভূমি প্রস্তুত। সেখানে এখন কৃষ্ণপ্রেমের সোনা ফলবে। যত শীঘ্র পার, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তখন পথ নির্দেশ দেব।'

এরপর প্রভু কানাইয়ের নাটশালা হয়ে পুনরাগমন করলেন শান্তিপুরে। এখানে দশদিনের অবস্থান। অবস্থান মানে রূপ-সনাতনের মত আরেক ভক্তের সন্ধান লাভ। অবশ্য এঁর চিত্তভূমি তখনও পূর্ণ প্রস্তুতি লাভ করেনি।

কে ইনি? ইনি হচ্ছেন সপ্তগ্রামের গোবর্ধন দাসের পুত্র। নাম রঘুনাথ। এষ্টেটের আয় বছরে বিশ লক্ষ। একমাত্র উত্তরাধিকারী এই রঘুনাথ। সে হেন রঘুনাথের কি না বিষয়ে বীতস্পৃহা।

হাহাকার রব উঠল গোবর্ধনের ঘরে। বংশের শেষ দীপ শিখাটিও নিবে যায় যে। তাহলে এই অতুল বৈভব ভোগ করবে কে? অপ্সরা সম ঘরণী এলেন ঘরে। না, কোন আকর্ষণ নেই রঘুর। থাকবে কেন? সোনার পালঙ্ক চাই না, চাই না সোনার পাত্র, রঘুর চাই সোনার গৌরাঙ্গ। ফলে কি হল? —'তবে আসি

রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা।' তখন রঘুনাথ কি করলেন?

'প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥'

অশ্রুতে ভেসে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে রঘু বললেন, 'প্রভু, কবে আমি নীলাচল যাব? কবে আমি তোমার পদছায়ায় শীতল হব। আমি যে আর এক মুহূর্তও সংসারে থাকতে পারছি না। তুমি এখানে আসার আগে কতবার চেষ্টা করেছি নীলাদ্রি পালিয়ে যেতে। কিন্তু পারি নি। পাইক বরকন্দাজ পথরোধ করেছে। আবার কোন কোন বার পথ থেকেও ধরে নিয়ে এসেছে। এখন তুমি স্বয়ং এখানে এসেছ। তোমার চরণে ঠাঁই দাও, প্রভু।'

শান্ত কণ্ঠে প্রভু বললেন,

'স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥'

আথে ব্যথে অস্থির হয়ে রঘুনাথ শুধোলেন, 'সেদিন আমার কবে হবে?' আশ্বাস বাণী শোনালেন প্রভু,

'বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥'

রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে রঘু বললেন, 'তুমি তো বললে কোন ছলে। কিন্তু

ছলের সন্ধান তো দিলে না।' মৃদু হেসে প্রভু বললেন,

'সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে?'

লোক চরিত্র বিচারের পরমাশ্চর্য শক্তি প্রভুর। এই তো মাত্র কয়েকদিন আগেই সাকব মল্লিক আর দবিব খাসকে নির্দেশ দিলেন যথাশীঘ্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বিষয়বাসনা ত্যাগ করে। আর ঠিক বিপরীত নির্দেশ দিলেন রঘুকে, 'স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।' একজনকে পাঠাচ্ছেন ঘরের ভিতরে, আর দুজনকে আনছেন ঘরের বাইরে। এই রকমই লীলা করেন ত্রিদশের রায়। তাঁর লীলা বোঝা বড়ই দায়। ভক্তের ভাবালুতায় ভেসে যেতেন না। বিচারের কষ্টিপাথরে পরখ করতেন। কেন করতেন? তিনি যে জীব সমাজের ধাতা-ত্রাতা।

দশদিন কাটল শান্তিপুরে। শান্তিতে-পরম শান্তিতেই কাটল। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় কৃষ্ণকথায় কাটল। কাটল কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে। বিদায় বেলা উপস্থিত হল। প্রভু ব্যথাহত কণ্ঠে বললেন, 'এখন বিদায় দাও। তোমাদের সবার শুভ কামনায় আমি নীলাদ্রি যাই। হ্যাঁ ভাল কথা, এবার কিন্তু তোমরা কেউ নীলাচলে যেও না। কারণ পুরীতে ফিরে গিয়েই আমি বৃন্দাবন যাব। বৃন্দাবন যাব বলেই তো বেরিয়েছিলাম, কিন্তু লোকসংঘট্টে আর যাওয়া হল না। এবার আমি যাবই যাব।'

ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু নীলাদ্রি পথ ধরলেন। যথাসময়ে পৌছে জগন্নাথ দর্শন করলেন। সংবাদ বাতাসের আগে চলে। প্রভুও

পৌঁছুলেন, আর অমনি চারদিকে উঠল কলরোল। সব ভক্তই ছুটে এলেন। এলেন কাশীমিশ্র, রামানন্দ. প্রত্যুম্ন, সার্বভৌম, বাণীনাথ, শিখি মাহিতি গদাধর প্রমুখ। কৌতুকী পুরুষ গৌরসুন্দর মৃদু হেসে বললেন, 'ফিরে এলাম। ব্রজে যাওয়া হল না। হবে কি করে? আমি যে আমার গদাধরকে কষ্ট দিয়ে গিয়েছি।' আবার সবাইকে বললেন, 'ব্রজগমনে দেখা দিল আরেক বাধা। একপা এগোতে না এগোতেই লোক সংঘট্ট। এ দৃশ্য দেখে সনাতন কি বলল জান? 'বাপরে বাপ! সঙ্গে দেখছি লক্ষ কোটি— এই কি ব্রজগমনের পরিপাটী?' কথাটা ভাবলাম— রাত্রে কানাইয়ের নাটশালায়। রাজমন্ত্রী তো— বুদ্ধিতে দড়। বড়ই বিচক্ষণ। হক কথাই বলল। আমার মন্ত্রগুরুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীও না একা গিয়েছিলেন। আর একা গিয়েছিলেন বলেই না দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন।'

তখন ভক্তবৃন্দ বললেন, 'বেশ তো প্রভু, না হয় একাই যেও। তবে একটা মিনতি রাখ। অন্তত, এই বর্ষার চার মাস নীলাচলেই থাক। তারপর মন যা চায়, তাই করো। আমরা তোমার ইচ্ছায় বাধ সাধব না।'

প্রভু তো ভক্তের অধীন। ভক্তের ইচ্ছা পূরণের জন্য কত যে তাঁর লীলা।

'এই মত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার॥'

:: ১ম খণ্ড সমাপ্ত ::

বাণী মঞ্জুষা

১। বেদ

২। উপনিষদ

৩। রামায়ণ

৪। সগীতা মহাভারত

৫। ভাগবত

৬। চৈতন্য ভাগবত

৭। চৈতন্য মঙ্গল

৮। চৈতন্য চরিতামৃত

৯। অমিয় নিমাই চরিত

১০। গৌরকথা—
ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

১১। বঙ্গীয় শব্দ কোষ

১২। প্রেমধর্ম ও রাসলীলা :
—হীরেন্দ্র নাথ দত্ত

১৩। মহাজন পদাবলী

১৪। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

১৫। তব কথামৃতম :
—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

১৬। ক) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা :
—নরোত্তম দাস।

খ) নরোত্তমের প্রার্থনা :
—নরোত্তম দাস।

১৭। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন

১৮। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯। মহাত্মা গান্ধী

২০। পি. আর, সরকার

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২। কাজী নজরুল ইসলাম

২৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২৪। স্বামী বিবেকানন্দ

২৫। মীরাবাঈ

২৬। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

২৭। বাংলার মধ্যযুগের বর্ণনা-ঋদ্ধ একাধিক গ্রন্থ

২৮। শেক্সপীয়র

২৯। মিল্টন

৩০। হাক্সলি

শুদ্ধিপত্র—১

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদের পংক্তি	ছাপা আছে	পড়তে হবে
৪	৫	২	যেন	যেমন
৪৩	৩	১	মায়াপুরের	নবদ্বীপের
৪৫	১	৬	আকাঙ্খী	আকাঙ্ক্ষী
১৫৭	১	২	এক সঙ্গে	এক অঙ্গে
১৭৭	১	১	নিত্যানন্দ মহারাজ	নন্দ মহারাজ
২২৮	১	৪	নিরাশায়	নিরালায়
২৪৩	৩	৫	শুধু শুধু	শুধু
২৬৩	৪	৫	দিলেন দিলেন	দিলেন
২৮৩	১	১	অবিশ্বাস	অবিশ্বাসী
৩০৫	১	৪	আন্তর্বেদনা	অন্তর্বেদনা
৩০৬	১	৩	সন্ন্যাসের	সন্ন্যাসীর
৩৩৮	১	২	কেন্দ্রপীরে	কেন্দ্রপীঠে
৩৪৫	১	৫	সর্ব্বে	সর্ব্বৈব
৩৪৬	২	২	নামতে	থামতে
৩৫৪	২	২	workship	worship
৩৮৭	১	১	বাঞ্চল	বঞ্চিল
৪০৯	২	৫	কুলুষের	কলুষের
৪১৩	৪ (শেষ)	১, ২	মোর, সেই	মোয়, সোই

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদের পংক্তি	ছাপা আছে	পড়তে হবে
৪২৯	৩	১	রতি বা ভক্তি	ভক্তি। ভক্তি থেকে রতি
৪৩৭	৫	১	পায়োধরে	পয়োধরে
৪৬০	২	২	বিদ্যামনতা	বিদ্যমানতা
৪৭১	৪	৪	দূবে	দূরে
৪৭৭	৩	৩	কোন	কান
৪৭৭	১	৩	দধী	দর্বি
৪৮৬	৪	২	শুদ্ধ অন্তর	ধন্য হল অন্তর
৫৪৪	২	১৮	নেই কোন জাত পাতের	শব্দ বন্ধটি বাদ যাবে।
৫৭৪	২	৭	প্রাণা	প্রাণ
৫৮৪	১	৯	বীণা	মনোবীণা
৬০৩	১	১	ওদনের অন্নের	উদরের ওদনের
৬১৯	৩	১২	hegiography	hagiography
৬২৮	ক্রমিক সংখ্যা	১৮	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ডঃ সুকুমার সেন

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদের পংক্তি	ছাপা আছে	পড়তে হবে
২১	৩	৩	ভেতি	ভাতি
১৩	২	৬	ব্রহ্মা	ব্রহ্ম
৪৯	২	সম্পূর্ণ শ্লোক		'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সতত- মিদমাভাতিনিতরাং । যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা ॥ দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈর্চ্চ্যরণা । ভবাণীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥'
৫৩	১	৪	ঈষাবাসমিদং	ঈশাবাস্যমিদং
৫৮	৩	শেষ	শরীরে	শরীর
৬৩	২	১	প্রক্ষস্যাত্মন্যথো	দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো
৭৩	শেষ	২	হস্তমিতরেন	হস্তমিতরেণ
			ধুনাম	ধুনাল
			মবুম	মজ্জং
			মুখাব্জলাসনা	মুখাব্জহসম্
৭৭	২	২	স্বপচাধম	শ্বপচাধমঃ

শুদ্ধিপত্র—২ (সংস্কৃত শ্লোক)

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদের পংক্তি	ছাপা আছে	পড়তে হবে
৭৭	৩	২	যেন	যে ন
৮৩	৩	২	গৃহপতির্ণো	গৃহপতির্নো।
			যতির্ধা	যতির্বা।
			পদকমলয়ো-	পদকমলয়ো-
			র্দাসানুদাস	র্দাসদাসানুদাস
৮৭	১	৮	প্রিয়াভন্ত্যাত্মনস্ত	প্রিয়াভবন্ত্যাত্মনস্ত
৯০	১	১	যদ্ধায়তো	যদ্ধ্যায়তো
৯০	শেষ	১	মহর্যাণাং	মহর্ষীণাং
		২	স্থাবরণাং	স্থাবরাণাং
১৪৮	১	১	গণ্ডমনা	গন্তুমনা
১৬৫	১	৫	লবিত্রি	লক্বিত্রী
			পরিত্রী	পবিত্রী
			ক্রিয়াগ্নোরপুমিত্র	ক্রিয়াগ্নোবপুর্মি
			পুত্রী	পুত্রী
১৭৭	২	৪, ৫, ৭	স্থ	নু
			স্তত্তথা	স্যাৎযথা
			ভনতাম	ভণ্যতাম
১৭৭	শেষ	২, ৫, ৬	প্রাণীনং	প্রীণনং

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদের পংক্তি	ছাপা আছে	পড়তে হবে
১৭৭	শেষ	২, ৫, ৬	দুখং	দুঃখং
			কর্ম্মনৈবাভিপদ্যতে	কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে
১৯৭	শেষ	৩, ৪	ভ্রশন্তি	ভ্রশ্যন্তি
			ত্বয়িঃ	ত্বয়ি
			নিস্তয়া	নির্ভয়া
			মূর্ধস্নুপ্রভো	মূর্ধসু প্রভো
২০১	১	৬, ৭	যোগেশ্বরোতীর্ভবতি-স্ত্রিলোক্যাম	যোগেশ্বরোর্ভ-বতস্ত্রিলোক্যাম ।
			বা কথং	ক বা কথং
২৬৪	৩	৬	যস্য	হ্যস্য
২৬৫	৩	৩	সমঃ	শমঃ
২৮১	১	২	নাত্র বিচারণা	নাত্রকালবিচারণা
২৮৩	২	৩	সর্ব	স
২৮৫	শেষ	১	পুরাণঃ	পুরাণঃ যোগঃ
২৮৭	২	৫, ৮, ৯	বিশ্বমনন্তরূপ	বিশ্বমনন্তরূপ
			স্তুর্গ্যাঃ	স্তুর্য্যাঃ
			সর্ব্বগুণপ্রসিদ্ধে	সর্ব্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ
৩২৫	২	৪	মৎপরমোভক্ত	মৎপরমোমদভক্ত

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদের পংক্তি	ছাপা আছে	পড়তে হবে
৩৫১	৩	৬	বর্ণাশ্রমাচারতা	বর্ণশ্রমাচারবতা
৩৫৩	শেষ	৩	যজ্জুহোসি	যজ্জুহোষি
৩৫৭	১	২	স্বকান	স্বকাশ
৩৬২	৩	১০	বাঙ্মনোভির্যে	বাঙ্মনোভির্যে
			প্রাযশেহাজিত	প্রায়শোহজিত
৩৬৪	১	৫, ৬	মার্ত্তরন্ধ্যোঃ	মার্ত্তবন্ধোঃ
			ক্ষুদ্রস্তি	ক্ষুদস্তি
			জববে	জঠবে
৩৬১	১	১, ২	যশ্মামশ্রতি	যশ্মামশ্রুতি
			তস্যতীর্থ	তস্য তীর্থ
৩৬৯	২	২	সনাথ	স নাথ
			জীবিত	জীবিতম ।
৩৬৯	৩	৩	দেহবুজ্জা	দেহবুদ্ধ্যা ।
৩৭১	৩	৪	বিজস্র	বিজহ্রুঃ
৩৭৪	১	২, ৩, ৪	সংস্পৃণ্য	সংস্পৃশ্য
			কেচিন্দ	কেচিদ
			বাদয়ন্তোধ্যান্ত	বাদয়ন্তোধ্মান্ত
			শৃঙাণি	শৃঙ্গাণি

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদের পংক্তি	ছাপা আছে	পড়তে হবে
৩৭৪	১	২, ৩, ৪	কেচিন্দ	কেচিদ
			প্রপায়ত	প্রগায়ন্তঃ
	২	৩, ৪	পাংশুর্ব্ববহু	পাংশুর্দবহু
			কৃচ্ছুতা	কৃচ্ছুতো
			ধৃতাস্মভির্যোগিভি-রপালভ্যঃ	ধৃতাত্মভির্যোগি-ভিরপাশভ্যঃ ।
			সব এব	স এব
৩৮০	১	১, ২	গন্ধরচাং	গন্ধরুচাং
			লম্যাশিষাং	লব্ধশিষাং
ঐ	২	২	স্রগ্ধ	স্রগ্ধী
৩৯১	১	১, ২	অনাত্মনোহন্নুরূপং	অথাত্মনোবরূপং
			লস্যসে	লপ্সসে
ঐ	২	৫	সহসৈখ	সহসৈব
৪০২	শেষ	১, ২	বিষ্ণেস্তস।।	বিষ্ণোস্তস্যা
			তথ	তথা
			গৈবৈকা	সবৈকা
৪০৩	১	৪	অনয়রাধিতো	অনয়ারাধিতো
৪০৪	১	৭	কালিন্দিতটান্ত-কুঞ্জে	কলিন্দনন্দিনী-তটান্ত কুঞ্জে

শুদ্ধিপত্র—২ (সংস্কৃত শ্লোক

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদের পংক্তি	ছাপা আছে	পড়তে হবে
৪১০	১	১, ২	সাধুনাং হৃদয়ন্ত্যহম	সাধুনাং হৃদয়ংত্বহম
			মদন্যতে	মদন্যত্তে
৪২৭	১	৪	ক্ষেত্রজ্ঞাখা	ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা
	৩	৮	মিত্রা	মিশ্রা
৪৩৭	২	৩, ৪	প্রেয়স্যনুপগুণা চাম্যা	প্রেয়স্যানুপমগুণা চান্যা
৪৪১	১	২	ক্রীড়া	ব্রীড়া
৪৫০	২	৫, ৬	মরুন্মনোক্ষদৃঢ়	মরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়
			যন্মনয়	যন্মুনয়
			বয়মনিতে	বয়মপিতে
৪৫১	২	৪	ভুজদণ্ডগৃহীত-কাঠ	ভুজদণ্ডগৃহীত-কণ্ঠ
৪৬০	১	১০, ১১	আত্মানি	আত্মনি
			ব্যঞ্জয়ত্ত্যা	ব্যঞ্জয়ন্ত্যা
			ববৃষুঃ	ববৃষুঃ